Registered No. C. 583.

[illegible] ।] বৈশাখ ১৩১৯ সাল। [১ম সংখ্যা।

উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২নং বউবাজার ষ্ট্রীট
উৎসব কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

কনখল রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম।

একাদশবর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী।

কন্‌খল রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, যাঁহারা উক্ত সেবাশ্রমের নিঃস্বার্থ পরসেবা ব্রতের বিবরণ এখনও শুনেন নাই, অথবা যাঁহাদের নানা কারণে উহার বিস্তারিত কার্য্যবিবরণ পড়িবার সুযোগ বা সাবকাশ নাই, তাঁহাদের গোচরার্থ অদ্য আমরা সংবাদ-পত্রের সাহায্যে উহার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট "দরিদ্র নারায়ণ" সেবার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বারংবার শ্রবণ করিয়া তাঁহার কয়েকজন শিষ্য হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কন্‌খলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একটী ভাড়াটে বাটীতে এই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে ও সর্ব্ব সাধারণের সহযোগিতায় আমরা উহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছি। বিগত দশবর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিদৃষ্ট হইবে। সাধুসন্ন্যাসী দরিদ্র তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় অধিবাসীগণকে রোগের সময় সহানুভূতি ও যত্নের সহিত ঔষধ পথ্য ও শুশ্রূষা দ্বারা রোগমুক্ত করিবার চেষ্টাই ইহার কার্য্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন অর্থাৎ আশ্রম স্থাপনার সময় হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬৯৭৪ জনের চিকিৎসা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৪৫ জনকে আশ্রমের হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছিল, প্রথম দেড় বর্ষে রোগীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১০৫৪ হইয়াছিল, আলোচ্য একাদশবর্ষে উক্ত সংখ্যা ৯৩২০ হইয়াছে অর্থাৎ প্রায় ৯ গুণ বাড়িয়াছে. ইহার মধ্যে কঠিন ও সংক্রামক রোগীর সংখ্যাও বড় কম নহে। যথা প্লেগ ১৯৭, ক্ষয় ১৮৩, কলেরা ২২০ ইত্যাদি, সাধারণের নিকট এপর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৯২২/১৫ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৫০৩৩৭॥/১০ খরচ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে হস্তে উদ্বৃত্ত ছিল ৫৮৪॥৪।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১৫০০ টাকায় ৫/ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া কুটীর করিয়া কার্য্য চলিতে থাকে, পরে সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে ক্রমশঃ উহার মধ্যে বাটী নির্ম্মিত হইতে থাকে, বিভিন্ন বাটী নির্ম্মাণার্থ কি ২ খরচ হইয়াছে,

(ক্রমশঃ)

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

শ্রীনরসিংহায় নমঃ।

শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদ-কৃত স্তোত্র।

(শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক অনূদিত)

প্রশান্ত মননশীল দীপ্ত জ্ঞানালোকে
পরাস্ত দেবতা ঋষি স্তুতিপরায়ণ।
পারি কি তুষিতে আমি অসুর জনম ?
অ-শব্দগোচর তুমি প্রভু নারায়ণ ।১

ধন, অভিজন, রূপ, তপ, বিদ্যা, তেজ,
প্রভাব, পৌরুষ, বল, বুদ্ধি, চতুরতা ;
পূজিতে পুরুষবরে নাহি প্রয়োজন
এ সকল ; ভকতির শুধু সার্থকতা ॥২

পদ্মনাভ পদরজে একান্ত বিমুখ
বহু-গুণান্বিত বিপ্র হইলেও হায় !
মনপ্রাণ সঁপিয়াছে চণ্ডাল অধম
শ্রেষ্ঠ হয়ে পুণ্যবলে সবংশে তরায় ॥৩

করুণাপ্রবণ তাই লহ পূজা তুমি ;
হে পূর্ণ! পূজক তরে পূজা-আয়োজন।
প্রতিবিম্বে শোভে যথা তিলকরচনা
সুরঞ্জিত কর যদি স্বকীয় আনন ॥৪

যাঁর গুণগানে ছিন্ন অবিদ্যাবন্ধন,
তাঁহারি মহিমাগানে কি ভয় আমার !
অবিরাম ভক্তিফুলে পূজিব গো দেব !
সংসার-জলধি সুখে তরিব দুর্ব্বার ॥৫

সংহর সংহর কোপ রূপ ভয়ানক,
উদ্বেজিত হেরি সব ভক্তের অন্তর।
ভক্তিভাবে ভজে এরা ; নাহি বৈরিভাব,
নিজসুখ তরে লীলা, লোক ক্ষেমঙ্কর ॥৬

ভয় নিবারিতে স্মরে শিবরূপ তব,
সংহরি বিকট রূপ দাওহে অভয়।
অসুর হয়েছে হত বিক্রমে তোমার,
উপদ্রবনাশে হৃষ্ট সাধুর হৃদয় ॥৭

করালাস্য, জিহ্বা, নেত্র দীপ্ত-দিবাকর,
আন্ত্রস্রজ, রুধিরাক্ত পিঙ্গল কেশর।
হুঙ্কারে স্তম্ভিত দিক্, সিংহরবে কার ;
হে অজিত ! নাহি ডরি হেরিয়া নখর ॥৮

স্বকর্ম্মরজ্জুতে বদ্ধ, গ্রাসিছে সংসার
হিংস্রজন্তু ; ত্রস্ত বহি গুরু দুঃখভার।
হে দীনবৎসল ! কবে দিবে হে শরণ
অঙ্ঘ্রিমূলে ; ডাকি লবে নিকটে তোমার ॥৯

ক্রমশঃ—

কবে প্রস্তুত হইবে ?

আর কবে প্রস্তুত হ'বে দিন ত ফুরায়। অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ঃ। যাহা শ্রেয় ভাবিয়াছ তাহা অদ্যই কর।

আর কিছুদিন সময় দাও—এখনও যে প্রস্তুত হইতে পারি নাই।

প্রস্তুত হইবার জন্য কি করিতেছ? এই কি তোমার প্রস্তুত হওয়া? সকল কাজে বেশ উদ্যম থাকে, কেবল উদ্যম থাকে না আসল কাজে। আজ শরীরটার যুত নাই, আজ মনটা ঠিক নাই, আজ বাড়ীতে গোলযোগ— দিনের পর দিন কাটে, ইহার অন্ত কি হইল? ইহার অন্ত কি হইবে? এভাবে চলিলে আর তোমায় হইবে না।

শরীর মন বাড়ী যেমন থাক্ তবুও প্রস্তুত হওয়া যায়। করিলেই করা যায়। সময় নাই, সুবিধা নাই—এ মূঢ়ের কথা। যতটুকু সময় পাও, যতটুকু সুবিধা করিতে পার—তাহা লইয়াই আরম্ভ কর। ইহাই মূলধন হউক। আরম্ভ করিলেই শক্তি বাড়িবে। শক্তি বাড়িলেই সদ্গুণ জাগিবে। ক্রমে সব পারিবে।

কিছু জাগাইয়া কিছু অভ্যাস কর। আর হাহা হুহু ছাড়। বেশ বসিতে পারিবে।

শুধু বসা এই না? তিন বেলা। কিছু ছাড়। কিছু ধর।

শ্মশানের ভাব জাগাও—তবে হাহা হুহু ছাড়িবে। এই জাগান ভাব কি?

শ্রীভগবানের আহ্বান না শুনিলে তাঁহার কাছে কি যাওয়া যায়? শ্রীভগবানের আহ্বান শুনিলেই, মানুষ সব ছাড়িয়া ব্রজগোপিকাদের মত তাঁহার কাছে যাইতে পারে। কথা সত্য? ব্রজগোপিকার ভাগ্য যদি তোমার না থাকে? সুখের আহ্বান যদি তুমি না পাও? দুঃখের আহ্বানও তাঁর আহ্বান।

এই ত সে দিন ছেলে গেল? মেয়ে গেল? স্ত্রী গেল? পিতা গিয়াছেন, মাতা গিয়াছেন, স্বামী গিয়াছে, ভাই গিয়াছে, বন্ধু গিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখ—কিছু যায় নাই এমন কি কেহ আছে? লোকের যায়, তোমার এখনও আছে—যেতেও পারে! এ ভাবিয়াও ত প্রস্তুত হইতে হয়।

এক পরামর্শ শ্রবণ কর। হাহা হুহু হিহি ছাড়িবার কৌশল, মনকে ভগবানের দিকে ফিরাইবার কৌশল—এই শ্মশান ভাবনা।

শ্মশানে চিতা জ্বলিতে কে না দেখিয়াছে? মণিকর্ণিকা, হরিশ্চন্দ্র; নিমতলা, শ্মশানেশ্বর অথবা পল্লীগ্রামের শ্মশান কে না দেখিয়াছে? বাহিরের শ্মশানে গেলে কিছুই হয় না। ভিতরের শ্মশানে একবার প্রবেশ কর। যাহার যাহা গিয়াছে, তাহার চিতাই একবার করিয়া হৃদয়ে জ্বাল। সেই মৃত্যুকালের কাতর ভাব, সেই নিঃশব্দে চক্ষের জল, সেই শয্যাকণ্টকী, তাহার পরে ঊর্দ্ধ চক্ষু, তাহার পর চিতায় দেহ সমর্পণ।

বসিয়াই প্রথমে হৃদয়ে চিতা চিন্তা কর। বৈরাগ্য আসিবেই।

মন! কিছুতেই ত হাহা হুহু হিহি তোমার যায় না। তোমাকে শ্রীরামপ্রসাদ ভুলোমামা বলিতেন। হৃদিশ্মশানে প্রিয়জনের চিতাধূমই তোমার অসম্বদ্ধ প্রলাপ ছাড়াইতে পারে; তোমার হাহা হুহু হিহি ছাড়াইতে পারে। প্রত্যহ বৈরাগ্য আনিয়া তোমাকে অভ্যাসের বস্তু দিতে হয়; তবে কাজ হয়।

মনকে বিরাগী কর। করিয়া অভ্যাস কর। তার পরে মুমুক্ষুর অবস্থা ভাব। পুরুষার্থ এই ভাবে জাগিবে। যদি দেখ দিবাতে ইহা হয় না—রাত্রিতে ইহা অভ্যাস কর; অনেক সময় পাইবে। অল্পে অল্পে অভ্যাস করিতে হয়। একবারে বেশী করিতে গেলে বিপর্য্যয়।

বৈরাগ্য, মুমুক্ষু ইত্যাদি চিন্তা করিয়া উৎপত্তি, স্থিতি, উপশমের পর নির্ব্বাণ হইতেই হইবে।

সান্ত্বনা।

প্রেমময়!

দে'ছ শোক তার সাথে দে'ছ এ'সান্ত্বনা;
শোক নহে হৃদি লয়ে মত্ত হাহাকার!
শোকশান্ত! স্মৃতিপূজা! হৃদয়নিলয়ে
প্রেমমন্ত্রে উপাসনা ভক্তি উপহার।

সেথা নাই কাম-গন্ধ প্রতিদানে আশা,
আত্মদানে জাগে প্রেম, ভক্তি ভালবাসা ;
পূজাগৃহে ধূপসম ধীর আয়োজন—
নীরবে দেবতাপদে নিঃশেষ অর্পণ।

সংসারের কোলাহল সেথা নাহি পশে,
দৃশ্যপট যায় মুছি নয়নের আগে ;
তোমারি পূজার ফুল বিকশে মানসে,
চিত্ত সেথা রহে স্থির প্রেমে অনুরাগে।

শোক শান্তি প্রদানিয়া আতুরে আশ্বাসি,—
হে অনন্ত ! সান্ত্বরূপে ধরা দাও আসি।

মৃ—

কোন্ সম্পদে জন্ম ?

জন্মের দোষ দিবার উপায় নাই। জন্ম যেরূপ ভাবেই হউক না কেন, উন্নতির উপায় শাস্ত্র সর্ব্বত্রই দেখাইয়াছেন। কাটা গাছ হইতে আম্র ফলান যায় না। ইহা বৃক্ষের সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এ নিয়ম আদৌ খাটে না। গাছের ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয় না। এজন্য বৃক্ষ আপনি আপনার উন্নতি করিতে পারে না। মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে। এই ইচ্ছা-শক্তিকে সাধুপথে চালাইলে, মানুষ যতই অধম অবস্থায় আসুক না কেন, অবশ্যই উন্নতিলাভ করিতে পারে। ঋষিগণের সিদ্ধান্ত ইহা। শ্রীগীতা বলেন অতি দুরাচার মনুষ্যও সাধু হইতে পারে। শাস্ত্রে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। রত্নাকর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও দস্যু হইয়া গিয়াছিলেন। ইনি আবার জগদ্বিখ্যাত বাল্মীকি হইয়াছেন। অহল্যা সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিয়াও শেষে আবার এমন কার্য্য করিলেন, যাহাতে তিনি আজও প্রাতঃস্মরণীয়া। প্রহ্লাদ, বলি, বিরোচন ইঁহারা দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। সেদিনের কথা জগাই মাধাই নিতান্ত দুর্জ্জন হইয়াও, আজ বহু পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

আমরা বলিতে চাই মানুষের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। মানুষ, সকল অবস্থা হইতেই উন্নতিলাভ করিতে পারে।

হতাশ হইও না। শোক করিও না। যথাসাধ্য শাস্ত্রপথ অবলম্বন কর। তোমার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। লোকে তোমাকে ভাল বলুক বা ভণ্ড বলুক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিও না। শ্রীভগবান্ মানুষের হৃদয় দেখেন। তিনি তোমার সহায়। শাস্ত্রীয় উদ্যম কখন ত্যাগ করিও না। শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার সহায়।

আর তুমি? শাস্ত্রীয় উদ্যম করিতেছ ভাবিয়া বেশ থাক। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা ইত্যাদি কর—এই তোমার দম্ভ। কিন্তু বাহিরে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের ভান করিলেও, ভিতরে তোমার চরিত্রের দোষ তুমি বিলক্ষণ জান। লোকে তোমায় সাধু বলিলেও, তুমি বেশ জান তুমি কি।

কপটাচার করিও না। বেশ করিয়া আত্মপরীক্ষা কর। করিয়া নিজের মধ্যে অসুরের লক্ষণ যাহা দেখ, তাহা সংশোধন কর। করিয়া দেবতা হইয়া যাও। এই জীবনেই পারিবে। উদ্যম কর।

কিরূপে বুঝিবে তোমার মধ্যে দোষ কি? শ্রবণ কর। ভগবান্ দৈবী-সম্পদ্ কি এবং আসুরসম্পদ্ কি তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। তুমি বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখ—কোন্ সম্পদে তোমার জন্ম? যদি দেখ আসুর ভাব তোমার বিলক্ষণ আছে, আর যদি বুঝিয়া থাক অসুর থাকা নিতান্ত মন্দ তবে আত্মপরীক্ষা দ্বারা দোষগুলি ধরিয়া শাস্ত্রমত তাহার চিকিৎসা কর—ভাল হইয়া যাইবে।

দৈবীসম্পদে মানুষের যে সমস্ত গুণ থাকে, অগ্রে তাহারই উল্লেখ করা যাউক। পরে আসুরসম্পদের দোষ কি তাহা বলা যাইবে।

দৈবীসম্পদের গুণগুলি উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে স্থূলভাবে দৈবীসম্পদ্, আসুরীসম্পদ্ এবং রাক্ষসীসম্পদ্ কি শ্রীগীতা তাহা দেখাইতেছেন।

(১) শাস্ত্রজ্ঞানজনিত ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মজনিত যে ভাল হইবার বাসনা, তাহার নাম শুভবাসনা। ইহা সাত্ত্বিকী। ইহা নিবৃত্তিমার্গে তোমাকে লইয়া যায়। যে সমস্ত গুণ তোমাকে নিবৃত্তিমার্গে বা মোক্ষপথে লইয়া যায়, তাহাই দৈবীসম্পদ্।

(২) লৌকিকজ্ঞান ও লৌকিককর্ম্মজনিত যে বিষয়বাসনা,—যে বিষয়-

বাসনা তোমার আসক্তিকে প্রবল করে এবং তোমাকে নিরন্তর প্রবৃত্তিপথে ছুটাইতে থাকে, তাহাই আসুরীসম্পদ্।

(৩) রাক্ষসীসম্পদ্ যাহা, তাহা দ্বারা মানুষ প্রবলভাবে হিংসাদ্বেষের কার্য্য করে—করিয়া রাক্ষসভাবে বিহার করে।

দৈবীসম্পদজাত গুণ—

(১) অভয়—ঠিক শাস্ত্রমত চলা, আর কিছুতেই ভয় না রাখা। নিতান্ত অপরিচিত স্থানে কে খাইতে দিবে?—আদৌ ভাবনা নাই! অরণ্যে সর্ব্ব-প্রতিগ্রহশূন্য হইয়াও ভয় নাই। মৃত্যুকেও ভয় নাই। শত্রুমধ্যেও ভয় নাই। সে আমার আছে, ভয় করিব কাহাকে? সে যে হৃদয়ে থাকিয়াও অন্য সর্ব্বত্রে ভয় কাহাকে হইবে?

(২) সত্ত্বসংশুদ্ধি—চিত্তে রাগ ও দ্বেষরূপ মলা না থাকা। পরবঞ্চনা নাই। হৃদয়ে এক, বাহিরে আর রূপ মায়া নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাকে অন্যরূপ করিয়া বলা রূপ অনৃত নাই! এই অবস্থায় চিত্তে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয়।

(৩) জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা। সাংখ্যই জ্ঞান। অষ্টাঙ্গ-যোগই যোগ। শাস্ত্র ও আচার্য্যমুখে আত্মা কি, অনাত্মা কি জানিয়া অনাত্মা হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া জানাই জ্ঞান। শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাই স্থায়ী করিবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহাররূপ বহিরঙ্গ সাধন করিয়া, ধারণা-ধ্যান সমাধিরূপ অন্তরঙ্গসাধনের অনুষ্ঠানই যোগ।

(৪) দান—ন্যায়ার্জ্জিত অন্নাদি যথাযোগ্য সৎপাত্রে বিভাগ।

(৫) দম—বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার সর্ব্বদা।

(৬) যজ্ঞ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ), ভূতযজ্ঞ (প্রাণি-দিগকে অন্নদান), মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথি-সেবা), দেবযজ্ঞ (দেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোত্রাদি, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন, মনে মনে শাস্ত্রীয় যুক্তির আলোচনাকে ঋষিযজ্ঞ বলে"। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১২।

(৭) স্বাধ্যায়—বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠ করিয়া গূঢ় অর্থ ধারণা করা।

(৮) তপ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা।

(৯) আর্জ্জব—সরল হওয়া, কপট না হওয়া। যতটুকু জ্ঞান হইয়াছে, শ্রদ্ধাবান্‌কে তাহা গোপন না করা।

(১০) অহিংসা—কোন প্রাণীর জীবিকার উচ্ছেদ না করা। কোন প্রাণীকে কোনরূপ পীড়া না দেওয়া।

(১১) সত্য—যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে এরূপ বাক্যে, অপ্রিয় ও মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া, যেটি যেরূপ সেইরূপ বলা।

(১২) অক্রোধ—অপরে তিরস্কার বা প্রহার করিলে যে ক্রোধ হয়, তাহার নিরোধ।

(১৩) ত্যাগ—সর্ব্ব কর্ম্মফল ঈশ্বরের অর্পণ। তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা।

(১৪) শান্তি মনের নিবৃত্তি; সঙ্কল্পশূন্য হওয়া।

(১৫) অপৈশুন—পরোক্ষে পরের দোষ না প্রকাশ করা।

(১৬) ভূতে দয়া—সর্ব্বভূতকে আপনার ভাবা। দুঃখী-জীবে করুণা।

(১৭) অলোলুপতা—ভোগের বস্তু সত্বেও ইন্দ্রিয়-বিকার না হওয়া।

(১৮) মৃদুতা—কোমল বাক্য সকলকে প্রয়োগ করা।

(১৯) লজ্জা—অকর্ম্ম করণে লোকলজ্জা।

(২০) অচাপল্য—বিনা প্রয়োজনে বাক্-পাণিপাদ ব্যবহার না করা।

(২১) তেজ—স্ত্রী, বালক, দুর্জ্জনের খাতিরে অভিভূত না হওয়া।

(২২) ক্ষমা—সামর্থ্য সত্বেও পরকৃত অপমান সহ্য করা। তাড়না করিলেও শান্ত থাকা।

(২৩) ধৃতি—দেহ ও ইন্দ্রিয় আসন্ন হইলেও স্থির রাখিবার শক্তি। সুখ ও দুঃখে মন চঞ্চল হইতে না দেওয়া।

(২৪) শৌচ—অন্তর ও বাহ্যকে প্রাণায়াম ও মৃজ্জলাদি দ্বারা শুদ্ধি।

(২৫) অদ্রোহ—অন্যকে হিংসা করিবার জন্য অস্ত্রাদি গ্রহণ না করা।

(২৬) অভিমানিতা—কাহারও কাছে মান্য না চাওয়া।

আসুরী সম্পদ্ কি ?

(১) দম্ভ—আমি ভারী ধার্ম্মিক—ইহা লোককে জানাইবার জন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ইহাই ধর্ম্মধ্বজিত্ব।

(২) দর্প—বিদ্যা, ধন, জনের গর্ব্ব। সেই গর্ব্বহেতু মহদাদির অবমাননার প্রবৃত্তি।

(৩) অভিমান—সকলে আমার সম্মান করুক, আমি সকলের পূজ্য—আপনাতে এই শ্রেষ্ঠত্বের আরোপ।

(৪) ক্রোধ—পরের অপকার জন্য অন্তঃকরণের জ্বলন্তাত্মিকা বৃত্তি।

(৫) পারুষ্য—রুক্ষভাষা কহা। কাণাকে পদ্মলোচন বলা, কুরূপকে রূপ-বান্ বলা। হীনকুলকে উত্তম কুল বলা।

(৬) অজ্ঞানতা—কর্ত্তব্যবুদ্ধি-হীন হওয়া। আপনার করণীয় কিছুই নাই। সময় হইলে হইবে এই বুদ্ধি।

যাহারা অসুর-স্বভাবে জন্মিয়াছে, তাহারা কোন্ কোন্ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত তাহাও জানে না; কোন্ কোন্ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত তাহাও জানে না। এরূপ লোক বাহিরের বা ভিতরের শুচির কোন ধার ধারে না। ইহাদের আবার সদাচার কিরূপে থাকিবে? আর প্রিয়-হিত-যথার্থ ভাষণই বা কিরূপে হইবে?

আসুরী-যোনিতে যাহাদের জন্ম তাহারা এই জগৎ সম্বন্ধে কি বলে?

অসুরস্বভাব জনগণ এই জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর বলে। কামই এই জগতের কারণ ইহাও বলে।

জগতের মূলে যে কোন সত্য বস্তু আছে তাহা ইহারা মানে না। বেদ পুরাণাদি প্রমাণশূন্য এই জগৎ। ইহারা বলে ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচর ইহারাই শাস্ত্রকর্ত্তা।

এই জগতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করে—ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আবার কি? এই জগতের আবার সৃষ্টিকর্ত্তা কে থাকিবে? অণু পরমাণুতে যে আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ দুই শক্তি আছে, তাহা হইতেই এই জগৎ উঠিয়াছে। যাহাকে লোকে আত্মা বলে—তাহাও অণুপুঞ্জের একত্র-অবস্থান হেতু জন্মে। ইহাতে কর্ম্মফলবিধাতা কেহ নাই। এই জগতের কোন কর্ত্তাও নাই, কেহ ব্যবস্থাপকও নাই। তবে ইহাতে এই সমস্ত বিচিত্র সৃষ্টি কিরূপে হইল? ইহা অপরাপর সম্ভূত। বিষয়ভোগাভিলাষী স্ত্রীপুরুষ সংযোগ হইতেই জগৎ হইয়াছে ইহারা ইহা বলে। কামই জগতের উৎপত্তির হেতু। ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই।

দুঃখের বিষয় হেকেল-প্রমুখ অনেক আধুনিক বিজ্ঞানবিতের এই মত।

এখন সুধীগণ বিচার করুন, এই মত ঠিক—না গীতা ঠিক? আমরা অধিক আর বলিব না। এইমাত্র বলি, জগৎ যাহাই হউক—এই জগতে প্রচুর দুঃখ আছে। আসুরী সম্পদে জগতের দুঃখ আরও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু দৈবীসম্পদ ধরিয়া ঐ গুণগুলি উপার্জ্জন করিতে পারিলে জগতের দুঃখ দূর হইবে। আসুরী সম্পদের ফল অতি ভীষণ। ইহা জানিয়া মানুষ আপনাদের দেবপ্রকৃতি বৃদ্ধি করিতে যত্ন করুক, তবেই জগতের কল্যাণ হইবে।

প্রবন্ধ শেষে আর একটি বলিয়া উপসংহার করিতেছি। অসুর সম্পদে জন্ম যাঁহাদের, তাঁহারা ত বেদপুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ ধূর্ত্ত, ভণ্ড, নিশাচর কৃত বলিয়া থাকেন। কিন্তু আর এক সম্প্রদায়ের লোক উঠিয়াছেন, তাঁহারা বেদ বা উপনিষদের কতক কতক মানেন, কিন্তু পুরাণাদি মানেন না। এইরূপ লোক যে জন্মিবে তাহা পুরাণকর্ত্তা জানিতেন। তাই আমরা বায়ু পুরাণে ১ম অধ্যায়ে পাই :—

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ। ১৯৯
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥ ২০০

যিনি সাঙ্গোপানিষদ্ চারবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণ জানেন না তিনি বিচক্ষণ নহেন। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া লইতে হয়। যাঁহারা পুরাণ না জানিয়া (না মানার ত কথাই নাই) উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন—শ্রুতি সেই অল্পজ্ঞানীর বা মূর্খের নিকটে এই বলিয়া ভীত হয়েন যে, "মাময়ং প্রহরিষ্যতি" এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে। যাঁহারা বেদ বা উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতে যান, তাঁহাদের কি এই পুরাণবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে?

নূতন বৎসরে—(১) নূতন করিয়া।

যেমন করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিলে, তেমন করিয়া চলিতে পারিলে না। জীবনে কত দোষ হইয়া গেল, এখনও হইতেছে; কারণ, এখনও ঠিক ঠিক চলিতে পারিতেছ না। এখন চেষ্টা কর, এখনও নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। হতাশ হইয়া কি লাভ?

রে চিত্ত! হতাশ ছাড়। আশা রাখ। পথ বলিয়া দিতেছি। আগে কর্ম্মটি ঠিক করিয়া লও। যে সে লোকের উপদেশ মত কর্ম্ম করিলে চলিবে না। কত ত দেখিয়াছ, কত শুনিয়াছ, কত পড়িয়াছ। তোমার মত হইয়াও কি কেহ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন? রত্নাকর ব্রাহ্মণ-দস্যু, তিনিই জগৎপূজ্য বাল্মীকি। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়-রাজা কিন্তু যথেচ্ছাচারী, তিনিই জগদ্বিখ্যাত সাধুব্রাহ্মণ; অহল্যা কুপথগামিনী ভ্রষ্টা, তিনিও প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যা। জগাই মাধাই মাতাল-দস্যু, তাঁহারাও ভক্তশ্রেষ্ঠ। নিতান্ত কুপথে গিয়াও ফিরা যায়, আবার নূতন করিয়া বাঁচা যায়। তুমি পারিবে না কেন? পারিবে।

এস এস আবার পুরাতন কার্য্য নূতন করিয়া করি এস। হইবেই। যদি অল্প সময়ও থাকে, তবু কর; উন্নতি বুঝিতে পারিবেই।

যে-সে লোকের কথা মত কার্য্য করিলে চলিবে না। তুমি যে কার্য্য করিবে, সে কার্য্য সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা পুণ্যশ্লোক আর কেহ করিয়া গিয়াছেন কি না দেখ। ঋষিগণ সেই কার্য্য করিতে বলেন কি না দেখ। আজকালকার ঋষিনামধারী হইলে চলিবে না। কারণ আজকালকার ঋষি, আজ যাহা বলেন কাল তাহা সংশোধন করেন। আজকালকার একজন ঋষি যাহা বলেন, আজ-কালকার অন্য ঋষি তাহা খণ্ডন করেন। এ সব ঋষিদের কথা মত কর্ম্ম করিতে গেলে, বৃথা-পরিশ্রম সার হইবে। এজন্য গুরুবাক্য ও সৎশাস্ত্রবাক্য যখন মিলিয়া যায়, তখনই তোমার ঠিক হয়। নতুবা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য গরমিল হইলে; গুরুও থাকিবেন না, শাস্ত্রও অধিগত হইবেন না। এই জন্য শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্মটি বুঝিয়া লও। যেমন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা গায়ত্রী—অন্য সকলের প্রাণায়াম-জপ-ধ্যান। এই কর্ম্মগুলি শাস্ত্রীয়কর্ম্ম। ইহা ধরিলে ঠকিবার সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মটি লইয়া পরে একটি দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে। কর্ম্মসম্বন্ধে যাঁহাদের গোল নাই, তাঁহারাও যে কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারেন না, তাহার মূল কারণ তাঁহারা প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন না।

আগে প্রাণকে জাগাও। দেখ দেখি এই চিন্তায় প্রাণ জাগে কি না? কর্ম্ম করিতে উৎসাহ পাও কি না?

দেহ ত ছাড়িতেই হইবে—সকলেই ত মরে। কিন্তু কুকুর শৃগালের মত মরিব না। মরি ত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়াই মরিব। "জপই জপই শ্যামনাম ছার তনু করব বিনাশ"।

ব্রাহ্মণ হও—সন্ধ্যার কর্ম্মগুলি জানিয়া লও। প্রাণায়ামটি জানিয়া লও। জানিয়া প্রতিদিন তিন বেলায়, প্রতিবেলায় ধীরে ধীরে, অল্প অল্প করিয়া অভ্যাস করিয়া সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া উত্তম ব্রাহ্মণ হও। সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাং। ভাল ব্রাহ্মণ হইতেও ইচ্ছা অথচ কার্য্য করিব না কিছুই। উত্তম ব্রাহ্মণ সহস্র জপ করিবেন, মধ্যম করিবেন শত, আর অধমের জন্য দশ। যাঁহারা এ পাঠ রাখেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন; শত উপাধি থাকিলেও নহেন। "সময়ে কুলায় না" যদি এই বলা হয়, তাহার উত্তর শূদ্রত্ব আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলেরই কি সময়ে কুলায় না? তাহা নহে। বেশ ত কাশীতে গিয়াছ! অন্য কার্য্য ত নাই। ব্রাহ্মণ বলাইতে চাও, তবে প্রতিদিন তিন বেলায় সহস্রবার করিয়া তিনসহস্র কর না। করিয়া দেখ না তুমি কেমন দাঁড়াও। প্রাণায়ামের সাহায্যে, কুম্ভকের সাহায্যে, হাজার করিয়া কর অথবা শুধু জপই কর।

রে চিত্ত! মরিবেই ত। যতদিন না জ্ঞানলাভ হয় ততদিন কর্ম্ম ছাড়িও না। মরণ হয় হউক; কর্ম্ম করিতে করিতে মরিব এই সঙ্কল্প দৃঢ় কর। আলস্য অনিচ্ছায় দিন কাটাইয়া মরিবে কেন? শাস্ত্র মানিয়া শাস্ত্র মত তিন বেলা কর্ম্ম করিব। ইহাতে মৃত্যু হয় হউক। একটা বলিবার থাকিবে, ঋষিগণের কথামত চলিতে প্রাণপণ করিয়াছি। ইহাতে সন্তোষ থাকিবে—ইহাতে নিশ্চয়ই সদ্গতি হইবে। ফলে যদি ঋষিদিগের কথামত সহস্র জপ সহ ত্রিসন্ধ্যা কর, তবে সাধারণ লোকের মত মরিবেই না। ইহাতে পশুর মত মৃত্যু হইতেই পারে না। যদি পূর্ব্বকৃত সুকৃতি থাকে, যদি কর্ম্মের সহিত স্বাধ্যায় থাকে, তবে এই জন্মেই জ্ঞানও হইয়া যাইতে পারে। আর যদি দুষ্কৃতি থাকে তবে

ঐরূপ কর্ম্মের চেষ্টাতেও, তুমি তোমার অবস্থা উন্নত করিয়া শান্তমনে দেহ ছাড়িতে পারিবে।

মৃত্যুপণ করিয়া কর্ম্ম কর। যতই পতিত হইয়া যাও না কেন, শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিতে পারিলেই বুঝিবে উন্নত অবস্থা আসিতেছে। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে পারাই পাপক্ষয়ের চিহ্ন। এইরূপ কর্ম্ম ও স্বাধ্যায় লইয়া জীবন কাটানকেই বলিতেছিলাম নূতন করিয়া।

এই কর্ম্মের বিঘ্ন যাহাতে হয় তাহাই মৃত্যু ভাবিয়া, উহা দূরে বর্জ্জন কর। "আয়েস" করিতে যিনি বলেন, তিনিই মৃত্যুর দূত ইহা জান। যত প্রকার সাধনা জানিয়াছ, ইহাদের মধ্যে প্রধান কর্ম্ম যেটি—যেটি করিতে তোমার স্বভাবতঃ কিছু ভাল লাগে, তাহাকে মুখ্য করিয়া অন্যগুলিকে গৌণভাবে অবলম্বন কর। করিয়া সকল কর্ম্মে এক কর্ম্মই কর। সব সাধিয়া একই সাধ। দেখনা সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা, এতদ্ভিন্ন জল, সূর্য্য, অগ্নি সব আছে; সব সাহায্যে একেকেই ডাকা হয়। মরিবই ত —এই কর্ম্ম করিয়া মরিব এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া চল; দেখদেখি কে তোমার সহায় হয়?

আর এক কথা। যদি অর্থ বুঝিতে নাও পার, তবে "তুমি প্রসন্ন হও" এই কথার দৃঢ়স্মরণে লৌকিক-বৈদিক যাহা করিবে তাহা করিয়া চল। জপকালে চক্ষুকে সূর্য্যমণ্ডলে ও কাণকে মনে জপ-উচ্চারণের শব্দে একাগ্র কর, হইবেই হইবে। আর কি বলা যাইবে—যদি ইহা না রুচি হয়, তবে যা করিতেছ করিয়া যেখানে যাইতেছ সেইখানেই যাইবে, আর কি হইবে? তাই বলি জ্ঞান যতদিন না হইতেছে, ততদিন কর্ম্ম কর; শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিয়া শতবৎসর আয়ু ধারণ কর। শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"॥

নূতন বৎসরে (২) জাগ্রত হওয়া।

এতদিন ত গেল—তুমি যাহারই কেন উপাসনা কর—কয়দিন তোমার উপাস্য দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিলে—ঠাকুর তুমি আছ তাহা বিশ্বাস করি; কিন্তু চিরদিনই কি বিশ্বাস লইয়াই থাকিব? তোমায়

প্রত্যক্ষ করিতে চাই। স্থূলনেত্রে তোমার যা দেখা যায়, তাহা দেখিতে চাই; আবার তৃতীয় নেত্রে যাহা দেখা যায় তাহাও দেখিতে চাই।

কয় দিন বলিতে পারিলে তুমি কি সত্য সত্যই আছ? বিশ্বাসে ত আছ বলি - না বলিলে চলেনা তাই বলি। যাহাদের চলে, তাহারা বলে না। আমার ত চলে না। বিশ্বাসে বলিলেও সত্য সত্য তুমি আছ, ঠিক ঠিক তুমি যেমন—শাস্ত্র যেমন বলিয়াছেন, ঋষিগণ যেমন বলিয়াছেন—তেমন করিয়া কৈ তোমায় দেখিলাম? কৈ তোমায় অনুভব করিলাম?

তোমায় দেখিলে পাপ ছুটিয়া যায়, অসম্বদ্ধ প্রলাপ দূর হয়, জড়তা তিরোভূত হয় শুনি। তোমায় দেখিলে মন আর অন্য কাহারও সহিত কথা কহিতে পারে না; তোমায় দেখিলে মানুষ আর অসত্যের সেবা করিতে পারে না; তোমায় দেখিলে স্বার্থের যজন হয় না; তোমায় দেখিলে মোহ আর থাকে না। তোমায় যেখানেই দেখি না কেন—ভিতরেই দেখি বা বাহিরেই দেখি—তোমায় দেখিলে—সর্ব্বত্র তুমি—তোমায় প্রণাম করিতে ভুল হয় না। কিন্তু এ সব হইল কৈ? মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু” ইহার কোনটি সাধনা হইল? কোনটি প্রবাহক্রমে চলিল? কোনটি লইয়া অনুক্ষণ থাকা গেল?

“মাং নমস্কুরু” তুমি বলিয়াছ সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই সহজ। যাহার সঙ্গে মতে মিলিল না, যে আমার অতি প্রিয় বস্তুকেও মিথ্যা প্রমাণ করিতে চায়, যাহার উপর চিত্তের অপ্রসন্ন ভাব হওয়া প্রায় দেখা যায়—কিন্তু তুমি ত তাহার মধ্যে আছ—তবে সেইটি স্মরণ করিয়া কৈ “মাং নমস্কুরু” সাধনা হইল? কৈ তাহাকেও তুমি ভাবিয়া, মনে মনে প্রণাম করিয়া, অতি শান্তভাবে কথা কহিতে পারিলাম? যদি সর্ব্বদা ‘মাং নমস্কুরু” মনে না রহিল, তবে আর উহার সাধনা কি হইল? যদি সর্ব্ববস্তু মধ্যে মায়িক ইন্দ্রজাল বাদ দিয়া তোমায় দেখিতে না পারিলাম, তবে সাধনায় অগ্রসর হইলাম কৈ?

নিত্যক্রিয়া-কালে যখন মন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, যখন ইহাকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না, তখন সময়ে সময়ে তুমি স্মরণ করাইয়া দাও মাং নমস্কুরু। সেই সময়ে প্রতি মন্ত্র উচ্চারণে—অর্থ বুঝিতে পারি বা না পারি, উচ্চারণে কেবলই নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে; কেবল নমস্কার করিতে

করিতে চক্ষে জল আসে, মন অসম্বদ্ধ প্রলাপ ছাড়ে, প্রাণে আশা জাগে। মনে হয় মাং নমস্কুরু সাধনা আর ছাড়িব না। কি নির্জ্জনে, কি লোকসঙ্গে সর্ব্বগত তোমাকে মনে মনে নমস্কার করিব; সকলকে তুমি ভাবিয়া আগে নমস্কার করিয়া সর্ব্বদা হুঁসিয়ারে থাকিব; মন্ত্রকেও তুমি ভাবিয়া নমস্কার করিব—কতবার ত ইহা করিব ভাবিলাম, কিন্তু কার্য্যে হইল কৈ?

সকলকে তুমি ভাবিয়া কথা কহিব—কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল কৈ? তবে কি ইহা এই ভাবে হয় না? কোন্ ভাবে তবে হয়?

তোমাকে আগে দেখিলে, তোমাকে আগে বুঝিলে, বুঝি ইহা সহজে হয়। তোমাকে দেখার সাধনা তবে কি প্রথমে করিতে হইবে? সর্ব্বদা তোমার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে? তুমি সত্য সত্যই যদি আছ, তবে তুমি একবার এস ইহাই কি প্রথম করা চাই?

তবে কি নিত্য কর্ম্ম বাদ দিয়া প্রথমে উহাই করিতে হইবে? হায়! তাহা ত ঠিক নহে। তোমার জন্য উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত হওয়া—এটা বহুকাল ধরিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করার ফল। তবে যাঁহাদের প্রথম বয়সেই ইহা হয়, তাঁহারা মহাপুরুষ! মহাপুরুষের আচরণ দেখিয়া প্রাণে উৎকণ্ঠা নাই কিন্তু উৎকণ্ঠার কথা কহিলে তাহাতে ত কোন কাজ হয় না। একটা প্রাণশূন্য অভ্যাস চলে মাত্র। কিন্তু অভ্যাসের সময়েও অসম্বদ্ধ প্রলাপ চলে, প্রবল লয় উঠে।

শ্রীগৌরাঙ্গ, ভাবে নৃত্য করিতেন—সবাই কি ইহা পারিতেছে? লোককে নাচিয়া ভাব আনিতে হয়। ভাবে নৃত্য ও নাচিয়া ভাব আনার যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য মহাপুরুষের সহিত সাধারণ মানুষের। তবে কি হইবে?

তোমার আজ্ঞা পালন প্রথমে। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত তোমার আজ্ঞা। রস পাই না পাই, তোমার আজ্ঞা বলিয়া ইহা করিতেই হইবে। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করা চাই না: শুধু করা চাই তোমার আজ্ঞা বলিয়া; যাহাকে ভালবাসি তাহার আজ্ঞা পালন করাই প্রকৃত ভালবাসার চিহ্ন। নিত্যক্রিয়ার পর কথা কওয়া অভ্যাস করা চাই, মনে মনে পূজা অভ্যাস করা চাই, মাং নমস্কুরু অভ্যাস করা চাই। কখন বা নিত্যক্রিয়া-কালে মাং নমস্কুরু অভ্যাস রাখিয়া, প্রণাম প্রদক্ষিণ অভ্যাস করিতে করিতে নিত্য ক্রিয়া করা চাই। তার পরে একান্তে কৈ তোমায় পাইলাম? কৈ তোমার প্রসন্নতা

অনুভব করিলাম ? কৈ তোমার আজ্ঞামত সাধনা করিতে পারিলাম ? আহা ! তুমি প্রসন্ন হও ! তুমি কৃপা কর ! সাধনার প্রথম স্তরে এইগুলি। যাঁহারা উপরে উঠিয়াছেন, তাঁহারা ধারণা, ধ্যান, সমাধি অভ্যাস করিবেন। সকলেই চেষ্টা করিবেন। না পারিলে বুঝিতে হইবে নীচের সাধনা পাকা হয় নাই। এই ভাবে সমকালে সাধনাগুলি অভ্যাস করিলে হইবে—করিয়া চল। শাস্ত্রই ইহা বলিতেছেন। জপাৎ শ্রান্তপুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্ত পুণর্জ্জপেৎ জপ ধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানাঞ্চ বিচারয়েৎ তোমারই আজ্ঞা।

শরণাপন্ন হওয়া কাহার নাম ?

হে ভগবন! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম—আমার আর কেহ নাই। তুমি আমায় রক্ষা কর। এইরূপ প্রার্থনা বিপন্নব্যক্তির মুখ হইতে যেন আপনা হইতে বাহির হয়। তবেই দেখা যায় যেখানে শরণাপত্তি—সেখানেই যেন আমার আর কেহ নাই আমায় রক্ষা, কর এই ভাব আছে।

শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে আমরা সকলেই চাই। কিন্তু প্রকৃত শরণ লওয়া কয়জনের হয় ? কেনই বা হয় না ?

বিপদে না পড়িলে শরণ লওয়া হয় না। বিপদ সর্ব্বদাই জীবের লাগিয়া আছে। পশু, পক্ষী, বালক ইত্যাদি জীব নিজের বিপদ বুঝে না। ইহারা যতক্ষণ আহত না হয় ততক্ষণ ক্লেশ বোধ করে না; অথবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের সম্মুখে ভয়ের বস্তু থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা ভয়ের ব্যথা অনুভব করে ও ভয় প্রকাশ করে। ইহারা ইহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে না বলিয়াই, শ্রীভগবানের শরণ লয় না। ইহারা অজ্ঞানে নিতান্ত আচ্ছন্ন বলিয়াই নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

যে সমস্ত নরনারী বালকের মত, যাহারা বালকের মত নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝে না, যাহারা বালকদিগের মত এত অধিক বস্তু প্রার্থনা করে যাহাতে বুঝা যায় তাহারা তাহাদের মন বুঝে না, এক কথায় যাহারা বালকের মত বিচারশূন্য অথবা বয়স্কবালকের মত শীঘ্র শীঘ্র একটা ধারণা করিয়া ফেলে, এইরূপ প্রকৃতির বৃদ্ধ বালক বা বৃদ্ধা বালিকা বিপদে পড়িয়া

ভগবানের নাম লইলেও ইহারা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে না। শরণাপন্ন হইতে হইলে যতটুকু স্থির মতির আবশ্যক, যতটুকু বিচার-বুদ্ধির আবশ্যক, যতটুকু বৈরাগ্য আবশ্যক, ততটুকু বিচারবুদ্ধি-প্রসূত বৈরাগ্য ইহাদের নাই। বিপদে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া ডাকিতে ভুলিয়া যায়। বিপদে একবারে বুদ্ধিলোপ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ডাকে ; আবার সামান্য আশার আলোকে হর্ষে আত্মহারা হইয়া ডাকা ছাড়িয়া দেয়। ইহা-দের অব্যবস্থিত চিত্ত ক্ষণে আশা, ক্ষণে হতাশ অর্থাৎ অল্প সুখে অল্প দুঃখে ইহারা বেহুঁস হইয়া পড়ে। ইহারা অতি অল্প সময়ের জন্যও এক ভাবে থাকিতে পারে না ; আশা ও হতাশের দোলায় নিরন্তর দোদুল্যমান হয় বলিয়া ঠিক শরণাপন্ন হইতে পারে না।

পশু, পক্ষী, বালক, বালকের মত যুবক বা বৃদ্ধ—ইহারা যে শরণাপত্তির বাহিরে আমরা তাহাই প্রথমে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে যাঁহারা যথার্থ শরণাপন্ন তাঁহাদের অবস্থা আলোচনা করিব। মৌখিক শরণাপন্ন না হইয়া যদ্দ্বারা মনেপ্রাণে শরণাপন্ন হওয়া যায়, তাহার আলোচনাই প্রয়োজন। বিপদ-নিবৃত্তির এমন সার্ব্বজনীন উপায় অথবা সার্ব্বভৌমিক উপায় আর কি দ্বিতীয় আছে ?

"মামেকং শরণং ব্রজ"—সমস্ত গীতার উপদেশের পরে শ্রীভগবান্ এই "শরণাপত্তি"তে গীতার উপসংহার করিয়াছেন। সমস্ত উপদেশ দিয়া, শেষে বলিতেছেন আমার শরণাপন্ন হও ?

যথার্থ শরণাপন্ন কে হইতে পারে ?

যিনি এই মৃত্যু সংসারসাগরের তীরে একবারও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ইহার ভীষণ তরঙ্গাস্ফালন দেখিয়াছেন, যিনি ইহার পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ-আস্ফালনে কিরূপে তরঙ্গপতিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত হইতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, যিনি সেই মৃত্যুসংসারসাগর-তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলরাশি মধ্যে ভয়ানক সর্প, হাঙ্গর, কুম্ভীরাদি সদ্যপ্রাণহারী জীবজন্তুর ভীষণ অবয়ব একবারও নিরীক্ষণ করিয়াছেন তিনিই যথার্থভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন।

যিনি সংসারের সর্ব্বত্র মৃত্যুর নিষ্ঠুর ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছেন, যিনি সংসারের সর্ব্বজীবে মৃত্যুর প্রধান সহচর পাপের দুর্লক্ষ্য বিচরণ অনুভব করিতেছেন—

তিনি এখানে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া থাকিলেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

হায়! এ সংসারে মৃত্যু ও পাপের মর্ম্মন্তুদ যাতনা কে না দেখিয়াছে? কে না নিত্য দেখিতেছে? তথাপি যাহারা পশুপক্ষীর মত স্বভাব বিশিষ্ট অথবা যাহারা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, পাপও অবশ্যই হইয়া যাইবে—তবে ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও যতটুকু পারা যায় ভোগ করিয়া লওয়া যাউক, যতটুকু পারা যায় পাপ হইতে সতর্ক হওয়া যাউক—এইরূপ জ্ঞানের আভাযুক্ত অজ্ঞানী যাহারা, তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া জীবের নিতান্ত আবশ্যক। জ্ঞানাভাযুক্ত অজ্ঞানী-গণ যে ঈশ্বরকে ডাকে, সেও তাহাদের ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিগুলির কার্য্যগুলি তিনি নিষ্পন্ন করিয়া দিবেন এই বিশ্বাসে? তাহাদের শরীর সুস্থ রাখিবেন বা তাহাদের স্বকপোলকল্পিত ইচ্ছার প্রসার তিনি করিয়া দিবেন সেইজন্য। কিন্তু যিনি সংসারের যথার্থ রূপ দেখিয়াছেন তিনি শরণাপন্ন হইবেন জরামরণ হইতে মুক্তিলাভ জন্য, তিনি শরণাপন্ন হইবেন মৃত্যুর নিদারুণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ জন্য, তিনি শরণাপন্ন হইবেন পাপের দুর্লক্ষ্য আক্রমণে নিতান্ত ভীত হইয়া।

আমি পাপা ইহা চিন্তা না করিয়া, আমি পবিত্রাত্মা সর্ব্বদা চিন্তা কর; এই উপদেশ অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু শুধু পবিত্রাত্মা পবিত্রাত্মা বলিয়া চিন্তায় কি হইবে—যদি কার্য্যে নানা প্রকার পাপ হইতে থাকে?

অন্যের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তাহাতে দোষারোপরূপ অসূয়া যতদিন আছে অন্যকে স্বমতের প্রতিবাদ করিতে শুনিয়া যতক্ষণ জ্বলনাত্মিকাবৃত্তির উদয়ে প্রতিবাদকারীর প্রতি অবিনীতবাক্য প্রয়োগ আছে, বিষয়-মৃগতৃষ্ণায় দিক্-বিদিক্ শূন্য হইয়া যতক্ষণ নিজ স্বার্থ জন্য অন্যের মনঃপাড়া দেওয়া আছে, স্বার্থান্ধ হইয়া যতক্ষণ মিথ্যা কথা নিতান্ত দোষের জানিয়াও স্বার্থরক্ষার জন্য মিথ্যার সমর্থন আছে, জীবে-দয়া শাস্ত্রবাক্য জানিয়াও যতক্ষণ নিজের শরীরের জন্য অন্যজীবের প্রাণহানিরূপ হিংসাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া আছে, যতদিন আটপৌরে ও পোষাকী চরিত্র তোমার আছে—বল ততদিন তুমি পবিত্রাত্মা, তুমি পবিত্রাত্মা, এই চিন্তা তোমাকে কার্য্যে পবিত্র করিল কোথায়? ভগবান্ শঙ্কর এই সমস্ত কর্ম্মদোষ প্রক্ষালন জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"অবিনয়মপময় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয় মৃগতৃষ্ণাম্। ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ"॥ আমরা পবিত্রাত্মা হইয়া কি এই সমস্ত দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি ?

ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের গুণের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

(১) তিনি কাহারও গুণ-উল্লেখের সময় দোষ দেখাইয়া দিতেন না।

(২) পরুষবাক্য বলিলে প্রত্যুত্তর করিতেন না।

(৩) শত অপকার করিলেও অপকার স্মরণ করিতেন না।

(৪) মিথ্যা কথা কহিতেন না।

(৫) শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেন না।

(৬) শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা শ্রবণ করিতেন না।

(৭) পরের দোষ যেমন জানিতে পারিতেন, নিজের দোষও সেইরূপ জানিতেন।

আরও কত আছে, কয়টি উল্লেখ করা যাইবে ? এক কথায় বলি, যতদিন রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য করা আছে, ততদিন বুঝিয়া রাখা উচিত—মৃত্যু ও পাপ সর্ব্ব অঙ্গে বিচরণ করিতেছে। শুধু চিন্তা করিলে কি হইবে আমি পবিত্রাত্মা—ইহা উপলব্ধি জন্য সাধনা করিতে হইবে, তবে আমরা পাপ-ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব। আজকালকার কেহ কেহ বলেন, কর্ম্ম করিও না, কর্ম্ম ত্যাগ কর—শুধু "মেডিটেশন" কর। আমরা ইহার আর কি প্রতিবাদ করিব ? জার্ম্মনীর প্রধান চিন্তাশীল গ্রন্থকার গেটে এই সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাই ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ। গেটে বলেন—

How can a man learn to know himself ? Never by meditating but by doing" ইত্যাদি। যদিও ইহা সত্য যে গেটে "Know thyself" ইহার অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন, তথাপি উপরোক্ত বাক্য সম্পূর্ণ সত্য।

আর এক কথা যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম্ম কর্ম্মাধিকারীর অবশ্য করণীয় —শ্রীভগবান্ ইহা উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় নিত্যকর্ম্ম-ত্যাগীর সংখ্যা আজকাল কত বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীগীতা বলেন যাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ তামসত্যাগী, কেহ রাজসত্যাগী। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া পাপের মন্ত্র আওড়াইয়া কি ফল—ইহাতে কোন উপকার নাই। এইরূপে যাহারা মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহারা তামস।

যাঁহারা স্নান সন্ধ্যাদি এবং অতিথি-সেবারূপ কর্ম্মে বিশেষ ক্লেশ ভাবিয়া নিত্য-কর্ম্মাদি করেন না, তাঁহারা রাজসত্যাগী ; কিন্তু যাঁহারা আমি কর্ত্তা—এই অভি-মান না রাখিয়া এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি করেন অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করেন, কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন—তাঁহারাই সাত্ত্বিকত্যাগী। তাঁহারাই ত্যাগের ফল যে জ্ঞান বা অমরত্ব তাহাই লাভ করিতে পারেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ ত্যাগী আজ কাল কয়জন? তাই বলি পাপভয়ে ভীত হও, মৃত্যুভয়ে ভীত হও :—হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও।

আজকাল আর এক সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, যাঁহারা অন্য শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলেন না—একমাত্র বেদই শাস্ত্র। আমরা জানি আমাদের সমস্ত শাস্ত্র বেদ-প্রমুখ। বেদে যাহা নাই, তাহা কোন শাস্ত্রই সমর্থন করেন না। বেদ এই সম্বন্ধে কি বলেন, তাহাই না হয় দেখা যাউক।

বেদ বলিতেছেন :—

দেবাবৈ মৃত্যোর্ব্বিভ্যত স্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্যদেভিরচ্ছা-দয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্তম্।

দেবাবৈ মৃত্যোর্ম্মারকাদ্বিভ্যতঃ কিং॥কৃতবন্ত ইত্যুচ্যতে এয়ীং বিদ্যাং এয়ী-বিহিতং কর্ম্ম প্রাবিশন্ প্রবিষ্টবন্তো বৈদিকং কর্ম্ম প্রারব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ। তন্মৃত্যো-স্ত্রাণং মন্যমানাঃ। কিঞ্চ তে কর্ম্মণ্যবিনিযুক্তৈঃ ছন্দোভির্ম্মন্ত্রৈ র্জ্জপ হোমাদি কুর্ব্বন্ত আত্মানং কর্ম্মান্তরেষ্বচ্ছাদয়ন্ ছাদিতবন্তঃ। যৎ যস্মাদেভির্ম্মন্ত্রৈরাচ্ছাদয়ন্ত-স্তস্মাচ্ছন্দসাং মন্ত্রাণাং ছান্দনাচ্ছন্দস্ত্বং প্রসিদ্ধ মেব।

ছান্দোগ্য প্রথমঃ প্রপাঠকঃ চতুর্থ খণ্ডঃ ॥২॥

ভাবার্থ এই :—দেবগণও মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ জন্য বেদবিদ্যা আশ্রয় করিয়া বৈদিককর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। অসুরের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ অনেক সময় বৈদিক যজ্ঞাদি করিতেন। যখন যজ্ঞাদি শেষ হইয়া যাইত, তখনও ছন্দোগান, মন্ত্রজপ, হোমাদি ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মে আচ্ছন্ন থাকিতেন বলিয়া তাঁহাদের মৃত্যু-ভয় থাকিত না। যেহেতু ঐ সকল মন্ত্র দেবগণকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিত, সেই জন্য ঐ সকল মন্ত্রের নাম ছন্দ। ছন্দ=যাহা আচ্ছাদন করিয়া রাখে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—ঈশা বাস্য-

মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগতে গতিশীল যাহা আছে, তাহাকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেল ইত্যাদি।

আর কি বলা যাইবে? ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিলেই, পাপ বা মৃত্যু আক্রমণ করিবেই। শ্রুতি স্মৃতি এক বাক্যে ইহা দেখাইতেছেন। শ্রীগীতাও সেই জন্য বলিতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

ধর্ম্মটি প্রকৃতির। পুরুষের ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া আমার (পুরুষের আত্মার) শরণাপন্ন হও। [আমার দ্বারা তোমার প্রকৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া ফেল, তবেই] আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।

এই সমস্ত কারণে বলা হয়, ত্রিসন্ধ্যার নিত্যকর্ম্ম ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া (অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে) কর; অন্য সময়ে সর্ব্বদা জপ যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকে। যদি পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মবশে অন্য কর্ম্ম করিতে হয়, তবে সেই কর্ম্মের অবসানে অথবা তাহার স্বল্প বিরামকালেও জপ যজ্ঞ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন কর। কত সময় বৃথা গল্পে, বৃথা পরনিন্দায়, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নষ্ট হয়; তাহা করিও না। সময়ের সৎব্যবহার কর— ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে পারিবে। তখন মৃত্যু-ভয় থাকিবে না। ইতি।

কপালে যা আছে।

কপালে যা আছে তাহা ত হইবেই—আমি আর চেষ্টা কি করিব— এই মত ধারণা যাঁহাদের, তাঁহারা পুরুষকার-বর্জ্জিত দৈব অবলম্বন করেন।

কপালে যা আছে তাহা ত হইবেই—আমি করিয়া যাই—এই মত ধারণা যাঁহাদের তাঁহারা পুরুষকার সংযুক্ত দৈব অবলম্বন করেন।

শাস্ত্রে যেখানে দৈবকে প্রবল করা হইয়াছে সেখানে পুরুষকারকে তুচ্ছ করা হয় নাই। দৈবে যাহা পারে করুক, আমি পুরুষকার মত কার্য্য করিবই। দৈব ত বাধা দিবে—তা বলিয়া আমি অলস হইয়া থাকিব

না। আমি পুরুষকার লইয়া কার্য্য করিব—দৈব বাধা দিলেই শেষে পুরুষকার দ্বারা দৈব নিহত হইবে—অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্র এই মীমাংসা করিয়াছেন। যে দৈবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার নাম মহানিয়তি। সৃষ্টিকালে মহাশক্তির স্পন্দনে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথ্বীর যে সমস্ত কার্য্য, অথবা ব্রহ্মাদি দেবতার সৃষ্টিচেষ্টা ইহাকে লঙ্ঘন করিতে কেহ পারেন না। কিন্তু দৈবকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হইবে—দৈব শতবাধা দিলেও, পুরুষকার ছাড়িয়া কখন অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে না—এই কথা শাস্ত্র শিক্ষা দেন।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হউক। মানুষ শ্রীভগবান্‌কে নিজের চেষ্টায় পাইতে পারে না। এ উক্তি শাস্ত্রের। কিন্তু তজ্জন্য মানুষ ঈশ্বরকে পাইবার জন্য কোন চেষ্টা করিবে না—এ কথাও শাস্ত্র বলেন না। শাস্ত্র বলেন, মানুষ যতদিন অহঙ্কার করিয়া বলে শ্রীভগবান্‌কে গলায় গামছা দিয়া টানিয়া আনিব—ততদিন সেই দম্ভময় পুরুষকে শ্রীভগবান্ ত্যাগ করেন। কিন্তু যে পুরুষ শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য প্রাণপণ করেন, অর্থাৎ বিশ্বাস করেন শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না—যিনি এই ভাবে সমস্ত পুরুষার্থ করিয়াও, কার্য্যসিদ্ধি জন্য শ্রীভগবানের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন—তিনি শাস্ত্রমত কার্য্য করেন। তিনিই শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন। অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকিতে শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। প্রাণপণ চেষ্টা ত করিতে হইবে, তাহার উপর বলিতে হইবে—ভগবান্ আমি প্রাণপণ করিবই, কিন্তু আমার প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারাও তোমাকে পাওয়া যায় না। আমি প্রাণপণ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার শত চেষ্টাও অতি তুচ্ছ। তুমি আপনি কৃপা না করিলে, আমার চেষ্টাতে কিছুই হইবে না। আমি তোমার শরণে আসিলাম; আমি প্রাণপণ করিতে করিতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; এখন তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই করিও।

দেহ যায় যাক্, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিবই। এই ভাবে তাঁহার আজ্ঞাপালন জন্য যিনি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্ম করিতে পারেন—তিনিই শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

অলস ব্যক্তি কখনও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। অলসের

ভগবানও নাই, পার্থিব ধনসম্পত্তিও থাকিতে পারে না। তাই বলা হইল—কপালে যাহা আছে তাহা হউক বা না হউক, তাহাতে দৃষ্টি না রাখিয়া শাস্ত্রমত নিত্যকর্ম্ম করিয়া চল, শুভ হইবেই।

যতদিন না জ্ঞান লাভ হয়, ততদিন প্রাণপণে নিত্যকর্ম্ম কর। নিত্যকর্ম্ম দ্বারা শত বর্ষ জীবনধারণে ইচ্ছা কর। এই শতবর্ষ মধ্যে চাইকি জ্ঞানলাভ করিতেও পার। যদি তাহাও না হয়, তবে তুমি জীবনসংগ্রামে বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিলে। পরজন্মে সহজেই তোমার হইয়া যাইবে।

প্রভাতে-ভাব।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিদ্রায় অচৈতন্য ছিলাম। সহসা কে যেন জাগাইয়া দিল। জাগিয়া দেখিলাম প্রকৃতিও জাগিয়াছে। প্রকৃতির হৃদয়-বীণা হইতে কি এক মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তামসিক নিদ্রার অবসানে, প্রকৃতির এই গম্ভীর শান্ত ছবি, আমারও হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া দিল। অন্তঃকরণের আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম। বাহিরে আনন্দ, ভিতরে আনন্দ—আনন্দের উদ্বেল-স্পন্দনে আমার চিত্ত ধীরে ধীরে ডুবিল। দেখিলাম মহানন্দসাগরে জীব ও প্রকৃতির মহান্ ও ক্ষুদ্রাদপি সত্ত্বা জাগিতেছে, আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছে। ফুল আনন্দেই ফোটে, আনন্দেই শুকাইয়া যায়; শিশির আনন্দেই জন্মে, আনন্দেই ঝরিয়া পড়ে। মানুষ আনন্দেই হাসে, আনন্দেই কাঁদে। এক মহানন্দ, এই অনন্ত কোটি বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও হন্তা। এই আনন্দসাগরে কত সূর্য্য, কত নক্ষত্র, কত চন্দ্র বিকশিত হইতেছে এবং লয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিকাশ বা অভিব্যক্তি আনন্দই, বিনাশ বা লয়ও আনন্দ। যিনি আপনার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে আনন্দ ও চৈতন্যময় সত্তাকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি জগতের সর্ব্বত্রই আনন্দের প্রকাশ দেখিতে পান। তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে স্ফুরিত হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়। এই আনন্দ ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে জগৎ ভুলাইয়া, আপনাকে ভুলা-

ইয়া, এক মহান্ সত্যে আনিয়া ফেলে। যেখানে আনন্দ নিজেই আপনাতে আপনি বর্ত্তমান। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হয়, জগতের জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং যিনি আমাদের উপজীব্য, প্রাণের প্রাণ—তাঁহাকেই দেখিতে পান। তিনি "পরিপূর্ণমানন্দম্"। যেখানে শুধু আনন্দই আছে, ভয় নাই, শোক নাই, মোহ নাই, যেখানে "সকৃৎ বিভাতি হ্যেষঃ ব্রহ্মলোকঃ" তিনি সেখানেই উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন "আনন্দরূপমমৃতং যৎবিভাতি"।

এই ভাবিতে ভাবিতে জীব-চৈতন্য হারাইয়া, আনন্দের সত্বায় যেন ডুবিয়া গেলাম। আনন্দ খুঁজিতে গিয়া নিজেই আনন্দসাগরে সত্বা হারাইয়া ফেলিলাম।

জাগতিক জ্ঞান হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, সীমাশূন্য নীলাকাশের এক প্রান্তে সূর্য্যদেব নিজের কিরণ বিকীরণ করিয়া, শান্ত জ্যোতিতে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাণের আবেগে, প্রিয়তম বিরহের উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া বলিলাম—

ওঁ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যমপহিতম্ মুখম্।
তত্ত্বং পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

এই প্রার্থনায় সূর্য্যে সেই আনন্দের ছায়া দেখিতে পাইলাম। আবার নন্দে ডুবিলাম; দেখিলাম ঊর্দ্ধে আনন্দ, অধে আনন্দ, সর্ব্বত্র আনন্দ, সৃষ্টির ক্রমিক বিকাশে আনন্দ, অণুতে পরমাণুতে আনন্দ, সৃষ্টিরবিকাশে আনন্দ। পৃথ্বী জলে লয় পাইলে আনন্দ। জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মহান্ আকাশে, মহাকাশ পরমাত্মায় আনন্দেই লয় পাইতেছে। ধ্যানযোগে মহাতপা যিনি তিনি তাঁহার মনবুদ্ধি প্রকৃতিতে, প্রকৃতি আত্মায় লয় করিবার চেষ্টায় আছেন—সে চেষ্টাও ত আনন্দ প্রসূত।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার সত্বা আনন্দে লীন হইল; ভাবিতেছিলাম—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেনজাতানি
জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিশংবিশন্তি।"

স্বপ্রকাশের আত্মপ্রকাশ।

সীমা শূন্য আমি একা
সীমামাঝে আমার প্রকাশ।
অনন্ত অসীম আমি
সীমা সৃষ্টি আমার বিলাস।
আমি এক অদ্বিতীয়
দুই সৃষ্টি খেলিবার ছলে।
আমি এক চিরন্তন
সান্ত সৃষ্টি আমার কৌশলে।
আমি, মায়া দোঁহে মিলি
গড়ি ভাঙ্গি বিচিত্র সংসার।
আমি মায়া ক্রীড়া-ছলে
রচি ছবি বিশ্ব চরাচর।
বিশ্বরূপ আমি ধরি
প্রলয়ের হলে অবসান।
ইন্দ্রজাল আমি রচি
ভুক্তি মুক্তি করিবারে দান।
আমি নানারূপ ধরি
ধরামাঝে অবতীর্ণ হই।
বিচিত্র কৌশলবলে
নানাভাবে বিরাজিত রই।
জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপে
সর্ব্বময় জ্ঞানময় আমি।
কর্ত্তা হেতু ক্রিয়া ভেদে
নিখিলের কর্ম্মাশ্রয় আমি।
আমা ভিন্ন নাহি আর
বিরাজিত অদ্বিতীয় আমি।

শ্রী আঃ

বিজ্ঞান ও শ্রুতি।

১৩১৮ সালের মাঘ মাসের "উৎসবে" শ্রীপঞ্চমী শীর্ষক প্রবন্ধে ২৩৯।২৪০ পৃষ্ঠায় সৃষ্টিতত্ব আলেচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির যে বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে উহা বিরোধ নহে। "শক্তি পরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন। * * * শক্তির সাম্যাবস্থাই যদি ব্রহ্ম হয়েন, তবে ব্রহ্মের পরম শান্ত ত্রিপদে থাকার কোন আবশ্যক নাই।" এই রূপ যুক্তি মূলে বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির বিরোধ কল্পনা করা হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে শক্তি পরিচ্ছিন্ন নহে, শক্তির বিকাশ পরিচ্ছিন্ন। শক্তির অব্যক্ত এবং ব্যক্ত অবস্থা আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর শক্তি পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে! কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং তদধিগত শক্তিও অনির্দ্দিষ্ট। এস্থলে তর্ক হইতে পারে যে, অনির্দ্দিষ্ট হইলেই অপরিচ্ছিন্ন হয় না। স্বীকার। তথাপি ব্রহ্ম বস্তুই একাংশে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছেন। সেই এক অংশ অনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন নহে। ব্রহ্মাণ্ডকে যদি ব্যক্ত ব্রহ্ম বলি, তবে ব্যক্তাব্যক্ত ব্রহ্মকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Potential ও Kinetic অর্থাৎ গুপ্ত ও প্রকট বলা যাইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধেও দেখা যায় যে তদধিগত শক্তির সমস্ত ভাগ প্রকটিত করা যায় না; অর্থাৎ কর্ম্মে পরিণত করা যায় না। শক্তি গুপ্তাবস্থা হইতে প্রকট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; এবং ঐ কর্ম্মকেই শক্তির প্রকটাবস্থা বলা যায়। গণিতজ্ঞ জানেন যে কর্ম্মোৎপাদনে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়, কর্ম্ম তাহার ঠিক অনুরূপ উৎপন্ন হয়; কিন্তু সে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে, নাও হইতে পারে, সুতরাং শক্তিকে অপরিচ্ছিন্ন বিবেচনা করিয়া তাহার একাংশ প্রকট হয়, অর্থাৎ Kinetic অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কর্ম্মে পরিণত হয়; অপরাংশ গুপ্ত অর্থাৎ Potential অবস্থাতেই থাকিয়া যায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই যেমন শ্রুতি সম্মত, তেমনই বিজ্ঞান

---

* যদিও একথা ইথার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে তথাপি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, ইথার শক্তি-বিশেষের বিকার মাত্র। সকল শক্তিই এক, ইহাও এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতির সহিত বিজ্ঞানের মিলন করিবার নিমিত্ত আমি এই শক্তির পশ্চাতেই ব্রহ্মবস্তু কল্পনা করি।

সম্মতও হইবে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক লজ্ (Lodge) বলেন— I have now endeavoured to introduce you to the simplest conception of the material universe which has yet occurred to man—the conception, that * is, of one universal substance * * * extending to the furthest limits of space of which we have any knowledge * * * some portions either at rest or in simple irrotational motion * * * other portions in rotational motion * * * and differentiated permanently from the rest of the medium by reason of this motion.

এস্থানে দেখা যাইতেছে যে শক্তির অংশ বিশেষ সাম্যাবস্থ "at rest" অপরাংশ চক্রাবর্ত্ত গতি বিশিষ্ট। লজ দেখাইয়াছেন these whirling portions constitute what we call matter, অর্থাৎ এই চক্রাবর্ত্তই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত ; যে অংশ সাম্যাবস্থ তাহা অব্যক্ত।

সুতরাং শ্রুতির সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ কোথায় ? বিজ্ঞান শক্তিকে অপরিচ্ছিন্ন বলিতে ইতস্ততঃ করে না; ব্যক্তাব্যক্ত ভেদে শক্তি পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, এই মাত্র প্রভেদ করে। শ্রুতিও তাহাই প্রমাণ করেন। সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির বিরোধ কাল্পনিক। শ্রুতি ত্রিপাদ অব্যক্ত বলেন; বিজ্ঞান যে অংশ at rest বা সাম্যাবস্থ তাহাকেই অব্যক্ত বলে, কিন্তু ঐ অব্যক্তের পাদ সংখ্যা নির্ণয় করিতে অক্ষম।

একথা অন্যদিক হইতেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। অনন্তকে নির্দ্দিষ্ট অঙ্কদ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল অনন্তই হয়। সুতরাং যে একাংশ ব্যক্ত তাহাকেও অনন্তের অংশ বিধায় অপরিচ্ছিন্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে। উপরে ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অনির্দ্দিষ্ট বলিয়াছি, এবং তর্ক স্থলে পরিচ্ছিন্ন বলিয়াও স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এই ভাবে কথাটী বিবেচনা করিলে তদ্রূপ স্বীকার করিবার কারণ ছিল না। সুতরাং শক্তিকে বক্ত্যাবস্থাতেও অপরিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে। শক্তির পরিচ্ছিন্নতার শ্রুতি প্রমাণ কৈ? অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তাহার শ্রুতি প্রমাণ কৈ ?

প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ২৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক্, বিচার দ্বারা ইহা উপলব্ধি করা যায়, তখনই নিগুর্ণ ব্রহ্মকে জানা যায়।" শ্রুতির মত উল্লেখ

করিতে এ কথা গ্রহনীয় নহে, কারণ ইহা শ্রুতি বিরুদ্ধ। ইহা সাঙ্খ্য দর্শনের মত হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতির মত নহে। যদি জগৎ ও ব্রহ্ম এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায়, তবে (শ্রুতি বলেন) জগৎ ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করাই মুক্তির হেতু। কিন্তু ব্রহ্মকে না জানিলেও মুক্তি নাই। সুতরাং এই একত্ব উপলব্ধি করিলেই ব্রহ্মকে জানা যাইবে এ অংশে শ্রুতির সহিত দর্শনের সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই।

শ্রীশশধর রায়।
এম, এ বি এল;

সৃষ্টি-রহস্য।

আপনাকে আপনি যতখানি জানিতে পারিবে তাহাতে অন্যের মনের অবস্থাও ততখানি জানিতে পারিবে। ইহা অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানের আদর্শ আর মানুষের পক্ষে হইতে পারে না।

আপনাকে আপনি পূর্ণভাবে জান তোমার জানার আর কিছুই বাকী রহিল না।

সৃষ্টি-রহস্য যে জানিতে চাও তাহার মূলে আত্ম-রহস্য জানার লালসা রহিয়াছে। "আমি কে" জানিবার লালসা স্বাভাবিক। "আমি কে" জানিতে পারিলে জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা মানবজীবনের শুভপ্রাপ্তি আর নাই।

---

† বেদাদি গ্রন্থে শক্তিকে মায়া বলা হইয়াছে। পরিমাণ করেন বলিয়া ইনি মায়া। কাজেই বেদাদি গ্রন্থের শক্তি বা মায়া বিজ্ঞানের অ্যাটম, ফোরস, ইলেকট্রন ইত্যাদি কিনা চিন্তাশীল সাধক তাহা বিচার করিবেন। তাহার পর সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বত্র যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহা বুদ্ধির কার্য্য। অ্যাটমকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়াও বিজ্ঞান কি তাহার মধ্য হইতে বুদ্ধির কোন অংশ বাহির করিয়াছেন? যদি অ্যাটমের মধ্যে বুদ্ধির কিছু না থাকে তবে সৃষ্টিতে বুদ্ধির বিকাশ হইতেছে কিরূপে? সমালোচক মহাশয় পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ইহা বেদে নাই বলিতে চান। আমরা এই উৎসব পত্রিকার জন্ম হইতে এই সপ্তম বর্ষারম্ভ পর্য্যন্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্রাদি হইতে তাহাই দেখাইয়া আসিতেছি। কাজেই প্রতিবাদ আর কি করিব। শেষে বলি

বড় দার্শনিক, বড় জ্ঞানী বা বড় কবি কে? না যিনি সৃষ্টি-রহস্য যত পরিষ্কার বুঝিয়াছেন বা বুঝাইয়াছেন। সৃষ্টি-রহস্য বুঝিবার যে সুখ বা অপরকে বুঝাইবার যে সুখ তদপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই। কারণ সমষ্টিভাবে সৃষ্টি-রহস্য বুঝিলে ব্যষ্টিভাবে আত্ম-রহস্যও বুঝিতে পারা যায়। আমার যথার্থতঃ সৃষ্টি হইয়াছে কি না আমার যথার্থতঃ ধ্বংস আছে কি না ইহা জানাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান। আমরা সৃষ্টি রহস্যের শেষ মীমাংসা এই শুনি যে ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। আমার জন্মও নাই আমার মৃত্যুও নাই। স্থূলচক্ষে সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না—হয় মানসচক্ষে বা জ্ঞাননেত্রে। যে দার্শনিক বা যে জ্ঞানী বা যে কবি যত জ্ঞাননেত্র বিকাশ করিতে পারেন তিনি তত বড়। বাহিরের দৃষ্টি অপেক্ষা ভিতরের দৃষ্টি আরও পরিষ্কার আরও উজ্জ্বল। ভিতরে যাহা দেখা যায় তাহা বাহিরে প্রকাশ করা যায় ভাষা দ্বারা।

বাহিরের বস্তু আমাদের সম্মুখেই দণ্ডায়মান থাকে কিন্তু ভিতরে যাহা ভাবনা করা যায় তাহা বাহিরে প্রকাশ করা যায় কেবল ভাষার দ্বারা।

কাজেই সৃষ্টি-রহস্য অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে হইলে জীবন্ত ভাষারও বিশেষ আবশ্যক।

ভগবান বশিষ্ঠ, ভগবান বাল্মীকি, ভগবান ব্যাস ইত্যাদি অপেক্ষা বড় দার্শনিক, বড় জ্ঞানী বা বড় কবি আমাদের দেশে নাই; অন্য দেশে আছে কি না তাহা বলার আবশ্যকতা আমরা বুঝি না।

ভগবান বশিষ্ঠের যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, ভগবান বাল্মীকির রামায়ণ, ভগবান ব্যাসদেবের অধ্যাত্মরামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত এবং অন্যান্য

আলোচক ও সমালোচক উভয়েই "বনং ব্রজেৎ"এর অবস্থায় আসিয়াছেন। শক্তি সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের এত মতভেদ আছে যে, ২।৪ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। ইহা আবার প্রাচীন ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের সহিত এক করা যে কত কঠিন সমালোচক মহাশয় তাহা অবগত আছেন। শুধু তর্কের দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থ নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা না করিয়া সেই বিষয় Realize করিতে প্রয়াস পাইলেই নিজেরও যথার্থ উন্নতি হয়, এবং নিজের আচরণ দেখিয়া অন্যেরও উন্নতি হয়। নতুবা শুধুই তর্কে ফল কি? বনংব্রজেতের দিনে এই জন্য এইরূপ তর্ক হইতে বিরত থাকাই সঙ্গত। তবে যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইতে পারে।—সম্পাদক।

পুরাণ ইহা অপেক্ষা বেদ বিশদ করিবার অন্য গ্রন্থ আছে কি না আমরা জানি না।

ইহাদিগকে উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ বলি এইজন্য যে ইহারা প্রসঙ্গক্রমে বহুকথা বলিলেও ইহাদের প্রধান লক্ষ্য মানব জীবনকে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত করা।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত আধুনিক মানব জাতির সাহিত্যের বহু পুস্তকের উদ্দেশ্য তুলনা করিলে আমরা আধুনিক সাহিত্যের বহু বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক ঐন্দ্রিয়ীক বা কাল্পনিক সুখ যাহাদের উদ্দেশ্য সে সমস্ত গ্রন্থ কিছু কালের মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ কত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে ও যাইবে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

এসব সাহিত্যে সত্য কথা থাকিতে পারে। কিন্তু সে সত্যে মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। মনে কর—কোন কবি লিখিলেন মানুষ সময়ের হস্তে ও ভয়ের হস্তে ক্রীড়ার পুতুল। কাল ধীরে ধীরে মানুষকে আক্রমণ করে, কাল ধীরে ধীরে মানুষের সমস্ত চুরি করে। তথাপি আমরা বাঁচিয়া থাকি—বাঁচিতে ঘৃণা করি কিন্তু মৃত্যুকে তথাপি ভয় করি। আমাদের ঘৃণিত জীবনের সমস্ত সময়টা একটা প্রবল সংগ্রাম ভিন্ন কিছুই নহে ইত্যাদি। কথা খুব সত্য কিন্তু ইহাতে মানুষের বিশেষ উপকার নাই। ক্ষণিক সুখ বা ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তি যে সাহিত্য লক্ষ করে সে সাহিত্য জীবকে প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে না। আমরা নিজের কল্পনায় নিতান্ত বিব্রত। কিন্তু যে সাহিত্য কেবল কল্পনা মাত্র প্রসব করে—যে সব কল্পনা আমাদিগকে দুঃখ নিবৃত্তির কোন স্থায়ী উপায় বলিয়া দিতে পারে না সে সমস্ত কাল্পনিক উপন্যাসের গল্পে জীবের বিশেষ কোন উন্নতি আশা করা যায় না।

তবে এ এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে মূল লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তৎসম্পাদন জন্য অন্য অন্য উপায় মত কার্য্যও আবশ্যক। যেমন পুষ্করিণী খনন জল প্রাপ্তি জন্য। কিন্তু জল প্রাপ্ত হইতেছে না অথচ বহুলোক মাটি কাটিতেছে—ইহাতে লোকের যে আংশিক ক্ষণিক সুখপ্রাপ্তির জন্য কিছু দৈনিক উপার্জ্জন তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকা যায় তবে সে উপকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিছু না হওয়া অপেক্ষা কিছু হওয়া উচিত সত্য কিন্তু কিছু

হওয়া উচিত হইলেও সেই কিছু দ্বারা মূল বিষয় প্রাপ্তির সুবিধা হইতেছে কি না তাহাতে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা মূল বিষয় হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে যাহার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা তাহারই অনুসরণ করা যাউক।

আদি কবির রামায়ণ ধরা যাউক।

ভগবান বাল্মীকি বহুস্থানে বলিতেছেন যিনি এই পাপবিনাশন পবিত্র পুণ্যতম বেদতুল্য রামচরিত পাঠ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আদিকাণ্ড প্রথম সর্গ। আবার চতুর্থ সর্গের প্রথমে বলিতেছেন— চরিত্রব্রত প্রভু বাল্মীকি সেই দুইজনকে (কুশী ও লবকে) বেদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণার্থ রাম ও সীতার সমস্ত চরিত সম্বলিত রাবণবধ নামক এক কাব্য শিক্ষা করাইলেন।

"বেদতুল্য রামচরিত" "রাম সীতার চরিত্র বুঝিলে বেদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করা হয়" এই সমস্ত উক্তির অর্থ কি? বেদে মানবজীবনের শ্রেয়োলাভ জন্য সহস্র সহস্র উপায় আছে। বেদ পাঠে বেদ মত কর্ম্ম করিয়া মানুষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া সংসারসাগর হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পায় তাহার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু সীতারামের চরিত্রপাঠে মানুষের বেদপাঠ কিরূপে হইবে?

রাম সীতা কাব্যের চরিত্র। তাঁহারা রাজা রাণী। সাধারণ মনুষ্য তাহাদের মতনই বা কিরূপে হইবেন? তাঁহাদের জীবনের কার্য্য আলোচনায় মানুষের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হইবে?

রাম আমার কে? সীতাই বা আমার কে? তাঁহারা ত্রেতাযুগে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা আমার কি উপকার করিবেন? তাঁহারা আমাকে ভবসংসার পার করিয়া দিবেন কিরূপে?

সাধারণ পাঠকের মনে এই সমস্ত প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। ভগবান্ বাল্মীকির সময়ে মানুষের বিশ্বাস যত প্রবল ছিল, ভগবান ব্যাসদেবের সময়ে কালমাহাত্ম্যে মানুষের বিশ্বাস ততদূর ছিল না। সেই জন্য ভগবান ব্যাস রামায়ণ অবলম্বনে অধ্যাত্ম রামায়ণ রচনা করেন। এই অধ্যাত্ম-রামায়ণে আমরা রামসীতারহস্যে সৃষ্টিরহস্য কি দেখিতে পাই। কাজেই রামসীতা রহস্যে আমরা

আত্মরহস্যও জানিতে পারি। সেইজন্য বুঝিতে পারি সীতারাম রহস্য বুঝিলে আমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হয়?

ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন—রামই পরংব্রহ্ম। তিনি সচ্চিদানন্দ। তিনি অব্যয়। তিনি সত্তামাত্র। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি আনন্দ, নির্ম্মল, শান্ত, নির্ব্বিকার এবং নিরঞ্জন (অঞ্জন, কালীশূন্য)। রামই সর্ব্বব্যাপী আত্মা। তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি অকল্মষ পাপশূন্য।

আর সীতা? সীতাই মূল প্রকৃতি। সীতা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী।

সীতা বা প্রকৃতি রাম বা পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই। পুরুষের নিকটে থাকিলে তবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন। আবার প্রকৃতি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা অবুধজনে পুরুষে আরোপ করে মাত্র।

জগতে যত কিছু হইতেছে সমস্তই প্রকৃতি করিতেছেন। আর অজ্ঞজনে তাহাই নির্ব্বিকার অখিল আত্মা পরমপুরুষে আরোপ করিতেছে। রাম কিন্তু কিছুই করেন না, কোথাও গমন করেন না, কোন শোক করেন না, কোন আকাঙ্খা করেন না, কোন কিছু ত্যাগও করেন না, কোন কিছু গ্রহণও করেন না। তিনি আনন্দমূর্ত্তি, তিনি অচল, তিনি পরিণামহীন। কেবল মায়া আশ্রয় করিয়া মায়া মানুষরূপে তিনি ভাসিতেছেন।

ইহাই সীতারাম তত্ত্ব।

ইহাতে কি বুঝিলাম?

বুঝিলাম রামই পরংব্রহ্ম। সীতা, সেই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মকে খণ্ডমত করিয়া রূপ দিতেছেন।

সীতা কে? মূর্ত্তিবিশিষ্ট রামই সীতা। সীতা কে? সীতারামেরই পরিচ্ছিন্ন মায়া-মানুষমূর্ত্তি। রামের মূর্ত্তিতেই সীতা ফুরাইয়া গিয়াছেন। রামমূর্ত্তি ভিন্ন সীতা আর এক লবও বেশী নহেন। আর রাম? রাম, সমস্ত সীতা—সীতার সমস্ত হইয়াও তিনি আরও কিছু। তিনি সীমাশূন্য। সীতা তাঁহার এক অংশে উদয় হইয়া তাঁহাকে রূপবান মত করেন।

রাম পরমাত্মা। সীতা বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপই সীতার শেষ কিন্তু সীতাই বা বিশ্বরূপই রামের শেষ নহে। রামের এক দেশে সীতাকর্তৃক রামের স্ফূর্ত্তি মত প্রকাশ। এইরূপ রাধাকৃষ্ণ, এইরূপ শিবশক্তি।

ক্রমশঃ

ধ।

ন

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

দয়া।

দয়াময়! তব দয়া বুঝা বড় দায়,
যাহা লভিবারে মন সদা ব্যস্ত হয়;
বাহিরে দেখায় বটে পীযূষ সমান,
তথাপি অন্তর জ্বালা না হয় নির্ব্বাণ।
নিতে চাও শুদ্ধ করি করিতে আপন;
মুক্ত করি দিতে চাও সকল বাঁধন;
জানাতে গভীর প্রেম মঙ্গল মধুর.
অশ্রুরূপে এস তাই বেদনা-বিধুর।
তোমার অগাধ প্রেম বিপুল জলধি,
ডাকিছে অনন্ত প্রেমে নিত্য নিরবধি।
মুগ্ধা-অভিমানে ভুলি, আপন ক্ষুদ্রতা,
তোমার অসীম প্রেম সীমা দিতব কোথা।
ক্ষুদ্র বিশ্ব কি বুঝিবে উদ্দেশ্য মহান্,
তব প্রেমে হয়েছিল তাই সন্ধিহান;

আপনারে ভেবেছিল অসহায় দীন,
বোঝেনি তোমার প্রেম চির-বোধহীন।
বিন্দু অশ্রু, তাও মোর যায়নিকো বৃথা,
অনন্ত নির্ভর দেছে গাঢ় সরসতা ;
আজ তাই ধারা-পরে ধারা নেমে আসে,
কণ্ঠ মোর ভাষাহীন ভাবে ভরে আসে॥

মৃঃ—

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।

প্রহ্লাদ-কৃত স্তব।

যে যোনিতে ফিরি প্রভু দহে অনিবার
প্রিয়-বিরহজ শোক, অপ্রিয়-সংযোগ ;
দুঃখের ঔষধ দুঃখ জেনেছি নিশ্চয়,
ব'লে দাও হে ভূমন্! তব দাস্যযোগ ॥১০
প্রিয়তম! সুহৃত্তম! পরম দেবতা!
তব লীলা-গাথা গাহে ব্রহ্মা গঙ্গাধর ;
সেবিত-পরমহংস পদযুগ সেবি,
তরি যাব ত্রিগুণের দুর্গম কান্তার ॥ ১১
শিশুর শরণ বিভো! নহে পিতা মাতা,
ঔষধ আতের, মজ্জমানের তরণী ;
উপেক্ষি তোমারে মূঢ় সেবে এই সব,
বিফল প্রয়াস, তারে ক্ষণস্থায়ী মানি ॥ ১২
তুমি কর্ত্তা, তুমি কর্ম্ম, তুমি সম্প্রদান,
তুমি হে করণ দেব! সকলি তোমায় ;
তোমাতে সকল বিশ্ব, ভিন্ন সত্তা কোথা?
যে যা করে ভাল মন্দ প্রেরণা তোমার ॥ ১৩

তোমারি আশ্রয়ে দেব! ক্ষুব্ধা মায়া দেবী,
সৃজিল দুর্জ্জয় মন কর্ম্ম ছন্দোময় ;
অবিদ্যা আঁধার, ভুঞ্জে ষোড়শ বিকার,
এ হেন সংসার চক্র কে উত্তীর্ণ হয় ॥ ১৪
তুমিই ক'রেছ জয় চিৎশক্তি বলে
বুদ্ধি গুণ—প্রভু তুমি কার্য্য-কারণের ;
ইক্ষুদণ্ড-সম চক্রে নিপীড়িত আমি,
হে কাল! রক্ষহ তুমি ত্রাতা বিপন্নের ॥ ১৫
দেখিনু অতুল বিভো! আয়ুশ্রী বিভব,
যাহা তরে লোক সব হাহাকার করে ;
পিতাকে করেছ জয় ভ্রুকুটী-বহ্নিতে,
দহিয়াছ তৃণ-সম তাঁহারে ফুৎকারে ॥ ১৬
দেহিদের সুখতত্ত্ব বুঝিনু বিশেষ,
অনিত্য জীবন লক্ষ্মী বিভব সম্পদ ;
চাহিনা চাহিনা নাথ! সিদ্ধির গরিমা,
নিজভৃত্য পার্শ্বে দাও শান্তিময় পদ ॥ ১৭
কোথা সুখ শ্রুতি সুখ মৃগতৃষ্ণিরূপ,
কোথা এই কলেবর ব্যাধির ভাণ্ডার!
নির্ব্বাপিতে কামানল মধুবিন্দু দিয়া
ব্যস্ত সদা ; মনে নাহি বৈরাগ্য সঞ্চার ॥ ১৮
রজোগুণ বিগঠিত, তামস ভূয়িষ্ঠ,
কোথা এ অমর দেহ, কোথা কৃপা তব!
ব্রহ্মা ত্রিপুরারি পদ্মা যে হস্ত না পায়
দিয়াছ মস্তকে মম হে ঈশ! মাধব! ॥ ১৯
জগতের আত্মা তুমি পরম সুহৃদ্
ছোট বড় জ্ঞান নাহি হে প্রভো! তোমার।
যথা সেবা তথা মাতা ; কল্পতরু তুমি!
ফল ফুল ছায়া দানে করে কি বিচার ॥ ২০

ক্রমশঃ—

প্রার্থনা।

আমার যে কিছুই হইল না। আমার যে কোন সাধই এখনও মিটে নাই। দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় আমার সকল বাসনাই বুঝি হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লীন হইয়া গেল। হে দীনবন্ধো! হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার নিকট আমার অনেক প্রার্থনা আছে, চাহিবার বস্তু অনেক আছে। প্রাণান্তক অন্তকের ভ্রূলতা-সদৃশী বাসনা-বিষধরী, আমার চিত্ত-বিলে সদাই গরলোদগার করিতেছে। তাহাতে আমার দেহ মন জর্জ্জরিত। আমি কি বলিতে পারি আমার কিছুই প্রার্থনা নাই! কামনার শত হিল্লোল আমার মনকে তরঙ্গায়িত করিতেছে। সে তরঙ্গের শেষ নাই, একটীর পর একটী করিয়া প্রলয়কালীন জলদমুকুট মস্তকে ধরিয়া, আমার হৃদয়-বেলায় নিদারুণ আঘাত করিতেছে। সে আঘাতে আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রাণ সহস্রধা চূর্ণবিচূর্ণিত। মজ্জমান জীব কি বলিতে পারে আমার তরণীতে প্রয়োজন নাই? অতএব হে কামদ! আমার অনেক কামনা আছে। একে একে বলি, তুমি শ্রবণ কর। তোমার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই। প্রার্থীর প্রতি ধনদুর্ম্মদান্ধ ধনীর ভয়াল ভ্রুকুটী ভঙ্গি, কিম্বা অপ্রসারবৎ হৃদয়শূন্য নীরব উপেক্ষা, কিম্বা বিদ্রূপের মর্ম্মন্তুদ অট্টহাসের ভয় তোমার নিকট নাই। আমার সকল কথাগুলি মন দিয়া শোন।

আমার নয়ন সর্ব্বদাই রূপ-দর্শনে লালায়িত। জন্মাবধি কত রূপই ত দেখিয়াছি, আরও কত দেখিতে হইবে। কোনও রূপেই ত নয়নের তৃপ্তি সাধিত হইল না। তবে কি এ রূপ-দর্শন লালসার আর সীমা নাই? হে সুন্দর! আমি শুনিয়াছি তোমার রূপ দেখিলে, রূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়। শুনিয়াছি তুমি সূর্য্যকোটী-প্রতীকাশ, চন্দ্রকোটী-সুশীতল, কন্দর্পকোটী-কমনীয়।

কেহ তোমাকে দেখিয়াছিল :-

সমং প্রশস্তং সুমুখং দীর্ঘচারু চতুর্ভুজম্।
সুচারু সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥
সমান কর্ণবিন্যস্ত স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎস শ্রীনিকেতনম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালা বিভূষিতম্।

নূপুরৈর্বিলসৎ পাদং কৌস্তুভ প্রভয়াযুতম্।
ত্র্যম্বং কিরীট-কটক কটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদ সুমুখেক্ষণম্॥

কেহ তোমাকে বলিয়াছেন:—

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ ররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুখণ্ডাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং॥

কেহ বা তোমাকে দেখিয়াছেন:—

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপিকরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুক সহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণি নিভং॥

হে সুরূপ! তোমার কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই বলিয়াই বুঝি তোমাকে অরূপ বলে; অথবা তোমার রূপ আছে বলিয়াই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রূপবান্। হে দয়াময়! শোনা কথায় আর আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। অতএব তোমার রূপটী আমাকে একবার দেখাও। আমার রূপ-দর্শন স্পৃহা নিঃশেষে মিটিয়া যাউক।

হে জগন্নাথ! তুমি সর্ব্বরসের আধার। শ্রুতি তোমাকে "রসো-বৈ-সঃ" বলিয়াছেন। প্রবরোদকা তোমার শৌচনিঃসৃত সরিদ্বরা রসময়ী সুরধুনী ত্রিজগৎ রসাল করিয়া তুলিয়াছেন। অজস্রস্রাবী তোমার রসধারার এক বিন্দু মাত্র বিষয়সুখে নিপতিত হইয়াছে বলিয়াই, ভ্রান্ত জীব উন্মত্ত হইয়া, রসের উৎসকে ভুলিয়া, ক্ষুরধার বিষয়-কুশপত্রিকা লেহন করিতে করিতে নাগকুলের ন্যায় ছিন্নজিহ্ব হইতেছে; অমৃত-ভাণ্ডে বঞ্চিত হইয়া আছে। আমার জিহ্বা কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি পাইতেছে না। আমি তোমাকে পূর্ণভাবে, আস্বাদন করিতে চাই। নহিলে আমার রসনা অবিতৃপ্তই রহিয়া গেল।

কত সুরভি গন্ধই ত আঘ্রাণ করিলাম। কুসুমবর্ণগত বন উপবনের অঙ্কে আশ্রয় লইলাম। প্রসূন-নির্যাস অঙ্গে মাখিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিলাম। কই, পরিণামে ত দেখিলাম—কোথায় সুখ, কোথায় বা সৌরভ আর কোথায় বা আমি। পুষ্প একটু আমোদ বিস্তার করিয়া ম্লান হইয়া গেল। স্বেদ-ক্লেদ-

শ্লেষ্মাপূরিত শরীরের পূতিগন্ধে ম্রিয়মাণ হইলাম। হে প্রভো! তুমিই পৃথিবীতলে গন্ধ বিস্তার করিয়াছ। তোমার পদসরোজের মকরন্দ-গন্ধে আকুল হইয়া ভক্তভৃঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে অভিসার করিতেছে। শ্রীমতী ব্রজবিলাসিনীরাও এ গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বলিয়া ছিলেন :—

কান্তাঙ্গ সঙ্গ কুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতিগন্ধঃ॥

আমাকে একবার সেই গন্ধ আঘ্রাণ করাও। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সফল হউক।

পুত্র-মুখকমল চুম্বনে যে সুখ সে বুঝি তোমারই; কান্তা-কণ্ঠালিঙ্গনে যে সুখ তাহাও বুঝি তোমা হইতে; মলয়জ মর্দ্দনে, স্নিগ্ধতোয়া মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া যে সুখ, তাহাও বুঝি তোমার। নতুবা তাহারা এ সুখ পাইল কোথায়? তোমার স্পর্শ বড় শীতল। সেই জন্যই :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি-অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি-অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

হে স্পর্শ-মণি! আমি তোমাকে একবার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আলিঙ্গন করিতে চাই। নহিলে আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সার্থকতা কোথায়?

শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শুনিবার জন্য কতই ব্যাকুল। মৃদঙ্গ মন্দিরা সংযোগে বারবিলাসিনীর মদিরা-মত্ত নির্লজ্জ বিলাস-গীতি শুনিয়াছি। ব্রীড়াবিহ্বলা পতিব্রতা কুলললনার অর্দ্ধস্ফুট প্রণয়-সম্ভাষণও শুনিয়াছি। কিন্তু মনও ভিজিল না। কোকিলের কলরব, মধুকরের গুঞ্জন, নৈশ বায়ুর মর্ম্মর গাথা, নির্ঝরিণীর কুলুধ্বনি সবই শুনিয়াছি—শুনিয়া একটু সুখও পাইয়াছি। কিন্তু তাহার পর—হে মধুর ভাষি!

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত মূর্চ্ছিতেন
সম্মোহিতার্য্যা চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্॥

তুমি আমায় একবার আহ্বান কর। তোমার প্রিয় সম্ভাষণ যেন আমি শুনিতে পাই। যেন বলিতে পারি :—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

নচেৎ কর্ণ-বিবর বৃথাই উত্তমাঙ্গকে বিকৃত করিয়া রহিল ॥

হে দীননাথ! আমার আরও কত কথা বলিবার আছে। আমি কিন্তু আর বলিতে পারি না। তুমি মনের কথা বুঝিয়া লও, ও আমার প্রাণ যাহা চায় তাহাই দাও। আমার প্রার্থনার কি শেষ আছে? শেষ হইবে তখন— যখন তোমাকে দেখিব, তোমাকে শুনিব, তোমাকে আস্বাদন করিব, তোমাকে আলিঙ্গন করিব, ও তোমাকে আঘ্রাণ করিব। নচেৎ জীবন উদ্দেশ্যশূন্য, বিফল ও শুষ্ক মরুপ্রায় ॥

মনের সহিত যুদ্ধ-জয়লাভের উপায়।

শ্রীভগবান এতই সুখময়, এতই মধুময়, এতই মনপ্রাণ-জুড়ান বস্তু যে, তুমি স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও, বা যাই হও তাঁহার কথা একবার শ্রবণ কর, তাঁহার রাজ্যের শান্তির কথা একবার ধারণা কর, সে আনন্দ-রাজ্যের আনন্দ একবার ভাবনা কর; তুমি আপনা হইতেই বলিবে আমি ঐ রাজ্যে যাইব, আমি তাঁহার কাছে থাকিব, আমি তাঁহাকে দেখিব, আমি তাঁহার কথা শুনিব, আমি তাঁহার সেবা করিব।

উত্তম বস্তু আস্বাদন করিলে অধম বস্তু গ্রহণে রুচি হয় না, আবার সর্ব্বোত্তম বস্তু পাইলে আর কিছুই পাইতে ইচ্ছা হয় না—সব পাওয়া ফুরাইয়া যায়, সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সকল কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ঐ রাজ্যে যাইতে পারিলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সকল বিবাদ মিটিয়া যায়।

বলিতেছিলাম ঐ রাজ্যের কথা শ্রবণ কর—শ্রবণ করিয়া ভাবনা কর সেই রাজ্যে যাইবার জন্য প্রাণ মন মাতিয়া উঠিবে। সেই রাজ্যের লোকের কথা শুন, সেই রাজ্যের লোকের সঙ্গ কর; তুমি এই ত্রিতাপতাপিত দেহ ও মনকে যেন এক অপূর্ব্ব-ভাবে পুলকিত হইতে দেখিবে। এই অশ্রু, এই পুলক, তুমি

ভুলিয়া যাইতে পার ; কিন্তু ইহা আবার না পাইলে, তুমি আর প্রকৃত সুস্থ হইতে পারিবে না ; তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার মন, তোমায় যত সুখের আস্বাদন করাক না কেন, তোমার তাহাতেও হইবে না। তুমি সেই আত্মরাজ্যের আনন্দ না পাওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুতেই পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না।

এই রাজ্য তোমার আমার সকলের ঈপ্সিত রাজ্য। এ রাজ্যে সকলেরই অধিকার। কোনও অপরাধে, কোনও পাপে, কোনও ব্যভিচারে, কোনও স্বাধীনতার শক্তির অপব্যবহারে আমরা সেই রাজ্য হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছি ; আমাদের কোন প্রকৃত সুহৃদের কথার অবাধ্য হইয়া আমরা আপনাদিগকে এক কপটীর রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি। এখানে আমরা আপনিই আপনাকে প্রহার করিতেছি আর কাঁদিতেছি ; আর আপনার নিকট হইতে আপনি পলায়ন করিতেছি।

বড় বিপদে পড়িয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি তবুও পলাইতে পারিতেছি না। কেবল গ্রাম্য কুকুরের ন্যায় এখানে ওখানে ছুটিতেছি আর চিৎকার করিতেছি।

যে আমাদিগকে এই বিপদে ফেলিয়াছে, যে আমাদিগকে বাঁধিয়া প্রহার করিতেছে সে আমাদের মন। যতদিন মনের অধীনে আমরা থাকিব, যতদিন মনো রাজ্যে বাস করিব ততদিন আমরা শত্রুকে মিত্র ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ যাতনা পাইব।

আবার যদি মনকে বশ করিতে পারি তবে ঐ মনই সুস্থ হইয়া আমাদিগকে সেই সুখময়ের নিকটে লইয়া যাইবে। কারণ মনের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারিলে মন সুস্থ হইয়া আপন সত্ত্বায় আনন্দ রাজ্য আপনি খুলিয়া দেয়, সুখময়কে দেখাইয়া দেয়—সেই অমৃত গঙ্গার জলে অবগাহন করায়।

তবে মনকে বশ করাই হইতেছে কর্ম্ম। মনোরাজ্য জয় কর—তবে আত্মরাজ্যে ঢুকিতে পারিবে। ইহা না করিতে যদি চাও তবে চিরদিন হাহা হুহু হিহির রাজ্যে বাস করিবে। কখন জুড়াইতে পারিবে না। এখুনি হিহি করিয়া হাঁসিতেছ এখুনি হুহু করিয়া কাঁপিতেছ আবার তৎক্ষণাৎ হাহা করিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। মনের সহিত যুদ্ধ না করিলে কখনও মন আপন রাজ্য ছাড়িয়া দিবে না—বিনা যুদ্ধে এক সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও এ ব্যক্তি অধিকার করিতে দিবে না—আর তোমারও ঐ পাগলের মত হাহা হুহু হিহি

করা ঘুচিবে না; তোমারও মুখে সাধুর মত কথা আর ব্যবহারে শয়তানের মত কাজ করা কখনও ঘুচিবে না।

তবে এস একবার মনকে জয় করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হই। ইহাই আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সুখময়কে পাইবে—এ যুদ্ধে মৃত্যু হইলেও অনেক দূর অগ্রসর হইয়া রহিলে।

এই পর্য্যন্ত ভনিতা। ইহার পরে করিবার কার্য্য। জগতে যত সাধু আছেন—যাঁহারাই মনকে জয় করিয়া আনন্দময়কে পাইয়াছেন—তাঁহারাই বলেন মনকে স্থির করিবার জন্য জপ, পূজা, পাঠ, ঈশ্বর, প্রণিধান রূপ কার্য্য করা চাই আর ব্যবহারিক কার্য্যও তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য করা চাই। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া চাই, আবার ব্যবহারিক কার্য্যেও জীবসেবা দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছি নিত্য ভাবনা করা চাই। এই দুয়ের একটি বাদ দিয়া শুধু একটি লইয়া থাক তুমি সুখময়ের রাজ্যে যাইতে পারিবে না। শুধু সন্ধ্যাপূজা জপ তপ লইয়া থাক আর প্রথম অবস্থাতে জীবসেবা না করিয়া জীবকে অগ্রাহ্য কর—তোমার সে পূজা ভগবান্ গ্রহণ করিবেন না। শাস্ত্র বড় জোর করিয়া বলিতেছেন জীবের অবমাননাকারীর পূজা শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না। আবার তুমি জীবসেবা কর অথচ যদি জীবসেবায় ঈশ্বরসেবা করিতেছি এই ভাব না আনিতে পার তবে তোমার সে কর্ম্মেও বন্ধন হইবে। তুমি আনন্দময়ের নিকটে কখন যাইতে পারিবে না। তবে তোমাকে দুই কর্ম্মই সমকালে করিতে হইবে। যখন দেখ যে নিত্যকর্ম্মাদি নিয়মিত তিন বেলায় না করিলে তুমি শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ রাখিয়া জীবসেবা করিতে পার না; যখন দেখ সাত্ত্বিক আহার না করিয়া যথাভিলষিত আহারে তুমি মনকে নিত্যকর্ম্মে স্থির করিতে পার না, যখন দেখ সদাচার না করিলে তুমি মনকে অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়াইতে পার না—তখন অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে মনকে শান্ত করিবার জন্য তোমাকে আহারে সাত্ত্বিক হইতে হইবে, ব্যবহারেও সাত্ত্বিক হইতে হইবে।

তুমি যাহাকে মনস্থির বল তাহা প্রকৃতপক্ষে মনস্থির কি না একবার বিচার কর। তুমি কবিতা লিখিতে পার, প্রবন্ধ লিখিতে পার, বা মেডিটেশন করিতে পার; কিন্তু ইহাকে প্রকৃতপক্ষে একাগ্রতা বলে না। বিচারক রায় লেখেন, বক্তা বক্তৃতার কথা মনে মনে মক্স করেন,

ধর্ম্মপ্রচারক প্রচার করিবার কথা পূর্ব্বে আলোচনা করেন, গ্রন্থকার গ্রন্থ লেখেন, কবি কবিতা লেখেন—এই সব কার্য্যে যে একাগ্রতা আছে, তাহাও ঠিক একাগ্রতা নহে। এটাও খবরের কাগজ পড়ার একাগ্রতা। এটাও যতক্ষণ ততক্ষণ। এখানেও বহু বিষয় দিয়া মনটাকে একটু মজাইবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। রায় লেখা শেষ হইলে, কবিতা লেখা শেষ হইলে, ধর্ম্ম-প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে যখন তুমি ব্যবহারিক জগতে আইস, তখন যাহা ছিলে তুমি তাহাই। তখন তোমার আর একাগ্রতা নাই। এক আর তোমার অগ্রে স্ফুরিত হইল না। ভাবিয়া দেখ কত কবিতা লিখিলে, কত প্রবন্ধ লিখিলে, কত সমাজ-সংস্করণের বক্তৃতা করিলে; কিন্তু তোমার হইল কি? তুমি শান্ত কি হইয়াছ? তুমি রাগ দ্বেষ কি ছাড়িতে পারিলে? তাই বলি একাগ্রতা ইহা নহে। ধারণা, ধ্যান, সমাধি ভিন্ন সংযমী হইতেও পারিবে না, একাগ্রতাও আসিবে না। ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও আহারশুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি না হইলেও হইবে না,; নিত্যক্রিয়া ও সাত্ত্বিক আহারাদি সদাচার না করিলেও হইবে না। তবেই হইল সাত্ত্বিক আহার কর আর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া প্রতিদিন তিন বেলায় নিয়ম মত কর, তবে তুমি মনকে শান্ত করিতে পারিবে।

এখন দেখ সন্ধ্যা, পূজা, জপ যে পার না, নিত্যক্রিয়ায় রস যে পাও না—কেন তাহা পাওনা? কেন ভাল করিয়া করিতে পার না? কেন তুমি তিন বেলায় ভাল করিয়া বসিতে পার না?

যাহাতে বসাটা অভ্যাস করিতে পার প্রথমে তাহাই ভাল করিয়া দেখ :

বসিবে ত মন। মনটাই যদি অত্যন্ত অস্থির রহিল্ জপ করাইবে কাহাকে? অবশ্য জপ করিলে মন শান্ত হইবে সত্য কথা; কিন্তু যতক্ষণ জপ করিলে মন স্থির হয়, ততক্ষণ সময়ও তোমার নাই। সময় থাকিলেও সে সাধ্য তোমার নাই। এ ক্ষেত্রে কি করিবে?

কতকগুলি অনুপান আছে। যাহার যেটী সুবিধা হয়, যে দিন যেটী ভাল লাগে, সেই অনুপানটি আগে করিয়া, জপ পূজাদি করিও। হইবে।

(১) সৎসঙ্গ অনেক হইয়াছে। তাহাতে শুনিয়াছ জগৎ থাক বা না থাক,—অন্ততঃ জপের সময় তোমাকে সংসারের কথা, জগতের চিন্তা মন হইতে সরাইতে হইবে। যখন জপে বসিবে তখনই বেশ করিয়া ভাবিয়া লও—সংসার মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, মনের প্রলাপ মিথ্যা, মনও মিথ্যা। এক মাত্র শ্রীভগবান্

তুমি সত্য। তোমার নাম সত্য। আমি সত্য বস্তু লইয়াই থাকিব। মন তুমি প্রতারক। তোমার মিথ্যা কথায় আর ভুলিব না। মন তোমার জল্পনা কল্পনায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন শ্রীভগবানে; শ্রীভগবানের নামে। আমি তাহাই আশ্রয় করিয়াছি, তাহা লইয়াই থাকিব, তাহা লইয়াই মরিব—এই আমার পণ। জপই জপই শ্যাম নাম ছার তনু করব বিনাশ—ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরম্বা পাতয়েৎ ইহা আমি করিবই।

প্রতিদিন আহ্নিককালে প্রথমেই ঠিক করিয়া লইব—এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা আমি বসিবই। ইহার পূর্ব্বে কিছুতেই আসন ত্যাগ করিব না। কেহ ডাকিলেও উঠিব না। মন তুমি যত আলস্যই দেখাও, যত অনিচ্ছাই প্রকাশ কর—আমি কিছুতেই ঐ সময়ের পূর্ব্বে আসন ছাড়িয়া উঠিব না। তুমি শত তুফান তুলিয়াও যদি আমায় কিছু করিতে না দাও, তথাপি আমি কিছুতেই আসন ছাড়িব না। এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া মনকে বসাইতে চেষ্টা কর। যাঁহারা প্রাণায়ামাদি করেন, বই দেখিয়া নহে গুরুর নিকট হইতে জানিয়া লইয়া যাঁহারা প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করেন, তাঁহারা নিতান্ত অশান্ত মন লইয়া, অত্যন্ত কষ্ট করিয়া যেন বায়ুর কোন ক্রিয়া না করেন। কারণ রোগের প্রবল অবস্থায় ঔষধ যেন কোন কার্য্য করে না, কিন্তু রোগের বিরামমুখে ঔষধ পড়িলেই যেন তাহা ফল উৎপাদন করে—সেইরূপ মনের নিতান্ত অস্থির অবস্থায় প্রাণায়ামাদি না করিয়া হয় জপ দ্বারা না হয় স্বাধ্যায় দ্বারা ইহাকে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকা ছাড়াইয়া তবে শ্বাসের ক্রিয়া করিতে হইবে।

(২) অনেককেই সংসার লইয়া থাকিতে হয়। উপস্থিত কালধর্ম্মে অনেককে সংসারের কার্য্য এত করিতে হয় যে, অনেকের আলস্য অনিচ্ছাও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও কিন্তু নিত্যক্রিয়া ত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। সংসারকর্ম্ম যতই কেন থাক না, তথাপি নিত্যক্রিয়াকালে মনকে বসাইতে হইবে। যাঁহাদের ইচ্ছা আছে কিন্তু সময় হইয়া উঠে না, তাঁহারা অল্পসময়ও নিত্যক্রিয়ায় রাখিবেন। যাঁহারা রাঁধেন, তাঁহারা কি চুল বাঁধেন না? করিলেই করা যায়। পূর্ব্বদুষ্কৃতি জন্য আমাদের বাধা আসিবেই। তাহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। বসিতেই হইবে। আবার পুনঃ পুনঃ নিয়ম মত চেষ্টা করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়া যাইবেই।

এই অবস্থায় একটা কার্য্য করা উচিত। যাঁহারা পুস্তকপাঠে সুখ পান, তাঁহারা আফিস হইতে আসিয়াই যদি নিত্যকর্ম্ম করিতে লাগিয়া যান, তবে সে কর্ম্মে সুখ পাইবেন না। একটা মৌখিক অভ্যাস মাত্র করিয়া যাইবেন। কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল; কিন্তু একটু ভাল করিয়া কর্ম্ম করিতে হইলে, সংসারের লোকের সঙ্গ হইতে আসিয়া, প্রথমেই যে শাস্ত্র-গ্রন্থে রুচি তাহা কিছুক্ষণ পাঠ করা উচিত। শুধু পড়িলে যদি মন কিছুই শান্ত না হয়, তবে যাহা পড়িতেছেন তাহাই লিখিতে চেষ্টা করিবেন। পড়িয়া মনে যে ভাব হইবে তাহাই নিজের মতন করিয়া লিখিবেন। ইহা মনকে ফিরাইবার এক অব্যর্থ উপায়।

(৩) যাঁহারা সঙ্গীত ভালবাসেন তাঁহারা একটা গান করিয়া, কখন বা একতারার সাহায্যে বা তানপূরার সাহাযো বা সঙ্কীর্ত্তনের সাহায্যে মনকে বিষয় হইতে ঘুরাইয়া, নিত্যক্রিয়ায় বসিবেন।

(৪) যাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারা বৈরাগ্য-চিন্তা করিয়া মনকে বসাইবেন। শুধু বৈরাগ্য-চিন্তায় যাঁহাদের হয় না, তাঁহারা প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুসময়ে যেরূপ কাতরভাব দেখিয়াছেন—মনে মনে তাহা আলোচনা করিয়া, প্রিয়জনের চিন্তাটা হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া, সেই চিতাধূম দেখিতে দেখিতে স্মরণ করিবেন—হায়! আমারও ত এইরূপ সময় আসিবে—হে ভগবন্! কোথায় তুমি—তুমি একবার এস। এই ভাবে মনকে কাতর করিয়া নিত্যক্রিয়া করিবেন।

(৫) যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা শ্রীভগবানের অবিজ্ঞাত স্বরূপ, তাঁহার বিশ্ব-মূর্ত্তি, তাঁহার মাধামানুষ বা মায়ামানুষী অবতার আলোচনা করিয়া, সেই রসে মনকে ডুবাইয়া হরি হরি করিবেন। কখন বা, শ্রীমন্দির মনে মনে স্বহস্তে মার্জ্জনা করিবেন। মনে মনে গঙ্গায় স্নান করিয়া, মনে মনে পুষ্প-চন্দন লইয়া দেবমন্দিরে গিয়া পূজা করিবেন।

আরও কত উপায় ঋষিরা দেখাইয়াছেন; ইহাদের মধ্যে যাঁহার যেটি ভাল লাগে তিনি তাহাই অবলম্বন করুন। এক বা ততোধিক উপায়ে মনকে বৈরাগ্যযুক্ত করিয়া বা ভক্তিযুক্ত করিয়া নিত্যক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। নিত্যক্রিয়ার অবসানে জপ লইয়া থাকিতে হইবে। ব্যবহারিক কার্য্যকালে মনে জপ রাখিয়া, বাহিরে হাতে-পায়ে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতেই ভগবৎ-কৃপালাভ হইবেই। একবার রস লাগিয়া গেলে আর ভয় নাই।

এইভাবে মনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারাই মনকে জয় করিতে সমর্থ। শুধু গলাবাজীতে ধর্ম্মরাজ্যে যাওয়া যায় না, শুধু মেডিটেশনে ব্যবহারিক ভাব ঠিক থাকে না। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ ক্রিয়া যোগ না করিলে কখন সরলতা আসিবে না; কখন প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যাইবে না।

তপস্যাই ভারতের সর্ব্বস্ব। বিনা তপস্যায় ভারতবাসী, ভারতবাসী থাকিবে না। তপস্যা কর, শ্রেয় হইবে। নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

হে ভগবন্! হে প্রিয়! হে সর্ব্বজনের সুহৃৎ! আবার কবে ভারতবাসী তোমার আজ্ঞা-পালন রূপ তপস্যা-কার্য্যে মন দিবে! কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, আবার কি সদাচার-পূত হইয়া তপস্যা করিয়া, তোমাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিবে? কবে করিবে প্রভু! কবে তুমি আমাদের তপস্যা-বুদ্ধি প্রবল করিয়া দিবে।

আমরা নিতান্ত মূঢ় হইয়া গিয়াছি; তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাদিগকে তোমার নিজের করিয়া লও। অহরহঃ নিত্যক্রিয়া রূপ তোমার আজ্ঞা-পালনের শক্তি দিয়া, আমাদের চিত্তশুদ্ধি করিয়া দাও। আর কি বলিব, তুমি আমাদের উপর যে প্রসন্ন তাহা অনুভব করাইয়া দাও!

শ্রীচরণ।

চাহিব না আর মুখেরি পানে, কহিব না কোন কথা।
ত্রিলোক-পূজিত যুগল চরণে, নোঙাইব শুধু মাথা॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি চিরকাল, এ মোর বাসনা মূলে।
(আমি) নোঙাইলে মাথা দিও দয়াময়! শ্রীপদ-পঙ্কজ তুলে॥
ও রাঙ্গা চরণে চির অধিকার, বল হে দেবে ত তুমি।
(নহে) সহজ উপায়ে, ভুলায়ে তোমায়, নিশ্চয় লইব আমি॥
তর্ক যুক্তি দিয়া চিনিতে তোমারে, নাহিক আমার কাজ।
পণ্ডিতে সহজ সে সব প্রণালী, মূর্খের মাথায় বাজ॥
(আজি পুরাতন কথা কহিব তোমায়, ভকত বৎসল হরি।
(তুমি) যুগে যুগে প্রভু! বাসনা পূরাও, কত মত রূপ ধরি॥

ব্রহ্মার নন্দিনী গৌতম-গৃহিণী, অহল্যা-সুন্দরী শিরে।
দিয়াছিলে পদ শ্রীরাম রাঘব, দেখ দেখি মনে ক'রে ॥
আর একবার নীরদবরণ, অধরে মুরলি ধরি।
ঈষৎ হেলায়ে দাঁড়াইয়াছিলে, কালিয় দমন করি ॥
পরম ভকত বিরোচন সুত, তাহার কারণে তুমি।
ছলনা করিয়া দীনবেশে প্রভু! মাগিলে ত্রিপাদ ভূমি ॥
(আবার) গুরুরূপে তুমি নিত্য নারায়ণ, জীবের কল্যাণ তরে।
সাকার হইয়া নিগুর্ণ ঈশ্বর, ভ্রম প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শ্রীপদে আমার পূর্ণ অধিকার, তাই ত পরাণ চায়।
গুরুশিষ্য বড় নিকট সম্বন্ধ, ছাড়িলে ছাড়ান দায় ॥
অপার করুণা লুকালে কি হয়, সারাটি জগৎময়।
(তবে) দাও দাও প্রভু! জলিত মাথায়, ও রাঙ্গা চরণ-দ্বয়!

রাঃ—

চিত্রকূট।

রেলের রাস্তা বর্ণনা সকলেই করেন। আমি আর তাহা নাই করিলাম। কলিকাতা হইতে ৺কাশীধাম—তথা হইতে প্রয়াগ—প্রয়াগ হইতে মাণিকপুর—মাণিকপুরে ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা—তথা হইতে করবি। এই রেলপথ। কোন্ তারিখে গমন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ রাখিতে মানুষের স্বভাবতঃ ইচ্ছা থাকে। সন ১৩১৮ সালের দুর্গাপূজার আশ্বিন-পঞ্চমী তিথিতে ৺. কাশী-যাত্রা। সেখানে বিজয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া, বিজয়ার পরদিন বেলা ৫টার গাড়ীতে চিত্রকূট গমন।

করবি ষ্টেশন হইতে পদব্রজে চিত্রকূট যাওয়া ভাল। যাইবার কালে কালিদাসের যক্ষের সিদ্ধছায়াতরু কিরূপ তাহা দেখা যায়, গিরিকন্দর দেখা যায়, 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং' কিরূপ ধারণা করা যায়, আর জনক-তনয়া-স্নান-পুণ্যোদকশালিনী মন্দাকিনীও পার হওয়া যায়। কেহ কেহ অসমর্থ না হইয়াও গো-যানে গমন করেন। ইহা না করাই ভাল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। রামগিরির সানুদেশে পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘ খেলা করিতেছে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত। পর্ব্বতমালা মন্দাকিনীর পূর্ব্ব-

তট বিভাগে। পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। আশ্বিন মাস—তখনও কিন্তু দুই এক খানা কালমেঘে জল ছিল। তাহারা সূর্য্যদেবকে এক একবার অন্তর্ভূত করিতেছিল, আর কালমেঘের প্রান্তভাগ রজতমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছিল। ইহা দেখিতে দেখিতে আমরা মন্দাকিনী পার হইলাম। তখন মন্দাকিনীতে বেশী জল ছিল না। পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া গেল। আমাদের জিনিষপত্র গো-যানে শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ পাণ্ডার বাড়ীর মুখের পথে চলিল। আমরা দেবনদী পার হইয়া নদীতটে একটি বিশ্রাম-স্থানের খোলা ছাদে বসিলাম। অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ মন যেন কোন মনোহর রাজ্যে যাইতেছিল। আমরা সেই ভাবনা-রাজ্যের কথা আগে বলিয়া চিত্রকূট-ভ্রমণ বর্ণনা করিব।

২

"সবই আমার রাম"

আমার কার?

"আমার"—"শক্তির" "সীতার"।

আমি শ্রীসীতার। শ্রীসীতা রামের।

আমি তবে সীতারামের।

সবই সীতারাম এ কিরূপ?

রাম ত কিছুই করেন না। তিনি কোথাও যান না—কোথাও স্থিত নহেন—শোকও করেন না—আকাঙ্খাও করেন না কিছুই করেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার চলনশূন্য—অচল। সীতাই অমূর্ত্তের মূর্ত্তি। স্বপ্রকাশের দ্বিতীয় প্রকাশ। রামং বিদ্ধি পরাত্মানং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ইত্যাদি। রামলীলার যাহা কিছু আচরণ তাহা সীতাই করিয়াছেন। অযোধ্যানগরে জন্ম হইতে রাবণ বিনাশ—পুনরায় অযোধ্যা আগমন পর্য্যন্ত শ্রীসীতাই সব করিয়াছেন। অবুধজনে সীতার কার্য্যগুলি শ্রীরামে আরোপ করে মাত্র এবং "আদীনি চান্যানি ময়ৈব চরিতান্যপি আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্ নির্ব্বিকারে খিলাত্মনি"।

শ্রীরামায়ণের সমস্ত ঘটনা না হয় সীতা করিলেন, কিন্তু এখনকার সবই সীতা করিলেন কিরূপে?

নিঃসন্দেহে বলা যায়,—মানুষ যাহা দেখে, শুনে, ভাবে, করে, বলে,—এ সমস্তই শক্তির কার্য্য, শক্তির বিকাশ। শক্তি ভিন্ন শক্তিমান্‌কে প্রকাশ করিতে আর কেহ নাই। স্বপ্রকাশের আত্মপ্রকাশ জন্যই এই শক্তি। শক্তির সাহায্য

ভিন্ন শক্তিমানে পৌঁছিতে কাহারও সাধ্য নাই। কোটিকম্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া চিৎকার করিলেও, তুমি যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা ব্রহ্ম নহেন; ব্রহ্ম-শক্তি। যতদিন ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের মধ্যে, ততদিন ব্রহ্ম আসেন না। আসেন শক্তি-আবৃত ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে চিনাইয়া দিতে পারেন এই শক্তি। শক্তি, পূর্ণমাত্রায় শক্তিমান্; আর শক্তিমান্ শক্তির পূর্ণাবস্থা হইয়াও আরও অনেক।

তাই বলিতেছি সীতাই চিরদিন সব করেন;—কিন্তু রাম না থাকিলে তিনিও জড়। আর রামকে পাইয়াই তিনি জড় হইয়াও চৈতন্য-দীপ্তা।

প্রকৃতি ও পুরুষের, রাম-সীতার, শিব শক্তির, রাধাকৃষ্ণের, ব্রহ্ম মায়ার তত্ত্ব ইহা।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" শ্রুতি ইহা বলেন। শ্রীগীতা সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্ট যাহা তাহাকেই বলেন বিশ্বরূপ। ব্রহ্ম আপনি আপনি অবস্থায় বা সমাধি দশায় অবিজ্ঞাতস্বরূপ। ব্যুত্থান দশায় বিশ্বরূপ। ব্রহ্মের ব্যুত্থান দশা প্রকৃতি অবলম্বনেই হয়। উৎকৃষ্ট যাহা তাহাই সৎ চিৎ আনন্দ। আর মিথ্যা যাহা, তাহাই নামরূপ। ইহাও শ্রুতি বাক্য। নাম রূপ যতই কেন সুন্দর হউক না তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র, তাহা মিথ্যা মায়া মাত্র।

রামসীতার তত্ত্বে যাহা পাওয়া যায়, তাহা স্মরণ রাখিয়া চলিতে পারিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। সর্ব্বত্র সমভাবে সেই সর্ব্বভূতের সুহৃৎ আছেন; তোমার মধ্যেও তিনি আছেন, তোমাকে যে সংহার করিতে আসিতেছে তার মধ্যেও তিনি আছেন। জীবের মায়িক অংশটি বাদ দিয়া, সৃষ্টির মিথ্যা অংশটি বাদ দিয়া যিনি জগৎ দেখিতে শিখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" যাহা মিথ্যা মায়া তাহা থাকিয়াও নাই; এই জন্য ভগবতী শ্রুতি সত্যবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আছেন আর মিথ্যা মায়া যাহা তাহা তাহার আবরণ শক্তিদ্বারা মায়ার সহিত ব্রহ্মের যে ভেদ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে ভেদ, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার যে ভেদ, রজ্জুর সহিত সর্পের যে ভেদ তাহা ঢাকিয়া রাখে। সেই জন্য সৃষ্টিকে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম হয়, দ্রষ্টাকে দৃশ্য বলিয়া ভ্রম হয়, রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু সর্ব্বই ব্রহ্ম নহে। সর্ব্বের মায়া অংশটি মিথ্যা—এইটি বাদ দিলেই ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছুই নাই। তথাপি এই মায়ার সাহায্যেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় বলিয়া, মায়াধিষ্ঠিত চৈতন্যের পূজা হয়। শত্রুমিত্র সমান হইয়া যায়—যদি ভিতরের

সচ্চিদানন্দকে কেহ স্মরণ করিতে শিক্ষা করে। শত্রুমিত্রকে, চণ্ডালকুকুরকে সমান ভাবে প্রণাম করা যায়—যদি কেহ সচ্চিদানন্দরূপী অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে বিশ্বাসে সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারে।

কাজেই "মাং নমস্কুরু" বড় সহজ সাধনা। কর না—মনে মনে সেই দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে সর্ব্বজীবকে, সর্ব্ব সৃষ্টবস্তুকে প্রথমেই প্রণাম করিতে অভ্যাস কর না। ঠিক হইবে।

কি হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর—উত্তরে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মনে কর তুমি সর্ব্বদা জপ অভ্যাস করিতেছ; কিন্তু অনেক সময়ে বল পাখীর বুলির মত নাম মুখস্থ করি, রস পাই না। ভাল তবুও ইহা করিয়া যাও। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বিশ্বাস কর। যে মন্ত্রটি জপ কর—তাহার অক্ষরগুলিকে কখন বর্ণাক্ষর মনে করিও না। ঐ অক্ষরগুলিও সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের রূপ মনে করিয়া লও। ভ্রূমধ্যে বা হৃদয়ে যখন জ্যোতির ভিতরে ঐ অক্ষরগুলিও লিখিয়া দেখিতে অভ্যাস করিতেছ, তখনও মনে ভাবিও তাঁহারই রূপ দেখিতেছি। যদি মূর্ত্তি না আনিতে পার, তাহা হইলেও হতাশ হইও না। বিশ্বাস কর মন্ত্রের অক্ষরগুলিও জ্যোতি-জড়িত তাঁহার এক মূর্ত্তি। চক্ষে এই মন্ত্রের অক্ষর দেখ, আর কর্ণে মন্ত্রের উচ্চারণের শব্দ শ্রবণ কর। তুমি চিত্ত স্থির করিতে পারিবে। তাঁহার মন্ত্র ঐ ভাবে চক্ষু—কর্ণ সাহায্যে জপ করিতে করিতে যখন ঐ মন্ত্রেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিবে, তখন তোমার সবিকল্প সমাধি হইবে। শ্রুতি বলেন অন্তরে যে তিন প্রকার সমাধি লাভ হয়, তন্মধ্যে দৃশ্যটিতে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলে সবিকল্প সমাধি হয়। জপের মন্ত্রটী এখানে তোমার দৃশ্যবস্তু। শ্রুতি আরও বলেন যিনি জপের মন্ত্রটি দেখেন বা শব্দটি শ্রবণ করেন, তিনি দ্রষ্টা বা শ্রোতা। যদি দ্রষ্টাতে লক্ষ্য স্থির করিতে পার তবে যে সমাধি হয়, তাহাও সবিকল্প সমাধি। দ্রষ্টাতে লক্ষ্য স্থির করিলে আর কিছুই থাকে না; থাকে শুধু "আছি" এই ভাব। ইহাই অস্মিতা সমাধি। ইহাও সবিকল্প কিন্তু আছি এই ভাবে লক্ষ্য স্থির করিতে করিতে যখন ইহা আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়, তখন অস্তির সহিত ভাতি ও প্রিয় আসিয়া উদয় হয়েন; এই সময়ে যে সমাধি হয়, তাহার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। জপের ভিতর দিয়াও এতগুলি হয়। কর—বুঝিবে।

তবে সমাধি অভ্যাস যাঁহারা করিবেন তাঁহাদিগকে স্থানকালে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং ভ্রমজ্ঞানগুলি ছাড়িতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক।

কোন কর্ম্মে জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই। সাধারণে ইহা বিশ্বাস করে। আবার পণ্ডিত মানুষেও বলেন "জীবাত্মার যে কর্ত্তৃত্ব তাহা পরমেশ্বরের অনুমতি সাপেক্ষ"।

কথাটা কতদূর সত্য বিচার কর। পরমেশ্বর কি অনুমতি করেন? শাস্ত্র বলেন, জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্" ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা। আবার বলেন, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্ন বশ মাগচ্ছেৎ ইত্যাদি।

কাম শত্রু জয় কর। রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না। এই সমস্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞা। জীব যখন ইহা কার্য্যে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে, করিয়া কৃতকার্য্য হয়—ধরা গেল পরমেশ্বরের কৃপা দ্বারা তাহারা ঐ কার্য্য করিল। জীব এখানে তাহার কার্য্যের কর্ত্তা নহে; ইহা ধরা গেল। পরমেশ্বরই জীবকে ইহা যেন করাইলেন।

কিন্তু সকল সময়ে ত মানুষ কাম জয় করিতে পারে না, সকল সময়ে ত রাগদ্বেষ জয় করিতে পারে না। পরমেশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া সে প্রাণপণ করিতেছে তবুও যখন রাগদ্বেষের কার্য্য করিয়া ফেলিল, সে ক্ষেত্রে কর্ত্তা কে? সে ক্ষেত্রে ত পরমেশ্বর কর্ত্তা নহেন, কর্ত্তা মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে তাহাই। তবেই হইল পুণ্য যখন হইল তখন কর্ত্তা পরমেশ্বর, আর পাপ যখন হইল তখন কর্ত্রী প্রকৃতি। তবে জীবের কর্ত্তৃত্ব শুধু পরমেশ্বরের অনুমতি সাপেক্ষ কিরূপে? যদি বল প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এক। আমি বলি ঈশ্বর করান পুণ্য, আর প্রকৃতি করান পাপ; তথাপি কি বলিতে হইবে উভয়েই এক? যে পরমেশ্বর বলিতেছেন কাম জয় কর, রাগদ্বেষ জয় কর—প্রকৃতি হইয়া তিনিই বলিতেছেন কামের কার্য্য কর, রাগদ্বেষের কার্য্য কর ইহা কি হয়? তাই বলিতেছি এ জ্ঞান ভ্রম-জ্ঞান। পরমেশ্বর কিছুই করেন না, কিছুই করানও না; জীবও কিছুই করেন না, কিছুই করানও না; কারণ জীব ও শিব এক। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি পরমেশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করেন, কিন্তু এই প্রকৃতি জীবকে অধীন করিয়া কর্ম্ম করেন।

তাই অহঙ্কারবিমূঢ় আত্মাই কর্ম্মের এক কর্ত্তা। ইহা ভিন্ন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, চেষ্টা ও দেবতা এই চারিটিও কর্ম্মের কারণ। পরমেশ্বর জীবকে অহংকারবিমূঢ় করেন না, করেন প্রকৃতি। এইটি বিলক্ষণরূপে জানিয়া, তুমি দ্রষ্টা তুমি দৃশ্য নও জানিয়া, পূর্ব্বোক্ত সমাধির চেষ্টা কর, সকলই বুঝিতে পারিবে। *যদি বল পরমেশ্বর যদি কিছু করেন না, কিছু করানও না, তবে কামশত্রু জয় কর ইহা বলে কে? ইহার উত্তর শুদ্ধ সত্ত্বই চৈতন্য-সন্নিধিতে পরমেশ্বর নামে অভিহিত। আর রজ ও তম ইহারাই অভিমান জন্মায়, পাপ করায় ইত্যাদি।

চিত্রকূটের কথা বলিতেছিলাম। বলিতেছিলাম এই সুন্দর তীর্থে, এই সীতারামের চরণধূলিতে পবিত্রীকৃত রমণীয় ক্ষেত্রে "সবই আমার রাম" আমার এই বলিতে ইচ্ছা করে। যদি তোমার এ ইচ্ছা না হয়, তবে তুমি রামকে কখন ভাল বাস নাই। যে যাহার প্রিয় সে কি তাহার কাছে শুধু পটের ছবি বা শিলাধাতুর মূর্ত্তি বা শুধু মন্ত্রের অক্ষর – এইরূপ ক্ষুদ্র থাকে? ভালবাসা বস্তুটি অনন্ত, ক্ষুদ্র সীমায় কি ইহা আবদ্ধ থাকে? যাহা প্রকৃত ভালবাসা তাহা অনন্ত সীমাশূন্য হইয়া সকল বস্তুকে, সকল জনকে, সকলকে তাহার অঙ্গীভূত করিয়া রাখে।

যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, আবার সকলকে আমাতে দেখে, আমি তার কাছে অদৃশ্য হই না; সেও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না। শ্রীভগবান্ ভালবাসার এই শেষ কথা বলিয়াছেন—যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ইত্যাদি যখন তোমার এটা ওটা সেটা আছে, যতদিন তোমার চক্ষে আকাশ আছে, জল আছে, বায়ু আছে, আলোক আছে, পৃথিবী আছে, চিত্রকূট আছে, মন্দাকিনী আছে, কামদ গিরি আছে, লক্ষ্মণ গিরি আছে, প্রমোদবন আছে, জানকীকুণ্ড আছে, তীর্থকোট আছে, দিব্যাঙ্গনা আছে, হনুমানধারা আছে, অনসূয়া আছে; যতদিন তোমার কাছে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি আছে, বৃহৎ বৃহৎ শিলাবিকীর্ণ পর্ব্বত আছে, পার্ব্বতীয় পথ আছে, বনস্পতি, বনলতা বনফুল আছে; যতদিন তোমার কাছে স্থানে স্থানে জলধারা আছে, গিরিকন্দরের উপরিভাগে ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য আছে; যতদিন তোমার কাছে পাখীর স্বরে চিত্রকূট শ্রবণ আছে, নানাবিধ বনবিহঙ্গের পরিষ্কার ঝঙ্কার আছে, ইহাদের দ্রুত গমনভঙ্গি আছে; যতদিন তোমার কাছে তুষার-

ধবল পর্ব্বতাকার মেঘপুঞ্জ আছে, আবার সেই পর্ব্বত-সানুদেশে অস্তঃসূর্য্য রজতমণ্ডিত নীলমেঘের বপ্রক্রীড়া আছে; যতদিন তোমার কাছে সব আছে— ততদিন এই সব পদার্থে তাঁহাকে দেখা অপেক্ষা রমণীয় আর কি হইতে পারে? আবার যখন তোমার কাছে অন্য কিছুই আর উদিত হয় না, শুধু তোমার রমণীয় দর্শনের মধুর মূর্ত্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই দয়িত অঙ্গে সকলকে দেখা অপেক্ষা আর রমণীয় কি থাকিতে পারে? তাই শ্রীভগবান্ শ্রীমান্ ভক্তকে অত্যন্ত সুখের কথা যাহা তাহার সংবাদ দিয়াছেন। যে ভক্ত ইহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তিনিই ধন্য হইয়া গিয়াছেন। যিনি না পারেন তিনি যদি বিশ্বাসেও ইহা দেখেন, দেখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন, সাধনার সঙ্গে এই চেষ্টা করিতে করিতে তিনিও ধন্য হইয়া যাইবেন।

বলিতেছিলাম আমার ইচ্ছা করে "সবই আমার রাম" এই আমি দেখি। যখন এই চিত্রকূটকে ভাবনায় বিশ্বাসেও রাম দেখি, মন্দাকিনীকে রাম দেখি, জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদককে রাম দেখি, যখন এই স্নিগ্ধচ্ছায়া তরু সমা-কীর্ণ রাম গিরিকে রাম বলিয়াই দেখি, যখন সকলকেই রাম বলিয়া ভাবনা করিতে পারি, যখন সুন্দরে-কুৎসিতে, জীবজন্তুতে, নরনারীতে কোথাও আমার রাম ভাবনা ভুল না হয়, যখন কর্কশ মধুর সকল প্রকার বাক্যে সেই রামই ভাবনা হয়, এক কথায় যখন বিশ্বাসেও জগৎ রামময় হইয়া যায়, তখন কি আমার আর কোন প্রার্থনার বস্তু থাকে? পুষ্পে পত্রে রাম, ফলে মূলে রাম, সর্ব্বত্র রাম যখন আমার স্মরণ হয়, তখন বুঝি আমার রাম-উপাসনা সাঙ্গ হয়। তখন বুঝি আমার রামকে বুঝিবার সময় হয়।

এই যে বলিতেছিলাম সবই আমার রাম—ইহা কি আমার মনগড়া একটা উচ্ছ্বাস? না তা হইবে কেন? শাস্ত্রও যে ইহা বলেন পূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছি।

শ্রীবৃহৎরামায়ণে শ্রীচিত্রকূট মাহাত্ম্যেও শ্রীভগবান বাল্মীকি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

চিত্রকূট গিরৌ রম্যে মন্দাকিন্যা স্তটে শুভে।
ঋষীণামাশ্রম পদে সদা তিষ্ঠতি সানুজঃ।
যয়ো ভূত্বা নদী যত্র রামরূপা ন সংশয়। ইত্যাদি

এখানে নদী, পর্ব্বত এখনও সেই শ্রীবাল্মীকির বর্ণন সময়ের মতনই

দেখা যায়। ইহারা রামরূপেই ছিল চিরদিন ; যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন থাকিবে।

শ্রীরামপদভূষিত এই পর্ব্বত কত সুন্দর !

প্রয়াগাৎ পশ্চিমেভাগে সপ্তযোজন সম্বিতঃ।

সকূটঃ পর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো মণি কাঞ্চন চিত্রিতঃ বিরাজতে। ইত্যাদি॥

প্রয়াগ হইতেই চিত্রকূট যাইতে হয়। প্রয়াগে ভগবান্ ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। এখনও সেই স্থান আছে। কতকগুলি দেবমন্দির সেখানে আছে, সপ্তঋষির স্থান আছে, আর সেই ভরদ্বাজাশ্রমের দীনহীন পাণ্ডাদিগের মধ্যে পাণ্ডানীদিগের মুখে এখনও রাম রাম আছে। শ্রীভগবানের লীলা-বর্ণনা শুনিলে এখনও চক্ষে জল আসে। আমরা ঐ স্থানে তুলসীদাসের রামায়ণ ও শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলাম। আর ঐ স্ত্রী লোকেরা তাহা শুনিয়া কাঁদিয়াছিল।

এই ভরদ্বাজাশ্রম হইয়া আমরাও চিত্রকূটে যাই। রামায়ণের বর্ণনাতে দেখি এখান হইতেই বনভূমি আরম্ভ হয়। শ্রীভরত যখন অযোধ্যায় সৈন্য সামন্ত লইয়া শ্রীরঘুনাথের সহিত মিলিতে গমন করেন, তখন প্রথমে এই নিবিড় বনভূমিতে তাঁহাকে পথ প্রস্তুত করিতে হয়। শ্রীভগবান্ কিন্তু বনে বনেই ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রকূটে উপস্থিত হয়েন।

আমরা সন্ধ্যার সময় চিত্রকূটে পোঁছিলাম। পাণ্ডা শ্রীকাশীপ্রসাদ বেশ ভাল। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সায়ংকালে মন্দাকিনীতে স্নানার্থ আসিলাম। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ বড় হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যে স্থানে স্নান তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটি বেশ সুন্দর। সকল ঘাটই বাঁধান। আমরা রামঘাটে জোৎস্নামাখা মন্দাকিনী-জলে স্নান করিলাম। শ্রীবাল্মীকি বর্ণিত চিত্রকূট-বিহারিণী এই দেব-নদী কতই মধুর বোধ হইল। স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম।

সকল তীর্থে যেমন বাঁদর চিত্রকূটেও সেইরূপ। তবে কাশীর মত এখানে কাপড় লইয়া যায় না, খাবার যাহা পায় তাহা লইয়াই পলায়ন করে। আবার বড় বড় বাঁদর মানুষের কাছে আসে। মানুষের গায়ে গায়ে বসিয়া খাবার খায়। আমাদের পাণ্ডার এক ১০।১১ বৎসরের ছেলের সঙ্গে এক বালক বাঁদরের

সখ্যতা আছে। বাঁদর সকল সময়েই বনে বনে বেড়ায়, কিন্তু প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ বালকের ডাকেই আইসে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আশ্বিন শুক্লা ত্রয়োদশী বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাকালে আমরা চিত্রকূটে পোঁছাই। পরদিন শুক্রবার। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া চিত্রকূটের পশ্চিমে যে সমস্ত গিরিকন্দর আছে, আমরা সেই দিকে যাই। সেখানে ময়ূর ময়ূরীর ইতস্ততঃ পাদচারণ দেখিয়া কতই যে সুন্দর বোধ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। ময়ূরগণ এক কন্দরের উপরিভাগ হইতে অন্য কন্দরের উপরে উঠিয়া যাইত; আমি সাগ্রহে তাহাই অবলোকন করিতাম্। মনে হইল এই পর্ব্বত এত রমণীয় না হইলে শ্রীভগবান্ চতুর্দ্দশ বৎসর এইখানেই অতিবাহিত করিতে অভিলাষ করিতেন না। ভগবান্ বাল্মীকি এই পর্ব্বতের বর্ণনা রামায়ণে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সে কতকালের কথা। যাঁহারা চিত্রকূট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উচিত শ্রীরামায়ণের অপূর্ব্ব বর্ণনা পাঠ করা।

শুক্রবার প্রাতে স্নান, সন্ধ্যা, পূজা, পাঠাদি করিয়া মানদ গিরি পরিক্রমণের ইচ্ছা করি। বেলা ১২ টায় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। চারিদিকেই পর্ব্বত। পাণ্ডারা পর্ব্বতের উপরেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চারিদিক হইতে বৃষ্টির জল মনোহর শব্দ করিতে করিতে মন্দাকিনী-মুখে ছুটিয়াছে। পূর্ব্ব দিন রাত্রে এবং পরদিন প্রভাতে মন্দাকিনীর রূপ একপ্রকার দেখিলাম, আবার বৃষ্টির পরেই মন্দাকিনী দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিল।

আমরা বেলা ৩।০টায় মানদ গিরি পরিক্রমণার্থ বাহির হইলাম। এই সেই মানদ গিরি—ইহারই উপরে শ্রীভগবান্ মা-জানকীর সহিত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানকার লোকে এই পর্ব্বতকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে। কেহই এই পর্ব্বতে আরোহণ করে না। সম্মুখে লক্ষ্মণ পাহাড়ী বলিয়া অন্য একটি পর্ব্বত আছে। পরিক্রমণের পথে তাহা পাওয়া যায়। সেই পর্ব্বতে উঠিয়া মানদ গিরি অবলোকন করে।

বৃহৎ রামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

কথং শ্রীরাজরাজাসৌ সপ্তাবরণ শোভিতঃ।
জানক্যা সহিতঃ শ্রীমান্ মন্দিরে রত্নভূষিতে॥
অভ্যন্তরে পর্ব্বতস্য বিহারং কুরুতে পরঃ।
এতৎ বিস্তরতো ব্রূহি সংসারার্ণব তারক॥

শ্রীসুতীক্ষ্ণ ভগবান্ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করেন—রত্নভূষিত, সপ্তাবরণ শোভিত এই পর্ব্বত-অভ্যন্তরবর্ত্তী মন্দিরে কিরূপে সেই রাজরাজেশ্বর শ্রীজানকীর সহিত বিহার করেন তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্ অগস্ত্য শ্রীভগবানের এই পরমাদ্ভূত বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। পর্ব্বত মধ্যে সন্তানক বন। বনের মধ্যে বিধিনির্ম্মিত সরোবর। সরোবরের উত্তর দিকে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মণিমাণিক্যবিজড়িত মন্দির। ইন্দ্রনীল, মহানীল, পদ্মরাগাদিনির্ম্মিত চতুর্দ্বার সেই মন্দিরের। মন্দির রত্নকবাট দ্বারা সুশোভিত। মন্দিরের শিখরদেশ মণিমাণিক্য-শোভিত হেম-কুম্ভযুক্ত। মন্দিরের তোরণদ্বার সমূহ মুক্তাদাম বিলম্বিত।

ভগবান্ বাল্মীকি কত্তই বর্ণনা করিয়াছেন। মন্দিরের চারিধারেই রমণীয় বনভূমি। সেখানে হংস, পারাবত, ময়ুর, কোকিল, শারিকা, শুকবৃন্দ সর্ব্বদা আনন্দধ্বনি করিতেছে। মন্দির সহস্র স্তম্ভসংযুক্ত। বজ্রভিত্তিবিনির্ম্মিত। মন্দিরের মধ্যে রম্য দিব্য রত্নবিনির্ম্মিত বেদিকা। ত্রৈলোক্যের সারভূত বস্তু দ্বারা এই রম্য-মন্দির সুশোভিত। সরোবর মণিবদ্ধ সোপানযুক্ত। মন্দিরের মধ্যে আবার পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর চারিদিকেই কত মন্দার, কত পারিজাত, কত সন্তান, কত হরিচন্দন বৃক্ষ। মধ্যদেশে যে বেদিকা তাহা কল্পবৃক্ষ তলে। মন্দির যোজনায়তন।

বহু বিস্তৃত বেদিকার উপরে দিব্য রত্নকাঞ্চননির্ম্মিত, ইন্দ্রনীলাদি নবরত্ন-খচিত মনোহর সিংহাসন। রসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ সীতার সহিত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট। ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি ত্রিদশ সেব্যমান শ্রীভগবানকে এই পর্ব্বতান্তরালস্থিত রত্নভূষিত মন্দিরে যিনি ধ্যান করেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন; তিনি সর্ব্ব কামনার সিদ্ধি করেন।

ধ্যায়ন্তি যে শ্রীরঘুবংশ বর্দ্ধনং
সিংহাসনাসীন মুদার বর্চসম্।
নগস্য মধ্যে সুবিশাল মন্দিরে
তে দেব বন্দ্যা ভগবৎ প্রিয়োনরা।

ইহার পরে আবরণ দেবতাদিগের সংবাদ। প্রথম আবরণে রামপাদ-প্রিয়া বিভূতিদা ঋদ্ধিদা শ্যামা কান্তিমতী কান্তা বিমলাদি সখীবৃন্দ। ইঁহারা—

রামরম্যা রামরতা রামনামপরায়ণা।
জানকীলক্ষণাভিজ্ঞা জানকীপাদসেবিকা।

ইহাদের কেহ বা বীণা বাদন করিতেছেন, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, কেহ গান করিতেছেন, কেহ তাল দিতেছেন, কেহ হাস্য করিতেছেন। কেহ বা

শ্রীরামচন্দ্রস্য মুখপঙ্কজং নিঃসৃতং—
তাম্বুলং চর্ব্বণং চক্রে। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় আবরণে অনিমাদি বিভূতি সমূহ। তৃতীয় আবরণে ধ্যানপরায়ণা সর্ব্বাবরণভূষিতা বেদমাতা গায়ত্রী। চারি বেদ অষ্টাদশ পুরাণ সংহিতা আগম— এই সমস্ত মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্থ আবরণে ব্রহ্মাদি সত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন। সেখানে ব্রহ্মা, শম্ভু, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য, মরুদগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ,

ধ্যায়ন্তি জানকীং শান্তং চতুর্থাবরণেস্থিতা।

পঞ্চমাবরণে দিব্যদেহধারী মুনীশ্বরগণ। ষষ্ঠাবরণে দিব্যরূপধারিণী গঙ্গাদি নদী। সপ্তমাবরণে দিব্যদেহধারী সুগ্রীব, হনুমানাদি কপীশ্বরগণ।

সকলেই রামানন্দ-রসোৎসুক। সেখানে কত গৌরবর্ণ শ্যামবর্ণ কল্পতরুবৃন্দ। এই সপ্তাবরণ মধ্যে

—জানকী জানিঃ সখীভিঃ সহিতো হরিঃ
সিংহাসনে রাজমানঃ সর্ব্বেষাং পুরতস্থিতঃ।

ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

এবমাবরণোযুক্তং যো ধ্যায়ন্তি রঘূত্তমম্।
চিত্রকূটস্থমচলং মনোবাঞ্ছা ফলং লভেৎ॥

এই মহিমান্বিত পর্ব্বতকে এখনও সকলে প্রদক্ষিণ করেন। আমরা এই পর্ব্বতের কামধেনু, মুখারবিন্দ, ভরতমিলন এই তিন দ্বার দর্শন করিলাম। আরও এক দ্বার আছে, তাহার নাম জানিতে পারিলাম না।

যেস্থানে ভরতমিলন হইয়াছিল, সেস্থানে পর্ব্বতগাত্রে অনেকগুলি মন্দির। শ্রীভগবানের বহু বিগ্রহ এখানে ভক্তরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু শ্রীভগবানের, শ্রীজানকীর ও শ্রীলক্ষ্মণাদির পদচিহ্ন।

কি সুন্দর, কি মহিমান্বিত এই শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন। যতবার স্পর্শ কর ততবারই শরীরে সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হয়। মনে হয় সেই চরণ-চিহ্নের উপর লুণ্ঠিত হই।

চরণ-চিহ্নের অপূর্ব্বতা মুখে বলা যায় না। শ্রীজানকী যখন শ্রীভগবানের সঙ্গে বনগমন করেন—সুমন্ত্র রথ লইয়া ফিরিয়া গেলে মা জানকী যখন ঐ দেশের কঠিন মৃত্তিকায় চলিতে অসমর্থ হন রথ হইতে অবরোহণ করিয়া "চতুরাণি পদানি গত্বা" চার পা গমন করিয়াই যখন শ্রীভগবানের দিকে ফিরিয়া বলেন আর্য্যপুত্র! আর কত দূর যাইতে হইবে? শ্রীভগবান্ তখন জনকনন্দিনীর জন্য কাতর হইয়া পৃথিবীকে প্রার্থনা করেন।

ধরণি! তব সুতেয়ং পাদবিন্যাসদেশে।
ত্যজ নিজ কঠিনত্বং জানকী যাতিঃরণ্যম্।

ধরণি! এই তোমার দুহিতা আর চলিতে পারে না। তুমি জানকীর পাদ বিন্যাস স্থানে নিজের কঠিনতা ত্যাগ কর; জানকী যে বনে যাইতেছে। শ্রীভগবানের বাক্যে পর্ব্বতও কোমল হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? যিনি বিশ্বাস করেন তাঁহার নিকট সকলই সত্য যিনি বিশ্বাস না করেন তাঁহার কাছে আর সত্য কি থাকিবে?

কামদগিরির পরিক্রমা পথে ভরতমিলন স্থানের পরেই আমরা লক্ষ্মণ পাহাড়ীতে গমন করিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঐ সময়েই পর্ব্বতে আরোহণ করি। পর্ব্বতের উপরে এখন মন্দির হইয়াছে এবং ভগবানের বিগ্রহ আছে। লক্ষ্মণগিরির যে দিক্ কামদগিরির দিকে তাহারই এক কোণে একটি উচ্চস্থান। সেই স্থানের উপর একটি ধনুকের রেখা ও পদচিহ্ন। এই পদ সেই মহাপুরুষের যিনি শ্রীসীতারামের সেবা জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ রাত্রিকালে এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কামদগিরি স্থিত শ্রীভগবানের কুটীরের দিকে চাহিয়া থাকেন। কোন বন্য জন্তু বা রাক্ষসাদি যাহাতে তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদন না করিতে পারে এই মহাপুরুষ সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া তাহাই দেখিতেন। এই স্থানে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া শতবার সেই চরণে লুণ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করে।

পরিক্রমার চারিধারেই মন্দির। আমরা পরিক্রমা শেষ করিয়া রাত্রি ৯ টার সময় মন্দাকিনীতে আসিলাম। রামঘাটে সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

শনিবারে আমরা প্রমোদ কানন, জানকী কুণ্ড ইত্যাদি দর্শন করিলাম। এই সব স্থান এতই সাধনায় অনুকূল যে একবার দেখিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না। কত সাধু এখানে তপস্যার জন্য বাস করিতেছেন।

রবিবারে আবার বৃষ্টি হইতে লাগিল, আমরা সে দিন বিশ্রাম করিলাম। সোমবারে আমরা প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়া যাত্রায় বাহির হইলাম। ভরত মিলনের পরে যখন অযোধ্যায় লোকজনের গতাগতি হইতে লাগিল, তখন শ্রীভগবান্ যে পথে দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলেন, আমরা সেই পথে চলিলাম। চিত্রকুটের কিঞ্চিৎ দূরে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা। শ্রীভগবান্ সেই পর্ব্বতের উপরে উপরে গমন করিয়া দণ্ডকারণ্যে গিয়াছিলেন। ঐ যাত্রায় আমরা পর্ব্বতের উপরে কোটিতীর্থ, দিব্যাঙ্গনা শ্রীজানকীর রন্ধনশালা এবং হনুমান-ধারা পর্য্যন্ত গমন করি। এ সমস্ত স্থান এতই রমণীয় যে ইহা বর্ণনা করিতে গেলে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। স্থানাভাব জন্য আমরা এইখানেই শেষ করিলাম।

জানকী কুণ্ড হইতে অনুসূয়া ৪ ক্রোশ। এখান হইতে ৫ ক্রোশ দূরে শরভঙ্গ আশ্রম। তথা হইতে ৪০০ ।০০ ক্রোশ মধ্যে নাশক পঞ্চবটী। যিনি গিয়াছেন তিনিই জানিতে পারিবেন এই সমস্ত কত সুন্দর!

আমরা উপসংহারে বলি, শ্রীরামতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ্ করিয়া যদি কোন সাধক এই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন, তবে তাঁহার তীর্থদর্শন কখনও বিফল হয় না। আজকাল চিত্রকূটে থাকিবার স্থানও অনেক হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য অবশ্যই বিলাসিতা-বর্জ্জিত। জীবনধারণোপযোগী সমস্তই পাওয়া যায়। তপস্যা করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের খাদ্যের জন্য কোন অসুবিধা হইবে না।

আর এক কথা বলি, তীর্থদর্শনে শাস্ত্র বলেন স্থূল স্থূল পাপের ক্ষয় হয়। তীর্থদর্শনে যদি ভগবৎ-বিশ্বাস বাড়িয়া না যায়, তীর্থদর্শনে যদি ভগবৎ-অনুরাগ না বর্দ্ধিত হয় তবে সে তীর্থ ভ্রমণে ফল কি?

তীর্থদর্শনে যখন ভগবৎ-অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তীর্থদর্শনে যখন ভগবৎ-বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন বল দেখি কাম, ক্রোধ, লোভাদি নরকদ্বার আর

কি বিভীষিকা দেখাইতে পারে? বলনা—স্থূল তীর্থ তোমাকে মানসতীর্থে পৌঁছিয়া দেয় কি না?

একবার পুণ্যস্থান সমস্ত দর্শন করিয়া আসিয়া মনে মনে প্রধান প্রধান স্থানে পরিভ্রমণ করিলে সহজেই চিত্ত শান্ত হয়। স্থূল শরীরকে তীর্থে ফিরাইলে যে ফল হয়, সূক্ষ্ম মনকে প্রত্যহ তীর্থ দেখাইলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইবেই। মন অসম্বদ্ধ প্রলাপ ত্যাগ করিয়া শান্ত হইলেই, ইহা পরমানন্দপ্রাপ্তির উপযোগী হইল।

সৃষ্টি-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এই যে সীতারামতত্ত্ব ভগবান ব্যাসদেব প্রকাশ করিলেন ইহা জানিলে আমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হইবে?

হইবে যদি এই তত্ত্ব বুঝিয়া আপনার সহিত এই তত্ত্বটি মিলাইয়া লওয়া যায়।

কিরূপে?

শ্রবণ কর। সৃষ্টিরহস্য মধ্যে তোমারও সৃষ্টিরহস্য রহিয়াছে। রাম-সীতা বা প্রকৃতিপুরুষ হইতে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সেইরূপ তুমিও পুরুষ-প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট।

সীতারাম যেমন শক্তি ও শক্তিমান মিলিত অবস্থা তুমিও সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান জড়িত মূর্ত্তি। তোমার শক্তিটি যিনি তিনি তোমার শক্তিমানকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। তোমার নাম রূপ বিশিষ্ট এই মূর্ত্তিই তোমার প্রকৃতি। আর তোমার শক্তিমান যিনি তিনি শক্তির পূর্ণাবস্থা হইয়াও আরও কিছু। তোমার সমস্ত শক্তি—তোমার শক্তিমানের একদেশে ভাসিয়া পূর্ণ শক্তিমানকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট করিয়াছে। তাহাতেই তুমি দেহ বিশিষ্ট হইয়াছ। শক্তিই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন আর তোমাতে তাহা আরোপ হইতেছে মাত্র। তুমি কিন্তু স্বরূপতঃ যাহা তাহা নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্। এখন এই শক্তিতে অভিমান না করিয়া যদি তুমি সর্ব্বদা শক্তিমানে অভিমান করিয়া

স্থিতিলাভ করিতে পার, তুমি শক্তি নও তুমি শক্তিমান এই ভাবনায় যদি তুমি স্থিতিলাভ করিতে পার তবে তুমি আপন স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে। এই স্বস্বরূপে স্থিতিলাভের এক উপায় যোগ।

যোগ কি?

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ

সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর তুমি প্রকৃতি হইতে যে পৃথক্ তাহা দেখিতে পাইবে?

যোগ করিলে কি হয়?

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্।

যোগসিদ্ধ করিতে পারিলে দ্রষ্টুর স্বরূপে বা নিঃসঙ্গ দ্রষ্টা- রূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে। ইহাই শক্তি হইতে শক্তিমানকে পৃথক্ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করা। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে চিরস্থিতি। বুঝিলে—সৃষ্টিরহস্য বুঝিলে কিরূপে আত্মরহস্য বুঝা যায়? বুঝিলে কিরূপে ইহাই মুক্তি? যদি বোঝা হইয়া থাকে তবে শাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বনে কর্ম্ম করিয়া ঐ অবস্থা লাভ কর। ইহাই জীবের কর্ত্তব্য। যাহারা ইহার অধিকারী হইতে পারিতেছে না তাহাদিগকে শাস্ত্রমত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দাও। ক্রমে চিত্তশুদ্ধি করিয়া ইহারা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিবে।

নতুবা সমস্ত জীবন ধরিয়া পুস্তক লিখিবে আর মরিবার সময় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিবে ইহাতে তোমার উদ্ধার হইল কৈ? তোমার জগতের উদ্ধারই বা হইল কিরূপে?

প্রাচীন সাহিত্য ইহাই শিক্ষা দিতেছেন তোমার আধুনিক সাহিত্য কি এই উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে?

অধিক কি!

জ্ঞানং সবিজ্ঞানমথানুভক্তি
বৈরাগ্যযুক্তঞ্চ মিতং বিভাস্বৎ।
জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং
যথা তথা ব্রূহি তরন্তি যেন ॥ ৯ ॥
পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহস্যং
তদেব চাগ্রে বদ বারিজাক্ষ।
শ্রীরামচন্দ্রেঽখিল লোকসারে*
ভক্তির্দৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা ॥ ১০ ॥

অগ্রে তাহা বলুন। সর্ব্বতত্ত্বের সারভূত শ্রীরামচন্দ্র—তাঁহাতে যে সুদৃঢ়া ভক্তি সেই ভক্তিই সংসার-সাগর পার হইবার তরণী ইহা প্রসিদ্ধ কথা ॥ ১০ ॥

সংসার-বন্ধন মোচন জন্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ। তাহার উপরে অন্য কোন সাধনা নাই। তথাপি আমার হৃদয়ের সংশয় ভেদ করিতে আপনার নির্ম্মল বাক্যই যোগ্য ॥ ১১ ॥

ঋষিগণ শ্রীরামকে প্রকৃতিরও পর বলিয়া শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় বলিয়া এক, সর্ব্বকারণের কারণ বলিয়া আদি ও মায়াগুণ সংপ্রবাহরূপ সংসার হইতে নিরস্ত বলিয়া থাকেন এবং সিদ্ধলোক সকল নিশিদিন সাবধান হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করেন বলিয়া তাঁহারাও পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১২ ॥

কেহ বলেন রামচন্দ্র যদিও পরম পুরুষ, তথাপি আপন অবিদ্যা দ্বারা আবৃত আপনার স্বরূপকে জানিতেন না—অপরের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলে তবে আপন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়েন ॥ ১৩ ॥

যদি তিনি আপনার পরমাত্মস্বরূপ জানিতেন, তবে সীতার জন্য এত বিলাপ কেন করিবেন? আর যদি আপন স্বরূপের জ্ঞান তাঁহার না থাকে, তবে লোকে তাঁহার সেবক কেন হইবে? অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া তিনি অন্য জীবের সমান। এক্ষেত্রে জীবের সহিত তাঁহার সেব্য-সেবক ভাব থাকিতেই পারে না ॥ ১৪ ॥

ইহার উত্তর যাহা আপনার জানা আছে তাহাই বলুন॥ যাহাতে আমার হৃদয়ের সংশয় দূর হয় এরূপ বাক্য আপনি কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১৫ ॥

---

*তত্ত্বসারে ইতি বা পাঠঃ।

ভক্তিই প্রসিদ্ধা দেব! সংসার মোচনে,
তাহ'তে নাহিক অন্য কিছুই সাধন।
তথাপি আমার হৃদি-সংশয় বন্ধনে—
ছেদন করুক্ তব বিশুদ্ধ বচন ॥ ১১ ॥

শ্রীরাম সবার আদি পুরুষ-উত্তম,
মায়াশূন্য গুণাতীত সর্ব্বজনে কয়।
সাবধানে সিদ্ধজন ভজি নিশি দিনে,
তদ্বিষ্ণু পরমপদে হ'য়ে যায় লয় ॥ ১২ ॥

যদিও শ্রীরাম পরম ঈশ্বর
কেহ কয় মোহে ছিলেন আবৃত।
অন্য উপদেশে হইল স্ফুরণ—
আত্মজ্ঞান যবে, হলেন জাগ্রত ॥ ১৩ ॥

আত্মজ্ঞানী যদি কেন বা বিলাপ
সীতার হরণে হইল তাঁহার?
অজ্ঞানী যদ্যপি কিসে সেব্য তিনি?
অজ্ঞজীব সনে প্রভেদ কি তাঁর? ॥ ১৪ ॥

ইহার উত্তর নাথ! করিয়া প্রদান।
হৃদি-সন্দ-ভেদী বাক্যে হরহ অজ্ঞান

তত্তোঽন্যৎসাধনং নাস্তি=অন্যৎধর্ম্মাদিতৎসাধনং ভব মোক্ষজনক তত্ত্ব-জ্ঞানসাধনং নাস্তীত্যর্থঃ। সামুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। ইতি ভক্তিমীমাংসাকৃচ্ছাণ্ডিল্য সূত্রাভ্যামিতরেন জ্ঞানেণ স্বসাধনতয়াঽপেক্ষিতত্বাৎ সা ভক্তির্মুখ্যেত্যাদ্য সূত্রার্থঃ॥ ভক্তিলক্ষণ পরং চ দ্বিতীয়ং সূত্রম্। হৃৎ-সংশয়বন্ধনং=হৃদ্গতসংশয়বিষয়ং রামস্য অনীশ্বরত্বম্ ॥

১২। নিরস্তমায়াগুণসংপ্রবাহম্=নিরস্তঃ ত্যক্তো মায়াগুণকৃতো রাগদ্বেষাদি সংপ্রবাহো যেন তম্॥ অপ্রমত্তাঃ—প্রমাদোঽজ্ঞানং তৎরহিতাঃ প্রমাদং বৈ মৃত্যু-

ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়
নান্যত্ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
তথাঽপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে
বিভেত্তুমর্হসামলোক্তিভিস্ত্বম্॥ ১১॥

বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং
নিরস্তমায়াগুণসংপ্রবাহম্।
ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ
পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ॥ ১২॥

বদন্তি কেচিৎ পরমোঽপি রামঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমাত্মসংজ্ঞম্।
জানাতি নাত্মানমতঃ পরেণ
সংবোধিতো বেদ পরাত্মতত্ত্বম্॥ ১৩॥

যদিস্ম জানাতি কুতো বিলাপঃ
সীতাকৃতেঽনেন কৃতঃ পরেণ।
জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ
সমো হি সর্বৈরপি জীবজাতৈঃ॥ ১৪॥

অত্রোত্তরং কিং বিদিতং ভবদ্ভি
স্তদ্ব্রূত মে সংশয়ভেদি বাক্যম্

শ্রীমহাদেব বলিলেন।—

পার্ব্বতি! তুমিই ধন্য এবং তুমিই যথার্থ ব্রহ্মানুরাগিনী, যেহেতু শ্রীরামতত্ত্ব জানিতে তোমার ইচ্ছা জন্মিয়াছে॥ ১৫॥

পূর্ব্বে এই পরম গুপ্ত রহস্য বলিবার প্রেরণা আমি আর কাহারও দ্বারা প্রাপ্ত হই নাই। অদ্য তোমার ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া আমি শ্রীরঘুনাথকে প্রণাম করিয়া [রামতত্ত্ব] বলিতেছি [শ্রবণ কর]॥ ১৬॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন :—

ধন্য সতি! ভক্তিমতি! পরম-আত্মায়
যেহেতু শ্রীরামতত্ত্ব জানিতে বাসনা ॥ ১৫ ॥
ইতিপূর্ব্বে আর কেহ না বলে আমারে
ভাঙ্গিতে রামতত্ত্ব রহস্য সর্ব্বথা।
তব ভক্তি-প্রশ্নে রাণি! হ'য়ে প্রণোদিত
বলিব রাঘব পদে করি নমস্কার ॥ ১৬ ॥
প্রকৃতির পর আত্মা শ্রীরাম অনাদি
একক আনন্দ তিনি পুরুষ উত্তম।

মহং ব্রবীমি। ইতি সনৎসুজাতীয়োক্তেঃ। তত্রহি। মৃত্যু র্বৈ তমঃ। ইতি শ্রুতে-মৃ র্ত্যুপদেনাজ্ঞানমিতি বোধ্যম্। তথৈব=তেন প্রকারেণ ভজনেনৈব সিদ্ধাঃ—তত্ত্বজ্ঞাঃ সন্তঃ পরং পদং মোক্ষং যান্তীত্যর্থঃ॥

১৩। পরমোঽপি রামঃ স্বাবিদ্যয়া মায়য়া সংবৃতমাবৃতমাত্মসংজ্ঞং ব্রহ্ম-সংজ্ঞমাত্মানং স্বস্বরূপং ন জানাতি॥ অতঃপরেণ ব্রহ্মণা সংবোধিতঃ। পরাত্মা-ঈশ্বরস্তদ্রূপঃ স্বং তত্ত্বং বেদ জানাতীতি কেচিদ্বদন্তি। তথাচ বাল্মীকীয়ে রাবণ-বধানন্তরং ব্রহ্মবাক্যম্।

তমুবাচ ততোদেবঃ স্বয়ম্ভূরমিতদ্যুতিঃ।
প্রগৃহ্যরুচিরং বাহুং স্মারয়ন্ পূর্ব্বদেহিকম্॥
ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাদ্দেবশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ॥ ইত্যাদি
উপদেশ সাহস্রাং ভগবৎপাদৈরপ্যুক্তম্।
ব্রহ্মা দাশরথের্যদ্বৎ উক্তে বাপানুদত্তমঃ।
তস্যাবিক্ষুত্ব সংবোধে নয়ৎনান্তরমাস্থিতঃ॥ ইতি

১৪.১৫। সীতাকৃতে=সীতানিমিত্তং বিলাপঃ সচারণ্যক কাণ্ড—
কিষ্কিন্ধাদৌ বাল্মীকীয়ে স্পষ্টৈব এব॥
কেন সেব্যঃ=অজ্ঞস্য জীববৎ সেব্যত্বাতাবাদিত্যর্থঃ।

১৬। পরাত্মনো ব্রহ্মণঃ।
এবং পার্ব্বত্যা পৃষ্টঃ শিবো রামস্বরূপমাহ॥

যজমান মুখে বলিতেছেন—ভদ্রং করিষ্যসি। ভদ্র শব্দের অর্থ সাধারণ কল্যাণ; যিনি যেরূপ অধিকারী, ভদ্র শব্দের অর্থ তাহার নিকট তদ্রূপই প্রতিভাত হইবে। মৃত্যু-মুখ-নিপতিত জীব 'তোমার কল্যাণ হউক' আশীর্ব্বাদ করিলে, আপন ভোগ-বৃদ্ধিরূপ ক্ষণিক মঙ্গলরূপে কল্যাণ শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়া লয়; আচার্য্য এইরূপ অধিকারীর জন্যই (অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যায়) বলিতেছেন ভদ্র—বিত্ত, গৃহ প্রজাপশুরূপ কল্যাণ। বস্তুতঃ ইহাও অধিযজ্ঞ-সেবীর মুখ্যফল নহে; ইহা আনুষঙ্গিক। যজ্ঞপুরুষের বিরাট্-সৌন্দর্য্যে যে ব্যক্তি মজিতে শিখিয়াছে—আনুষঙ্গিকরূপে তাহার অনিচ্ছুক হৃদয়ের নিকট যে বিত্ত-গৃহাদি উপস্থিত হয়, তাহারই বর্ণনা করিয়া এই ব্যাখ্যা অধিভূত-সেবী বহির্ম্মুখ জনকে প্রলুব্ধ করিতেছেন। এই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অধিভূত-সেবী জীব যখন শ্রুতির উত্তান-প্রবাহে হৃদয় ঢালিয়া দেয়—তখন তাহার চিত্ত নির্ম্মলী স্পৃষ্ট জলের মত বিশোধিত হইয়া দেখিতে পায় 'ভদ্রং' পদে সে যাহা বুঝিয়াছিল কেবল তাহাই নহে। সে দেখিতে পায় তাহারই দৃষ্টির ক্ষুদ্র পরিধিতে এক সময়ে যাহা বিত্ত গৃহাদিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল—এখন পরিধি-বিস্তারে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ধনরত্নের একাধার স্বরূপ জ্ঞান-সাম্রাজ্য এই 'ভদ্রং' শব্দের অর্থ। বৎস! এই জ্ঞান মহারত্নই ভদ্রশব্দের প্রকৃত অর্থ। অগ্নি সবিশেষরূপে এই রত্ন ধারণ করিয়া যাজ্ঞিকের নিকট আবির্ভূত হন বলিয়াই, প্রথম মন্ত্রে তাঁহাকে 'রত্নধাতম' বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! অগ্নি যদি হব্যদাতা যজমানের জন্য বিত্ত, গৃহ, প্রজাদিরূপ মঙ্গলের ব্যবস্থা করেন, তবে যজমান প্রত্যাখ্যানের ভাষায় 'উহা তোমারই' ইহা বলিতেছেন কেন?

আচার্য্য] বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিত্ত, গৃহ, প্রজা, পশু, ধন, রত্ন প্রভৃতি সমস্তই বিষয়, ইহাই জীবকে আপন বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে; বিষয়চোর জীবকে পথ ভুলাইয়া বিপথে লইয়া যায়, অবশেষে দীনহীন অকিঞ্চন করিয়া মৃত্যুর নিকটে ইহাকে বলিদান করে। এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াই বাহ্য প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চাহিলে, নচিকেতা মৃত্যুকে বলিয়াছিলেন—

> ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
> জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥
>
> [কঠোপনিষৎ ১অঃ, ২৭]

ভগবান্! বিত্তদ্বারা মানবের হৃদয়ের জ্বালা উপশমিত হইবার নহে। আর তোমাকে যখন দেখিতে পাইয়াছি, তখন (আধুনিক ভাবে) বিত্তলাভ করিবই; আর যতদিন তোমার প্রভুত্ব আছে, জীবনধারণও আমার অসাধ্য হইবে না।

আমার কিন্তু বরণীয় বর তাহাই—যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

নচিকেতা আরও বলিয়াছিলেন—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

[কঠোপনিষৎ ১অঃ, ২৬]

হে সর্ব্বান্তকারিন্! মরণধর্ম্মা জীবের 'কাল' পর্য্যন্ত অবস্থিত বিষয়রাশি ইহা সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ জীর্ণ করিয়া ফেলে। সমগ্র জীবন এ অতি তুচ্ছ সময় সুতরাং (আমি তোমার উপহার গ্রহণ করিতে পারিব না); এই অশ্বসমূহ, এই নৃত্যগীত ইহা তোমারই; এই ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-রাশিতে আমার প্রয়োজন নাই। বৎস! নচিকেতা যেমন বলিয়াছিলেন 'তবৈব বাহা স্তব নৃত্যগীতে', এখানে ঋত্বিক্ তেমনই যজমানের প্রতিনিধি হইয়া বলিতেছেন—'তাবত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ'।

স্বার্থপর জীব যেমন এক পয়সার জন্য জগতের সব সম্বন্ধ উপেক্ষা করিতে পারে, কাম-সেবী যেমন কামের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া লোকনিন্দা, বিষয়সম্পত্তি অবহেলা করিতে পারে, তদ্রূপ যজ্ঞপুরুষের সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনে চিত্ত লোলুপ হইলে, তাহার নিকট বাহ্যবিষয়ের দ্বারে সুখের মাধুকরী উপেক্ষণীয় হইয়া যায়; তাই জীব বলিতে পারে 'তবৈব বাহা স্তব নৃত্য গীতে' 'তাবত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ'।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! অগ্নিকে অঙ্গিরঃ বলা হইয়াছে কেন?

আচার্য্য] বৎস! এ সম্বন্ধে তোমাকে বহু কথা বলিবার আছে, সূক্তশেষে তোমাকে বিস্তৃতরূপে এবিষয় বলিব। আপাততঃ তুমি এই পর্য্যন্ত ধারণা করিয়া রাখ—অঙ্গিরস ইহা অগ্নির অন্যতম নাম। ভগবতী শ্রুতি বহুস্থানে অগ্নিকে অঙ্গিরস্তমঃ (ঋ স ১।৭৫।২) প্রথম অঙ্গিরোনামক ঋষি (ঋ, স ১।৩১।১,২) এবং অঙ্গিরোবংশে উৎপন্ন (ঐ ১।১২৭।২) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং অঙ্গিরঃ ইহা যে অগ্নির অন্যতম নাম, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপত্বাগ্নে দিবে দিবে, দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি ॥৭

পদানুসরণী] হে অগ্নে! বয়মনুষ্ঠাতারঃ দিবে দিবে প্রতিদিনম্ দোষাবস্তঃ রাত্রৌ অহনি চ ধিয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তঃ নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ উপসমীপে ত্বা এমসি ত্বামাগচ্ছামঃ॥

পদ-নিষ্যন্দিনী] উপ (সমীপে) ত্বা (তোমাকে) অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) এমসি (আগমন করিতেছি) দিবে দিবে (প্রতিদিন) দোষাবস্তঃ (দিবারাত্রি) ধিয়া (বুদ্ধিযোগ) বয়ম্ (আমরা) নমঃ (প্রণাম) ভরন্তঃ (করিতে করিতে)।

বঙ্গানুবাদ] হে অগ্নিদেব! আমরা (যাজ্ঞিকগণ) প্রতিদিন দিবারাত্রি বুদ্ধিযোগে তোমাকে প্রণাম করতঃ তোমার নিকটে আসিয়া থাকি।

গূঢ়ার্থ সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! আমার পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ একটা প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, আপনার নিকট অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি আমি স্বমুখে অপরাধ খ্যাপন করিলেও যেন পাপ-ভার লাঘব হইবে বলিয়া বোধ হয়, তাই বলিতেছি—ভগবন্! দুঃসঙ্গের ফলে কখন কখন আমার মনে হয় ভগবান কি চাটুপ্রিয় যে তাঁহাকে স্তব করিতে হইবে? যিনি আত্মানুভব সন্তুষ্ট, তাঁহার স্তবরূপ চাটুবাক্যে প্রয়োজন কি? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, শারীরিক ব্যাপার বিশেষকেই প্রণাম বলে 'ধিয়া নমো ভরন্তঃ' ইহা কিরূপ?

আচার্য্য] বৎস! পুরাকালে ভারতীয়-হৃদয়ে এরূপ সংশয় উঠিত না—দুর্ভেদ্য ভাবকবচে ভারত-হৃদয় অবগুণ্ঠিত থাকিত, যে হইতে সেই ভাবের বহিঃপ্রাকার বিধ্বস্ত হইয়াছে সেই হইতেই এই পঙ্কিল কুসংস্কার-প্রবাহ ভারত-ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক আমি তোমাকে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বলিতেছি প্রণিহিত মনে শ্রবণ কর—

অজ্ঞান বা আত্ম-বিস্মৃতিই জীবের বন্ধন। আত্মজ্ঞান-আত্মস্ম পূর্ণত্বের ও

পূর্ব্বক স্বস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। পূর্ব্বে সৃষ্টিপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তোমাকে দেখাইয়াছি—এক পরিপূর্ণ আত্মাই ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌রূপে বিরাজমান এবং পরিপূর্ণ আত্মারই অশুদ্ধ ব্যষ্টি অভিব্যক্তি প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব নামক চৈতন্য। প্রাজ্ঞ ও তৈজসের কথা ছাড়িয়া তুমি একবার বিশ্বনামক চৈতন্যের অবস্থা আলোচনা কর; বিশ্ব ব্যষ্টি স্থূল দেহের অভিমানী। কি এই স্থূল দেহ! ইহা পত্রাগ্রবিলম্বিত শিশির বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুর, ইহা আপাত-মনোরম চর্ম্মকঞ্চুকে আচ্ছাদিত মাংস-পুত্তলী, ইহা মলমূত্র-পূয়-শোণিত-ক্লেদ প্রভৃতি অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ। কি এই স্থূল দেহ! ইহা অহঙ্কাররূপ গৃহস্থের আরামপ্রদমন্দির-বলবতী বিষয়তৃষ্ণা; এই মন্দিরের গৃহস্বামিনী, দুশ্চেষ্টা ইহার নিত্য-সহচরী দাসী; ইন্দ্রিয়রূপ গবাক্ষজালে ইহা পরিপূর্ণ; ইহা বিষয়মললোলুপ চিত্তের আবাস; 'রক্ষ রক্ষ' 'মুঞ্চ মুঞ্চ' 'ত্রাহি ত্রাহি' 'হাহা হূহূ' ইত্যাদি সাময়িক চিত্ত-চীৎকারে ইহা পরিপূর্ণ। ইহা মৃত্যুপথ-নেতা কামের স্থাপিত পানশালা। বৎস! জীব বহুজন্মসঞ্চিত দুষ্কৃতিবলে এই দেহের সহিত পরিচিত হয়, অবশেষে দেহকেই আমি মনে করিয়া আপন পূর্ণ-আনন্দময়স্বরূপে বঞ্চিত হয়। চিন্তামণি বিনিময়ে বিবকুসুম ক্রয় করে।

যাহা হউক জীব এখন এই কৃতঘ্ন দেহের সহিত মিশ্রিত হইয়া দৈহিক সম্বন্ধে মাতা পিতা, ভাই ভগিনী, বন্ধু বান্ধব, স্বজন পরিজন নামক বহুদেহের সহিত 'আমার' এই সম্বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; দেহের বন্ধ এই সংবন্ধের সাহায্যে বিষ-গ্রন্থিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার অনুভব, ইহার স্মৃতি, ইহার অনুমান, ইহার উপমান—এই অজ্ঞান রাজ্যেরই জ্ঞান অজ্ঞান, ইহারই সংকল্প বিকল্প, ইহাতেই রতি বিরতি লইয়া জীব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; জীবের অবসর নাই। গৃহস্থের সর্ব্বলুণ্ঠনকারী সূর্য্যোদয়-ভীত চৌর যেমন দ্রুতগতি আপন অন্ধ-গুহার দিকে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ জীবও সর্ব্বদা কামরূপ চোরের সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া, আপনারই সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, আপনি আপনাকেই প্রবঞ্চনা করিতে করিতে দ্রুতগতি মৃত্যুপথে চলিয়াছে—জীবের সময় নাই—জীবের বিশ্রাম নাই। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে একই ভোগ ভুগিতে ভুগিতে জীব চলিয়াছে—জীবের বিরাম নাই; কোথায় ইহার বিশ্রাম? স্মৃতি বলিতেছেন—সৎ কর্ম্ম পরিপাকান্তে করুণা-নিধিনোদ্ধৃতাঃ। প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্। তখন জীব বিশ্রাম সুখ ভোগ করে—যখন তাহার সৎকর্ম্মের পরিপাক হয়, যখন করুণানিধি

উৎপত্তি প্রকরণের ভূমিকা।

বৈরাগ্য ও মুমুক্ষ প্রকরণদ্বয় শেষ হইল। যোগবাশিষ্ঠ মহাগ্রন্থ বুঝিবার জন্য আমরা অন্য শাস্ত্রের সাহায্যও গ্রহণ করিতেছি। বেদের তাৎপর্য্য ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া ধারণা করিতে যাওয়াই কর্ত্তব্য। সে ভাগ্যও কয়জনের আছে? ঋষিদের চিন্তার সহিত আমাদের চিন্তা মিশাইবারই প্রয়াস সামর্থ্যই বা কোথায়? অসংযমীর স্বাধীন চিন্তা অসার। মনস্থির করিবার সাধনা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা স্থিরমনপ্রসূত সত্যকথার যুক্তিবিচার প্রকৃত পক্ষে ধারণা করিতে পারেন না। এই জন্য শাস্ত্রের সত্যবাক্যগুলি লইয়া মানুষ তাহার ব্যবহার করিবার সময় বহু কুযুক্তি আনয়ন করে, করিয়া সমাজকে ব্যভিচারী করিতে চায়।

"আমিই সেই" ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কিন্তু যতদিন না বিচার দ্বারা এই তত্ত্ব অনুভব সীমায় আইসে ততদিন লৌকিক আচরণ মত কর্ম্ম করিতে হইবে। জ্ঞান হইলেও ভিতরে নির্লিপ্ত ভাব রাখিয়া বাহিরে লৌকিক ব্যবহার ঠিক রাখিতে হইবে; কিন্তু যাঁহারা গোঁজা-মিলন দিয়া সাধু হইয়াছেন, বা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, বা পরমহংস হইয়াছেন বা সোহহং স্বামী হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রমের কার্য্য ঠিক ঠিক করা হয় নাই বলিয়া সন্ন্যাসী হইয়াও সকাম কর্ম্ম করিতেছেন। উদর-নির্ব্বাহ জন্য শিষ্য করা আবশ্যক, শরীররক্ষা জন্য কুক্কুটাদি সেবাও আবশ্যক ইত্যাদি ভ্রষ্ট বিচারের ফল, সমাজে চালাইতেছেন। স্কুলের বালকেরা অঙ্কের ফল অগ্রে জানিলে, গোঁজা-মিলন দিয়া ফল মিলাইয়া দেয়। কখন কখন আপনার গোঁজা-মিলন আপনি ধরিতেও পারে না; অথচ বেশ হৃষ্ট থাকে ফলে মিলিয়াছে বলিয়া। গোঁজ-মিলুনে সাধুও সেই প্রকার।

এই দোষ প্রক্ষালন জন্য আমরা ব্যভিচারী হৃদয়ের চিন্তা-প্রণালীর আদর করি নাই; যুক্তি তর্ক ঋষিদিগের প্রণালী মতই করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ইঁহাকে আজকাল লোকে গোঁড়ামি বলে। আমরা বলি যেখানে যুক্তি-বিচার নাই, অথচ নিজের স্বেচ্ছাচারী হৃদয়ের বশীভূত হইয়া কার্য্য করাই প্রধান যুক্তি তাহাই গোঁড়ামি। উচ্চ সংযমী সাধু হৃদয়ের চিন্তাস্রোতে নিজের চিন্তা ঢালিয়া দিতে প্রয়াস পাওয়া গোঁড়ামি নহে; ইহাই দুর্ব্বল সাধকের বল।

বেদের ব্যাখ্যা—উপনিষদের সমন্বয় ভগবান্ বশিষ্ঠ যেরূপ করিবেন, সেরূপ আর কোথায় সম্ভব হইতে পারে? এই জন্য আমরা ভগবান্ বশিষ্ঠ-কৃত বেদ ও উপনিষদ্ ব্যাখ্যা গ্রন্থ এই যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেদ-ব্যাখ্যা বলিতেছি।

এই মহাগ্রন্থ প্রতিস্থানে আত্মদেবের এরূপ ভাবে সংবাদ দিতেছেন যেন সর্ব্বত্রই আমরা আত্মবস্তুকে চিনিতে পারিতেছি; কিন্তু অভ্যাস করি না বলিয়া ব্যবহারিক কার্য্যে তাহা হারাইয়া ফেলিতেছি। এই মহাগ্রন্থই যেন সাধকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। কর্ম্মী ভক্ত জ্ঞানী—সকলকেই বেদমার্গে ইনি চালাইয়া দিতেছেন। যোগবাশিষ্ঠ ভক্তির বিরোধী যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার যোগ্য নহে।

এই জীবনেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির বহু উপায়ের মধ্যে একটি উপায় এই:—

(১) মনে মনে তীর্থ যাত্রা করিয়া আইস।

(২) লোকের শোকতাপ হৃদয়ে আনিয়া, হৃদয়মধ্যে প্রিয়জনের চিতা জ্বালিয়া, হৃদয়ে বৈরাগ্য আনয়ন কর।

(৩) বৈরাগ্যবান্ হইয়া প্রবল পুরুষকার অবলম্বন কর। হয় মুক্তিলাভ করিব, নতুবা মুক্তিলাভ চেষ্টায় প্রাণ দিব। শৃগাল কুকুরের মত মরিব না। এই প্রতিজ্ঞা লইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হও। অগ্রে বৈরাগ্য প্রকরণ তাহার পরেই মুমুক্ষু-প্রকরণ।

মুমুক্ষুকে উৎপত্তি শ্রবণ করিতে হইবে। কেন হইবে তাহা লইয়াই এই এই প্রকরণ আরম্ভ। আমরা ভূমিকাতে প্রকাশ ও প্রকাশের আবরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। উৎপত্তি প্রকরণের প্রথম শ্লোকটি অত্যন্ত কঠিন। আশা করি, এই আলোচনায় তাহারও কথঞ্চিৎ ভণিতা হইবে।

বন্ধন দশায় দুঃখ, মুক্ত হইলেই সুখ। দৃশ্য-দর্শনই বন্ধন। দৃশ্য-দর্শন না থাকাই মুক্তি। সম্মুখের এই আকাশমণ্ডিত বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যদি কোনরূপে তোমার চক্ষু হইতে মুছিয়া যায়; শুধু চক্ষু হইতে নয় কিন্তু মন হইতেও যদি মুছিয়া যায়, তবে যাহা থাকে তাহাই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশ যাহা তাহাই এতৎশাস্ত্রে আত্মপ্রকাশ।

আত্মাকে আমরা সকলেই সর্ব্বদা ব্যবহার করি। "আমি" "আমি" প্রতি মুহূর্ত্তে বলিতে হয়। এই আমি না থাকিলে চক্ষু দেখে না, কর্ণ শুনে না, মন

ভাবে না, কোন ইন্দ্রিয়ের চলন হয় না। আত্মা আছেন বলিয়া প্রকৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় লইয়া সর্ব্বদা স্পন্দিত হইতেছে! যাঁহাকে সকলে সর্ব্বক্ষণে ব্যবহার করে, আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! তাঁহাকে প্রায় লোকেই জানে না!

আত্মপ্রকাশই যে পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ ইহা জীবন্মুক্ত ভিন্ন কেহই অনুভব করিতে পারে না।

প্রকাশটি যাহা তাহার নাম চৈতন্যময় জ্ঞান। প্রকাশে বা চৈতন্যময় জ্ঞানে কখন দিক্ ভূমি আকাশাদি জ্ঞেয়বস্তুর প্রকাশ হয় আবার কখন এই চৈতন্যময় জ্ঞান বা প্রকাশটি, দিক্ভূমি আকাশাদি প্রকাশ্যবস্তু বা জ্ঞেয়বস্তু হীন হইয়া আপনি আপনি ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন "যে প্রকাশে দিক্ভূমি আকাশাদি প্রকাশ্যবস্তুর প্রকাশ হয়, সেই প্রকাশ দিক্ভূমি আকাশাদি প্রকাশ্য বস্তু হীন হইলে যাহা হয় তাহাই আত্মপ্রকাশের উদাহরণ।

দৃশ্য-দর্শনটি আত্মপ্রকাশের আবরণ। এই দৃশ্য-দর্শনটি আত্মপ্রকাশকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রহিয়াছে। দৃশ্য-দেখা যতদিন আছে, ততদিন আত্মদর্শন নাই। দৃশ্য-দর্শন যতদিন আছে ততদিন দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, বন্ধন আছে, যাওয়া আসা আছে। দৃশ্য-দর্শনটি মায়ার বন্ধন।

অপূর্ব্বেয়ং হরের্মায়া ত্রিগুণারজ্জুরূপিণী।
যয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি॥

কতই আশ্চর্য্য দেখ। সাধারণ বন্ধনে মানুষ নড়িতে চড়িতে পারে না। কিন্তু শ্রীহরির মায়া! ইনি জীবকে তিন গাছি রজ্জু দিয়া বন্ধন করেন। এই বন্ধন মুক্ত হইয়া মানুষ চলনরহিত পরমানন্দে স্থিতিলাভ করে, কিন্তু মায়ার বন্ধনে জীব সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়।

দৃশ্য-দর্শন জ্ঞানই এই অপূর্ব্ব মায়ার কার্য্য। ইহা থাকিতে থাকিতে আত্ম-প্রকাশের সম্ভাবনা নাই।

দর্পণে প্রতিবিম্বপাত বন্ধ না হইলে দর্পণ যেমন নির্ম্মল প্রতিবিম্বশূন্য স্বরূপে থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মদর্শনে দৃশ্য-দর্শন প্রতিবিম্বপাত বন্ধ না করিতে পারিলে, আত্মদর্পণ আপন নির্ম্মল স্বপ্রকাশ অবস্থায় থাকিতে পারেন না।

কোন্ সাধনায় তবে আত্মপ্রকাশ হয়? যে সাধনায় মিথ্যা জগৎ আর চক্ষে ভাসে না, যে সাধনায় মিথ্যা দেহ আর জাগে না, যে সাধনায় মিথ্যা মন

আর মিথ্যা-সঙ্কল্প তুলে না, সেই সাধনায় আত্মা, দৃশ্য-দর্শন বিসূচিকা শূন্য হইয়া আপন আনন্দস্বরূপে সর্ব্বদা স্থিতিলাভ করেন।

এই সর্ব্বোচ্চ সাধনা কি ?

আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন অথবা গুরুমুখে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের আলোচনা শ্রবণাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা এবং পরে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ে পরিপক্ক হইয়া স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করা ইহাই সর্ব্বোচ্চ সাধনা।

ইহা ত সন্ন্যাসের পরে কর্ত্তব্য।

হাঁ। বিদিদিষা-সন্ন্যাস ও পরে বিদ্বৎসন্ন্যাসে যাহা সাধনা করিতে হয়, তাহাই বলা হইল।

বিবিদিষা অর্থ আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা। বিবিদিষা সন্ন্যাসের কার্য্য হইতেছে কাম্য কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া শুধু শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন লইয়া থাকা। ইহাতে আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তবে বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্বৎসন্ন্যাসে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়ে জীবন্মুক্তি।

বিবিদিষা সন্ন্যাসে তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত জন্মিবে। ইহাতে নিদিধ্যাসন বা সমাধি পর্য্যন্ত লাগিবে। কিন্তু ঐ সমাধির ব্যুত্থান দশাতেও যখন চৈতন্যরূপে স্থিতি ছুটিবে না, অথচ অন্য কর্ম্মাদি অভ্যাস বশতঃ অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মের মত হইয়া যাইবে তখন বুঝা গেল বিদ্বৎসন্ন্যাসও শেষ হইয়াছে। ইহাই জীবন্মুক্তি।

তত্ত্বমসির বিচারের পর তত্ত্বাভ্যাস, বাসনাক্ষয় এবং মনোনাশ সমকালে হইলে জীবন্মুক্তি হয় ইহা বুঝিলাম। বুঝিলাম বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত দৃশ্য দর্শন দূর হইবে না। আর তত্ত্বাভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত আত্ম-প্রকাশে স্থিতিলাভ করা যাইবে না।

দৃশ্য নাই, দৃশ্য নাই, এই বলিলে দৃশ্য-দর্শন দূর হইবে না। জগৎ নাই, জগৎ নাই এই মিথ্যা প্রলাপে জগৎ নাই হইয়া যাইবে না। মহাবাক্য বিচার দ্বারা দৃশ্য নাই ইহা অনুভব করিয়া স্থিতি কি ইহা জানা চাই। শুধু এই বিচারেই যে হইবে তাহা নহে; কিন্তু তত্ত্বাভ্যাস না করা পর্য্যন্ত আত্মা স্বপ্রকাশ-অবস্থায় স্থিতি লাভ করিতে পারিবেন না। এই কারণে বলা হইতেছে বৈরাগ্য যেমন আবশ্যক তত্ত্বাভ্যাস তদপেক্ষা অধিক আবশুক। ফলে তত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা বৈরাগ্যও প্রবল হইবে এবং বৈরাগ্য-বিচারেও তত্ত্বাভ্যাসের সুবিধা হইবে।

তত্ত্ব কোন্ বস্তু ? কেমন করিয়া ইহার অভ্যাস করিতে হয় ?

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।]　　১৩১৯ সাল, আষাঢ়।　　[৩য় সংখ্যা।

সংসার-মায়া—গাধি-ব্রাহ্মণ।

১। সুন্দর পর্ব্বতের পার্শ্বে সুন্দর আশ্রম। চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ। বৃক্ষে বৃক্ষে নানাপ্রকার ফল ফুল। ফুলে ফুলে নানাবর্ণের প্রজাপতি। বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবিধ ফল পাইয়া নানাবিধ বিহঙ্গম কাকলি করিত। নানাবর্ণের হরিণ বনভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। আশ্রমের নিকটে খেলা করিত। ময়ূর আসিয়া নৃত্য করিত। আশ্রমটি বড়ই সুন্দর। আশ্রমের নিকটেই প্রফুল্ল কমলশোভী এক সরোবর। সরোবরের জলপান করিতে কত বন্য জন্তু আসিত। সরোবরে স্নান করিতে কত পক্ষী আসিত। কোশল নামে জনপদে এই ঘটনা।

২। গাধি ব্রাহ্মণ বাল্যকাল হইতে বিরাগী। পিতামাতা বহুদিন হইল গত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন নাই; একা আশ্রমে তপস্যা করেন।

৩। ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া ডাকিয়া থাকেন। কাতর প্রাণের ডাকে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া দেখা দিলেন। তপস্যা-তপ্ত ব্রাহ্মণ প্রার্থনা জানাইল—ভগবান্ সংসার-মায়া কিরূপ তাহাই দেখিতে ইচ্ছা। দেখিতে পাইবে এবং মায়া হইতে উদ্ধারও পাইবে, বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই অরণ্যে ব্রাহ্মণ কতিপয় দিবস আবার তপস্যা করিলেন। ব্রাহ্মণ, মানসমধ্যে অতীত ও ও অনাগত বিষয় বিষ্ণুর আদেশানুসারে চিন্তা করেন।

৪। ব্রাহ্মণ একদিন সকুশ করঘর্ষণ দ্বারা জল ভাগ আবর্ত্ত করতঃ, সরোবরের জলে ডুবিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছেন। অতি অল্পকাল জলে ডুবিয়া থাকিতে হয়। মন্ত্রজপের জন্য জলে ডুবিয়াছেন। মন্ত্র ভুল হইয়া গেল। ঐ অত্যল্প-কালের মধ্যেই ব্রাহ্মণ বহু অবস্থায় পতিত হইতে লাগিলেন।

৫। গাধি ব্রাহ্মণ জলমধ্য হইতেই দেখিলেন যেন নিজভবনে মৃত হইয়া নিশ্চলভাবে পতিত আছেন। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল রসশূন্য ও মলিন। বায়ুশূন্য হওয়ায় গণ্ডস্থল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শবীভূত সেই দেহে নয়নদ্বয় কপালে উঠিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় অলগ্ন। শুভ্রদশনাবলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে যেন আত্মজীবন লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিতেছে। যেন বলিতেছে—এই অসার ক্ষণস্থায়ী রক্তমাংসের সমষ্টি এই জঘন্য দেহ, আবার আমাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিল? আমি ছিলাম বলিয়াই ইহার সৌষ্ঠব ছিল,—আমি চলিয়া যাইতে না যাইতে দেখ ইহার কি বিষম আকার হইয়াছে? আমি চলিয়া যাইতেছি, আর দেখ শরীরটা কিরূপ ক্লেশ করিতেছে?

৬। গাধি দেখিলেন, আত্মীয়বর্গ দীনভাবে চারিদিকে কুররীপক্ষীর দলের ন্যায় উপবেশন করিয়া চীৎকার করিতেছে। মাতা, গাধির চিবুক ধরিয়া রোদন করিতেছেন। ভার্য্যা, সেতুভঙ্গ হইলে জলাশয়ের জল যেমন বাহির হইলে আকণ্ঠ-সলিলমগ্না নলিনী অবনতমুখী হয়, সেইরূপ অবনতমুখী হইয়া তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্টা। গাধি যেন বান্ধবদিগের কাহার কিরূপ স্নেহ ইহা বিচার করিবার জন্য মৌন হইয়া রহিয়াছেন।

৭। সকলে নিরুপায় হইয়া তাঁহার মৃতদেহ বাড়ী হইতে বাহির করিতে লাগিল। মাতা, ভারবাহী ঘোটকীর ন্যায় ভূমে পড়িয়া কাতরভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, আর পরিজনেরা মাংসনাড়ীবসা-কর্দ্দমময় ভীষণ শ্মশানে মৃতদেহ আনয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে দেহ, চিতার উপর স্থাপিত হইল। চিতামধ্যে অগ্নি প্রদত্ত হইল। ক্ষণকালমধ্যে ঐ দেহ ভস্মাবশেষ হইল।

৮। গাধি ব্রাহ্মণ জলমধ্যে থাকিয়াই দেখিতেছেন তাঁহার আত্মা ভূতমণ্ডল নামক এক জনপদের প্রান্তসীমাবাসী এক চণ্ডালীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সেই সুকুমার আত্মা, গর্ভবাস নিবন্ধন যন্ত্রণায় সাতিশয় পীড়িত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

২

সংসার-মায়ায় গাধির চণ্ডালত্ব।

১। চণ্ডালী কালক্রমে এক সন্তান প্রসব করিল। চণ্ডালীগর্ভে জন্মিয়া গাধির আত্মা, চণ্ডালগণের প্রিয়শিশু হইয়া উঠিল। ষোড়শবর্ষ বয়সে চণ্ডাল-শিশু কুক্কুরসঙ্গে বিচরণ করিয়া শত শত মৃগবধ করিত। ক্রমে এক চণ্ডাল-বালিকার সহিত গাধির বিবাহ হইল। ক্রমে চণ্ডালরূপী গাধির কতিপয় পুত্রকন্যা জন্মিল। গাধিচণ্ডাল এক গৃহস্থ হইয়া উঠিল।

২। দেখিতে দেখিতে জরা আসিয়া পড়িল। গাধিচণ্ডাল জরাজীর্ণ হইয়া পড়িল। চণ্ডাল অতিশয় ক্রূর। বহু জীবহিংসা করিত। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, গাধিচণ্ডালের স্ত্রীপুত্রকন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গাধিচণ্ডাল কতই কাঁদিল। শেষে দুঃখিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে, কীরজনপদে এক সুন্দর পুরীতে সে আসিল।

৩। গাধিচণ্ডাল দেখিল ঐ দেশের পথিমধ্যে বিবিধ মণিরত্নভূষিত এক মঙ্গলহস্তী বিচরণ করিতেছে। ঐ দেশে রাজা ছিল না। মঙ্গলহস্তী যাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইবে সেই রাজা হইবে—ইহাই ঐ দেশের নিয়ম।

৪। গাধি পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। ক্রমে হস্তী গাধির নিকটে আসিল। আসিয়া গাধিচণ্ডালকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। ঐ রাজ্যের লোক তখন গাধিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। সে যে চণ্ডাল ইহা কেহই জানিল না।

৫। গাধি রাজা হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিল। ক্রমে গাধি রাজভোগে নিজের চণ্ডালত্ব ভুলিল। অন্তঃপুরচারিণী রাণীগণের সেবায় গাধির নূতন জীবন হইল। নাম হইল গবল রাজা।

৬। আট বৎসর হইয়া গেল। গবল রাজার রাজত্বে সকলে আনন্দে রহিয়াছে। রাজা একদিন যদৃচ্ছাক্রমে গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া শূন্যদেহে অবস্থান করিতেছিলেন। অলঙ্কার, বেশভূষার প্রতি তাঁহার বিরক্তি আসিয়াছে।

৭। গবল ঐ ভাবেই রাজপুরীর প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়াছেন। একদল স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ চণ্ডাল, বাহিরে বীণাবাদন করিয়া গান

করিতেছিল। সেই চণ্ডালগণ রাজাকে কটঞ্জ বলিয়া সম্বোধন করিল। আর রাজকামিনীগণ বাতায়ন-পথে তাহাই দেখিতেছিলেন।

৮। চণ্ডালগণ বলিল, ওহে কটঞ্জ! এই দেশের রাজা ত তোমাকে বসন ভূষণ দিয়া আপ্যায়িত করেন? রাজা চণ্ডালদিগের কথা অমান্য করিলেন। কিন্তু রাজকামিনীগণ রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া সন্দেহ করিলেন। ক্রমে সেই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

৯। মন্ত্রীগণ, রাজনারীগণ ও নগরবাসীগণ চণ্ডাল-অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মহীপতিকে শবের ন্যায় আর স্পর্শ করিলেন না। রাজভৃত্য রাজা হইতে দূরে দূরে রহিতে লাগিল।

১০। ক্রমে রাজ্য নিরানন্দময় হইয়া গেল। মহাপাপ হইয়াছে মনে করিয়া, স্ত্রী-পুরুষ সকলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে মনস্থ করিল। নগরব্যাপী এক চিতা প্রস্তুত হইল। বহুলোক প্রজ্বলিত অনলরাশিমধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল।

১১। রাজার প্রাণে নিদারুণ যাতনা। তাঁহার জন্যই প্রজাবর্গ প্রাণত্যাগ করিতেছে ভাবিয়া, রাজা অগ্নিকুণ্ডে সেই গবল নামক দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

৩

গাধি ব্রাহ্মণের জলমধ্য হইতে উত্থান।

১। জলমধ্যস্থিত গাধি ব্রাহ্মণ অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতেই স্বীয় অঙ্গদাহ অনুভব করতঃ বোধপ্রাপ্ত হইলেন।

২। জল হইতে উঠিয়া গাধি ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ আমি কি দেখিলাম? আপন চিত্ত শান্ত করিবার জন্য গাধি আপন স্বরূপ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আমি সেই গাধি, এই আমি জলমধ্যে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছিলাম। আমি চণ্ডাল হই নাই। গাধি পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

৩। নিজ স্বরূপ স্মরণ করিয়া গাধি, তীরে উঠিলেন; কিন্তু তিনি সকল বস্তুকে অসৎরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। মনে মনে আবার স্মরণ করিতে লাগিলেন, আমি কে? কি দেখিতেছি? এ যাবৎ আমি কি করিলাম? আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই জন্য এই ভ্রম দেখিতেছি।

৪। গাধি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি মাতা ও পত্নীর সম্মুখে মৃত হইলাম। কিন্তু আমার মাতা ও পত্নী কোথায়? শৈশবেই আমার

মাতাপিতা মৃত। আমি চির-অবিবাহিত। ব্রাহ্মণের মদিরাস্বাদনের ন্যায় রমণীর আস্বাদ আমি একবারেই জানি না। আমি গন্ধর্ব্বনগরবৎ তবে একি দেখিলাম? ইহা আমার ভ্রম। ইহা কোন মায়া।

৫। তথাপি আমি বিশেষ কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। উন্মত্ত শার্দ্দূল যেমন গভীর অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, দেহীদিগের চিত্তও সেইরূপ এই প্রকার ভ্রান্তদৃষ্টিতে ভ্রমণ করে। এই সমস্তই চিত্তের ব্যামোহ। গাধি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কিছুদিন আপন আশ্রমে বাস করিলেন।

৪

গাধি ব্রাহ্মণের নূতন ঘটনা।

১। গাধি আপন আশ্রমে বাস করিতেছেন। একদিন অন্য এক ব্রাহ্মণ গাধির অতিথি হইয়া আসিলেন। গাধি যত্নপূর্ব্বক অতিথির সেবা করিলেন। সে রাত্রি অতিথি ও গাধি, সন্ধ্যোপাসনা ও জপাদি সমাপনান্তে একত্রে কোমল পল্লবশয়নে শয়ন করিলেন।

২। তপস্বীদ্বয় তপস্যা সম্বন্ধে বহু আলাপ করিলেন। শেষে গাধি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভাগ! আপনি এত কৃশ কেন? কেনই বা আপনাকে এত পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছে?

৩। অতিথি বলিতে লাগিলেন, আমি কীরদেশে এক মাস ছিলাম। অকস্মাৎ একদিন শুনিলাম, আজ আট বৎসর এই দেশে এক চণ্ডাল রাজত্ব করিতেছিল। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, কথা সত্য। রাজার চণ্ডালত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িলে, রাজা হুতাশনে দেহত্যাগ করেন। রাজ্যের বহুলোক পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন। আমিও প্রয়াগে গিয়া পাপশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করি। তৃতীয় মাসের পর পারণ করিয়া, এই অদ্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।

৪। সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে অতিথি প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৫। গাধি আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। ভাবিলেন ইহাও কি মায়া? আমি বন্ধুজনের মধ্যে যে মরিয়াছিলাম ইহা ত নিশ্চয়ই মায়া। কিন্তু আমার চণ্ডালজন্মের ব্যাপারটা কিরূপ তাহা একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

৬। গাধি ভূতমণ্ডল গ্রামে আসিলেন। গ্রামের চতুঃসীমা দেখিয়া বিস্মিত

হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, নরকরাশির ন্যায় গাধি সেই চণ্ডালপল্লীকে সেইরূপ দেখিলেন। চণ্ডালজন্মের সমস্ত চিহ্ন সেখানে বিদ্যমান দেখিলেন।

৭। পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানসকল দেখিয়া গাধির বৈরাগ্য জন্মিল। সেই ভগ্ন বাসগৃহ, গৃহভিত্তিতে যবাঙ্কুর, পানপাত্র স্বরূপ খর্পর, গৃহের চালের অর্দ্ধভাগ পতিত, সেই মাদুরের ছিন্নার্দ্ধ—এই সমস্ত পূর্ব্ববৎ দেখিয়া গাধি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। ভিতরে ঘৃণা, আত্মগ্লানি, অদৃষ্টনিন্দা-প্রবাহ ক্রমে চলিতে লাগিল। তত্ত্ববিৎ গাধি, শুষ্ক শবপ্রায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রাক্তন আত্মভবন দেখিতে লাগিলেন।

৮। গাধি তখন এক লোকালয়ে গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ গৃহে যে চণ্ডাল বাস করিত, তাহার কথা কি তাহার মনে আছে?"

৯। গ্রামবাসী বলিল ঐ চণ্ডালের নাম কটঞ্জ। তাহার পুত্র পৌত্রাদি মৃত হইলে, সে কীরদেশের রাজা হইয়া আট বৎসর অতিবাহিত করে। পরে তাহার চণ্ডালত্ব চারিদিকে প্রচার হইলে, সে বহু প্রজার সহিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন দেয়। ব্রাহ্মণ আপনি, এত আগ্রহ করিয়া উহার কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? সে কি আপনার কেহ হয়?

১০। গাধি এক মাস ঐ গ্রামে বাস করিয়া, স্বপ্নানুভূত ঘটনাগুলি দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া লইলেন। মায়া-কৌশল করিয়া মিথ্যাকে সত্যবোধ করাইয়া দিতে লাগিল।

৫

গাধির কীরদেশে গমন।

১। গাধির দুঃখের সীমা নাই। চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানগুলি দর্শন করেন। যেখানে গৃহভিত্তিতে গজদন্ত প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যেখানে সুরাপানমত্ত চণ্ডালবন্ধুদিগের সহিত বানরীমাংস পাক করিয়াছিলেন, যেখানে গজমদতিক্তীকৃত সুরাপান করিয়া চণ্ডালীকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহচর্ম্মে শয়ন করিতেন, যেখানে কুক্কুরগণ ভিত্তি-প্রোথিত গজদন্ত-স্তম্ভে চর্ম্মদ্বারা বাঁধা থাকিত—একে একে গাধি সমস্ত দেখিয়া উন্মাদের মত হইলেন। শেষে কিছুদিন পরে ভূতমণ্ডল গ্রাম ছাড়িয়া, হিমালয়ের উপর সেই কীরদেশে গমন করিলেন।

২। এখানেও সেই সমস্ত। সেই রাজধানী, সেই অট্টালিকা, সেই

উদ্যান, সেই সরোবর। গাধি, সেখানকার লোককে চণ্ডালরাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রামবাসীগণ মঙ্গলহস্তী হইতে আরম্ভ করিয়া, গবল রাজার অগ্নিপ্রবেশের কথা সমস্তই বলিল। আরও বলিল, সে ঘটনা বার বৎসর হইল হইয়া গিয়াছে।

৩। গাধি সেই দেশে থাকিতে থাকিতে বিষ্ণুকে রাজা হইয়া মন্দির হইতে বাহির হইতে দেখিলেন। সমস্ত ঘটনা গাধি স্মরণ করিলেন এবং সত্য দেখিলেন। ইহা সমস্তই স্বপ্ন। কোথা হইতে এই মায়া আসিল? আমার মন মোহিত হইয়াছে। আমি চারিদিকে ভ্রান্তিই দেখিতেছি। চক্রধারী বিষ্ণু আমাকে মায়া দেখাইয়াছেন ইহা আমার মনে হইতেছে। আমি গিরিগুহায় থাকিয়া যাহাতে মায়ার জন্ম ও স্থিতি জানিতে পারি তাহার যত্ন করিব।

৪। হায়! মায়া কতই দুরত্যয়া। এই মায়াকে কে তাড়াইতে পারে? কে ইঁহারে জয় করিতে পারে? রামরাবণের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যখন মায়াতে সীতাকে দ্বিখণ্ড করিয়া দেখাইয়াছিল, তখন অন্যের কথা দূরে থাক মায়ান্তকারী সাক্ষাৎ রুদ্ররূপী শ্রীমহাবীর পর্য্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। দশানন যখন শ্রীজানকীকে বশ করিতে না পারিয়া শ্রীভগবানের কাটামুণ্ড দেখাইয়াছিল, তখন সাক্ষাৎ মায়াস্বরূপিণী শ্রীসীতা আপনার মায়ায় আপনি ভুলিয়াছিলেন। সাধারণ মানব কি করিবে? মনই যে তাহাদের মায়া। কোথাও কিছু নাই, এই মন কত মায়া তুলিতেছে, আর মানুষ কতই ভ্রম দেখিতেছে—এই মন বশ করিবে কে? সেই জন্য মায়া অতিক্রম করিবার কৌশল, মন বশ করিবার কৌশল শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে" আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিতে থাক; আমার নাম লইয়া, আমার কথা স্মরণ করিয়া, মনের তরঙ্গসমূহে স্থির থাকিয়া, নামের হাল ধরিয়া থাক; আমিই তোমাকে মায়া অতিক্রম করাইয়া দিব।

৫। গাধি গিরিগুহায় গমন করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে প্রীত করিবার জন্য গণ্ডূষ মাত্র জল পান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। মায়া একদিকে চণ্ডালত্বের ঘটনা সত্যবৎ দেখাইয়া ব্যাকুল করিতেছে; কখন কখন চণ্ডালত্ব স্বপ্ন বলিয়া আবার চণ্ডালপল্লী দেখাইয়া দিয়া ভ্রম দৃঢ় করিতেছে; অন্যদিকে গাধি নিতান্ত কাতর হইয়া মায়া বুঝিবার জন্য শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতেছেন। ইহাই সাধনা। গাধি এক বৎসর ধরিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিলেন।

৬। গাধির উগ্র তপস্যায় শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। শূন্যে থাকিয়াই শ্রীভগবান্ দেখা দিলেন। গাধি কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমার বাসনাদিগ্ধ মন স্বপ্নে যাহা দর্শন করিল, আমি জাগ্রত হইয়াও তাহা ঠিক ঠিক দেখিতেছি কেন? জলমধ্যে এক মুহূর্ত্তে যে স্বপ্ন-ভ্রম উপলব্ধি করিলাম, তাহা আবার প্রত্যক্ষগোচর করিলাম কেন?

৭। ভগবান্ কহিলেন—গাধে! জগদ্রূপী মহাভ্রম যাহা দেখিতেছ, তাহা বাসনারোগাক্রান্ত চিত্তভাবাক্রান্ত আত্মস্বরূপেরই রূপ। সমস্তই চিত্ত-মধ্যে। সেই অতিথি, সেই চণ্ডালগণ, সেই কীরবাসীগণ, সেই ভূতমণ্ডল গ্রাম এই সমস্তই ভ্রম—সমস্তই মোহ। তুমি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করতঃ মনে মনেই উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় এই বিভ্রম দৃষ্টিগোচর করিয়া থাক। এখন উঠ, নিজ কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ভিন্ন শ্রেয়ঃলাভ হইবে না। চিন্তাকে অনাস্থা করিয়া ঘন ঘন নাম করিয়া যাও। না পারিলে চুপ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে মায়া-চণ্ডীর প্রচণ্ড নৃত্য দেখিতে থাক। আমিই তোমাকে শান্ত করিয়া দিব, বিষ্ণু এই বলিয়া অন্তর্হ্হিত হইলেন।

৬

গাধির শেষ কথা।

১। বিষ্ণু চলিয়া গেলেন। গাধি নিজে মোহ-বিষয় বিচার করিবার জন্য আবার ভূতমণ্ডলে আকাশে মেঘভ্রমণের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

২। কোথাও কিছু নাই বলা হয়, মনে কর এইখানে এক গোল পুষ্করিণী, তাহার মধ্যে বটবৃক্ষ। বৃক্ষের ছায়া পুষ্করিণীকে ছায়াময়ী করিয়াছে। ইহা সমস্তই মিথ্যা। কিন্তু তুমি এই মিথ্যা ত্যাগ কর। ত্যাগ করিয়া আমায় বলিও। ত্যাগ করিয়া আসিয়া যদি সংবাদ না দাও, তবে আমি তোমায় অভিসম্পাত করিব। এই যে মিথ্যা, এই মিথ্যাকেও যেমন ত্যাগ করা যায় না—মায়ারও ব্যাপার সেইরূপ। গাধি যাহাকে মিথ্যা বলিতেন—তাহাই পুনঃ পুনঃ দর্শনে মায়ারই কার্য্য করিতে লাগিলেন।

৩। এই উপায়ে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে না পারিয়া, গাধি আবার গিরি-কন্দরে ফিরিয়া আসিয়া, হরির আদেশমত তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন।

৪। অল্পকাল মধ্যে আবার জনার্দ্দন দেখা দিলেন। একবার আরাধনা করিলেই বিষ্ণু বন্ধু হইয়া থাকেন। জলধর যেমন গর্জ্জন করিয়া ময়ূরের সঙ্গে

কথা কয়—শ্রীভগবান্ গাধিকে পুনরায় বলিলেন, গাধে! পুনরায় তপস্যা দ্বারা তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ?

৫। দেব! আমি পুনরায় সেই ভূতমণ্ডলে ও কীরদেশে ছয়মাস ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ করিতে ত পারিলাম না। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা শুনিয়াছিলাম—এবারেও তাহাই দেখিলাম, তাহাই শুনিলাম। প্রভু! তবে কেন তুমি বলিতেছ সমস্তই মিথ্যা? তোমার বাক্যে আমার মোহনাশ না হইয়া, বাড়িয়াই যাইতেছে।

৬। তখনও গাধির কালপূর্ণ হয় নাই। ভগবান্ বলিলেন, চিত্তমধ্যে কতকগুলি ঘটনা প্রবাহিত করিয়া দিলে, ঐ ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক, তাহা সত্য মত প্রতিভাত হয়। একজনের চিত্তে যে ভ্রম ঘটে, বহুজনের চিত্তে সেইরূপ হইতে পারে। জগদ্দর্শনটাও ঐরূপ ভ্রম মাত্র। বহুজনের চিত্তে ঐ এক ভ্রম আছে, তাই সকলে একরূপ ভ্রম দেখিতেছে। তুমি সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া "আমি কে" এই ধ্যান কর। প্রথম প্রথম চিত্ত সঙ্কল্প তুলুক বা না তুলুক, তুমি চিত্তকে ও চিত্তসঙ্কল্পকে মিথ্যা ভাবিয়া দ্রষ্টারূপে অবস্থান কর। এই শান্তভাবে থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিবে—তুমি সেই হৃদয়শায়ী পুরুষ—যিনি এই "নবদ্বারপুরে দেহে নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" ভাবে শান্ত হইয়া অবস্থিত। তুমি সর্ব্বসঙ্কল্প, সর্ব্বচিন্তা দিয়াই আমার পূজা কর। চিন্তা উঠিলেই বল—প্রভু এই চিন্তা উঠিতেছে, আমি সুন্দর সুন্দর বস্তু দিয়া তোমাকে পূজা করিতে পারিলাম না; আমার স্বকীয় বস্তু এই সমস্ত সঙ্কল্প; আমি ইহাই তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তোমাকে যাহা দিলাম, তাহা তোমার নিকটেই গিয়াছে, আমার আর কোন কিছু নাই; আমি শান্ত হইয়া রহিলাম। তুমি এইভাবে সর্ব্বসঙ্কল্প আমাতে অর্পণ করিয়া আত্মদেবের পূজা করিয়া পরম শান্তভাবে ধ্যানস্থ হও। শ্রীভগবান্ এই উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

৭। গাধি আবার কতদিন গিরিকন্দরে তপস্যা করিলেন, তথাপি ভ্রম দূর হইল না। তিনি আবার শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন এবং দুঃখ জানাইলেন।

৮। গাধির সময় পূর্ণ হইল। শ্রীভগবান্ এবারে আগমন করিয়া গাধির মায়া দূর করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন;—

গাধে! তুমি মায়া দেখিতে চাহিয়াছিলে, সেই জন্য মৎসঙ্কল্পবশে আমি

তোমার চিত্তে চণ্ডালসংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলাম। ভূতমণ্ডলগ্রামে পূর্ব্বে কটঞ্জক নামে এক চণ্ডাল তোমার চিন্তিত শরীর ও গৃহদারাদি প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ চণ্ডালই কীরদেশে রাজা হয় এবং হুতাশনে দেহত্যাগ করে। তুমি এখন যাহা চিত্তে প্রবাহিত দেখিলে, আমি তাহাকেই পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত করিয়া মায়াবলে উৎপন্ন করিয়া দিলাম। অতীত ঘটনা হইলেও এই কটঞ্জ-বৃত্তান্ত তোমার চিত্তে বর্ত্তমানরূপে প্রতিভাত হইল। তোমার চিত্তে যে ঘটনা উদয় করাইব, তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তিত বিষয় লইয়া আমি পূর্ব্বে ঐ ঘটনাগুলি ঘটাইয়া রাখিলাম। কাজেই তোমার চিত্ত যে সমস্ত প্রবাহ মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল, তুমি স্থূলশরীরে তাহার কিছু না করিলেও সূক্ষ্মদেহে সমস্ত করিলে, এবং কটঞ্জ চণ্ডালও পূর্ব্বে তাহাই করিয়াছিল; কাজেই তুমি সূক্ষ্মদেহে যাহা ভোগ করিলে, পূর্ব্বে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া তোমার এখনকার চিন্তিত ব্যক্তি তাহা করিয়া গিয়াছে। কাজেই তোমার সমস্ত বিষয় সত্য বলিয়া মনে হইল।

চিত্তই মায়াচক্রের নাভি, মায়াচক্র প্রবলবেগে ঘুরিতেছে। এই চিত্তরূপ মায়াচক্রের মধ্যভাগকে যদি আক্রমণ করিয়া থাকিতে পার, তবে মায়াচক্র আর তোমাকে ঘুরাইতে পারিবে না।

এখন তুমি বৈরাগ্যবশে সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত কর্ম্ম, আমাতে অর্পণ করিয়া সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ কর, করিয়া তপস্যা কর; তুমি পরমপদে চিরবিশ্রান্তিলাভ করিতে পারিবে।

গাধি দশবৎসর ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

গাধির উপসংহার।

১। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জান। মিথ্যা কি? সমস্তই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই সত্য। চেতনই সত্য, জড় মিথ্যা। ইহার বিচার কর?

২। জগৎ যাহাই হউক তুমি ইহার সম্বন্ধে যাহা চিন্তা কর, তাহাইত কল্পনা? কল্পনাটা চিত্তস্পন্দন মাত্র। চিত্ত স্পন্দনশূন্য কর, সঙ্কল্প ত্যাগ কর, তুমি আত্মসংস্থ হইয়া শান্তভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করিবে।

৩। কিছুদিন ধরিয়া বিচার কর সত্য কি? মিথ্যা কি?

কল্পনাটা মিথ্যা। তমসঙ্কল্প লইয়া থাক, তুমি কীট পতঙ্গাদি হইয়া যাইবে। রজসঙ্কল্প লইয়া থাক, আবার মানুষ-জন্ম হইবে। সত্ত্ব সঙ্কল্প কর, মোক্ষ-সাম্রাজ্য তোমার অদূরে। এই সমস্ত কল্পনা ত্যাগ কর, এই জীবনেই মুক্তি। সঙ্কল্পটা মায়া,—মিথ্যা।

অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্মফলত্যাগ।

নাম অভ্যাস অপেক্ষা নামের জ্ঞান ভাল; নামের জ্ঞান অপেক্ষা নাম লইয়া ধ্যান ভাল; অজ্ঞান পূর্ব্বক ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-প্রীতি জন্য কর্ম্ম করা ভাল।

১। চিত্ত যখন সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য হইয়া পরমপদে সমাহিত হয়, তখন সমাধি।

২। চিত্ত যখন এই স্পর্শ করিলাম ভাবনা করে, তখন ধ্যান।

৩। চিত্ত যখন ধ্যান না পারে, তখন ইহাকে মানসে যে ফুলতোলা, মালা-গাঁথা ইত্যাদি ঈশ্বরভক্তিবর্দ্ধক কর্ম্ম করান তাহার নাম মৎকর্ম্ম-পরম হওয়া। শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং—অভ্যাসযোগে ইহার সাধনা করিবে।

৪। চিত্ত যখন নিজের সঙ্কল্পসমূহকে, উহারা যেমন যেমন উঠে তেমনি তেমনি তাহাদিগকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে, করিয়া আবার শান্ত হইয়া স্পর্শ করিতেছি এইরূপ ভাবনা করিতে পারে—চিত্তের এই বাসনা-সমর্পণ কার্য্যকে সঙ্কল্পত্যাগ-চেষ্টা বলে, ইহাই মদ্‌যোগ।

৫। চিত্ত যখন ভারি চঞ্চল, তখন নিবৃত্তিমার্গের শাস্ত্রোজ্জ্বল আমি, প্রবৃত্তিমার্গের বিষয়-দীপিত আমিকে উপদেশ করি—ইহা বৈরাগ্য উদয়ের জন্য করিতে হয়। বৈরাগ্য উদয়ের পরে যখন কর্ম্ম করা যায়, তখন কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াই কর্ম্ম হয়। মদ্‌যোগটি সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগ জন্য। এখানে কর্ম্ম নাই; কিন্তু বৈরাগ্যটিতে কর্ম্ম আছে, কর্ম্মফল নাই।

৬। যখন কোন উপদেশই এই দুরন্ত চিত্ত শুনিতে না চায়, পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিলেও পুনঃ পুনঃ বিষয় চিন্তাতেই ইহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তখন যে বেগে চিত্ত চিন্তা তুলে, আমার আশ্রয়ে থাকিয়া সেই বেগে ইহাকে জপ করাইতে হয়। ইহা যত যতবার ভূত দেখিবে, তত ঘন ঘন রাম নাম ইহাকে করাইতে হইবে। ইহাই জপ। এই জপ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনা।

৭। এই জপ সন্ধ্যাপূজায় আছে, এই জপ প্রাণায়ামে আছে, এই জপ কুম্ভক করিয়াও সুন্দর হয়, এই জপ করিতে করিতে ধ্যান অভ্যাস হয়, এই জপ পরম উপকারী। এই নাম জপ দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া, চিত্তকে নামে একাগ্র করিলে, নামস্বরূপ যে নামী তাঁহার দর্শন হয়। তিনি একবার দেখা দিলেই বন্ধু হইয়া যান। যখন ডাকা যায়, তখন আসিয়া যাহা করিলে ভাল হয় তাই করিতে বলিয়া যান।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে।

প্রভু! নিবেদি চরণে তবে,
প্রাণের আকুতি ব্যাকত করিব
যা থাকে কপালে হ'বে।
পুরীক্ষেত্র-মাঝে, জগন্নাথ-সাজে,
তোমারে দেখিনু আমি ;
বিশাল নয়নে করুণা সাগর,
চাহিয়া রহিলে তুমি।
(আমি) সে মুখ নেহারি অথির হইনু,
নয়নে ঝরিল ধারা ;
তুলসী চন্দনে শ্রীপদ পূজিতে
হইনু বাউরি পারা।
না দিল আমায় তিল অবসর,
পূজার সময় হরি ;
(আমি) লুটায়ে লুটায়ে কাঁদিলাম কত,
তোমায় স্মরণ করি।
যেখানেই যাই দেখিতে তোমায়,
পশ্চাতে তাড়না কত ;
অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা রহিল শ্রীনাথ,
এবার জনম-মত।

বারে বারে নাথ, পাইয়া আঘাত,
শিখেছি লুকাতে আমি ;
লুকাইয়া পূজা হ'লনাত আর
তুমি যে জগতস্বামী।
অগাধ সলিলে কঠিন প্রস্তরে,
চন্দ্রমা সরোজ মাঝে,
গুরুব্রহ্মরূপে বিরাজ ধানুকী,
অর্দ্ধ-নারীশ্বর সাজে।
প্রকৃতি-জড়িত পুরুষ সুন্দর,
অনাদি গৃহস্থ তুমি ;
(তবে) কাহার বিধানে, কেমনে হইব—
বল হে স্বতন্ত্র আমি।
তবু তুমি আমি এ কোন্ বিচার,
তাইনা যাতনা পাই ;
ঘুচিল না হরি ! বৃথা হাহাকার,
তিন লোকে নাই ঠাঁই।
রূপ রস আদি বিষয়-পরশে,
সজ্ঞানে হারাই জ্ঞান ;
প্রখরা প্রকৃতি কুটিল কটাক্ষে,
ভুলায় তোমার ধ্যান।
ধারণা-অভ্যাস নাহিক আমার,
কি হ'বে হে দীনবন্ধু !
কেমনে যাইব বল বল গুরো !
এ ভব দুস্তর-সিন্ধু !
সমুদ্রকল্লোল অতীব ভীষণ,
অনন্ত তরঙ্গ তার ;
রাম রাম হরে জয় জগন্নাথ !
আমারে করহে পার !

রা—

ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা।

১। সকলের মধ্যেই সত্যস্বরূপ তুমি আছ। কিন্তু সর্ব্বত্র তুমি ভাস-না, তাই আমি তোমায় দেখিতে পাই না। আমি মূঢ়।

২। বিশ্বাস রাখি তুমি সর্ব্বত্র আছ। তথাপি সর্ব্বকালে সর্ব্ববস্তুতে তোমায় স্মরণ করিতে পারি না। কতবারই ভুলিয়া যাই। আমার কর্ম্ম ভাল ছিল না। তাই তোমায় স্মরণ করিতে না পারিয়া, আমি মিথ্যা তরঙ্গে ভাসিয়া যাই।

৩। মিথ্যাকে মিথ্যা ভাবিতে আমার মনে থাকে না। আমার বিচার সব সময়ে থাকে না বলিয়া ক্লেশ পাই।

৪। আমি কোন্ পথে চলিব? তুমি সর্ব্বত্র আছ ইহাই যখন মনে রাখিতে পারি না, তখন তোমার সন্তোষের জন্য কর্ম্ম আমি করিব কিরূপে? তবে আমার পথ কি?

৫। সত্যস্বরূপ তুমি। তোমার উপর মিথ্যার খেলা হইতেছে। তুমি তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়ার সঙ্গে না জানি কি খেলা খেলিতেছ। আমাকে এই মিথ্যা হইতে রক্ষা কর। আমার আর কেহ নাই। কেহই আমায় রক্ষা করিতে পারে না। আমি তোমার আশ্রয়ে আসিলাম। আমি তোমার হইলাম।

৬। দেখ প্রভু! আমার দুঃখ কি? আমি যখন নির্জ্জনে বসিয়া তোমায় ডাকিতে চেষ্টা করি, তখনও আমি নির্জ্জন পাই না। আমি সর্ব্বদা যেন বহু লোকজনের সঙ্গে কথা কই। আমার চিত্ত একাগ্র হইয়া শুধু তোমায় লইয়া থাকিতে পারে না। আমার চিত্ত সর্ব্বদা পরের কথা লইয়া থাকে। মুখে তোমার নাম করি; কিন্তু চিত্ত, জপকালেও অন্য বস্তু বা ব্যক্তির সহিত নানা কথা কয়।

৭। বল আমি কি করিব? ঠিক পাগলের মত মন এখানে ওখানে ছুটিয়া বেড়ায়। এটা ওটা ধরে। আমি শাসন করিতে গেলেও শাসন মানে না। আমি মনের উপর রাগ করি। মন তাহা গ্রাহ্যই করে না। বল প্রভু! আমার উপায় কি?

৮। আমি কত কষ্ট করিতেছিলাম; তুমি আসিয়া আমায় পরিত্রাণ করিলে? তুমি বলিলে—চিত্ত যাহা করে করুক, তুমি চিত্তকে সংসারের হাল দেখাও। বাল্যকাল, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধত্ব যাহা যাহা যেমন যেমন দেখিয়াছ, নিজের হউক বা পরের হউক একবার আলোচনা কর। কত দুঃখ পাইয়াছ তাহাই চিন্তা কর। কতবার কর্ম্ম-দুরাচার হইয়াছ ভাব। কতবার কত জঘন্য কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছ মনে কর। আর মনে কর মরিতেই ত ছুটিয়াছ। যাহা যাহা করিলে মৃত্যু হয় তাহাই ত করিতেছ। মৃত্যু হইতে রক্ষা যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা ঠিক মত হইতেছে কোথায়?

৯। প্রথমে ভিত্তি দৃঢ় কর। সেই ভিত্তির উপরে ধর্ম্ম-প্রাসাদ তোল। তবে ত ধর্ম্ম-সৌধ স্থির থাকিবে। নতুবা ভিত্তি দৃঢ় নহে বলিয়া, সামান্য বাতাসেই তোমার ধর্ম্ম-গৃহ পড়িয়া যাইবে।

১০। বৈরাগ্যই ধর্ম্মের ভিত্তি। বৈরাগ্য নিত্য অভ্যাস করা চাই। প্রত্যহ বৈরাগ্য আলোচনায় যখন মন কাতর হইবে, প্রত্যহ বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধত্বের ক্লেশ স্মরণ করাইতে করাইতে যখন মন কাতর হইয়া উঠিবে, স্বামীর মৃত্যু, বা জামাতার মৃত্যু, বা পুত্রের মৃত্যু, বা কন্যার মৃত্যু, স্ত্রীর মৃত্যু, বা পিতামাতার মৃত্যু যাহার ভাগ্যে যাহা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া, মনকে লোকসঙ্গ হইতে, সংসারসঙ্গ হইতে প্রত্যাহার কর, মৃত্যু চিন্তায় ভীত হও, হইয়া তবে ভগবানের আশ্রয়ে আইস। তখন কাতর হইয়া ভগবানের নাম করিতে পারিবে, তখন ভগবানের নাম করিতে করিতে রস অনুভব করিতে পারিবে। তখন বাহিরের কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেছ স্মরণ করিতে পারিবে। মনই মায়া। মন বশীভূত করিতে হইলে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। নিত্য বৈরাগ্য অভ্যাস কর। করিয়া জপ, ধ্যান, আত্মবিচার এই অন্তরঙ্গ সাধনা কর। বাহিরের কর্ম্ম যতদিন না ছুটিয়া যায়, ততদিন ঈশ্বর-স্মরণ করিয়া লোক সেবা কর।

১২। সংসার সত্য, লোকজন সত্য, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন সত্য, যাত্রা সং সত্য, রঙ্গ তামাসা সত্য, ইহা হইলে শ্রীভগবান্‌কে হারাইয়া ফেলিবে।

১৩। আর সমস্তই ক্ষণিক বলিয়া আস্থার বস্তু নহে। শ্রীভগবান্ সত্য,

তাঁহার নাম সত্য, জপ ধ্যান আত্মবিচার দ্বারা সেই সত্য আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্‌কে লইয়া থাক, তবে থাকিতে পারিবে।

১৪। মিথ্যাকে ভগবানের আত্মমায়া জানিয়া, মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ব্যবহারপরায়ণ হও। সর্ব্বদা সত্যস্বরূপ ভগবান্ লইয়া থাকিতে চেষ্টা কর। চিত্ত প্রসন্ন হইবে। তখন ভগবৎ কৃপা বুঝিতে পারিবে। ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

১৫। এ দেহও থাকিবে না, এ ধন-জনও থাকিবে না, এ দুঃখও থাকিবে না, এ সুখও থাকিবে না—প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা ভগবান্‌কে ডাকিতে থাক; আলস্য, অনিচ্ছা ত্যাগ করিয়া ভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ত্তব্য করিতে পারিবে।

এস দীন দয়াময়।

এস এস বলি ডাকি সকাতরে,
শুনিতে তুমি কি পাওনা?
ব্যথিতের প্রাণ তুমি যে জগতে,
তবে কেন দাও যাতনা!
বড় সাধ মনে একান্তে বসিয়া,
করিব তোমার সাধনা;
আশায় আশায় দেহ হ'ল ক্ষীণ (বুঝি)
অপূর্ণ রহিল কামনা।
গণা দিন গেল দেখিতে দেখিতে
কি হইবে প্রভু! বলনা?
দিবস ঢাকিয়া গভীর আঁধার,
চৌদিকে করিছে ঘোষণা।
এস জ্যোতির্ম্ময় মানস-মন্দিরে,
দূরে থাকা আর সাজে না

সময় থাকিতে এস এস হরি,
তবে ত বুঝিব করুণা।
এস এস বলি ডাকি কত কাল,
অসাড় হইল রসনা ;
তবু কি তোমার পূজা নিতে আর,
সময় এখনও হ'লনা ?
(তবে) থাক তুমি থাক, বাকী কটা দিন
আমার আর কি যাবেনা ?
আমি থাকিতে পারি না, না ডেকে তোমায়,
কি করিলে তুমি বলনা ?
কি আছে তোমার দুইটি অক্ষরে,
কত সুধা ক্ষরে জানি না ;
দর দর ধারে বুক ভেসে যায়,
বলা আর কিছু হ'লনা।
আমি অভিমানে, বলি কত কথা,
অপরাধ তুমি নিওনা ;
এমন করিয়া স্নেহের নয়নে,
কেহ ত আমারে দেখেনা !
(আমি) এই ছুঁই ছুঁই যুগল চরণে;
মাথা রেখে বলি এসনা ;
নয়নের জলে পথ যে ভিজাই,
পাছে পদে লাগে বেদনা।
(আমি) না জানি আহ্বান, আদর আরতি,
স্তব-স্তুতি তব ভজনা ;
(তুমি) শিখায়েছ যাহা, ডাকি দু অক্ষরে,
যা জান তা তুমি করনা।
রা—

৺কাশীধাম।

সে অনেক দিনের কথা যখন বিশ্বেশ্বর প্রথম ৺কাশীতে লইয়া যান। সেই সময়ে দুটী দৃশ্য শ্রীভগবান্ দেখাইয়াছিলেন। উপযুক্ত না হইলে তিনি বৃথা কোন কার্য্য করেন না। এখন যে তিনি উপযুক্ত মনে করিয়াছেন তাহাও আমি জানি না; কিন্তু যেন সেই বহুপূর্ব্বের দৃশ্য একটু বুঝিতে পারিতেছি, আর শাস্ত্রের সহিত এই বুঝার অর্থ মিলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছি—হয় ত তিনি একটু উপযুক্ত করাইয়া লইতেছেন।

কথাটা এই। নূতন ৺কাশীতে গিয়াছি, দশাশ্বমেধ নূতন দেখিতেছি। অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর নূতন দেখিয়া আসিয়া দশাশ্বমেধের বাজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। গলিগুলি কিছুই ঠিক হয় নাই; দিকেরও নিশ্চয় হয় নাই। মনের মধ্যে কোনটার নিশ্চয় নাই। মনের মধ্যে স্থানগুলা পর্য্যন্তও যেন গোলমাল হইয়া আছে।

দুইটী সাধুকে বিশ্বেশ্বরের গলির দিক্ হইতে আসিতে দেখিলাম। একটি সাধু যুবক। আর এক জন সাধু বৃদ্ধ। উভয়েরই গৈরিকবস্ত্র-পরা। যুবকের গায়ে পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র জড়ান। বৃদ্ধের কটীদেশটুকু মাত্র গৈরিক বস্ত্র দ্বারা আবৃত। যুবক সন্ন্যাসী কাহারও দিকে চাহিলেন না। মুখখানা গম্ভীর। চক্ষু দুটী যেন কোন একটা ভাবে বাহিরের কিছু লক্ষ্য করিতেছে না। আপন মনে আপনি চলিয়াছেন। মনের মধ্যে কিছু লইয়া এতদূর অন্যমনস্ক আছেন যেন তাঁহার কাছে এই জগৎ পর্য্যন্ত নাই। সেকালে আমার এই দৃশ্যটী বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেই যুবক সন্ন্যাসীটি বাজার ছাড়াইয়া দেবনাথপুরা, বাঙ্গালীটোলা, রাণামহল বা কেদার যাইবার গলি (কালীমূর্ত্তির সম্মুখের পথ দিয়া গিয়াছে)—সেই দিক্ দিয়া গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকেই চিন্তা করিতেছিলাম; ভাবিতেছিলাম কি সুন্দর ভাবই দেখিলাম। বাহিরে চাহিয়া আছি, আর ভিতরে বাজারের নিকটে দাঁড়াইয়া কি যেন কি দেখিতেছি হঠাৎ আর এক দৃশ্য দেখিলাম। কতকগুলি বাবু লোক—এখন যেখানে রুদ্রাক্ষের মালার দোকান ও তাহার পাশে অন্য অন্য দোকান—সেই স্থানে বসিয়া নানাপকার বাজে কথা কহিতেছিলেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এক জন পরমহংস—এখন তাহা বুঝিতেছি। তখন পরমহংস দেখি নাই।

পরমহংস মুণ্ডিত মস্তক। ইনি ঐ দোকানের নিকটে আসিয়া বাবুদিগের দিকে একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বিকটভাবে দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া উঁহাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিয়া যে দিক্ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিকেই চলিয়া গেলেন। তখন এই দৃশ্য ভাল লাগিলেও পূর্ব্বের যুবক সন্ন্যাসীকে ভাল লাগিয়াছিল। আর এখন ভাল লাগিতেছে এই পরমহংসকে।

উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। এক জন ভাব পাইয়া ভাবের ঘোরে অন্য বিষয়ে অন্যমনস্ক। কিন্তু তিনি দুঃখী। কারণ যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাকে যেন পাইতেছেন না। ভাব আয়ত্ত হয় নাই বলিয়া দুঃখী। পাইতেছি না বলিয়া দুঃখী। এই যে তাঁহার দুঃখভরা মূর্ত্তি ইহাতেও একটা অভিমান আছে—দেহাত্ম বোধ আছে বলিয়াই দুঃখী।

পরমহংস—ভাব আয়ত্ত করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইতেছেন—যে বিকট ভঙ্গীকে তোমরা ভদ্রলোক সকলে অসভ্যতা মনে কর, তাহা তোমরা অজ্ঞান দেহাত্মবাদী বলিয়াই মনে করিতেছ। আমি দেহ নহি, দেহ হইতে স্বতন্ত্র। হে ভদ্রলোক! যখন তুমি মরিবে তখন এই শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহটাকে সভ্যভব্য করিতে কত প্রয়াস পাইতেছ বলিয়া, দেহাত্মবোধ প্রবল রাখিয়াছ বলিয়া, তুমি দেহটাকে আমি আমার করিয়াছ বলিয়া, মরিবার সময় বহু কষ্ট পাইবে। আর তোমার অজ্ঞানাচ্ছন্ন পরিজনও তোমার মৃত্যুসময়ে তোমার বিকট অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কতই দুঃখ করিবে; তোমার মুখের বিকৃতি দেখিয়া তখন ইহারা কতই কাঁদিবে। কেননা ইহারা দেহ পর্য্যন্ত দেখিতেই জানে। আর আমি! আমি দেখিতেছি দেহটা, আমি নই। এটা মরিবার সময় বহু বিকট আকার ধরিবে। ইহার বিকট আকার দেখিয়া, আমি তখন এটাকে উপহাস করিতে করিতে রমণীয় দর্শনের নিকটে চলিয়া যাইব। যাইবার সময় বলিয়া যাইব—রে হতভাগ্য! দেখ তুমি সর্ব্বদাই বিকট; তুমি নিতান্ত জঘন্য বস্তু হইয়া আমাকে কিরূপে তোমার মধ্যে রাখিতে পার? দেহ! তুমি দগ্ধ হও বলিয়াই তোমার নাম দেহ। তুমি শীর্ণ হও বলিয়াই তোমার নাম শরীর। তুমি মরিবে—জ্ঞানীর মৃত্যুতে দুঃখ কি? দেহ! তোমার যে যাতনা ইহা উপহাসেরই বিষয়।

আমি ছিলাম বলিয়াই দেহের সৌষ্ঠব থাকে, আমি চলিয়া যাইতে না

যাইতেই ইহার বিষম আকার হয়; ইহা বিকট ভঙ্গী করে। হে ভদ্রলোক সকল! আমি তোমাদিগকে এই যে বিকট আকার দেখাইলাম, এই জঘন্য দেহের এই স্বরূপ; তোমরা ইহাকে সাজাইয়া জামা জোড়া গায়ে দিয়া সৌষ্টব করিলে কি হইবে? ইহাকে অন্তরে উপহাস করিতে শিক্ষা কর, অন্তরে অনাস্থা করিতে অভ্যাস কর; এটা ভূতে নির্ম্মাণ করিয়াছে—ভূতের নির্ম্মিত বস্তু সর্ব্বদাই জঘন্য, এটাতে আমি আমার ত্যাগ কর; যাইবার সময় বলিয়া যাইতে পারিবে—হতভাগ্য দেহ! আমি তোমাকে উপহাস করিয়াই চলিয়া গেলাম; এখন তুমি দগ্ধই হইবে।

পরমহংসের মনের ভাব এই—ইহা ভাবিয়াও আমি এখন শান্তি পাইতেছি। যেটাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, যেটা শত্রু, তাহাকে অনাস্থা করিতেই তিনি দেখাইলেন। দেহ হইতে তিনি ছাড়া, তাই দেখাইলেন।

কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য এই দেহের স্বরূপ দুঃখ;-আমার স্বরূপ আনন্দ। বিকটভঙ্গীর সঙ্গে হাঁসি— ইহার অর্থ ই তাই। আমি আনন্দ, দেহ বিকট। বিকটটা পুড়িবে, আর আনন্দ আপনস্বরূপ পরমানন্দের নিকট চলিয়া যাইবে। যে দেহ এত দিন আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল যাইবার সময় তাহাকে একটু উপহাস করিয়া যাওয়াই উচিত।

সংসারচক্র নিবৃত্তি বা মোহনিবৃত্তি।

১। "মম মায়া দুরত্যয়া" মায়া নিতান্ত বিষমা, দুস্তরা। অনবহিতচিত্ত ব্যক্তিকে ইহা সঙ্কটে পাতিত করে। কোথায় মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপী স্বপ্নভ্রম-দৃষ্টি আর কোথায় বহুবর্ষব্যাপী জনমমরণ ভ্রম, বহুযোনী ভ্রমণ ভ্রম।

২। মায়াচক্রই সংসারচক্র। ইহাই মোহ চক্র। 'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা" মায়া বা "আমি আমার", ইহাই যথার্থ জ্ঞান যে শান্ত স্বরূপে স্থিতি — যথার্থ জ্ঞান যে নৈব কুর্ব্বন ন কারয়ন্ অবস্থা, ইহাকে হরণ করে।

৩। সর্ব্বদা র্ণমান ভ্রমপ্রদ এই সংসারচক্রের নাভি হইতেছে চিত্ত!

সংসারভাবনা যাহা কিছু, দুঃখসুখ যাহা কিছু, বিপদ আপদ যাহা কিছু, তাহার ভাবনা, ভয় এবং তজ্জনিত দেহবিকার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যখন মনে কষ্ট পাও, তখন কষ্ট কোথায় হইতেছে ভাবনা কর দেখিবে চিত্তই ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

৪। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" আমিই পুরুষকার-রূপী। পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারিলে—চক্রের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তুল কাষ্ঠ (ঘুর) আঁটিয়া ধরিলে যেমন চক্র থামান যায়—সেইরূপ সংসার চক্রের মহানাভী চিত্তকে আক্রমণ করিলে, সংসার চক্র বা মোহ-চক্র থামিয়া যায়।

৫। পুরুষকার দ্বারা চিত্ত-আক্রমণ কিরূপ এখন ইহা দেখ। ইহাই চিত্তনিরোধ উপায়। চিত্তকে বশীভূত করাই একমাত্র উপায়। চিত্তমধ্যেই সংসার। ঘট-নাশে ঘটাকাশ থাকে না চিত্তনাশে সংসারও থাকে না।

চিত্তলয় কিরূপে হয়?

১। প্রথমেই চিত্তকে অনাসক্ত কর, বিষয়দোষ দেখাও; তবেই চিত্ত অনাসক্ত হইবে। গত বিষয় ভাবনা ও ভবিষ্যত বিষয় ভাবনা করিও না কেননা ইহাতে কোন ফল নাই। গত ও ভবিষ্যৎ ভাবনা আসিলেই ঐ সমস্ত চিন্তা আত্মদেবকে সমর্পণ কর—প্রভু! গত ও ভবিষ্যৎ ভাবনার যোগ্যতা আমার নাই—আমি বিশ্বাস করি এ সমস্তই মিথ্যা ভাবনা—আমি শ্রীভগবান্ আত্মারামে সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস করিলাম। এই ভাবে সঙ্কল্পপ্রভব কামনা সকল ত্যাগ কর। ভূত ভবিষ্যৎ ভাবনা না করিয়া চুপ করিতে গেলেও বর্ত্তমান বিষয় সকল চিত্তমধ্যে উঠিবে। চিত্ত অনাসক্ত হইয়া কেবল বর্ত্তমান বিষয় ক্ষণকাল বাহ্যবুদ্ধিতে সেবনপূর্ব্বক ভূতভবিষ্যৎ বিষয় ভাবনা ত্যাগ করিলে চিত্ত অচিত্তভাব প্রাপ্ত হইবে। চিত্ত লয় হইবে। এই সাধনাটি সম্পন্ন করিবার জন্য চিত্তকে সম্বোধন করিয়া জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলিতে চিত্ত যেরূপ ক্লেশ পাইয়াছে তাহা উহাকে স্মরণ করাইয়া দাও। পুত্র কন্যার মৃত্যু ক্লেশ, অর্থ উপায় ক্লেশ, লোকসঙ্গ ক্লেশ, বালককালের ক্লেশ, যৌবনের ক্লেশ, জরা ব্যাধির ক্লেশ, শরীরের সর্ব্বদা ক্লেশ, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করার ক্লেশ বিহিত কর্ম্ম করার ক্লেশ—ইহাই চিত্তের মধ্যে তুলিতে থাক। আগত মৃত্যুক্লেশ কিরূপ ভীষণ হইবে—প্রতিদিন মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস নিদ্রা সময়ে ঈশ্বর বিস্মৃতি কত ভয়ানক

চিত্তকে ইহা স্মরণ করাও—এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত বৈরাগ্যে পূর্ণ হইবে—বিষাদযোগ স্থির হইলেই তখন চিত্ত সর্ব্ব সঙ্কল্প শূন্য হইয়া পরমপদ ধ্যান করিবার উপযুক্ত হইবে। আরও চিত্তকে স্মরণ করাও মৃত্যুকালে বা নিদ্রাকালে রমণীয় দর্শনের কাছে যাইতেছি। ইহা যতদিন না দৃঢ় ভাবনা হয় ততদিন সুখ কিছুতেই নাই। অল্প ভোগ যাহা রাখিয়াছ তাহারও ভোগকালে চিত্তকে নিত্য তিরস্কার কর। এই সমস্ত করিতে করিতে এক দিকে ভোগে অরুচি, অন্য দিকে রমণীয়দর্শনের কাছে যাইব এই ভাবনাঅভ্যস্ত হইবে।

২। অনুক্ষণ সঙ্কল্পাংশের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর—যখই সঙ্কল্প উঠিবে তখনই বল আবার দেখ চিত্ত বৃথা কি সঙ্কল্প তুলিতেছে—ইহাতে কোন ফল নাই—শান্তপদে থাকার জন্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়নের স্মরণ জন্য নাম লইয়া থাকাই শ্রেয়। অনুক্ষণ এইরূপ করিলে চিত্ত অচিত্ত ভাব ধারণ করিবে। তরঙ্গ আপন চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া শান্ত জলরূপে পরিণত হইবে।

৩। যতক্ষণ মেঘ থাকে ততক্ষণ আকাশে জলবিন্দু থাকে। চিদাত্মা যতক্ষণ চিত্তযুক্ত থাকিবেন ততক্ষণ সঙ্কল্প কল্পনা থাকিবে, দুঃখ থাকিবে, যাতনা থাকিবে—যতক্ষণ চন্দ্র ততক্ষণ হিমবিন্দু। কিন্তু চিদাত্মা নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্, সদা শান্ত, আর চিত্তটা সদা চঞ্চল। চিত্তটা সঙ্কল্প তুলুক বা না তুলুক—তাহাতে অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিলে--যাহাই কেন হউক না আমি কিছুই করি না, কিছু করাইও না, এই ভাবনা সর্ব্বদা করিলে চিদাত্মা যে চিত্ত হইতে পৃথক্ ইহা স্থিরবিশ্বাস দাঁড়াইবে—ইহা দ্বারাই প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ হইয়া যাইবে। ইহাতেই সংসার মূলদগ্ধ হইয়া গেল।

৪। চিত্ত হইতে পৃথক্ কৃত যে চেতন তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য। ঐ প্রত্যগাত্মা নির্ম্মল স্বভাব। ইঁহাতে সঙ্কল্প নাই! নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ইহাই সঙ্কল্প শূন্য অবস্থা। চিত্তটি ক্ষয় হইয়া গেলে, চঞ্চলতাটি থামিয়া গেলে একটি পরমার্থ দৃষ্টি জাগিবেই। জল নড়াটি বন্ধ হইলেই পূর্ণচন্দ্রটি জলের মধ্য হইতে ভাসিবেন। পূর্ণচন্দ্রই সমস্ত ছাইয়া আছেন দেখা যাইবে। মায়াচক্রটি বা মোহচক্রটি যে আত্মার সর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিয়া আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবলবেগে ঘুরিতেছিল—চিত্তটি ক্ষয় হইলেই এই সংসারচক্র থামিয়া গেল—রহিলেন মাত্র পূর্ণ শশধর—আহা! আমিই সেই পূর্ণশশধর! চিত্তটাই আত্মাকে যেন অহঙ্কার বিমূঢ় করিয়া অহং কর্ত্তা এই অভিমানে অপরিচ্ছিন্নকে

পরিচ্ছিন্ন করিয়া সংসারমোহ তুলিয়াছিল ; এখন চিত্তস্থির হওয়াতে মিথ্যা আমি আমি আমার আমার কোথায় দূর হইয়া গেল—এখন সেই ধ্যেয় নাম —পরিপূর্ণ নামীমাত্র রহিলেন—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্ত হইল—আপদ গেল।

একান্তে গিয়া কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া এই সাধনাটি করিতে হয়। ভূর্ভুবস্ব ব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার বরণীয়ভর্গ প্রণবটি—তাঁহারাই দীর্ঘ জপ করিতে হয়; পরে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি যাঁহার করা অভ্যাস থাকে তাহা করিতে করিতে—অথবা চিত্তপিশাচকে এই সেই পরমপদ স্পর্শ করিলাম—সহস্রার নীচে ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে স্পর্শ করিলাম এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে—স্পর্শ হইয়া গেলে চিত্ত আত্মাতে সমাহিত হইলেন—আত্মসংস্থ যোগ সাধিত হইল। তখন যোগিনাং অপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং ইহা করিয়া যুক্ততম হইয়া ধ্যান অবস্থাতে ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে থাকিয়াই সেই কোটি বিদ্যুদ্ভাসিত মণিমণ্ডপে নিরন্তর থাকিয়াও চলা ফেরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস আহারবিহার সমস্তই হয়—সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে আত্মবিভূতি মাত্র দর্শন হয় পরে জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়।

৫। এই যে এই কর্ম্ম করা—এত লেখা এত সাধনা—ইহা নৈব কুর্ব্বন্ না কারয়ন্ স্বরূপ হৃদয়পুরের রাজা যে আমি সে আমি করেন না। সে আমি করানও না। কিন্তু আমি থাকার জন্য চঞ্চল চিত্তের মধ্যে যে একটা প্রতিবিম্ব ভাসিয়াছে সেই প্রতিবিম্ব একবার প্রবৃত্তিমার্গের চিত্তে অভিমান করিয়া সুখী দুঃখী হইতেছে আবার নিবৃত্তিমার্গের চিত্তে অভিমান করিয়া শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে উজ্জ্বল হইয়া—এই নিবৃত্তিমার্গের আমি প্রবৃত্তিমার্গের আমিকে জপ পূজা বিচার ধ্যান লেখাপড়া ইত্যাদি করাইতেছে। ইহা দ্বারাই এই প্রতিবিম্ব আমিটা বিম্ব আমিতে মিশিতে চেষ্টা করিতেছে। এই আমিটা যখন নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্এর নিকটে আসিতেছে তখনই পরম শান্তপদে স্থিতি—এইটি আয়ত্বাধীন হইলেই যখন ইচ্ছা দেহ ধরা বা দেহ ছাড়া—আর জননমরণ নাই আর পুনরাবৃত্তি নাই। ইহাই জীবন্মুক্তি।

ভয় ও অভয়।

বাবা! সংসার করিতেই সময় যায় আপনার উপদেশ মত কর্ম্মে বেশী সময় যে দিতে পারি না তাতেই ত ভয় হয়।

না পারিলেও ভীত হইও না। যাহা কর সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কর তাহাতেও অভয় পদ পাইবে।

সকল কর্ম্ম শরণাপন্ন হইয়া কিরূপে করিতে হয়? সংসারের কর্ম্মও কি শরণাগত হইয়া করা যায়?

যায় বৈকি। সকল কর্ম্মই তাঁহার শরণে আসিয়া করা যায়। তবে কর্ম্মের কৌশলটি জানা চাই।

কর্ম্মের কৌশল কি বাবা?

যৎ করোষীত্যাদিনা অর্পয়িত্বৈব কর্ম্মাণি কুরু। নতু কৃত্বার্পয়েতি। সকল কর্ম্ম যাহা কর, যাহা খাও, যাহা যজ্ঞ দান বা তপস্যা কর—সকল বৈদিক কর্ম্ম বা সকল লৌকিক কর্ম্ম—ওকালতি বা ডাক্তারি বা মোক্তারি বা বিছানা করা, ঘর ঝাট দেওয়া বা রাঁধা বাড়া অথবা সন্ধ্যা আহ্নিক করা যাহা কিছু করনা কেন সমস্তই প্রথমে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস করিও। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে হে ভগবান্! হে দয়াময়! হে দীনবন্ধু! আমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ঘোর সংসারে পড়িয়াছি। কত লোক তোমার পূজা, তোমার জন্য ফুল চন্দন সংগ্রহ করা, তোমার জন্য মালা গাঁথা, তোমার জন্য ধূপ দীপ দেওয়া, তোমার জন্য শাস্ত্রাদি পাঠ করা ইহা লইয়াই থাকিতে পায়—আমি পতিপুত্রাদি লইয়া ব্যস্ত তোমার কার্য্যে সময় পাই না। আমি কিন্তু প্রভু! তোমার শরণাগত। আমি তোমারই! কর্ম্ম করিতে যাইবার আগে অথবা মনে মনে মনকে নির্জ্জন করিয়া এই প্রার্থনাগুলি কর করিয়া কর্ম্ম কর তবেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা হইল। স্বকর্ম্মণা তমর্ভ্যর্চ্চ ইহাই। এমন অভ্যাস কর যে কোন কর্ম্মই যেন তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া হয়—এই যদি করিতে পার তবে অভয় পদ প্রাপ্ত হইবে।

দেখ অনেকে সাধু সাজিয়া থাকিতে পারে বটে কিন্তু বালক বা বালিকা কাল হইতে কি কি করিয়াছে তাহা সকলেই জানে—আর জানেন শ্রীভগ-

ক্রমশঃ—

শ্রীগুরুর সস্নেহ দৃষ্টিপথে পতিত হয় তখন ইহার বিশ্রাম; দয়ার্দ্রসাগর শ্রীগুরু তখন এই অনাদি-সংসারপ্রবাহচালিত, জননমরণে আবর্ত্তিত বিষয়কীটকে সংসারতটস্থ কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় স্থাপন করেন; জীব যথা-সুখে বিশ্রাম-লাভ করে। এই সদ্‌গুরু কৃপাপ্রাপ্ত জীব বুঝিতে পারে আত্মানুভবসন্তুষ্ট হৃদয়-রাজের জন্য স্তব নহে, স্তব তাহার নিজেরই জন্য। জীব রজঃতমোগুণে ক্ষিপ্ত ও মূঢ়; এই ক্ষিপ্ত, মূঢ় বৃত্তিই তাহার রাগদ্বেষের কারণ, জন্ম মরণের হেতু। এই রাগদ্বেষ, এই জন্মমরণ, এই ক্ষিপ্ততা, মূঢ়তা অতিক্রমের জন্য তাহার সত্ত্বপ্রসাদ আবশ্যক। বিরাট পুরুষের গুণবর্ণনা তাহাকে শুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেয়, এই জন্য বড় আবশ্যক এই স্তুতি। বিরাট্ আত্মার বিস্মৃতিই তাহার এই জননমরণের কারণ—ইহা যে বুঝিয়াছে তাহার সর্ব্বদা আবশ্যক স্মরণ। স্বরলহরীবদ্ধ স্তুতি আপন সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যলোলুপ চিত্তকে সর্ব্বদা স্মরণের মধুময় অবস্থায় লইয়া যায়; এই জন্য সর্ব্বদা আবশ্যক স্তুতি। তাঁহার বিরাট্ অঙ্গের বিরাট্ মাধুরী স্মরণে বিষয়ামিষ-লোলুপ চিত্তের অশুচিভাব অপনীত হইয়া যায়, চিত্ত কাল্পনিক ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া যায় এই জন্য স্তুতি আবশ্যক। চিত্ত আপন লোভনীয় রজঃ তমঃ ছাড়িয়া তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীচরণযুগলের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য সত্ত্বময় বেশভূষা গ্রহণ করে; এই জন্য স্তুতি আবশ্যক। এই জন্য প্রণবময়ী ভগবদঙ্গসঙ্গিনী বাগ্‌দেবী জীব-কণ্ঠবিহারিণীরূপে সহস্রাক্ষরা সাজিয়াছেন; দেহাভিমানী জীবকে কুসংকল্প অসংবদ্ধ প্রলাপ ছাড়াইয়া আপন প্রবাহে মিশাইয়া লইবার জন্যই মাতেব-হিতকারিণী পতিতোদ্ধারিণী শ্রুতি দশসহস্র ঋক্‌রূপে পরিণত হইয়াছেন। বৎস! তুমি তোমার দুরবস্থা স্মরণ করিয়া স্তুতি আলোচনা কর; বুঝিতে পারিবে, ভগবান্ স্তুতি-প্রিয় না হইলেও স্তবের আবশ্যকতা বিলক্ষণ রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বহুজন্মসঞ্চিত রাগদ্বেষাদি ভাবগত-মল ও ভাষাগত অশুদ্ধি ক্ষালনের জন্য স্তুতি-রসে অবগাহন আবশ্যক। এ আবশ্যকতা এক জাতি অজ্ঞান জীব বুঝিতে পারে না, দ্বিজাতি বুঝিতে পারে। একজাতি অজ্ঞান জীবের স্বভাবতঃই মনে হয়—কণ্ঠতালুর অভিঘাতজনিত কীচকধ্বনিবৎ শব্দই বাক্য, সুতরাং তাহা সর্ব্বসাধারণ; কিন্তু সাবিত্রীজাত দ্বিজাতি শিশু মনে করে তাহার দ্বিতীয় জন্ম হইয়াছে, এখনও তাহার কথা ফোটে নাই। এখন তাহার বাক্য, মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; বিশুদ্ধ বাক্য স্ফুর্ত্তি হয়

নাই; সে সাবিত্রীরাজ্যের ভাব ও ভাষা শিখিতে পিতা আচার্য্য ও মাতা সাবিত্রীর শরণাপন্ন হয়। স্নেহময়ী জননী আপনি অক্ষরময়ী হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। পিতা অক্ষর পরিচয় করান, ভাষা শিক্ষা ও ভাষা ব্যবহার শিক্ষা দেন, প্রাকৃত শিশুকে সংস্কৃত করিয়া লন। আচার্য্যরূপ পিতার নির্দ্দেশে—বৎস সাবিত্রী-শিশু স্ফুটনোন্মুখ ভাষায় 'প্রার্থনা করিতে শিখে—বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমেবাচি প্রতিষ্ঠিতম্। আবিরাবির্ম'এধি। অর্থাৎ হে হে প্রকাশময়ি! মাতঃ গুরুবাক্য যেন আমার মনে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ মন যেন আপন অসংবদ্ধ চিন্তারাশি মুছিয়া ফেলিয়া মন্ত্রবাক্যোপহৃত পবিত্র ভাবরাশিতে আপনাকে নীরন্ধ্র করিয়া ফেলে, এবং আমার বাক্য ও যেন পুনরায় ব্যবহারকালে মনের চিন্তিত বিষয়গুলিই মাত্র পর্য্যাপ্ত-ভাষায় প্রয়োগ করে; এবং ইহা শুধু আমার চেষ্টায় হইবার নহে, সুতরাং যাহার উদয়ে মন ও বাক্য আপন পরিমিত রেখা অতিক্রম করে না এমন তোমার শুভাগমন আমি প্রার্থনা করিতেছি। এই ভাবে প্রার্থনাপরায়ণ বাক্‌শিক্ষার্থী সাবিত্রী-কুমারের নিকট জগৎ অপরিচিত। তাহার পরিচিত মধ্যে কেবল পিতা ও মাতা তাহার নিকট যদি কিছু ভাল লাগে তবে সে কেবল পিতা ও মাতা, ও সে কেবল সুধাবর্ষী পিতা মাতার গুণরাশি তাই দশসহস্র ঋক্ স্তুতিতে পরিপূর্ণ। পিতামাতার গুণ কীর্ত্তন ইহা চাটু নহে। বিষয়-লোলুপ ব্যক্তির বিষয়ের জন্য যে বিষয়ীর গুণ বর্ণনা তাহাই চাটু; কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে সাবিত্রী-শিশু ভাবিয়া আপন বিরাট্‌স্বরূপ চিন্তার জন্য পিতামাতার গুণবর্ণনা করিতেছে, সে চাটুকার নহে। আর সরল, মুগ্ধ, আপন শিশুর রচনাসুধা শ্রবণে সহজানন্দময়ী যদি শিশুচিত্ত প্রসারের জন্য প্রসন্নাই হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা তিনি 'চাটুপ্রিয়' এই অপবাদের পাত্র হইবেন কেন? কেনা অমৃতং বাল-ভাষিতম্' শ্রবণে আপ্যায়িত? বৎস! তুমি বহির্ম্মুখ অলসজনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্তুতিরসাস্বাদন কর; আপনিই ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে।

বৎস! এইবার আমি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রণাম ত্রিবিধ-কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। 'ধিয়া নমো ভরন্তঃ' ইহা দ্বারা মানস প্রণামের কথাই বলা হইয়াছে। ভগবান্ অগ্নিদেবের পুরোবর্ত্তি অধি-ভূত মূর্ত্তিকে বিরাট্ অধিযজ্ঞ মূর্ত্তির সহিত সংবদ্ধ করাই সবিশেষ ফলপ্রদ।

এজন্য বুদ্ধিযোগে প্রণামই আবশ্যক, সুতরাং শ্রুতি বলিতেছেন—'ধিয়া নমো ভরন্তঃ।

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্দ্ধমানং স্বেদমে ॥ ৮

পদানুসরণী] পূর্ব্বমন্ত্রে ত্বামুপৈমসীতি অগ্নিমুদ্দিশ্য উক্তম্, কীদৃশম্ ত্বাম্? রাজন্তম্ দীপ্যমানম্ অধ্বরাণাং রাক্ষস-কৃত-হিংসারহিতানাম্ যজ্ঞানাং গোপাং রক্ষকম্, ঋতস্য সত্যস্য অবশ্যম্ভাবিনঃ কর্ম্মফলস্য দীদিবিম্ (পৌনঃ-পুণ্যেন ভৃশং বা দ্যোতকম্ আহুত্যাধারমগ্নিং দৃষ্ট্বা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধং কর্ম্মফলং স্মর্য্যতে ইতিভাবঃ। স্বেদমে স্বকীয় গৃহে (অগ্নি-শরণে) যজ্ঞশালায়াং হবির্ভির্বর্দ্ধমানম।

পদ নিষ্যন্দিনী] রাজন্তম্ (দেদীপ্যমান) অধ্বরাণাম্ (রাক্ষস কৃত হিংসা রহিত যজ্ঞসমূহের) গোপাম্ (রক্ষক) ঋতস্য (অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফলের) দীদিবিম্ (সাতিশয়-প্রকাশক) বর্দ্ধমানম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) স্বে (স্বকীয়) দমে (গৃহে—যজ্ঞশালায়)।

বঙ্গানুবাদ] পূর্ব্বমন্ত্রে অগ্নিদেব! তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি—'নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকি'—(বলিতে ইচ্ছা হয়) কেমন তুমি—তুমি দীপ্যমান, তুমি (রাক্ষস-কৃত হিংসা হইতে) অধ্বরের রক্ষাকর্ত্তা; তুমি ঋত বা অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফলের প্রকাশক (স্মারয়িতা) অর্থাৎ আহুতির আধারস্বরূপ তোমার দীপ্যমান কলেবর দেখিলে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ কর্ম্মফলের কথাই মনে হয়। আর তুমি স্বকীয় গৃহে যজ্ঞশালায় হবি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্ম] ভগবন্! চতুর্থ মন্ত্রে অধ্বর শব্দের ব্যাখ্যায় আপনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি 'অধ্বরস্য গোপাম্' কেন বলা হইয়াছে। কিন্তু 'ঋতস্য দীদিবিম্' কথাটি এখনও আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আচার্য্য] বৎস ! ঋত শব্দের অর্থ সত্য ; দীদিবি শব্দের, অর্থ দ্যোতক। অগ্নিকে বলা হইতেছে—ভগবন্ ! তুমি সত্যের প্রকাশক বা দ্যোতক। কি এই সত্য ? যজ্ঞাদি কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলকে ঋত বা সত্য বলা হয়। কি এই অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ? জ্ঞান বা জ্ঞানময় পরমাত্মার বিবিদিষাই কর্ম্মফল। ভগবতী উপনিষদ্ দেবী বলেন—'তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা হনাশকেন' ইতি। ব্রাহ্মণগণ এহেন আত্মাকে বেদ-পাঠ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ফলাসঙ্গত্যাগ সাহায্যে জানিতে অভিলাষী হয়েন। এই জ্ঞানাভিলাষ বা বিবিদিষাই কর্ম্মের ফল। গীতা ভাষ্যে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন—ফলতৃষ্ণা-শূন্যেন ক্রিয়মানে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিরূপা জ্ঞান-প্রাপ্তি-লক্ষণা সিদ্ধিঃ। (শ্রীগীতা ২।৪৮ শ্লোঃ ভাঃ) অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে অনুষ্ঠাতা নিষ্কাম পুরুষের সত্ত্বশুদ্ধি পূর্ব্বকজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে ইহাই কর্ম্মের সিদ্ধি বা অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল। ভগবান্ অগ্নিদেবের পবিত্র তমোবিনাশী দীপ্যমান কলেবর দর্শনে দর্শক যাজ্ঞিক পুরুষের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে সত্ত্ব প্রকাশে ভরিয়া যাইতেছে আর সেই সত্ত্ব-প্রকাশে তাহার হৃদয়গৃহস্থিত কত জ্ঞান-রত্ন যাজ্ঞিকের দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিতেছে সেইজন্য বলা হইয়াছে 'ঋতস্য দীদিবিম্'।

সনঃ পিতেব সূনবে হগ্নে সূপায়নো ভব।

সচস্বানঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

পদানুসরণী] হে অগ্নে ! সত্বং নো হস্মদর্থং সূপায়নঃ শোভন-প্রাপ্তিযুক্তঃ ভবঃ। তথা নো হস্মাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যার্থং (কল্যাণার্থ মিত্যেৎ) সচস্ব সমোবতো ভব। তত্রোভয়ত্র দৃষ্টান্ত :—যথা সূনবে পুত্রার্থং পিতা সুপ্রাপঃ প্রায়েণ চ সমাবেতো ভবতি তদ্বৎ।

পদ নিষন্দিনী] সঃ (সেই তুমি) নঃ (আমাদের) পিতেব সূনবে (পিতা যেমন পুত্রের নিকটে) অগ্নে (হে অগ্নিদেব) সূপায়নঃ (অভিগম্য বা সুলভ) ভব (হও) সচস্ব (সমবেত অর্থাৎ মিলিত হও) নঃ (আমাদের) স্বস্তায় (কল্যাণের জন্য)।

বঙ্গানুবাদ] হে অগ্নিদেব ! পিতা যেমন পুত্রের নিকট সুলভ এবং পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণের জন্য তাহার সহিত মিলিত হয়েন, তদ্রূপ তুমিও আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সহিত মিলিত হও। ৯

ধন্যাঽসি ভক্তাঽসি পরাত্মনস্ত্বং
যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছা তব রামতত্ত্বম্ ॥ ১৫
পুরা ন কেনাপ্যভিচোদিতোঽহং
বক্তুং রহস্যং পরমং নিগূঢ়ম্।
ত্বয়াদ্য ভক্ত্যাপরিণোদিতোঽহং
বক্ষ্যে নমস্কৃত্য রঘূত্তমং তে ॥ ১৬ ॥
রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদি-
রানন্দ একঃ পুরুষোত্তমো হি।

হে পার্ব্বতি! রাম প্রকৃতির পরে—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অসঙ্গ আত্মা; ইনি অনাদি, আনন্দ-ব্রহ্ম, এক-একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইনি পুরুষোত্তম। আত্মমায়া দ্বারা এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি আকাশের মত সর্ব্ববস্তুকে ভিতরে বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

পার্ব্বতী—রাম প্রকৃতির পর আত্মা—ভাল করিয়া বল?

মহাদেব যাহা দেখ, শোন, অনুভব কর—সমস্তই প্রকৃতি। আত্মা যিনি তিনি প্রকৃতি হইতেও পৃথক, প্রকৃতির দ্রষ্টা। প্রকৃতি জড়, রাম চেতন। চেতনের প্রভায় জড় চেতনবৎ হইয়া আপন কার্য্য রামে আরোপ করে, করিয়া যেন রামকেই কার্য্য করায় ও সুখী দুঃখী করায়।

পার্ব্বতী—অনাদি কি?

মহাদেব—রামই সকলের আদি-কারণ। রামের কারণ কেহ নাই।

পার্ব্বতী—তিনি পুরুষোত্তম কেন?

মহাদেব—পুরে শয়ান যিনি তিনি পুরুষ। অবিদ্যাপুরে শয়ান জীব এবং মায়াপুরে শয়ান ঈশ্বর। এই উভয় অপেক্ষা যিনি উত্তম তিনিই পুরুষোত্তম রাম। ক্ষর ও অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম। স্বরূপে তিনি গুণের অতীত, মায়াতীত হইয়াও মায়া অবলম্বনে বিশ্বরূপ।

পার্ব্বতী—এই প্রভুর মানুষদেহ ধারণ কিরূপে হইবে?

মহাদেব—যাহা ঘটে না তাহাই ঘটাইতে পারে এইরূপ অঘটিত ঘটনা

নিখিল জগৎ যাঁর মায়ার রচনা
আকাশের মত যিনি অন্তরে বাহিরে ॥ ১৭ ॥
সবার অন্তরে থাকি অত্যন্ত গোপনে
আপন মায়ায় দেখে এ সৃষ্ট-জগৎ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাচে তাঁরই চারিধারে
চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহ চঞ্চল যেমতি ॥ ১৮ ॥

১৭। রামঃ পরাত্মা—ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ।

প্রকৃতেরিত্যস্যাগ্র ইতি অসংসর্গীতি চ শেষঃ।

প্রকৃতিতৎকার্য্যেভ্যোঽন্যত্বাত্তৈরসংসর্গাচ্চ রামঃ পরমেশ্বর এবেত্যর্থঃ। জীবস্তু তৈরুপাধিভিঃ সংসৃষ্টঃ তৎধর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানবানিতি ভাবঃ। অতএবা-নাদিরেক আনন্দঃ। কার্য্যানন্দ ব্যাবৃত্তয়ে অনাদিরিতি। এবং চানন্দং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুতিসিদ্ধং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব পুরুষোত্তমঃ পুরু-ষেভ্যো জীবেভ্য উত্তমঃ তি প্রসিদ্ধমেতদিত্যর্থঃ। নন্বীদৃশস্য মনুষ্যাদি দেহধারণং কথমতআহ। স্বমায়য়েতি। অঘটিতঘটনা শক্তিরূপা মায়া। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। ইতি শ্রুতি সিদ্ধা তয়া ইদং কৃৎস্নং দৃশ্যং সৃষ্ট্বাঽন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ॥ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। ইতি শ্রুতেঃ। তাদৃ-শস্য মনুষ্যশরীরপরিগ্রহোনাশ্চর্য্যায়। তদুক্তং গীতাভাষ্যে। ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ স্বভাবোঽপি স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি তানুজিঘৃক্ষয়েতি। নন্বেবং সৰ্ব্বগতত্বে সর্ব্বজ্ঞেয়ঃ কিং নেত্যত আহ।

১৮। সর্ব্বান্তরস্থোঽপি নিগূঢ় আত্মেতি। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরঃ। ইত্যাদি শ্রুত্যা সর্ব্বান্তরস্থত্বেনোক্তোঽপি নিগূঢ়ঃ। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতেত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ইতি শ্রুতেঃ॥ তাদৃশস্য সত্ত্বে ব্যবহারকালিকমপিমানমাহ॥ স্বমায়য়েতি॥ স্বাজ্ঞানকল্পিতয়ামায়য়েত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। নিত্যশুদ্ধাদিরূপেশ্বর স্বরূপাজ্ঞানেন তস্যাঘটিতঘটনাসামর্থ্যাপরপর্য্যায়া যা মায়াখ্যা ত্রিগুণশক্তিরূপাধি কল্পিতা-বচ্ছেদৈস্তৎস্বরূপৈ জীবৈঃ কল্পিতা সা চ স্বজাতীয়মেব সংসারপ্রচ্ছাবচং প্রসূতে অতএব তৎস্বরূপজ্ঞানে সকার্য্যায়াস্তস্যানাশঃ রজ্জু জ্ঞানেনেবরজ্জুকল্পিতভুজঙ্গস্য

স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা
নভোবৎ অন্তর্বহিরাস্থিতো যঃ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বান্তরস্থোপি নিগূঢ় আত্মা
স্ব মায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে।
জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি
যৎ সন্নিধৌ চুম্বক লোহবদ্ধি ॥ ১৮ ॥

শক্তিরূপা তাঁহার এক আত্মমায়া আছে। রামই মায়ী মহেশ্বর তাঁহার প্রকৃতিই মায়া। তিনি মায়া দ্বারা এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যেন সৃজন করেন, করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ এই প্রভুর মানুষশরীর-ধারণ আবার আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইবে? শ্রীগীতাও বলিতেছেন—ভূতা-নামীশ্বরোঽপি সন্ সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। সর্ব্বভূতের ঈশ্বর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব হইলেও আত্মমায়া দ্বারা দেহবান মত—জাত মত হয়েন। ইহা লোকানুগ্রহ জন্য; কারণ তাঁহার স্বপ্রয়োজনাভাব।

পার্ব্বতী—"নভোবৎ অন্তর্বহিরাস্থিতো যঃ" এই যে বলিলে, আকাশের মতন ভিতরে বাহিরে আছেন তিনি, তবুও জীবের দুঃখ ঘুচে না, জীবের ভয় যায় না; জীব আনন্দ পায় না, শক্তি পায় না—আহা! ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি?

মহাদেব—আকাশ যে ভিতরে বাহিরে আছে তাহাকেই মানুষ কি পায়? বলিলেই মনে হয় যেন আকাশ দেখিতেছি—আকাশের কিন্তু কোন রূপ নাই। আকাশকে জানা যায় আকাশের গুণ যে শব্দ তদ্দ্বারা। সেইরূপ ব্রহ্মকে জানা যায় যখন ব্রহ্মগুণ আশ্রয় করিয়া গুণবান্ মত হয়েন। প্রভেদ এই যে আকাশও মায়া, গুণও মায়া কিন্তু ব্রহ্ম মায়াতীত, আর যখন তিনি গুণবান্ মত হয়েন তখন মায়া অবলম্বনেই তাঁহার রূপ ও গুণ হয় ॥১৭॥

আত্মা সকলের অন্তর্গত পরন্তু অত্যন্ত গুপ্ত। তিনি আত্মমায়া রচিত এই সমস্ত জগতকে দেখিতেছেন। আর চুম্বক প্রস্তরের সমীপে লৌহ যেমন আপনা আপনি পরিভ্রমণ করে সেইরূপ তাঁহার সমীপে অনেক ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছে; তাঁহার সমীপস্থিত হইয়াই মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন এই সমস্ত জড়বর্গ আপনা হইতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥১৮॥

মূঢ় জনে নাহি জানে এই তত্ত্ব কথা
ভ্রমজ্ঞানে আচ্ছাদিত মানস যাদের।
শুদ্ধবুদ্ধ মায়াতীত আত্মদেবে তারা
দুঃখের আরোপ করে অজ্ঞানে সর্ব্বথা॥ ১৯॥

কম্পাদিকার্য্যসহিতস্য। ন চ জীবৈস্তৎকল্পনা তৎ স্বষ্টোপাধিভিশ্চজীবতে-ত্যন্যোন্যাশ্রয়ঃ। অনাদিত্বেনাপিপরিহারাৎ। নন্বেকস্য তত্ত্বজ্ঞানেন তন্নাশে-সংসারোচ্ছেদাপত্তিঃ একরজ্জৌযুগপৎদর্শনানাং সর্পভ্রমে একস্যরজ্জুজ্ঞানেন তস্য সর্পভ্রমকার্য্যে ভয়কম্পাদৌ নিবৃত্তেহপি অন্যেষাং তদ্দর্শনেন তদনিবৃত্তি বদুপপত্তে-রিতি। তয়া স্বষ্টমিদং বিচষ্টে পশ্যতি এবং চ দ্রষ্টৃত্বেন তৎসিদ্ধিঃ। নান্যো-হতোহস্তিদ্রষ্টা। ইতি শ্রুতেঃ। একেনৈবাকাশেনোপাধিভেদাৎ ঘটাকাশাদ ব্যবহারবৎ একেনৈব চেতনেনোপাধিভেদাদনেক জীব ব্যবহারোপপত্তৌ চেতনা-নেকত্বেমানাভাবাৎ দ্রষ্টৃত্বেন তৎসিদ্ধিরিতিভাবঃ। ন চ তত্তৎ অজ্ঞানরূপোপাধি-বিশিষ্টস্যৈব জীবত্বে জীবস্যাজ্ঞানমিতিব্যবহারানাপত্তিঃ ভার্য্যাবিশিষ্টস্যৈব গৃহস্থত্বেহপি গৃহস্থস্য ভার্য্যেতি বদুপপত্তেরিতি দিক্। চেতনস্বীকারে মানান্তরমাহ। জগন্তীতি॥

জগন্তি জগদন্তঃকরণানি যৎ সন্নিধৌ নিত্যং পরিতোভ্রমন্তি স্ব স্ব চেষ্টাং কুর্ব্বন্তি। অন্যথা সর্ব্বস্য জড়ত্বাৎ চেতনাভাবে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। ননু নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং। ইতি শ্রুতেস্তস্য নিষ্ক্রিয়তয়া কথং তেনান্যেষাং ব্যাপার সংপাদনমত আহ। চুম্বকলোহবদ্ধীতি।

যথা নিষ্ক্রিয়োহপি চুম্বকমণি লৌহং শক্তি বিশেষাৎ সন্নিধি মাত্রেণ চালয়তি তথা চেতনো নিষ্ক্রিয়োহপি স্বমায়া বৈচিত্র্যাদেব তানি সন্নিধি মাত্রাৎ ব্যাপারয়-তীত্যর্থঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ॥

অনাপন্ন বিকারঃ সন্ অয়স্কান্ত বদেবয়ঃ।
বুদ্ধ্যাদীংশ্চালয়েৎ প্রত্যক্ সোহহমিত্যবধারয়েৎ॥ ইতি॥

১৯। এতস্মাম্মাগুণা স্পৃষ্টত্বাদিরূপং রাম স্বরূপং যে জীবা ন জানন্তি। অজ্ঞান হেতু বিমূঢ় চেতসঃ। বিমূঢ় চেতসত্বে হেতুঃ স্বাবিদ্যয়া সংবৃত মানসা ইতি।

স্বোপাধিভূতয়া অবিদ্যয়া বিদ্যাবিরোধিভাব দাঢ়্যরূপয়া সংবৃতান্তঃকরণাঃ। অতস্তে জীবাঃ শুদ্ধবুদ্ধে শুদ্ধত্বং মায়াদোষানাক্রান্তত্বেন বুদ্ধে জ্ঞান স্বরূপে

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

স্বর্গদ্বারে গীত।

—"যে মাতা বাঁধেন মোহে
মোহমুক্ত করিতেও তিনি"

রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ
বল কোথায় শিখেচ।
স্বরূপেতে অরূপ যিনি
তাঁরে রূপ ধরিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

রূপটি তোমার কেউ জানে না, তত্ত্বে তোমায় কেউ বোঝে না
কোথাও নাই তবু তুমি, যথায় তথায় ভেসেচ
তা'তে ভেসে তারে নিয়ে,
রূপধ'রে রূপ দিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

তোমার রূপের নাই তুলনা, প্রাণে ভাসে মুখ ফোটেনা
কেমন চাওয়া কেমন হাসি, উদাস ক'রে রেখেচ
প্রত্যালীঢ় পদে দুলে
ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

এই যে সাগর তুফান ডেকে, ওঠ পড় তাহার বুকে
নেচে নেচে সারা বুকে, পদ্মে পদ্ম ছেয়েচ
উঠায় মিলায় নাচ্-তরঙ্গে
এক কর এক দেখাচ্চ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

জগবন্ধু এই যে নমি, ভিতরে সে বাইরে তুমি
তার প্রাণে তোমার রূপে, দুয়ে একটি হ'য়েচ
পানার মত জনম জলে
জলকে ঢেকে ভেসেচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

এইই তুমি আদিযুগে শোভ দেখিয়ে যাগে যোগে
হয়ে কুলাঙ্গনা বিবসনা, রণরঙ্গে মেতেচ
শেষে এলোকেশী ধ'রে অসি
দানবে নাশ ক'রেচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

ত্রেতায় কুলবধূ হ'য়ে, অসুর-গৃহে বন্দী র'য়ে
যেন কত অনাথিনী, কতই কেঁদেচ
এক হ'য়ে আর সেজে
কৌশলে কুল মজিয়েচ।
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

দ্বাপরে আয়ান-ঘরে, সদা ননদিনী ডরে
বধূরূপে বাস ক'রে, কতই করেচ
(তবু) যার বধূ তার বধূ আছ
(শুধু) ক্লীব সংসার তরিয়েচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

তুমি বরণীয় ভর্গ, তুমি ভোগ অপবর্গ
তুমিই তুমি আর কেন, আমি-সাজা রেখেচ
শ্রীচরণে এই মিনতি, আমি মেরে দাঁড়াও যদি
(তবে) আমায় তুমি চরণ দিয়ে সকল সাধ মিটিয়েচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

ভয় ও অভয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বান্। তিনি ত জানিয়াইছেন তবে কেন তাঁহাকে মন খুলিয়া সব বলিতে পারিবে না? তাঁহাকে বল—তাঁহার শরণাপন্ন হও—সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ কর—এও খুব ভাল সাধনা। অথবা সকল সাধনার মূলে এই সাধনা থাকিবে।

বাবা! আমি ত অনেক পাপ করিয়াছি। তার ফলে আমাকে নাস্তিক পুত্রাদির জন্য অশাস্ত্রীয় রন্ধনাদিও করিতে হয়। বাবা! অশাস্ত্রীয় কর্ম্মও কি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া করা যায়? না আপনি আমার মনে যাহাতে হতাশ না আইসে সেইজন্য শুধু সাহসের কথা বলিতেছেন?

বাপু! আমার কথায় সন্দেহ করিও না। জানিও আমি নিজের কথা একটিও কই না। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলি।

শ্রীগীতা বলিতেছেন—অষ্টাদশে

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণোমদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বদা মদেক শরণ হইয়া কর। আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয় পরম পদ লাভ করিবে।

ভগবান্ শঙ্কর ব্যাখ্যায় বলিতেছেন সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি—সর্ব্বকর্ম্ম এমন কি নিষিদ্ধ কর্ম্মও যদি মদেক শরণ হইয়া কর—কর্ম্মের পূর্ব্বে আমাকে বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও—তুমি সমস্ত উচ্চ অঙ্গের সাধনালাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যাইবে।

বল না এমন অভয় আর কোথায় আছে? যাহা কর—করিবার অগ্রে তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া শ্রীভগবানের শরণে আসিয়া কর নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ থাকিবে না। কর—আজ হইতেই আরম্ভ কর। হইবেই।

ধ্যান—স্থূলে ও সূক্ষ্মে।

স্থূল ধ্যানে উপাস্য ও উপাসক থাকে। সূক্ষ্ম ধ্যানে উপাস্যের সঙ্গে উপাসক মিশিয়া এক অদ্বৈত ভাব থাকে। সূক্ষ্মধ্যানই স্থিতি।

সুন্দর দেবতা মনোহর মূর্ত্তি। প্রাণভরা সাগ্রহ দৃষ্টি। এই দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রদক্ষিণ করিতেছিলাম। প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সব ভুল হইয়া গেল। যেন তোমায় লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রদক্ষিণ হইতেছে। কতক্ষণ পরে মনে হইল আমি যেন স্থির হইয়া শান্তচক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া আছি। পদতলে পতিত পরম শান্ত চলন রহিত পুরুষ, অনিমিষে আপন বক্ষোপরি প্রত্যালীঢ়পদে দণ্ডায়মানা আপন প্রকৃতিকে দেখিতেছেন। বড়ই মধুর। যখন এই ভাবে আপন বক্ষে আপন প্রকৃতিতে একাগ্র হইবে, তখন স্থূলধ্যানে স্থিতি হইল। ইহাতে উপাস্য উপাসক থাকিল। দেখিতে দেখিতে যখন দেখা আর থাকিবে না—শুধু এক দ্বৈত-রহিত জ্ঞানানন্দমাখা. কি রহিল—ধ্যান নাই, ধ্যাতা নাই, ধ্যেয় নাই এই অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই সূক্ষ্ম ধ্যান।

সমুদ্র।

আহা! ঐ সাগর-উদ্বেলিত উন্মথিত ফেনিল অম্বুরাশি ঐ তুলা ফেলা ঐ রঙ্গ ঐ নৃত্য আহা! কাহার জন্য তাহা কি বুঝিয়াছ? না শুধুই সৌন্দর্য্য ও কবিতার হার?

আহা! সাগর গর্জ্জন ঐ বিরামবিহীন আলস্যবিহীন মধুনিস্যন্দিত মৃদু মধুর ঝঙ্কার! আহা! গর্জ্জন কি? ঐ গর্জ্জন ঐ তর্জ্জন কেন? গর্জ্জন কি শুধুই গর্জ্জন না তাহা ছাড়া আর কিছু আছে? গর্জ্জনের মধ্যে প্রবেশ কর; কি দেখিলে? বলিবার নাই, বলিতে পারিলাম না!

আহা! সর্ব্বোপরি এই হৃদয়সমুদ্র কি উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়াছে? আহা এই যে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিপলকে তোমাকে নাচাইয়া নাচাইয়া কোন্ অব্যক্ত অজানা পথে ঢেউ খেলা সোপানরাজির মধ্য দিয়া ফেনিল আকুল

জীবনভার বহিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ? না শুধুই সাগরগর্জ্জনে আপন উন্মত্ততার অবসর অন্বেষণ?

উন্মত্ত ত অনেক হইয়াছ তবে কেন? আপন ছাড়িয়া উন্মত্ত হও, দেখিবে ভিতর বাহির সব গোল হইয়া গেল; তুমি 'প্রলয় পয়োধিজলে' ভাসিতেছ। তখন চিরপ্রবাহ—সে প্রবাহ এই কল্লোলের ন্যায় মুখর—এই উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল চলমান।

তাই বলি, হৃদয়সমুদ্র তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া ঐ সাগরতরঙ্গে মাতিও না। হৃদয়তরঙ্গে সাগরতরঙ্গে মিলাও; এক মহাতান বাজিয়া উঠিবে; দুয়ে মিলিয়া মহালয়ে সুচিরশান্তিতে লীন হইয়া কোথায় যাইবে কে জানে? ইহারই নাম বিশ্বসুরে যোগদান। ইহারই নাম বিশ্বপ্রেম। ইহারই নাম সনাতন ধর্ম্ম। আর আন অসম্ভব।

দেখ, শুন, বুঝ, সমুদ্র কেন নাচে? নাচা কি নাচাই? এতে থামা কি নাই? গর্জ্জন করে সত্য—গর্জ্জনের মধ্যে এক মহাবিরতির লয় ঝঙ্কার কি নাই? দেখ হৃদয়তরঙ্গঝঙ্কার উঠে, নামে, থামে। থামে কোথায়? লক্ষ্য কর। কি উপায়ে থামে? সে থামার নিয়ম, আইন লক্ষ্য কর; তুমি আর নাচিতে চাহিবে না। নাচিবে অথচ নাচার রঙ্গভঙ্গ থাকিবে না।

আচ্ছা সাগর নাচে। কাহাকে লইয়া নাচে? কাহাকে ভিন্ন কি নাচা হয়? কাহাকেও আশ্রয় না করিলে নাচা কি সম্ভব?

সাগর! নাচ—যার জন্যই নাচ—তুমি নাচ; তুমি বড় সুন্দর নৃত্য করিতে পার—জানা গেল। তাতে আমার কি?

সাগর! বেশ সুর তুলিতে জান—বেশ লয় তানের ঝঙ্কার মিলাইয়া সপ্ত স্বরের তন্ত্রীযোগে বেশ কলকণ্ঠ স্বনে নিনাদ ছাঁদিতে শিখিয়াছ—বল তা'তে আমার কি?

আমার চাওয়ার জিনিস তোমার মধ্যে—তোমার উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে—তোমার মর্ম্মরায়মাণ নিনাদের মধ্যে কোথায়?

আহা! তুমি যা চাও—আমিও ত তাই চাই। তবে কিছু ভেদ আছে। থাক্—আজ ভেদ ভুলিব তোমার চির বিরহ বহ্নিস্ফুর্জ্জিত অসীম প্রেমবহ্নি মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ডুবিব—দোষ কি? তুমি অতলস্পর্শ অসীম প্রেম রত্নাকর তোমার মধ্যে চিরশান্তিলাভ করিতে দাও তোমার অনন্ত অসীম সুশীতল প্রাণের

মধ্যে সমবেদনার যোগদান করিয়া একতারে মিশিয়া যাইব। তুমি—আমায় তোমার ঐ তরঙ্গে নাচাইয়া—লইয়া না যাইয়া—কোথায় যাইবে?

রে মুখর—তীব্র ভীষণ চণ্ড উন্মত্ত, কপট মোহন—আর না আর তোকে দেখিয়া ভয় নাই। যাহার মৃত্যু তুচ্ছ তাহার আবার ভয় কি?

আঃ—

পথহারা—শ্বাসে লক্ষ্য।

দৃশ্য মনোহর, দেখিতে দেখিতে বহুদূর আসিলাম, পথ আর ফুরায় না, বহুকাল ধরিয়া চলিতেছি, চলিবার বিরাম নাই। অপরিণত বয়সে মোহবশতঃ সুন্দর ভ্রমে এই পথে বাহির হইয়াছিলাম, যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই মনোরম বোধ হইতেছিল বটে কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, যাহা খুঁজি তাহা এপথে নাই। প্রথমতঃ শোভায় মন মুগ্ধ হইতেছিল, তাই ভাবিতেছিলাম যে, এই পথেই সুখ পাইব; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, এপথের সুখ স্থায়ী নয়, আজ আছে, কাল নাই। বাল্য গেল, যৌবন গেল, প্রৌঢ়াবস্থাও যায় যায় হইয়াছে, কত কি করিলাম, কত দেখিলাম, কত ছবি সুন্দর বোধে হৃদয়ে আঁকিলাম, কত হাসিলাম, কত কাঁদিলাম, কত কি ছাইমাই করিলাম, কই যাহা খুঁজি তাহা ত পাইলাম না। ক্রমে ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ভোগলালসা পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে; সুতরাং সুখের বিনিময়ে দুঃখই পাইতেছি। দর্শনশক্তির হ্রাস হইতেছে চস্‌মা দিয়া দেখিতেছি, শ্রবণশক্তির হ্রাস হইয়াছে, শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল, দন্ত গিয়াছে, কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে ভক্ষণ করিতেছি, চলিবার শক্তি নাই, যান দ্বারা সে কার্য্য সাধন করিতেছি। ভোগের জন্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করিতেছি, তথাপি তৃপ্তি হইতেছে না, যতক্ষণ ভোগ করা যায় ততক্ষণ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকি, ভোগাবসানে আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ। এযেন দুঃখের রাজ্য, এখানে ত সুখ নাই। এখানে যেন একই ভাব, সকলেরই সমান দশা, সকলেই দৈত্যের হাসি হাসে, দুঃখের উপর একটা আবরণ জোর করিয়া দিতে চেষ্টা করে। যাহা ধারাবাহিকরূপে এক নিয়মে পরিচালিত হয়, তাহা ত চেতন নহে জড়, আসল নহে নকল। তাহা হইলে ইহার নিয়ামক এক-

জন আছেনই। তিনি নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে আছেন, তিনি যন্ত্রী আর ইহা যন্ত্র। কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায়? এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে একজন গাহিয়া গেল—

"ঘটিল বিষম গ্রহ, সোনা ফেলে আচলে দিয়েছি গেরো"। গানটি শুনিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, যে আমারও যেন ঐ অবস্থা; যাহা খুঁজিতেছি, যেন তাহাকে ফেলিয়া দিয়া বাহ্য চটকে মুগ্ধ হইয়া আঁচলে গেরো দিয়াছি। এখন কি করি, কোথা গেলে তাহাকে পাই কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যেমন চলিতে ছিলাম তেমনিই চলিতেছি, কাহারও সহিত দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করি। সকলেই হাসে, বলে পাগল! এত নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইলে না, উপভোগের নিমিত্ত এত বিলাস সামগ্রী রহিয়াছে, তাহাতেও মন উঠিল না, যাহা কেহ জানে না, কেহ দেখে নাই, কেহ পায় নাই—তাহার জন্য এত লালায়িত কেন? এস যাহা পাইতেছ তাহা লহ, অধ্রুবের জন্য ধ্রুব ত্যাগ করিও না. সকলই নশ্বর, আজ যাহা দেখিতেছ কাল তাহা থাকিবে না, সুযোগ ছাড়িও না, ভোগ করিয়া লও, নচেৎ পরে দুঃখ পাইবে। এই সব শুনিয়া আর মন উঠে না, বলি, "যাহা আজ আছে তাহা কাল থাকিবে না,—তাহা কি কখনও সুখ দিতে পারে? যদি দেয় ত সে সুখ দুদিনের জন্য, পরে আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ, বরং তখন ঐ ক্ষণিক সুখের স্মৃতি মর্ম্মদংশন করিতে থাকে, জ্বালা আরও বাড়ে"! সকলেই পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। আমিও চলিতেছি যাহার সহিত দেখা হয় তাহাকেই বলি 'ভাই আমি পথহারা, আমাকে পথ দেখাইয়া দাও'। কেহ কেহ বলে, "কোথায় যাইবে বল"। আমি ঠিক ঠিকানা বলিতে পারি না, বলি 'জানি না'। সকলেই পাগল ভাবে। এইরূপ যাইতে যাইতে শ্রান্ত হইয়া এক তরুমূলে উপবেশন করিলাম, ভাবিতেছি গন্তব্য স্থান জানি না, এসেছি বিপথে; যাঁহাকে খুঁজি তাঁহাকে চিনিনা, তাঁহার বিষয়ে কিছু জানি না, অথচ তাঁহাকে পাইতে চাই, এ বাসনা কি পূর্ণ হইতে পারে? এমন সময় সহসা ধ্রুবের উপাখ্যানটী মনে হইল, প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। বালক ধ্রুব এইরূপে অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা হইলে আমার বাসনাও পূর্ণ হইতে পারে—এই আশা হইল। আরও মনে হইল বিশ্বনিয়ন্তাকে পাইবার প্রধান উপায় শাস্ত্র। শাস্ত্রে সকল অবস্থার বিষয় বর্ণিত আছে; নিজের অবস্থা শাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত রহিয়াছে বুঝিতে পারিলে সংসার

কাটিয়া যায় এবং সাধনার পথও বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। ধ্রুব-চরিত্র আলোচনা করিয়া শিশু ধ্রুবের প্রাণের ব্যাকুলতা মনে হইল, এবং ঐ ব্যাকুলতাই সাধনা বলিয়া বুঝিলাম। আরও বুঝিলাম যে ভগবানের অসীম দয়া, জীবের মতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনিই বড়ই ব্যাকুল। তাহা না হইলে এ সময়ে সহসা ধ্রুবের কথা আমার মনে উঠিবে কেন? এই তরঙ্গ যেন তিনি আমার মনে তুলিয়া দিয়াছেন। ব্যাকুল না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, সরল সুকুমার শিশু ধ্রুব কত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, আর আমি মহাপাপী কত পাপ করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আর কেহ জানুক আর নাই জানুক নিজের অবিদিত কিছুই নাই, এত পাপভার বহন করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে চাহি; আমার প্রাণে কতটা ব্যাকুলতা আনিতে হইবে তাহাও অনুমান করিলাম, দুর্ব্বল পাপভারগ্রস্ত আমি তাঁহার পথে যাইতে পারিব না বোধ হইল। তবে কি যাহা চাহি তাহা পাইব না? প্রভো! দয়াময়! তুমি যে পাপীর আশ্রয়; দীনবন্ধো! হৃদয়ের জ্বালা তোমা ভিন্ন কে নির্ব্বাণ করিবে? তুমি দয়া না করিলে পাপীর গতি কি হইবে? পবিত্র সূর্য্যকিরণ চণ্ডালগৃহেও প্রবেশ করে, তবে কেন প্রভো দীনে দয়া করিবে না? না করিয়াছি এমন অকর্ম্মই নাই, অকর্ম্মের স্রোতে গা ঢালিয়া আছি, তুমি ভিন্ন কে এই শক্তিহীনকে কর্ম্মস্রোতে ফিরাইবে? তোমার দয়া ভিন্ন দাসের অন্য গতি নাই। অগতির গতি! পতিতপাবন! দীনের প্রতি কৃপানয়নে চাও, আমার অপবিত্র হৃদয়কে পবিত্র কর,—নতুবা তোমার স্বচ্ছ মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইবে কিরূপে? বিপথগামী সন্তান আমি, পথে তুলিয়া আন তুমিই যে আমার মত-পাপীর আশ্রয়। তুমিই পিতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই মাতৃস্বরূপিণী; সন্তান, অপরাধী সন্তান-শত সহস্র, লক্ষ লক্ষ, অগণিত পাপ আচরণ করিয়া কাতরভাবে মা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, মা দয়া করিয়া কোল দাও, তোমার পবিত্র ক্রোড়ে উঠিয়া নির্ম্মল হই। জননি! কাতর সন্তানের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর, হৃদয় পবিত্র হউক। আমার মনকে কাতর করিয়া দাও, যেন তোমার পথে নিয়ত চলিতে থাকি। কামকিঙ্কর আমি, চিরকালই কামনার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি. এখন তোমার কৃপার আশায় কামনাকে নিযুক্ত করিলাম, নিষ্কাম কি তাহা জানি না, উপলব্ধি করিতেও পারি না; তোমায় পাইয়া যে সুখ তাহারই কামনা করিতেছি, যদি কখনও পাই তখন কামনা যদি যায় ত যাইবে, কামনার কিঙ্কর কামনা

কিরূপে ছাড়িব ? তোমায় পাইবার কামনাই বলবতী করিলাম, বাসনাময় ! বাসনা পূর্ণ কর। এইরূপ প্রার্থনা করি আর পথ চলি, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলি,—"ভাই, যে পথে গেলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সে পথ কোথায় বলিতে পার। যেথান হইতে বিচ্যুত হইয়া আসিয়াছি সেখানে যাইবার পথ বলিয়া দিতে পার।" শুনিয়া কেহ হাসে, কেহ কথা কয় না, অতি অল্প লোকেই সহানুভূতি করে। অবশেষে একটী মহাপুরুষ বলিলেন, "যে পথে আসিয়াছ সেই পথে যাও—গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিবে।" তাঁহার চরণে পতিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বলিলাম, কত কাঁদিলাম, শেষে কহিলাম, প্রভো ! এই পথে তো এতদিন আসিয়াছি—তাঁহার সাড়াটী কোথায় তো পাই নাই। তিনি কহিলেন, পাইয়াছ বই কি, মনে করিয়া দেখ দেখি "সোনা ফেলে আঁচলে গেরো" এই গানটী শুনিয়া একটু সাড়া কি পাও নাই ? ধ্রুবোপাখ্যান মনে উঠায় কি তাঁহার সাড়া পাও নাই ? উপলব্ধি করিয়াও যদি না ধর, সে দোষ কার ? তাঁহার না তোমার ? তাই বলি অতীতের আবৃত্তি ভিন্ন পাপীর ত্রাণ হয় না ; অতীতের আলোচনা কর, যে পথে আসিয়াছ সেই পথে যাও, পথ হারাইবে না। মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করিতেছ অথচ মৃত্যুর কোলে উঠিতেছ—কিরূপে মৃত্যুকে এড়াইবে ?

আ—কিরূপে মৃত্যুর কোলে উঠিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি না।

ম—ঐ ত মজা, বুঝিতে পারিলে কি কেহ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিত ? জন্ম হইলেই জীব,কালের রাজ্যে পতিত হয় ; যত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। দক্ষিণে হাওয়াটা জীব বড় ভাল বাসে, তাই দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে আইসে ; যমের দ্বার দক্ষিণ দিকে জান ত ? উত্তর দিকে অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে তাকায় না।

আ—আপনি বলিলেন অতীতের আবৃত্তি ভিন্ন পাপীর ত্রাণ হয় না, ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

ম—বুঝাইয়া বলি শ্রবণ কর,—বর্ত্তমানে তুমি নিষ্পাপ হইতে পার, ভবিষ্যৎ তোমার করায়ত্ত, যখন ভগবানের জন্য প্রাণ আকুল হয়, তখন বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে পাপের আশঙ্কা বড় অল্প ; আশঙ্কা যে নাই তাহা বলিতেছি না, ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রকৃত আগ্রহ হইলে পাপের আশঙ্কা অল্পই হইয়া থাকে। কিন্তু গত-জীবন যাহা পাপে কাটাইয়াছ তাহার আলোচনা অর্থাৎ তাহার জন্য অনুতাপ

করিতে হয়, না হইলে মন নির্ম্মল পদার্থের প্রতিবিম্ব লইতে পারে না; অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

আ—বুঝিলাম, কিন্তু পথ কি?

ম—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। মহাজনেরা কেহই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হন নাই, সকলেই পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণে যে পথে চলে তাহার বিপরীত পথে গিয়াছেন। সম্মুখে লক্ষ্য থাকিলে চিত্ত বাহ্যদ্রব্যে আকৃষ্ট হয়, অনেক খেলিবার দ্রব্য পায়, সাধনে নিবিষ্ট হয় না। পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য থাকিলে কেহ তোমার অজ্ঞাতে অনিষ্ট করিতে পারে না। তাই বলি পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চল, পশ্চাদ্দিকে যে পথ অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছ সেই পথই তোমার পথ, গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিবে। এ মায়ার রাজ্যে অধিক অগ্রসর না হইয়া জালগুটানই ভাল।

আ—বেশ কথা, সম্মুখে চক্ষু রহিল আর পশ্চাতে দেখিব কিরূপে?

ম—সম্মুখে ত চক্ষু আছে, সম্মুখে দেখ তোমার যম; যাহা কিছু রমণীয় সম্মুখে দেখিবে, তাহাকে তোমার যম বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেই ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য আসিবে।

আ—আচ্ছা, পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিলে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিব তাহা কিরূপে বুঝিব?

ম—যেখান হইতে আসিয়াছ, যে অবস্থা হইতে এই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ সেই অপ্রাকৃত অবস্থা পশ্চাতে না সম্মুখে?

আ—তাহা পশ্চাতে বৈ কি।

ম—তবে সেদিকে লক্ষ্য না করিলে উপায় কি? দেখ কোথা হইতে আসিয়াছ, কিরূপে আসিলে, কিরূপে এ অবস্থা হইল, তাহা হইলে মূলে লক্ষ্য পড়িবে; মূল ছাড়িয়া দিলে কি বৃক্ষের উপর উঠা যায়? মুক্ত হইতে গেলে কিরূপে বদ্ধ হইয়াছ তাহার তথ্য অবগত হও, তবে ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পশ্চাতে লক্ষ্য ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই।

আ—বুঝিলাম, পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। আমি কি ছিলাম তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ম—নিশ্চয়ই; কোন ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে দেখিতে হয় ব্যাধি কিরূপে উৎপন্ন হইল, কিরূপে বিস্তার পাইল; তখন মূলে আঘাত করিলে

ব্যাধি নির্ম্মূল হয়, নতুবা দু'দিনের মত চাপা থাকে মাত্র।

আ—আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, তৎপূর্ব্বে শিশু-অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে শায়িত থাকিতাম, তৎপূর্ব্বে মাতৃগর্ভে ছিলাম।

ম—বেশ, ঐরূপই আলোচনা কর, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আরও ভাবিয়া দেখ, যৌবনের সঞ্চারকালে ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া উঠিলে, বহির্বিষয়ে সেগুলিকে নিযুক্ত করিয়াই এই অবস্থা হইয়াছে; তখন সেগুলিকে ভিতরে টানিয়া রাখিতে পারিলে কি হইত তাহাও ভাব। যৌবনকাল বিকাশের সময়, ঐ সময় সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়েরই স্ফূর্ত্তি হয়। সেই সময়ে সুসঙ্গ ছাড়িয়া কুসঙ্গ করিয়া বিকাশের ব্যভিচার করিয়াছ, তাই ত এই দশা হইয়াছে। কাচ লইয়া চিন্তামণি বিকাইয়াছ, তাহার জন্য অনুতপ্ত হও। বালকাবস্থায় পিতামাতা ও নিকট-আত্মীয়গণের সহবাসে কিরূপ ছিলে তাহা ভাব, তৎপূর্ব্বে শৈশবাবস্থায় জননীর ক্রোড়ে কিরূপ ছিলে তাহা ভাব, তৎপূর্ব্বে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় কিরূপ ছিলে ভাবিবার চেষ্টা কর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ভাবিতে ভাবিতে বুঝিতে পারিবে যে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবার সময়েই ব্যভিচার ঘটিয়াছে, সুতরাং উন্নতির পরিবর্ত্তে অধোগতি হইয়াছে। সেই সব ব্যভিচারের জন্য অনুতাপ কর। অনুতাপেই পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, মনের দণ্ডবিধান হইবে, তবে ত মন কাতর হইবে। মাতৃগর্ভে জরায়ুমধ্যে ভ্রূণাবস্থায় থাকিবার পূর্ব্বে কোথায় কি অবস্থায় ছিলে তাহাও ভাব, কিরূপে জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলে এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ পশ্চাৎদিক্ আলোচনা করিয়া যাও, শেষে মূলে উপস্থিত হইবে; তখন বৃক্ষারোহণ অর্থাৎ সাধনা সহজ হইবে।

আ—ভ্রূণাবস্থার পূর্ব্বে পিতৃদেহে বীর্য্য এবং মাতৃদেহে শোণিতরূপে ছিলাম; এই দুইয়ের মিশ্রণে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

ম—শুধু দেহ কেন? তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে সৃষ্টিতত্ত্বে আসিলে সব বুঝিতে পারিবে; আর তখন নিষ্কৃতির পথ অর্থাৎ সাধনাও বুঝিতে পারিবে। মাতৃগর্ভে জীব কিরূপে আইসে ইহাও এক রকম সৃষ্টিতত্ত্ব স্থূলভাবের। এ তত্ত্ব আলোচনা করিলে জটিল সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা সহজ হইবে।

আ—একটু বুঝাইয়া দিন।

ম—পিতৃদেহে বীর্য্যরূপে ছিলে,—উহা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং উহাকে

ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে পারা যায়। তন্ত্র বলেন বিন্দুব্রহ্ম, মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" ঐ বীর্য্যের স্পন্দন হইল, স্থির চঞ্চল হইলেন, শোণিতে সংযুক্ত হইলেন; পুরুষ যেমন মায়ায় আসক্ত হইয়া সৃষ্টি করেন, সেইরূপে বীর্য্য শোণিতে জীবসৃষ্ট হইল। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম হইতে শব্দ উত্থিত হয়। 'ওঁকার'; এই শব্দ শেষে প্রণব-মূর্ত্তি ধারণ করেন। শুক্রও তদ্রূপ ঐ ধ্বনিতে জরায়ুতে প্রবিষ্ট হয়; তখন মূর্ত্তিও হয় ওঁকার, প্রণব, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নবমূর্ত্তি হইতে চলিল। ক্রমে গঠিত হইয়া, প্রাণ দেহ মন ইত্যাদি সমস্ত সংস্কার বিশিষ্ট হইয়া ভ্রূণাকার হয়। যতদিন গর্ভে থাকে সেই প্রণবই শুনিতে থাকে, যত পুষ্টি পাইতে থাকে ততই প্রণব হইতে দূরে আসে; শেষে ভূমিষ্ঠ হয়। অজপা উল্টাইয়া মনপ্রাণ সবই বহির্ম্মুখ হইল, কেবল বাহিরেই বিচরণ করিতে থাকে; আর কালের রাজ্যে আসিয়া কালের ক্রোড়ে উঠিতে থাকে। আর অজপার দিকে লক্ষ্য থাকে না। অহং অহং করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। "হংকারেণ বহির্যাতি" এইরূপে গোলযোগ ঘটিয়াছে। সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব বলিতেছি মিলাইয়া লও ঠিক কি না।

আ—বলুন।

ম—পুরুষ অনাদি ও স্বাধীন, স্বাধীনতা বশতঃ তাঁহার ইচ্ছা হইল "অহং বহুস্যাম্।" শব্দ উত্থিত হইল ওঁকার, উহা জ্যোতির্ম্ময়রূপ ধারণ করিল। স্থিরসমুদ্রে পবন বহিল, স্থিরত্বের উপর চঞ্চলতা আসিল, ওঁকার হংসাকারে পরিণত হইলেন "হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ" এইরূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল, উপরে চঞ্চল ভিতরে স্থির, স্থির, চঞ্চলতার আভরণ পরিলেন। স্থির পুরুষ স্পন্দিত হইয়া বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। পুরুষে প্রকৃতি সংযোগ হইল। পুরুষ স্থির, প্রকৃতি চঞ্চল; যেমন স্থির শিবের বক্ষে চঞ্চল শিবানী, স্থির নারায়ণের ক্রোড়ে চঞ্চলা লক্ষ্মী। শক্তিমান্ হইতে শক্তির বিকাশ হইল, উহাই মায়া; পুরুষ মায়ার আভরণ পরিধান করিলেন, বালকের সজ্জার ন্যায় পুরুষ আপনি আপনি সাজিলেন। বালক যেমন নগ্নাবস্থায় এই আমি কাপড় পরিলাম, এই জামা পরিলাম বলিয়া হাত পা নাড়িয়া সাজে এবং আমি বেশভূষা করিলাম বলিয়া অভিমান করে,—সেইরূপ পুরুষ মায়ার সাজে অর্থাৎ যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া মনে করিয়া লইয়া সাজিলেন এবং তাহাতেই অভিমান

করিলেন। ছিলেন নিরাকার, হইলেন সাকার; ছিলেন নির্গুণ হ'লেন সগুণ; চিন্ময়ী অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইলেন। পরে সগুণ হইয়া ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন বিগ্রহে প্রকাশ হইলেন। প্রকৃতিও ত্রিমূর্ত্তিতে ঐ তিন মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিলেন; হ'লেন ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এক হইতে বহু উৎপন্ন হইল। পুরুষের ইচ্ছা হইবা মাত্র ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ওঁকার, ইহা প্রথমে ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ হইল। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ"। এই ওঁকার স্পন্দিত হইয়াছিল গায়ত্রীচ্ছন্দে ইহা তেজোময়, সুতরাং ইহার দেবতা অগ্নি এবং সৃষ্টির প্রাক্কালে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বলিয়াছি মায়ার সংযোগে ইহা হংসরূপী হইয়াছিল; ব্রহ্মা ইহাকে বাহন করিয়া মানসসরোবরে ছাড়িয়া রাখিলেন অর্থাৎ হংসরূপী শ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা মুক্তি লক্ষ্য করিয়া যোগমায়া অবলম্বন করিলেন। মহেশ্বর এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উর্দ্ধনেত্র করিয়া পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। আর বিষ্ণু এই চঞ্চল হংসকে স্থির করিয়া নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া রহিলেন। মায়ার তরঙ্গে ভাসমান সৃষ্ট জীবসমূহ, চঞ্চল তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং স্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইল। সৃষ্টির প্রাক্কালে উত্থিত ওঁকার ধ্বনি আর শুনিতে পাইল না, কেহবা সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি ভোঃ এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। মায়ার তরঙ্গে ভ্রমবশতঃ তাঁহারা ভোঃ এই সম্বোধনাত্মক শব্দ শুনিলেন। ভ্রমে-পতিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলে সে যেমন তাহার ভ্রম বুঝিতে পারে, এবং যাহা করিতে যাইতেছিল তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়,—সেইরূপ যাঁহারা ওঁকারের ভোঃ প্রতিধ্বনি শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রম উপলব্ধি করিয়া কে সম্বোধন করিতেছে। এইরূপ মনে করিয়া সেই শব্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ ইঁহারা তপস্যা অবলম্বন করিলেন। আর যাঁহারা মায়ার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বহু-দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের তখন অবিদ্যার আবরণ পড়িয়াছিল। মায়ায় ভ্রম হয় অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃত মনে হয়, আর অবিদ্যার আবরণ পড়ে অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুকে জানিতে দেয় না। এই অবিদ্যার

আবরণে পড়িয়া তাঁহারা শুনিলেন "অহং"। কারণবারির অহং গর্জ্জনে তাঁহারা মত্ত হইয়া উঠিলেন,কেবল অহং অভিমানে অবিদ্যার স্রোতে গা ঢালিলেন। সুতরাং হংসের 'স' শব্দ কর্ণ গোচর হইল না কেবল হংকারেই রহিলেন। সেই হেতুই বহির্ম্মুখ হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন, কারণ হংকারেণ বর্হির্যাতি; ইহাদের অন্তর্দৃষ্টি হইল না, সুতরাং মুক্তি লক্ষ্য হইল না। বাস্তবিক হংস ভিন্ন জলের উপর দেহরক্ষার উপায় আর কি আছে? "বহির্ম্মুখ হংকারে" মত্ত হইয়া তাঁহারা "স" অর্থাৎ পরমপুরুষকে বিস্মৃত হইলেন, এবং ঐ হংসরূপী শ্বাসের পীড়ন করিয়া আরও বিকৃত হইতে লাগিলেন। এই সাধারণ জীবের অবস্থা। এই বিকারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে এই হংসরূপী শ্বাসকে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। উহাই উপায়,উহা ধরিলেই'স'কারে লক্ষ্য পড়িবে। 'সকারেণ বিশেৎ পুনঃ' সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি জন্মিবে, পশ্চাংদিকে লক্ষ্য থাকিবে আর বাহিরে "হংকারে" যমের কোলে তুলিয়া দেয়। তাহা হইলে দেখ, পশ্চাৎদৃষ্টি না করিলে জীবের গতি নাই। হংস ভিন্ন কেহ গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে না। পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি না রাখিলে মন অশ্বকে সংযত করা যায় না, উহা নিয়তই ছুটিতে থাকে, হংসকে ধরিতে পারা যায় না। তাই বলি ভাই যাগাতে পথ হারাইয়াছ, পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হংসকে অবলম্বন কর। এই হংসই তোমার বাহন হইয়া তোমাকে মায়াপারাবারের পারে লইয়া যাইবে।

প্র

তুমি আমি।

আমি কে?

আমি চেতন, জড় নহি।

তুমি কে?

আমিও চেতন—অন্য কিছুই নহি।

তবে তুমি ও আমি এক?

মূলে এক, কিন্তু স্থূলে ভিন্ন।

ভাল করিয়া বল।

আমি অখণ্ড, তুমি খণ্ড। তুমি দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। আমি ব্যুত্থানে বিশ্বরূপ হইলেও আপনি আপনি ভাবে বা সমাধিদশায় অপরিচ্ছিন্ন।

আমি খণ্ড তুমি অখণ্ড ? চিরদিন কি এইরূপ থাকিব ?

না। যাহা দ্বারা খণ্ডমত হইতেছ সেটা কাটাও, আমার মত হইবে।

কিরূপে ?

দেহটা তুমি নও, মনটাও—তুমি নও এইটি বেশ করিয়া বুঝিয়া প্রথমে উহাদের দ্রষ্টাস্বরূপে থাক, পরে আপনি আপনি ভাবে থাকিতে পারিবে। এই সব করিতে হইবে—সেই জন্য তোমার কর্ম্ম আছে আমার কোন কর্ম্ম নাই।

কর্ম্ম যতদিন আছে ততদিন কি করিব ?

খণ্ড যতদিন থাকিবে ততদিন কর্ম্ম থাকিবে। কর্ম্ম যতদিন থাকিবে, ততদিন তুমি মা বলিয়া সাধনা কর। বাচিক, শারীরিক, মানসিক কর্ম্ম মা'তে অর্পণ কর। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। কাজেই আহার করেন প্রকৃতি। স্নান, গমন, শয়ন, সন্ধ্যা, পূজা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সমস্ত কার্য্য করেন প্রকৃতি। তোমার দ্বারা যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে তোমার চিন্তা, তোমার গমনাগমন, তোমার স্নানাহার, এই সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতিই করিতেছেন ; সকল কর্ম্মে ইহা স্মরণ করিয়া কর। ইহারও কৌশল আছে। কোন একটি মন্ত্রগ্রহণ। ঐ মন্ত্রই তোমার মা। সত্য সত্যই মা। কারণ, রূপ যেখানে যাহা আছে—জগন্নাথের রূপই বল, কৃষ্ণের রূপই বল, সীতারূপই বল, রামরূপই বল, কালীই বল, শিবই বল সবই প্রকৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত পুরুষ। মা দ্বারা আবৃত চৈতন্য। করা, ধরা, অনুভব করা, যা কিছু তাহা সবই প্রকৃতি। সবই মা। ঐ মন্ত্র স্মরণ করাই মার স্মরণ। যখন যাহা কিছু করিবে মন্ত্র স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে কর। ইহা করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত লও। আহার করিতে বসিয়াছ। ভাবনা কর—আহার করেন প্রকৃতি—কুণ্ডলিনীশক্তি, মা। আহারের পূর্ব্বেই বেশ করিয়া স্মরণ কর প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। বেশ করিয়া স্মরণ কর আহার করিবেন মা-কুণ্ডলিনীশক্তি ; আমি তাহাতে আহুতি দিতেছি। পঞ্চপ্রাণকে বাহিরে এবং ভিতরে আহুতি দিয়া—প্রতিগ্রাস অন্ন মন্ত্র জপ করিতে করিতে আহুতি দিয়া শ্যামা মাকে ভাবিতে ভাবিতে আহার কর-ইহাই আহার ; যজ্ঞ। এইরূপ স্নান-যজ্ঞ, গমন-যজ্ঞ, ভাবনা-যজ্ঞ, কথাকওয়া-যজ্ঞ—যজ্ঞরূপে জপে মা'কে ডাকিতে ডাকিতে কর্ম্ম কর ; ইহাই কর্ম্মার্পণ। এইরূপে যখন শারীরিক, বাচিক, ও মানসিক কর্ম্ম মাকে অর্পণ করিতে দৃঢ়-অভ্যস্ত হইলে-তখন দ্রষ্টাভাবে

শিবস্বরূপ হইয়া নিজশক্তির মধুর রূপদর্শনে বিভোর থাকিতে পারিবে। এ অবস্থায় কর্ম্ম নাই। আছে চক্ষে-চক্ষে মিলন। ক্রমে এই অবস্থায় সবিকল্প সমাধি ও অস্মিতা সমাধি আসিবে, পরে আসিবে নির্ব্বিকল্প সমাধি।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্বস্বরূপে স্থিতি। আবার ব্যুত্থানে বিশ্বরূপে স্থিতি। এইরূপ কর—দেখিবে আমিই তোমার পূর্ণত্ব কিরূপে? দেখিবে খণ্ড অখণ্ডে মিশিয়া দ্বিত্বরহিত হয় কিরূপে? দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া আত্মরতি আত্ম-ক্রীড় অবস্থায় বিহার হয় কিরূপে?

অপেক্ষা—শুভদৃষ্টি।

পুষ্প-পত্রে সাজাইয়া নির্জ্জন বাসর,
আছি শুধু অপেক্ষিয়া তারি পথ চাহি;
কি জানি আসিবে প্রিয় কোন্ শুভক্ষণে?
কোন্ কল্প লোক হ'তে মায়ানদী বাহি—
সোনার স্বপন তীরে; আগ্রহে অধীর,—
আঁখি পাশে ধরা দিবে বাসনার জন।
যদি নিমিষের তরে আঁখিতে আঁখিতে
হয় চির-আকাঙ্ক্ষিত মধুর মিলন;
তবে কিরে রহে কিছু অতৃপ্ত জীবনে?
পরশে মঙ্গল দিঠি, ধেয়ায়ে মূরতি—
অবহেলি শত জন্ম পারি যাপিবারে;
নিভৃত পরাণে রচি প্রেমের আরতি।
তাই শশঙ্কিত প্রাণ,—কি জানি যদি গো—
মুহূর্ত্তের আলাপনে থেকে যায় ত্রুটি;
হয় ত হবেনা সারা সমস্ত জীবনে,
স্বপনের জাল যাবে নিমিষেতে টুটি।

মৃ—

৺পুরীতে "তুমি এস" ইহার অভ্যাস।

তুমি এস। আমি তোমায় দেখিয়া তৃপ্ত হই, তোমার কথা শুনিয়া তৃপ্ত হই, তোমায় স্পর্শ করিয়া তৃপ্ত হই।

তুমি এস আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া আনন্দ পাই ; তুমি আসিলে কি করিব ভাবিয়া আনন্দ পাই।

তুমি এস। আমি পদধৌত করিয়া দিয়া আহ্লাদিত হই, তোমার চরণ মুছাইয়া দিয়া আহ্লাদিত হই, তোমায় বসাইয়া এই গ্রীষ্মের দিনে তোমায় পাখা করিয়া আনন্দিত হই, তোমায় তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দিত হই।

তুমি এস। আমি তোমায় স্নান করিতে পাঠাইয়া আনন্দিত হই, তোমার আহারের আয়োজন করিয়া আনন্দিত হই, তোমার বিশ্রামের উদ্যোগ করিয়া আনন্দিত হই, আবার বিশ্রামান্তে তোমার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া আনন্দিত হই।

তুমি এস। সকলের সঙ্গে শুধু তোমায় দেখিয়া, সকলের সংশয় নিবারণ জন্য তোমার কথা কওয়া শুনিয়া আনন্দিত হই। আবার নির্জ্জনে একান্তে তোমায় একা পাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আনন্দিত হই। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া, তোমার শ্রীমুখে কিছু শুনিয়া আনন্দিত হই।

তুমি এস। তুমি এস। আমি নিত্য ভাবিব। আমি নিত্য অপেক্ষা করিব। আমি নিত্য অভ্যাস করিব—তুমি আসিলে কি করিব। আর উপাসনা ত আমি জানি না। বল ইহাতে কি আমার হইবে না ?

কখন ভাবি তুমি যেন আসিলে আমি তোমার সেবা করিলাম, তোমায় বিশ্রাম করিতে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি তোমার প্রসাদ সেবা করিয়া, তোমার নিকটে স্থির হইয়া বসিলাম।

আবার তুমি আমায় আদর করাইয়া বসাইলে—কত আরও আদর করিলে ইহা যখন আমি অভ্যাস করি, তখন আর আমাতে আমি থাকি না। নিত্য যদি ইহা অভ্যাস করি, তবে কি আমার কিছু হয় না ?

আর এক কথা। যখন আমার সেবা শেষ হইল, যখন তোমার আদর

সেদিনকার মত নিবৃত্তি হইল, তখন আমি তোমার নিকটে স্থির হইয়া বসিলাম। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—হাঁগা তুমি আমার কে?

তুমি—আমি তোমার পূর্ণত্ব।

তুমি আমার "পূর্ণত্ব" কিরূপে ইহা আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমি যদি স্ত্রীলোক হই, তাহা হইলেও তুমি আমার পূর্ণত্ব—পুরুষ হইলেও তুমি আমার পূর্ণত্ব। কিসে পূর্ণত্ব হয়?

তুমি—যাতে পূর্ণত্ব হয় আমি তোমার তাহ।

স্ত্রীলোক হইয়া যদি আমায় মা বলিয়া সুখী হও বা পুত্র বলিয়া সুখী হও বা কন্যা বলিয়া সুখী হও বা সখা বলিয়া সুখী হও বা স্বামী বলিয়া সুখী হও—আমি তোমার তাই। অথবা যদি সব বলিয়া তোমার সুখ হয়, তাহাহইলে ও আমি তোমার তাই।

পুরুষ হইয়া যদি মা বল বা কন্যা বল পিতা বল বা সখা বল বা সখী বল বা স্ত্রী বল—যাহা বলিয়া সুখী হও, আমি তোমার তাই।

ভাবে আমায় গ্রহণ কর। স্থূল সম্বন্ধে গ্রহণ করিও না। ভাবের সম্বন্ধ মধুর, স্থূলের সম্বন্ধে দোষ আছে।

একা বসিয়া আমি যে ভাবের মানুষ তাহাই ভাবিবে; স্থূল গুরুতে বা স্থূল নায়কে আমাকে আরোপ করিতে যাইও না।

গুরুর নিকট হইতে সন্ধ্যা-পূজা জানিয়া কখন সন্ধ্যা-পূজা সারিয়া তুমি এস ইহার অভ্যাস করিবে; কখন "তুমি এস" ইহার ভাবনা করিয়া, ভাব আনিয়া, সন্ধ্যা পূজা করিবে। এই এক প্রকার।

আর এক পকার আছে। কখন তুমি এস বলিয়া তারে ডাকা। কখন নিজে তাহার নিকটে মানসে যাওয়া।

তোমার কল্পনা-শক্তি সর্ব্বদা স্বাধীন। কল্পনায় তাহার কাছে যাও। প্রথমে সংসার-সাগরের তীরে আইস। সেখানে পদ্মের উপর উঠিয়া সুধা সাগরের মধ্যে মণি দ্বীপ—তাহার নানা বাটিকা—সরোবর—সরোবরের তীরে মণ্ডপ—মণ্ডপের চারি ধারে সপ্তাবরণ। প্রথম আবরণে বিমলাদি সখী, দ্বিতীয়ে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি মূর্ত্তি ধরিয়া, তৃতীয়ে গায়ত্রী নিজে মূর্ত্তি ধরিয়া, চতুর্থে ব্রহ্মাদি দেবতা, পঞ্চমে বশিষ্ঠাদি ঋষি, ষষ্ঠে গঙ্গাদি নদী, সপ্তমে দেবতার পৃথিবী উদ্ধারের সহায়

এইগুলি পার হইলে মন্দির, কল্পদ্রুম, রত্নবেদী সিংহাসনে আমি তোমার ইষ্টদেবতা। এ করিলেও হয়। যাহার যাহাতে সুবিধা।

সন্ধ্যাপূজা অন্তে এই ভাবে মানসে তাঁহার সঙ্গ—ইহা উপাসনা।

তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে আমি কে, জগৎ কি বিচার—ইহাতে সদ্যোমুক্তি। এখন যাহার যাহাতে রুচি। সব না পার, যতটুকু পারিবে তাহাতেই সেই লোকে গতি হইবে।

শ্রীগুরু।

বিপদভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন
তুমি নারায়ণ, শুনি চিরকাল।
জরা, ব্যাঘ্রীবেশে অন্দরে প্রবেশে,
ব্যাধি আসি, সার করিবে কঙ্কাল॥
অনুচর সহ, মৃত্যু অহরহ,
আশে পাশে থাকি, করিছে হুঙ্কার।
ভীষণ দুস্তর, কামাদি মকর
বাসনা-সাগরে, বীভৎস আকার॥
ভয়ে কাঁপে প্রাণ, রক্ষ ভগবান্,
অনাথের নাথ! তুমি যে সবার।
থাকিতে সময়, এস দয়াময়,
দেখি নাম-নামী দু'য়ে একাকার॥
কোথা মৃত্যুভয়, ব্যাধি বা কোথায়,
কামনা সাগর নিমিষে শুখায়।
যেন অনুগত, প্রভুভক্ত মত
চিরদাস, চিত্ত শ্রীপদে লুটায়॥
কল্পনার চিত্র, আঁকিল বিচিত্র,
সমদুঃখ কত অদ্ভুত রচনা।
মন-শিল্পীকর, এবে নিরন্তর,
যেন সে কখন কিছুই জানে না॥

জনমি শ্রীপদে, ভুলিয়া সম্পদে,
বহুলক্ষ যোনী সহিয়া যন্ত্রণা—
যদি পাও তুমি, পুণ্য জন্মভূমি,
গুরু-কৃপাবলে ছেড়না ছেড়না ॥
চির-শুভকরী, শ্রীগুরু শ্রীহরি,
বীজরূপে প্রাণে করিছে ঘোষণা।
গুরু নারায়ণ, বিপদ-ভঞ্জন,
তবে বল মন কিসের ভাবনা ॥
গুরুবাক্য জ্ঞান, গুরুবাক্য ধ্যান,
অমূল্য চরণে পড়িয়া থাক না।
যা করিতে হয়, করিবে নিশ্চয়,
কেন মর ভেবে আপন-ভাবনা ॥
তোমার নিয়ন্তা, গুরু হর্ত্তা কর্ত্তা,
কেন কর্ত্তা সাজা এ সং সেজনা।
বহু অনুরাগে, পঞ্চ-অঙ্গরাগে
সাজায়েছ তনু, উপায় শোন না ॥
গুরু-পাদজলে, নিতুই সিঞ্চিলে,
কাঁচা রং আর কখন রবে না।
অমৃত পরশে, পরম হরষে,
সীতারাম বলি কেবল ডাক না ॥

রা

দাস ভাব।

আমার এমন দিন কি হ'বে যখন আর আমার নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে হইবে না? নিজের ইচ্ছায় কিছু করা যেন আমার বড়ই ভার বোধ হইয়াছে। আমি যেন আর কাহারও ইচ্ছায় চলিতে চাই, ফিরিতে চাই, কথা কহিতে চাই, সব করিতে চাই, সব না করিতে চাই। এই আমার সুখ-স্বপ্ন।

আহা! ইহা অপেক্ষা মধুর স্বপ্ন ত আমি ধারণা করিতে পারি না। আমি চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া থাকিব, সে আমায় বলিবে এই কর; আমি প্রাণ ভরিয়া তাহার কর্ম্ম করিব, করিয়া আবার তাহার কাছে আসিব, আবার তাহাকে দেখিব, দেখিয়া দেখিয়া আমার আর নিবৃত্তি হইবে না।

এ আমার কে যার জন্য আমি নিজের বলিতে যাহা আছে সব ত্যাগ করিয়া, দাস হইয়া, দাসী হইয়া সেবা করিতে চাই? এ আমার কে যার জন্য আমি নিজের বলিতে যাহা আছে সব বিকাইয়া, ঐ চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাই?

মহাদেবের অত্যন্ত সুখ কখন্?

যখন বিভোর হইয়া তিনি নৃত্য করেন।

এ কখন্ হয়?

যখন 'নিজশক্তি উমাং পশ্য" তার পরে আছে "মহেশ ইব নৃত্যসি"। নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া মহেশ্বরের যে আনন্দ—সেই আনন্দে মহেশের নৃত্য;—ইহা অপেক্ষা আর আনন্দ কোথায়?

প্রথম প্রথম ত নৃত্য থাকে না; প্রথম প্রথম ত চলন থাকে না। যখন দৃশ্য সংসারকে শ্মশান করিয়া, সংসারকে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম গায়ে মাখিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়; যখন মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রিয়বস্তুকে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মের বিভূতি লইয়া আভরণ করা সার হয়; যখন সদ্য-প্রাণসংহারকারী বিষধর সর্প অঙ্গে জড়াইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়; যখন মরিতে চাহিলেও মরণ হয় না; কালকূট বিষেও প্রাণ যায় না—যখন দিন নাই রাত্রি নাই, সকল সময়ে শ্মশানে মশানে সকলের পরিত্যক্ত ভয়ানক স্থানে, ভয়ানক দ্রব্যমধ্যে বেষ্টিত হইয়া, কাহার অপেক্ষায় যেন মৃতপ্রায় হইয়াও প্রাণরাখা মাত্র হয়; শবপ্রায় হইয়া শবরূপে যেন কার অপেক্ষায় চেতোমুখ হইয়া থাকিতে হয়—এইরূপে থাকিতে থাকিতে যেন হৃদয়ে কার সাড়া পাওয়া যায় ধীরে ধীরে তখন যেন শুভ্র নির্ম্মল জ্যোতির পাপড়ী হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। সেই জ্যোতির পাপড়ীগুলি সংলগ্ন হইয়া, কত সুন্দর একটি পদ্ম ফুটিয়া উঠে। উগ্র ভাবনায় দেখিতে দেখিতে পদ্মের ভিতর হইতে একটি মূর্ত্তি জাগিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে পদ্ম আর দেখা যায় না—দেখা যায় একটি মূর্ত্তি।

কি সুন্দর সেই মূর্ত্তি! বিমল শুভ্র জ্যোতিরাশির সুন্দর মহেশ্বর। মহেশ্বর বক্ষ বিস্তার করিয়া পড়িয়া আছেন—সেই বক্ষের উপরে কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী

বিগলিত চিকুরা, প্রসন্ন স্মেরবদনা, দন্তচ্ছটায় উদ্ভাসিত রূপমাধুরী, সুন্দর হিমকর-বদনা, দয়মান দীপ্তনয়না, আলোকবক্ষে নীলমেঘের মানুষী-মূর্ত্তি কি সুন্দর! বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া এই মূর্ত্তি—আর পদতলে যিনি তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহারই পানে চাহিয়া। স্থিরদৃষ্টি দেখিয়া মনে হয়,—শবপ্রায় পুরুষ যেন ঐ রমণীয়াঙ্গী রমণী-মূর্ত্তিকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছেন। যখন চেনা হইয়া যায়, যখন ঠিক হইয়া যায় এই আমার সর্ব্বসাধনার সমষ্টিস্বরূপিণী, যখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় এই আমার নিজশক্তি, তখন একটা অপরিচ্ছিন্নের পরিচ্ছিন্ন ভাব আইসে। সেই দেহ তখন ঐ অসীম আনন্দকে আর যেন চাপিয়া রাখিতে পারে না তখন সাধক সমস্ত অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে দেখিয়া নৃত্য করেন। সেই দেখা অবধি তিনি দাসরূপে তাঁহারই ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া যান।

অপরোক্ষানুভূতি।

আপন জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া 'তুমিই সেই' এইটি অনুভব করার নাম অপরোক্ষানুভূতি।

এই অনুভূতি হইলে কোন্ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইবে?

স্থিরনিশ্চয় হইবে—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এই আত্মা কোনসময়ে জন্মগ্রহণ করেন না, কখন মৃতও হয়েন না। ভূত্বা উৎপন্ন হইয়া—বা ভূয়ঃ পুনরায়—ন ভবিতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন—ইতি ন ইহা নহে। ইনি জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ, বিকারশূন্য, অপরিণামী। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

আমি—আমার জীবাত্মা—এইরূপ ইহা অনুভব হইলেই অপরোক্ষানুভূতি হইল।

আমি জন্মাই নাই, আমি মরিবও না, দেহ নষ্ট হইলেও আমি যা' তাই আছি—এইটির অনুভব হইলে কি হইবে?

এইটি হইলেই মোক্ষলাভ হইল। এইটি হইলেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইল। বিনা সাধনায় কখন মুক্তি হইবে না।

মহা প্রলয়ে জীব প্রকৃতিতে সংস্কারসহ লীন থাকে মাত্র। ঐ সংস্কার থাকে বলিয়া, আবার জীবকে সৃষ্টিসময়ে দুঃখভোগ করিবার জন্য সংসারে আসিতে হয়। যতদিন না সাধনা দ্বারা সমস্ত বিষয়-সংস্কার নাশ করিতে পারে, ততদিন জীবকে পুনঃ পুনঃ এই মৃত্যুসংসার-সাগরে যওয়া আসা করিতেই হইবে!

আর এক কথা। জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম ভোগ হয় কিরূপে? বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে সত্য, কিন্তু জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সহকারী কারণ না থাকিলে কখনও বীজ হইতে বৃক্ষ হইতে পারে না। সেইরূপ ভোগের বস্তু না পাইলে, ভোগও হইতে পারে না জীবের কর্ম্মক্ষয় করিয়া জীবকে মুক্তি সুখ দিবার জন্য, সগুণব্রহ্ম বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। শ্রুতি বলেন—"উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি"।

মুক্তির সাধনা কি তাহাই ত প্রয়োজন।

প্রথমে বিচার কর নিত্য কি, অনিত্য কি? যাহা নিত্য তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা অনিত্য তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অনিত্য লইয়াই জীব মত্ত থাকে। ইহাকে বিষয়বিরাগী করিতে হইবে। ভোগমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। সকল প্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ কর। সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, সবই দুদিনের জন্য, সমস্তই মায়া—পুনঃ পুনঃ ইহার অভ্যাসে ভোগে রুচি থাকিবে না! ইহার পরে মনকে নিত্যবস্তুতে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়, মনকে অনিত্যবস্তুতে যাহাতে টানিয়া আনিতে না পারে, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়নিরোধ করিতে হইবে। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের উপরে জোর নাই বলিয়া, উহাদিগকে সহ্য করিয়া করিয়া দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইতে হইবে। সেই নিত্য-বস্তুতেই রতি রাখিতে হইবে। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে যেন কিছুতেই অবিশ্বাস না হয়। কোন কিছু হইল কি না হইল সে দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া, গুরু ও শাস্ত্র আজ্ঞা বলিয়া শ্রদ্ধা সহকারে সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। এই সমস্ত করিতে করিতে মুক্ত হইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিবে। তখন অন্য কর্ম্ম

ত্যাগ করিয়া 'তুমিই সেই' ইহার বিচাররূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিতে হইবে।

এই সমস্ত সাধনা কি বিষয়ীর হয়? না তা হয় না। বিষয়ীর চিত্ত সর্ব্বদা অশুদ্ধ। তজ্জন্য তাহাকে—ভগবান্ প্রসন্ন হও—এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তাদি পূর্ব্ব-পাপনাশক কর্ম্ম, এবং উপাসনাদি চিত্তশুদ্ধির কর্ম্ম প্রতিদিন অনলসে করিয়া যাইতে হইবে। এই সমস্ত সাধনায় বিষয়ীর বিষয়াশক্তি দূর হইয়া, চিত্ত রাগদ্বেষরূপ মল বর্জ্জিত হইবে।

চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিবিদিষা সন্ন্যাস লইতে হইবে। ইহার পূর্ব্বের সাধনাই বলিলাম। বিবিদিষা সন্ন্যাসীর কার্য্য তত্ত্বজ্ঞান। ইঁহাদের সাধনা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

তত্ত্বজ্ঞান পরিপক্ক হইলে তবে বিদ্বৎসন্ন্যাস। বিদ্বৎসন্ন্যাসীর কার্য্য তত্ত্বাভ্যাস—আপনি আপনি ভাবে স্থিতি। ইহাদের সাধনা ঐ অভ্যাসের সঙ্গে মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় করা। যোগের শেষ অবস্থায় মনোনাশ হইবে এবং ভোগে অরুচি হইলে বাসনা ক্ষয় হইবে। সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ই বিদ্বৎসন্ন্যাসীর কার্য্য! সন্ন্যাসীর কোন কর্ম্ম নাই। এই সমস্ত মানসিক ব্যাপার মাত্র।

যাঁহারা তত্ত্বাভ্যাসী হইতে পারেন নাই, এবং তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করিতে পারিলেন না অথচ যাঁহারা উপনিষদাদি শ্রবণ করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধক জন্য "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইল না তাঁহারা কি করিবেন?

মোক্ষলাভ জন্য ইঁহারা উপাসনা করিবেন। পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞান দ্বারা যেরূপ পরমতত্ত্বে স্থিতিরূপ মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা দ্বারাও মুক্তিলাভ হইতে পারে।

তৎ ইহার ভাবই তত্ত্ব। তৎটি হইতেছে তদ্‌বিষ্ণুর পরম পদ। পরম-শান্ত চলনরহিত পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুর ত্রিপাদ যাহা তাহাই পরমপদ। স্থিতির স্থান এই সীমাশূন্য ত্রিপাদ। আনন্দেই স্থিতি। অন্য কোথাও স্থিতি হইবে না। যে একপাদে নিরন্তর সঙ্কল্প-তরঙ্গ বা জগৎ-তরঙ্গ উঠিতেছে, ব্রহ্মের সহিত তুলনা করিলে ইহা সূর্য্যকিরণে এসরেণুর মত। কিন্তু শ্রীহরির মায়ার বিচিত্রতা এই যে, এই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড—এসরেণু অজ্ঞানীর নিকটে অনন্ত অপরিসীম। শুধু ব্রহ্মাণ্ড নহে, কিন্তু অজ্ঞানীর নিকটে এই গোষ্পদপ্রমাণ সংসারও অপার সমুদ্র। সীমাশূন্য ত্রিপাদ ব্রহ্ম আপন চতুর্থপাদের বিন্দুস্থানে যে মায়া-তরঙ্গ উত্তোলন করেন অথবা যাহা স্বভাবতঃ মণির ঝলকের মত উত্থিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ ইন্দ্রজাল। ইহা কখন উঠে নাই. কিন্তু মায়া-দেখান যেন উঠিয়াছে। এই মায়া কি তাহার বিচারও মায়ারই কার্য্য। তথাপি জল, সন্তরণে পার হইতে হইলে যেমন জল ধরিয়াই জল পার হওয়া যায়, সেইরূপ মিথ্যা ধরিয়াই মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন সত্যে স্থিতিলাভ হইতে পারে না।

মিথ্যা মায়ার ব্যাখ্যা শাস্ত্রে এই জন্য দেখা যায়। সত্যের ব্যাখ্যা নাই। সত্য সত্যই। মিথ্যার যে ব্যাখ্যা সে কেবল মিথ্যাকে তাড়াইবার জন্য। এই উৎপত্তি-প্রকরণে মিথ্যার উৎপত্তি বিচার করা হইয়াছে—সে কেবল মিথ্যা উপশম জন্য।

শাস্ত্রে মায়ার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—মায়া আপন স্বরূপে শুদ্ধ সত্ত্ব। সত্ত্ব সর্ব্বদা ব্রহ্মপথে গমন করিতে ছুটিতেছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিতে পারেন বলিয়া তিনিও প্রকাশরূপিণী।

পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে মনের সঙ্কল্প উঠার মত বা সমুদ্রে তরঙ্গ উঠার মত যখন স্পন্দধর্ম্মিণী সঙ্কল্পরূপিণী মায়া, স্বভাববশে উত্থিত হয়েন, তখন মায়া প্রথমে চৈতন্যদীপ্তা হইয়া প্রকাশ পান।

চৈতন্যদীপ্তা মায়াই ঈশ্বর। এখানে মায়াকে লক্ষ্য না করিয়া তদুপহিত চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—ইনি পুরুষ, ইনি ঈশ্বর। ঈশ্বরই প্রাজ্ঞপুরুষ, ইনিই অন্তর্যামী, ইনিই সর্ব্বশক্তিমান্, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম, ইনিই বিশ্বরূপ।

আর যিনি ঈশ্বরী, যিনি প্রকৃতি, যিনি মায়া—তিনি শুদ্ধসত্ত্ব, গুণাচ্ছন্ন বা মায়াচ্ছন্ন চৈতন্য। এখানে মায়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া ঐ মায়াজড়িত চৈতন্যকেই বলা হয় ঈশ্বরী।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরী—উভয়েই চৈতন্য। যেখানে চৈতন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে বলা হয় ঈশ্বর; আর যেখানে মায়ার প্রাধান্য সেখানে ঈশ্বরী।

চৈতন্য যিনি তিনি শুধু জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা-পদার্থ। ইনি আপনস্বরূপে নিঃসঙ্গ পুরুষ। ইনি যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকেন, তখন কোন সৃষ্টি নাই। ইহা মহাপ্রলয়ের অবস্থা। এই অবস্থায় দ্বৈত নাই। এক অদ্বৈত নিঃসঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করেন। এই নির্গুণ ব্রহ্ম বস্তুটি অবিজ্ঞাতস্বরূপ।

স্বভাবতঃ মণির ঝলক উঠার মত যখন সেই চিন্মণি হইতে মিথ্যা ঝলক উঠার মত বোধ হয়, যখন পরিপূর্ণ অদ্বৈত ভাবরাশির উপরে মিথ্যা ভাষার স্পন্দন হয়, যখন ব্রহ্মের উপর মিথ্যা সঙ্কল্পাত্মিকা বাসনার স্পন্দন হয়—তখন সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম যেন মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়েন। বস্তুতঃ মায়ার সহিত জড়িত হইলেও, তাঁহার চলনরহিত আনন্দস্বরূপের কিছুই ক্ষতি হয় না। অজ্ঞানে দেখায় যেন তিনি খণ্ডিত।

যখন কিছুই আর নাই তখন অজ্ঞান কোথায়? অজ্ঞান যখন থাকে, তখন তাঁহাকে খণ্ডিত দেখায়; যখন অজ্ঞান থাকে না তখন তিনি যাহা তাহাই। তাই বলা হয় যদি মায়ামোহে কেহ আচ্ছন্ন হইবার থাকে, তবে সে দেখে ব্রহ্ম খণ্ডিত।

মায়ার স্পন্দন যখন হয়—তখন ঐ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সঙ্গে আর দুইটি গুণ থাকে। ইহারা রজঃ ও তম। এই রজস্তম, শুদ্ধ নির্ম্মল সত্ত্বকে যখন কলঙ্কিত করে, তখন যে মলিন সত্ত্ব ভাসে -তাহাই অবিদ্যা। শুদ্ধ সত্ত্ব বা মায়া এক। এজন্য তদুপহিত চৈতন্যও এক। এজন্য ঈশ্বরও এক।

মলিন সত্ত্ব কিন্তু বহুখণ্ডে খণ্ডিত হয়েন। রজস্তম কলঙ্কিত সত্ত্ব রজস্তমের চঞ্চল অবস্থাতে নানা খণ্ডে স্পন্দিত হয়েন। সেই বহু খণ্ডোপহিত চৈতন্য যাঁহারা তাঁহারা জীব।

গুণগুলি প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকে। আর ঐ গুণসাম্যের মধ্যে বৈষম্যের বীজও থাকে। সহজ কথায় বুঝিতে হইলে বলিতে হয়—সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম যাহা তাহার সহিত রজস্তমের যে বিরুদ্ধভাব, সেই বিরুদ্ধভাবই গুণবৈষম্যের কারণ। কিন্তু সহকারী কারণ না থাকিলে যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না,

সেইরূপ যদিও প্রকৃতিমধ্যে গুণবৈষম্যের বীজ থাকে, তথাপি চেতন-পুরুষের সান্নিধ্য না ঘটিলে কখনও গুণবৈষম্য হইতে জগৎবৃক্ষ জন্মিতে পারে না।

আবার এই সান্নিধ্যই বা কি? চৈতন্য ত সর্ব্বব্যাপী। প্রকৃতি-পুরুষে বা শক্তি-শক্তিমানে এক হইয়াই থাকেন। এই এক অবস্থায় শক্তি আছেন বা নাই কিছুই বলা যায় না। থাকিলে অনুভব নাই কেন? না থাকিলে সৃষ্টি কোথা হইতে আইসে ইহার উত্তর কি?

বেদান্ত সহজভাবে উত্তর দেন—রজ্জুই আছে, সর্প নাই। সর্প যাহা ভাসে তাহা অজ্ঞান।

বলিতেছিলাম, চৈতন্যের সান্নিধ্য-অর্থে এক হইয়া থাকা অবস্থা হইতে একটু পৃথক্ হওয়া। ইহাই সান্নিধ্য। চৈতন্যের সান্নিধ্য হইলে মায়া অব্যক্ত বা অতিসূক্ষ্ম স্পন্দন অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা স্থূল স্পন্দন অবস্থায় আসিতে থাকেন।

জলের উপর তীর-তরু। তীর-তরুর ছায়া জলে পড়িয়া ঐ স্থানের জলটিকে ছায়াখণ্ডিত জলরূপে দেখাইতেছে। ক্রমে জল হইতে স্পন্দন উঠিয়া যখন জল ও ছায়া চঞ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ ছায়া বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়। আবারবলি মায়ার বহুখণ্ডে বিভক্ত হওয়াই ইহার অবিদ্যা-আকার ধারণ করা। অবিদ্যা সহিত জড়িত চৈতন্য তখন বহুখণ্ড মত দেখায়, তখন অখণ্ড জলরাশির, তীর-তরুর ছায়ায় খণ্ডিত হওয়ার মত একমেবাদ্বিতীয়ং যিনি তিনি বহু হইয়া যেন ভাসেন।

কিন্তু এখানে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে,

অপ্রবুদ্ধ জনাচারো যত্র রাঘব দৃশ্যতে।
তত্র ব্রহ্মণ উৎপন্না জীবাঃ ইত্যুত্তরঃ স্থিতাঃ॥
সম্প্রবুদ্ধ জনা চারে বক্তুমেতন্ন শোভনম্।
তদ্ব্রহ্মণ ইদং জাতং ন জাতং চতি রাঘব॥

ভাবার্থ এই যে অজ্ঞানীই দেখেন ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু জ্ঞানী জানেন ব্রহ্ম হইতে যাহা জন্মিতেছে মত বোধ হয় বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মই প্রকাশ হন। কাজেই সৃষ্টি বলিয়া কিছুই নাই।

ইহা মায়ারই কল্পনা। ব্রহ্মই মায়া-সাহায্যে সৃষ্টিরূপে ভাসেন। যেমন সুষুপ্তিই স্বপ্নরূপে ভাসে সেইরূপ। এই জন্য বলা হয়—এই মায়িক সৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, তিনিই জীবন্মুক্ত।

ব্রহ্মে জগৎ নাই। মায়া কর্তৃক যখন ব্রহ্মে ঈশ্বর ও জীব ভাব আরোপ হয়, তখনই আদি জীব যে ব্রহ্মা তিনি জগৎ দর্শন করেন। কিন্তু তাঁহার এই জগৎ-দর্শন স্বপ্ন-দর্শনের মত।

স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সত্য মত বোধ হয়, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে কিছুই থাকে না। সেইরূপ অজ্ঞানে জগৎ-স্বপ্ন। জ্ঞানে জগৎ-স্বপ্নের নাশ হয়।

তবেই দেখ দৃশ্য-প্রপঞ্চ আছে বলিয়াই অখণ্ডের খণ্ড ভাব। ইহাই বন্ধন। এখন দৃশ্য-প্রপঞ্চ যেরূপে অভাব-প্রাপ্ত হয় তাহা দেখাইবার জন্যই এই প্রকরণ।

যোগবাশিষ্ঠ।

উৎপত্তি-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বন্ধহেতু বর্ণন।

রাম—উৎপত্তি, স্থিতি ও উপশম প্রকরণ সকলে কাহার উৎপত্তি, কাহার স্থিতি, কাহারই বা উপশম বর্ণনা করিবেন ?

বশিষ্ঠ—যাহা সমস্ত দুঃখের কারণ তাহার।

রাম—কি কারণে সমস্ত দুঃখ উপস্থিত হয় ?

বশিষ্ঠ—বন্ধনেই দুঃখ, বন্ধন না থাকিলেই সুখ।

রাম—বন্ধন কাহার হয় ? কেনই বা হয় ?

বশিষ্ঠ—মনে কর একজন স্বপ্ন দেখিতেছে, কতকগুলি লোক আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। লোকটি যতক্ষণ এই স্বপ্ন দেখিল, ততক্ষণ কষ্ট ভোগ করিল; কিন্তু যখন জাগ্রত হইল, তখন বুঝিল স্বপ্ন-বন্ধনে কষ্ট অনুভব করিলাম। আশ্চর্য্য! মিথ্যাস্বপ্নেও ক্লেশ দিতে পারে।

সেইরূপ আত্মার মায়ানিদ্রায় একটা দীর্ঘ স্বপ্ন দেখা হইল। সে স্বপ্নে এই পরিদৃশ্যমান্ দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রথমে সূক্ষ্ম সঙ্কল্লাকারে, পরে স্থূল জগৎ-আকারে দাঁড়াইল। দৃশ্য-দর্শনই বন্ধন।

বন্ধোঽয়ং দৃশ্য সদ্ভাবাদ্দৃশ্যাভাবে ন বন্ধনম্।
ন সম্ভবতি দৃশ্যন্তু যথেদং তৎ শৃণু ক্রমাৎ ॥৬॥

দৃশ্য আছে বলিয়া যখন বোধ হয়, তখনই বন্ধন হয়। দৃশ্যের অভাব হইলে

বন্ধন থাকে না। যেরূপে দৃশ্য বা দৃশ্যজ্ঞান অভাব হইবে, তাহা ক্রম-অনুসারে শ্রবণ কর।

আবার শোন—

দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য সত্তাঙ্গ বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।
দ্রষ্টা দৃশ্যবশাদ্বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে ॥২২॥

দ্রষ্টা আপনা ভুলিয়া যখন দৃশ্যই আমি এইরূপ আত্মবিস্মৃতিতে পড়েন, তখনই হয় বন্ধন। দ্রষ্টা দৃশ্যের দ্বারাই বদ্ধ। দৃশ্যাভাবে মুক্ত।

রাম—দৃশ্য দর্শনে বদ্ধভাব কিরূপে আইসে?

বশিষ্ঠ—প্রথমে দৃশ্য কি তাহাই দেখ।

জগত্ত্বমহমিত্যাদির্মিথ্যাত্মা দৃশ্যমুচ্যতে।
যাবদেতৎ সম্ভবতি তাবন্মোক্ষো ন বিদ্যতে ॥২৩॥

জগৎ তুমি আমি ইত্যাদি মিথ্যা বস্তুকেই দৃশ্য বলা হয়। এই মিথ্যা দৃশ্য-জ্ঞান যতদিন থাকিবে ততদিন মোক্ষ নাই।

এখন দেখ দৃশ্যদর্শন-হইতে বদ্ধভাব কিরূপে আইসে। যখন তুমি কোন বস্তু দেখিতেছ, তখন তোমার চিত্তই বস্তুর আকারে আকারিত হইয়া তোমার দৃশ্য হইতেছে। বাহিরের বস্তুটা উপলক্ষ মাত্র। ঐ বস্তুর আকারে আকারিত চিত্তই তোমার দৃশ্য। যিনি দ্রষ্টা তিনি চেতন। যাহা দৃশ্য তাহা জড়। তুমি তোমার চিত্তকে যখন দেখ, তখন চৈতন্য দ্বারা দীপ্ত হইয়া জড় চিত্তটা চেতনভাব ধারণ করে। সেই জন্য জড়টা চঞ্চল হইয়া নানাবিধ সঙ্কল্প তুলে ও নানাকার্য্যে ছুটে। আবার যিনি দ্রষ্টা তিনিও জড়ভাব প্রাপ্ত হয়েন, এবং জড়ের কর্ম্মগুলি তাঁহাতে আরোপিত হয়। যিনি চেতন তিনি জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া জড়ের কর্ম্মে অভিমান করেন; কাজেই নানাপ্রকার আসক্তিতে বদ্ধ হয়েন। আমার শরীর খারাপ, আমার মাথা ধরিয়াছে, আমার স্ত্রীপুত্রাদি খাইতে পায় না, আমি ভাবনায় কৃশ হইয়া যাইতেছি ইত্যাদি বন্ধনে আত্মা মহাদুঃখী হইয়া যান।

রাম—"আমি" "আমার" ইহাই তবে বন্ধন?

বশিষ্ঠ—হাঁ। প্রকৃত আমি ছাড়িয়া তুমি যখন একটা ভুল আমি হইয়া দাঁড়াইবে আর আমার আমার করিবে, তখনই তুমি বদ্ধ।

একটা দৃষ্টান্ত লও। স্ফটিক মণির নিকটে জপা পুষ্প রাখা হইয়াছে। এখন

স্ফটিকে জপার ছায়া পড়িল এবং জপাতেও স্ফটিকের আভা পড়িল। জপাতে স্ফটিকের আভা পড়ায়, ঐ আভা দ্বারা জপার রূপ খুলিয়া, জপার অতি সূক্ষ্ম আকার দেখা গেল। এখন যদি স্ফটককে চেতন বল এবং চেতনের আভাও চেতনের মত হয়, তবে জপাতে পতিত আভাস-চৈতন্য জপার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, আপনাকে জপা ভাবিয়া সুখী বোধ করিলেন। ফলে সুখী ভাবিয়াও দুঃখীও হইলেন। কারণ স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভিতরে আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী, এইরূপ একটা অভিমান আসিয়া গেল; কাজেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দুঃখও আসিয়া গেল, স্ত্রীর পেট কাঁপিলে কষ্টবোধ হইতে লাগিল, স্ত্রীর বিসূচিকা হইলে ভয়ানক যাতনা বোধ হইতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইল, প্রাণ যায় যায় হইল, ইত্যাদি।

অন্য পক্ষে স্ফটিকে যে জপার ছায়া পড়িল তাহাতে স্ফটিকের এক অংশ রঞ্জিত হইল; অন্য অংশ স্বচ্ছই রহিল। রঞ্জিত অংশাবচ্ছিন্ন স্ফটিক জপার মত রঞ্জিত হইয়া, আপনার স্বরূপ ভুলিয়া, আপনাকে খণ্ডিত মত বোধ করিলেন। যিনি পূর্ণ তিনি আপনাকে খণ্ড ভাবিয়া ক্রমে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি সম্পন্ন হইয়া গেলেন। শেষে বহু সঙ্কল্প করার সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডভাব যত বেশী হইতে লাগিল, ততই শক্তির হ্রাস হইয়া, জ্ঞান ও আনন্দের হ্রাস হইয়া, জড়ত্ব আসিয়া গেল। ইহাই বন্ধন, ইহাই দুঃখ।

ভাল করিয়া দেখ—আত্মা যতক্ষণ মনের দ্রষ্টা ততক্ষণ তিনি মন নহেন; কাজেই মনের সুখ দুঃখ তাঁহাতে নাই। মনকে দেখিতে দেখিতে যখন তিনি মনকে সুন্দর দেখিলেন, যখন সুন্দরকে দেখিবার জন্য আসক্তি আসিল, তখন আপন স্বরূপ ছাড়িয়া মনই হইয়া গেলেন। দ্রষ্টা দৃশ্য হইয়া গেল। চেতন জড় হইয়া গেল ইহাই বন্ধন, ইহাই দুঃখ। যতক্ষণ মানুষ নিজের ক্রোধের দ্রষ্টা থাকে, ততক্ষণ বিচার থাকে; ক্রোধ অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু যেমন ক্রোধ দেখিতে দেখিতে ক্রোধরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তখনই নিজের স্বরূপ ভুল হইল। আত্মজ্যোতি নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বিকট কাণ্ড হইয়া গেল।

রাম—এই অধ্যাসটাই ত দুঃখের কারণ। এই অধ্যাস কাহার দ্বারা হয়? দ্রষ্টাকে তাঁহার আপন স্বরূপ ভুলাইয়া দেয় কে?

বশিষ্ঠ—মায়ার আবরণশক্তি দ্বারা দ্রষ্টা ও দর্শনের যে ভেদ সেই ভেদ আবরিত হয়। প্রকাশের আবরণ হয় এই আবরণশক্তি দ্বারা। মায়ার এক

শক্তিতে আত্মা পরিচ্ছিন্ন মত হয়েন ; দ্বিতীয় শক্তিতে দ্রষ্টা দৃশ্য ভেদ আবৃত হয়।

সহজ করিয়া বলি শ্রবণ কর। দ্রষ্টা-দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, দৃশ্যের অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে দৃশ্যটি দ্রষ্টার চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ হইলে মন হইলেন দ্রষ্টা। মনই তখন চৈতন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া হইলেন চেতন। মনই হইলেন আত্মা। আর প্রকৃত দ্রষ্টা তখন দৃশ্যের জড়ভাবে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া হইলেন জড়।

অভ্যাস দ্বারা এইটি হয়। আমি আত্মাকে দেখিতেছি যখন বলা হয়, তখন আমি হইতেছে মন। আর দৃশ্য আত্মা হইতেছেন জড়। দৃশ্য যাহা তাহাই জড়। যথার্থ দ্রষ্টা আত্মাই। দ্রষ্টাস্বরূপ ভুল হইলেই বন্ধন। দৃশ্য-দর্শনে বদ্ধভাব এইরূপে হয়।

রাম—এই দৃশ্যটা ছিল কোথায় ? পরিপূর্ণ আত্মাই ত আছেন অন্য কিছুইত নাই। দৃশ্য আসিল কোথা হইতে ?

বশিষ্ঠ—পদ্ম মধ্যে কমল লতিকার সূক্ষ্ম অবস্থা পদ্মবীজ যেরূপ লুক্কায়িত থাকে দ্রষ্টা ভাবের মধ্যেও সেইরূপ দৃশ্য লুক্কায়িত থাকে।

মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে মায়ার উদয়ও স্বাভাবিক। পদার্থকে পরিমিত করেন বলিয়া ইঁহার নাম মায়া। আত্মা সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিলেও, মিথ্যা মায়ার উদয়ে একটা মিথ্যা খণ্ডভাব জন্মে। মায়ার উদয়ে আমি অন্য কিছু দেখিতেছি—চৈতন্যের এইরূপ ভ্রমবোধের মত হয়। এই ভ্রান্ত দ্রষ্টাভাব যখন জাগিল, তখনই ঐ ভ্রম, মায়াই দৃশ্য বলিয়া বোধ হইল। ক্রমে দৃশ্যটি সুন্দর বোধ হইল। ইহা শোভনাধ্যাস।

আত্মাই সুন্দর। এখন কিন্তু আত্মা আপনা ভুলিয়া মিথ্যা মায়াকে সুন্দর দেখিলেন। ক্রমে আসক্তিতেই বদ্ধভাব আনিল। স্বামী-স্ত্রী, সুন্দর স্ত্রী সুন্দর করিয়া, স্বামী ভাব ছাড়িয়া, স্ত্রীর গোলাম হইলেন। স্ত্রী যা বলে তাহাই আনন্দে করিতে লাগিয়া গেলেন। আত্মতৃপ্ত, আত্মক্রীড় প্রেমক আপন প্রেমিক ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, স্ত্রীর গোলাম হইয়া গেলেন ; ইহাই বদ্ধাবস্থা।

দ্রষ্টা ভাবটি সর্ব্বদা অহংপূর্ব্বক হয়। অভিমান না জাগিলে দ্রষ্টাভাব জাগে না। মায়া স্বাভাবিকভাবে কোটিকল্প ধরিয়া মণির ঝলকের মত উঠুক বা মিলাইয়া যাউক,তাহাতে আত্মার কোন বিকার হয় না ; যদি আত্মাতে অহং ভাব

এতদজানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমানসা যে।
স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবুদ্ধে
স্বারোপয়ন্তীহ নিরস্তমায়ে ॥ ১৯ ॥

পার্ব্বতী—আত্মা সকলের মধ্যে আছেন বলিয়া সকলেই ত আত্মাকে জানিতে পারে ?

মহাদেব—জীবের মধ্যে আর কোন জীবের তাঁহাকে জানিতে শক্তি নাই, আছে এক মানুষের। মানুষের শক্তি আছে, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে না। আত্মা সর্ব্বত্র আছেন সত্য, কিন্তু অত্যন্ত গুপ্তভাবে আছেন। যাঁহারা সাধক, যাহারা অতি-সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা নিতান্ত সূক্ষ্ম-বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করেন "দৃশ্যতেত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। শ্রুতিবাক্য।

পার্ব্বতী—বুদ্ধি দ্বারা দর্শন কিরূপ ?

মহাদেব—চক্ষু দ্বারা হয় দর্শন, আর বুদ্ধি দ্বারা হয় বোঝা। বোঝাটাই হইতেছে যথার্থ দর্শন। শীতের অন্তে যখন বৃক্ষ হইতে পত্র ঝড়িয়া পড়ে, তখন চক্ষু ইহা দেখে সত্য ; কিন্তু বুদ্ধি আর কিছুর আগমন বুঝিতে পারে। বসন্ত আসিয়াছে ইহা চক্ষু দেখে না, কিন্তু বুদ্ধি বুঝিতে পারে বা দেখিতে পায়। বুদ্ধির ধর্ম্ম বিচার। বুদ্ধি বিচার দ্বারা, আত্মাদর্শন বা আত্মনুভব, করিতে পারে। নেতি নেতি বুদ্ধিই নিশ্চয় করিয়া দেয়। বৈরাগ্যবলে যখন সমস্তই মন হইতে লয় হইয়া যায়—তখন প্রলয়কালে যিনি অবশিষ্ঠ থাকেন, তিনিই থাকেন। তিনিই আত্মা।

পার্ব্বতী—বুদ্ধি কিরূপ বিচার দ্বারা আত্মদর্শন করে ?

মহাদেব—বিচার দ্বারা বুদ্ধি দেখাইয়া দেয় যে, আত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয় নহে, জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, অন্তরেন্দ্রিয়ও নহে, প্রকৃতিও নহে। তবে আত্মা কি ? যাহা দেখা, শোনা, অনুভব করা যায়, তাহার কিছুই নহে। আত্মা কি তাহা জানা যায় না। যিনি ভিন্ন দেখা যায় না, শোনা যায়না,—তাহাতে দেখিবার কেহ নাই সত্য ; তিনিই জ্ঞাতা তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই সত্য ;—দেখা যায়না, শোনা যায় না, জানা যায় না সত্য ; কিন্তু আত্মা আছেন ইহা বুঝা যায়। আমাকে

বার বার জন্ম-মৃত্যু সংসারে ভ্রমণ
করে মূঢ়! স্নেহে বদ্ধ হ’য়ে কর্ম্মযুত—
আর নাহি জেনে তাঁরে, হৃদয়ে যে জন,
কণ্ঠে হারভ্রান্ত যথা বাহিরে সন্ধানে॥ ২০॥
সূর্য্যে যথা অন্ধকার কভু না সম্ভবে
জ্যোতির স্বরূপ তথা পরম ঈশ্বরে-
জ্ঞানঘন রঘূত্তম পরম আত্মায়
অবিদ্যার স্থিতি কোথা? একি কভু হয়?॥ ২১॥
যথা শিশু ঘূর্ণি-খেলা খেলিয়া দাঁড়ালে
দেখে ঘুরে গৃহ আদি—এ যথা আরোপ।
তথা দেহেন্দ্রিয় কর্ম্ম নিশ্চল আত্মায়
মূঢ়জন আরোপিয়া করয়ে বিলাপ॥ ২২॥

নিরস্তমায়ে স্বজ্ঞানবতাং নিরস্তা মায়া যেন তাদৃশে।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ইতি গীতোক্তেঃ। ঈদৃশে রামে স্বাজ্ঞানং স্মুতরামারোপয়ন্তি। স্বস্যাজ্ঞত্বাৎ রামমজ্ঞমিতি জানন্তীত্যাশয়ঃ। তেষাং দুষ্টফলমাহ।

২০। সংসারমিতি। তে পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুকর্ম্মযুক্তাঃ ভূরি যজ্ঞাদি কর্ম্মযুক্তাঃ সংসারমেবানসরন্তি। যতস্তে যথাঽজ্ঞাঃ কণ্ঠগতং চামীকরং স্বর্ণালঙ্কারং ন জানন্তি এবং হৃদয়েস্থিতং রামং তে ন জানন্তি। অতঃ সংসারমেবানুসরন্তীত্যর্থঃ। কিং চ পরাত্মন্যজ্ঞানাসংভব ইতি দৃষ্টান্তেনাহ।

২১। যথেতি। অপ্রকাশস্তমো যথা রবৌ জ্যোতিঃস্বভাবে জ্যোতিঃ স্বরূপে ন বিদ্যতে। তথা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেন নির্ব্বিশেষাপরোক্ষজ্ঞানেন ঘনে নিবিড়ে পরতঃ পরমাত্মনি উৎকৃষ্টেভ্যোঽপ্যুৎকৃষ্টে রামে অবিদ্যা কথংস্যাৎ। তাদৃশে বস্তুন্যবিদ্যানবকাশাদিতিভাবঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ।

অপ্রকাশো যথাদিত্যে নাস্তি জ্যোতিঃ স্বভাবতঃ।
নিত্যবোধস্বরূপত্বান্নাজ্ঞানং তদ্বদাত্মনি॥ ইতি॥

সংসারমেবানুসরন্তি তে বৈ
পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুকর্ম্মযুক্তাঃ
জানন্তিনৈবং হৃদয়ে স্থিতং বৈ
চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ ॥ ২০ ॥
যথাঽপ্রকাশো নতু বিদ্যতে রবৌ
জ্যোতিঃস্বভাবে পরমেশ্বরে তথা।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনে রঘূত্তমে
ঽবিদ্যা কথং স্যাৎ পরতঃ পরাত্মনি ॥ ২১ ॥
যথাহি চাক্ষা ভ্রমতা গৃহাদিকং
বিনষ্টদৃষ্টেভ্রমতীব দৃশ্যতে।
তথৈব দেহেন্দ্রিয় কর্ত্তুরাত্মন:
কৃতং পরেঽধ্যস্য জনো বিমুহ্যতি ॥ ২২ ॥

আমি দেখিতে পাই না, আমি কে আমি তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারি না সত্য ; কিন্তু বুঝি যে, আমি একটা কিছু আছি। বিচারবুদ্ধিতে আত্ম-দর্শনের ক্রম কতক বলা হইল।

পার্ব্বতী—পরমাত্মা আত্মমায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, করিয়া সৃষ্টির সর্ব্ববস্তু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎকে দর্শন করেন। এই আত্মমায়াটা কি ?

মহাদেব—যেমন তুমি আমার আত্মমায়া, সেইরূপ পরমাত্মা আত্মমায়া দ্বারা জগৎ সৃজন করেন [স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা] এবং আত্মমায়া দ্বারা জগৎ দর্শন করেন [স্বময়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে]।

পার্ব্বতী—মায়াতে জগৎ সৃষ্টি, মায়াতে জগদ্দর্শন যদি হয়, তবে সমস্তই কি মিথ্যা ? মায়া যেকালে মিথ্যা তখন মায়িক সৃষ্টিও মিথ্যা, মায়িক দর্শনও মিথ্যা ?

মহাদেব—শান্তিগীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

সূর্য্যের প্রকাশ যদি সমভাবে রয়
দিবস রাত্রির ভেদ সম্ভব কি হয় ?
সেইরূপ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানঘন রামে
জ্ঞান ও অজ্ঞান ভেদ থাকিবে কেমনে ? ॥ ২৩ ॥
তাই বলি পরানন্দময় রঘুনাথে
কমললোচন যিনি বিজ্ঞান স্বরূপ,
অজ্ঞানের সাক্ষী যিনি—কোথায় অজ্ঞান ?
যাঁর মায়া—মায়া তাঁরে বাঁধিবে কেমনে ? ॥২৪॥

২২। যথা বিনষ্টদৃষ্টের্দোষযুক্তস্য দৃষ্টেঃ পুরুষস্য ভ্রমতাক্ষ্ণা গৃহাদিকং ভ্রমতীব। উৎপ্রেক্ষেয়ম্। ভ্রমতী বেতি গৃহ্যতে তেনৈব নষ্টদৃষ্টিনা। পুরুষেণেতি শেষঃ। তথৈব দেহেন্দ্রিয়াবচ্ছিন্নস্য কর্ত্তুরাত্মনোঽন্তঃ করণস্যাহঙ্কারাখ্যস্য কৃতং পরে সর্ব্ব-ধর্ম্মালিপ্তেতদনবচ্ছিন্নে চেতনেঽধ্যাস্যজনো জীবো মুহ্যতি অহং কর্ত্তেতি মোহং প্রাপ্নোতি। এবং চ যথাক্ষিগত ভ্রমণস্যগৃহাদাবা রোপঃ যথা চান্তঃকরণধর্ম্মস্য কর্ত্তৃত্বাদেরাত্মন্যারোপস্তথাস্যাজ্ঞানস্য রামে আরোপ ইত্যাশয়ঃ।

২৩। ভগবতি রামে স্বতো জ্ঞানমজ্ঞানং বা ন সম্ভবতীতি পুনরপি দাঢ্যার্থয়োক্তং যুক্তমেবাহ। নাহরিতি। সূর্য্যং প্রতিরাত্রিদিবস বিভাগা-ভাবেহেতুঃ প্রকাশরূপা ব্যভিচারিতঃ। ক্বচিৎকাপীত্যর্থঃ। জ্ঞানাজ্ঞানয়ো-র্ভগবত্যনবস্থিতৌ হেতুঃ শুদ্ধচিদ্ঘনত্বম্ ॥ ২৩ ॥

২৪। পরানন্দময়ে সর্ব্বভূতৈরেতদানন্দমাত্রায়া উপজীবনাৎ। বিজ্ঞানরূপে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানরূপে তমোঽজ্ঞানরূপম্ তমসোঽসম্বন্ধে হেতু দ্বয়ম্ অজ্ঞান-সাক্ষিত্বং মায়াধিষ্ঠাতৃত্বরূপং মায়াশ্রয়ত্বং চ মোহকারণং তমোঽজ্ঞানম্। যো যন্মায়াধিষ্ঠাতা স তদ্বিষয়াজ্ঞানহীন ইতি লোকে দর্শনাদিতি ভাবঃ। ন ন্বেবং সতি ব্রহ্মা দাশরথে র্যদ্বদুক্ত্যেবাপানুদত্তম ইত্যাদ্যাচার্য্যাদ্যুক্তেঃ কা গতি-রিতি চেচ্ছৃণু। রাবণবধার্থং মনুষ্যত্বনাটনায় ভগবতা সঙ্কল্পপূর্ব্বং কৃতস্য স্বমহাত্ম্যাচ্ছাদনস্য তত্র তমঃশব্দেনোক্তেরদোষাৎ। উক্তং হি সংক্ষেপশারীরকে। সঙ্কল্পপূর্ব্বকমভূদ্রঘুনন্দনস্য নাহংবিদান ইতি কংচন কালমেতৎ। ব্রহ্মোপদেশমুপলভ্য

নাহর্ন রাত্রিঃ সবিতুর্যথা ভবেৎ
প্রকাশরূপা ব্যভিচারতঃ ক্বচিৎ।
জ্ঞানং তথাঽজ্ঞানমিদং দ্বয়ং হরৌ
রামে কথং স্থাস্যতি শুদ্ধ চিদ্‌ঘনে ॥ ২৩ ॥
তস্মাৎ পরানন্দময়ে রঘূত্তমে
বিজ্ঞানরূপে হি ন বিদ্যতে তমঃ।
অজ্ঞান সাক্ষিণ্যরবিন্দ লোচনে
মায়াশ্রয়ত্বান্নহি মোহকারণম্ ॥ ২৪ ॥

সৃষ্টির্নাস্তি জগন্নাস্তি জীবোনাস্তি তথেশ্বরঃ।
মায়য়া দৃশ্যতে সর্ব্বং ভাসাতে ব্রহ্মসত্তয়া ॥ ৯
যথা স্তিমিতগম্ভীরে জলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণ বশাদ্বীচির্ন বস্তু সলিলেতরৎ ॥ ১০
তথাহি পূর্ণচৈতন্যে মায়য়া দৃশ্যতে জগৎ।
ন তরঙ্গো জলাদ্ভিন্নো ব্রহ্মণোঽন্য জ্জগন্নহি ॥ ১১
চৈতন্য বিশ্বরূপেণ ভাসতে মায়য়া তথা
কিঞ্চিদ্ভবতি নো সত্যং স্বপ্ন কর্ম্মেব নিদ্রয়া ॥ ১২
যাবন্নিদ্রা ধ্রুতং তাবৎ তথাঽজ্ঞানাদিদং জগৎ।
ন মায়া কুরুতে কিঞ্চিন্মায়াবী ন করোত্যমু।
ইন্দ্রজাল সমং সর্ব্বং বদ্ধদৃষ্টিঃ প্রপশ্যতি ॥ ১৩।
অজ্ঞানজন বোধার্থং বহ্যদৃষ্ট্যা শ্রুতীরিতম্
বালানাং প্রীতয়ে যদ্বদ্ধাত্রী জল্পতি কল্পিতম্।
তৎপ্রকার প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কুন্তিনন্দন ॥ ১৪

ভাবার্থ এই যে সৃষ্টিও নাই, জগতও নাই, জীবও নাই, ঈশ্বরও নাই। তথাপি যে বলা হয় আছে, মায়া দ্বারা ব্রহ্মসত্তাই ঐঐ রূপে ভাসেন।

স্তিমিত গম্ভীর জলরাশি পরিপূরিত মহাসমুদ্রে বায়ুবশে যে বীচি উঠে তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে সেই সৃষ্টিরূপ ইন্দ্রজাল ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে।

মায়া দ্বারা চৈতন্যই বিশ্বরূপে ভাসিয়াছেন। যেমন নিদ্রাকালে স্বপ্ন ভাবে তাহাতে কিছুমাত্র সত্য নাই সেইরূপ।

অতিগুপ্ত সুদুর্ল্লভ, মোক্ষকথা, করিব ব্যাখান।
এ সংবাদ, সীতারাম, হনুমানে করেন প্রদান ॥ ২৫ ॥
রাম অবতারে রাম, রণদর্পে, বিনাশি রাবণে।
পুত্র, সৈন্য, যান সহ, দেবতাকণ্ঠকে, ঘোর মহারণে ॥ ২৬ ॥
শ্রীসীতা লক্ষ্মণ আর, হনুমান, সুগ্রীবাদি সহ।
আসিলেন অযোধ্যায়, অতি হর্ষে, করি সমারোহ ॥২৭॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি রামে, অভিষেক করেন তৎপর।
সূর্য্যকোটিপ্রভ রাজা, বসিলেন, সিংহাসন পর ॥ ২৮ ॥
তথা দেখি হনুমানে, কৃতাঞ্জলি, সম্মুখে দাঁড়ায়ে।
জ্ঞানে লক্ষ্য কর্ম্মশেষে, অন্য কাঙ্ক্ষা, সব তেয়াগিয়ে ॥২৯॥
সীতায় বলেন রাম, বল তত্ত্ব, পবননন্দনে ;
নিষ্পাপ জ্ঞানের পাত্র, সদা ভক্তি, আমা দুই জনে ॥ ৩০ ॥
শ্রীরাম নিশিত তত্ত্ব, কন সীতা ; লোকবিমোহিনী।
যে মাতা বাঁধেন মোহে, মোহমুক্ত, করিতেও তিনি ॥ ৩১ ॥

নিমিত্তমাত্রং তচ্চোৎসসর্জ সক্তে সতি দেবকার্য্যে ॥ ইতি। ভাগবতেঽপ্যুক্তম্ স্ত্রীসঙ্গীনাং গতিরিতিপ্রথয়ংশ্চচারা ইতি।

২৫। মরুৎসূনুর্বায়ুপুত্রো হনুমান্।

২৬। রামায়ণে রামায়ণপ্রবর্ত্তকে রামাবতারকালে ইত্যর্থঃ॥ দেবকণ্টকম্ দেবদ্রোহিণম্॥

২৮। পরিবৃতঃ সীতাদিভিরিতিশেষঃ॥

২৯। পুরতঃ স্থিতম্ অগ্রেস্থিতম্॥ অনেন গুরূপসদনং দর্শিতম্॥ নিরাকাঙ্ক্ষং জ্ঞানেতরধনাদি নিরপেক্ষম্॥

৩০। তত্ত্বং মৎস্বরূপতত্ত্বম্॥ নিষ্কল্মষোঽয়মিত্যনেন জ্ঞানাধিকারিত্বং সূচিতম্॥ নৌ আবয়োঃ॥

৩১। রামস্য তত্ত্বং শ্রোতুর্নিশ্চিতং যথা ভবতি তথা প্রাহ॥ লোকবিমোহিনীত্যনেন বন্ধনকর্ত্তুরেব বন্ধমোক্ষে সামর্থ্যমিতিদর্শিতম্॥ রাজাজ্ঞয়া বদ্ধোহি

অত্র তে কথয়িষ্যামি রহস্যমতি দুর্ল্লভম্।
সীতারামমরুৎসূনু সংবাদং মোক্ষসাধনম্॥ ২৫ ॥
পুরা রামায়ণে রামো রাবণং দেবকণ্টকম্।
হত্বারণে রণশ্লাঘী সপুত্র বলবাহনম্॥ ২৬ ॥
সীতয়া সহ সুগ্রীব লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
অযোধ্যামগমদ্রামো হনূমৎপ্রমুখৈর্বৃতঃ॥ ২৭ ॥
অভিষিক্তঃ পরিবৃতো বশিষ্ঠাদ্যৈর্মহাত্মভিঃ।
সিংহাসনে সমাসীনঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ॥ ২৮ ॥
দৃষ্ট্বা তদা হনূমন্তং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্।
কৃতকার্য্যং নিরাকাঙ্ক্ষং জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্॥ ২৯ ॥
রামঃ সীতামুবাচেদং ব্রূহি তত্ত্বং হনূমতে।
নিষ্কল্মষোহয়ং জ্ঞানস্য পাত্রং নৌ নিত্যভক্তিমান্॥ ৩০ ॥
তথেতি জানকী প্রাহ তত্ত্বং রামস্য নিশ্চিতম্।
হনূমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী॥ ৩১ ॥

যতক্ষণ নিদ্রা ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য মত বোধ হয়। সেইরূপ যতক্ষণ অজ্ঞানে দীর্ঘ সংসার স্বপ্ন ও সত্য মত বোধ হয় কিন্তু জাগরণে স্বপ্নের কিছুই সত্য মনে হয় না।

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই মায়াও কিছুই করেন না আর মায়াবীও কিছুই করেন না। কিন্তু বদ্ধ দৃষ্টি জনে সমস্তই ইন্দ্রজালের মত দেখিতেছে।

অজ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি দ্বৈত ভাবের আশ্রয় লইয়াছেন যেমন ধাত্রী বালকদিগের প্রীতি জন্য গল্প কথা ব্যবহার করে সেই রূপ। ফলে—

লেশ মাত্রং ন হি দ্বৈতং দ্বৈতং। ন সহতে শ্রুতিঃ॥ ভগবতী শ্রুতি দ্বৈত ভাব সহ্য করিতে পারেন না কারণ লেশ মাত্রও দ্বৈত নাই।

পার্ব্বতী—যেমন লৌহ চুম্বকে লাগিয়া থাকিবার জন্য তাহার চারি ধারে ছুটিয়া বেড়ায় সেইরূপ অনেক ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চারিধারে ছুটিয়া বেড়াইতেছে? ইহা বুঝিব কিরূপে?

সীতা বলিলেন—

শ্রীরাম সচ্চিদানন্দ, পরব্রহ্ম, অদ্বৈত সুন্দর।
উপাধি বর্জ্জিত নিত্য, সত্তামাত্র, নহেন গোচর ॥ ৩২ ॥
নির্ম্মল, আনন্দ, শান্ত, নির্ব্বিকার, কালিমা বর্জ্জিত।
সর্ব্বব্যাপী আত্মা রাম, স্বয়ং জ্যোতি, পাপ বিরহিত ॥ ৩৩ ॥
আমি তাঁর আদ্যাশক্তি, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী।
তাঁহার সন্নিধি মাত্রে, অনলসে, সৃষ্টিবিধায়িনী ॥ ৩৪ ॥
আমার রচিত সৃষ্টি, মূর্খে তাঁহে, করয়ে আরোপ।
যা' নাই তা' আছে ভাবি, মায়ামোহে, করে দুঃখভোগ ॥ ৩৫ ॥

তদাজ্ঞয়ৈব মুচ্যত ইতি লোকপ্রসিদ্ধম্॥ এবং চ ভগবতী কৃপৈব মুখ্যং মোক্ষকারণমিতি দর্শিতম্॥

৩২।৩৩॥ রামং পরং ব্রহ্ম বিদ্ধি। রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদে নেদং পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ইতিরামতাপনীয়ে পাদ্মেচোক্তঃ।

সৎ=বাধহীনম্।

সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগৎ বাধৈক সাক্ষিণঃ।

বাধঃ কিং সাক্ষিকো ব্রূহি নত্বসাক্ষিক ইষ্যতে॥ ইত্যুক্তেঃ॥

চিৎ=জ্ঞানস্বরূপম্। আনন্দং=তৎরূপম্।

অদ্বয়ম্=একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। ইতি শ্রুতেঃ।

সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তম্=স্থূল সূক্ষ্ম সকলোপাধিনির্ম্মুক্তম্।

বিরাড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।

ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ॥ ইতিবার্ত্তিকম্॥

কিং চ সর্ব্বোপাধিভির্ধর্ম্মৈর্বিনির্মুক্তমস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ।

সত্তামাত্রম্=বস্তুমাত্রে সদিতি ব্যবহার নিয়ামকমিত্যর্থঃ।

এতৎ সম্বন্ধাদেব সর্ব্বত্রসদিতি ব্যবহার ইতিভাবঃ।

অগোচরম্=মনোবচসোরপ্যবিষয়মিত্যর্থঃ॥ যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। ইতি শ্রুতেঃ।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

গীতা পরিচয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বিজ্ঞপ্তি।

গীতা পরিচয়ের প্রথম সংস্করণ বহুদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। সুবিধা হয় নাই বলিয়া, এতদিন এই পুস্তক পুনর্মুদ্রন করা হয় নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল। মূলতত্ত্ব এক থাকিলেও, বিষয়গুলিকে বিশদ করিবার জন্য এই সংস্করণ।

নূতন সংস্করণে দুইটি নূতন অধ্যায়ও সন্নিবেশিত হইল। এই দুইটি অধ্যায়ের নাম হইবে গীতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্ম এবং গীতার রক্ষা মন্ত্র।

পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তনের দুই একটি কারণ উল্লেখ করা হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" যাহারা যে প্রয়োজনে আমাকে আশ্রয়ে করে, তাহাদিগকে সেই ফলদানেই আমি অনুগ্রহ করি।

স্বাধ্যায়সম্পন্ন সাধক যেমন যেমন শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ সাধনা দ্বারা এই বেদত্রয়ী তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী মুক্তিগেহিনীর আশ্রয়ে আগমন করেন, তিনি ততই যেন ইঁহার অনুগ্রহ অনুভব করেন।

শ্রীগীতা একবার অধ্যয়ন কর, মনে হইবে যেন ইহাতে কত কি আছে, যেন কত কি ইনি দেখাইবেন আশ্বাস দিতেছেন; আবার পড় নূতন সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত হইল; আরও পড় আরও রমণীয়; মনে হয় যেন ইহার শেষ নাই।

শ্রীগীতা ব্রহ্মস্বরূপিণী। শ্রীগীতা জ্ঞানময়ী। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার ভক্তের যে কোন ভক্ত যে ভাবে ইঁহার ভজনা করেন, ইনি সেই ভাবের মধ্য দিয়াই যেন ইঁহার আশ্রিতকে—এই কোলাহলময় জগতের অন্তস্তলে যে এক রমণীয় নিস্তব্ধভাবজগৎ আছে, প্রতিগতির অভ্যন্তরে যে এক পরমশান্ত স্থিতি আছে—ধীরে ধীরে শত সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে সেই স্থানে লইয়া যান।

শ্রীগীতা আনন্দময়ী। সাধনা দ্বারা ব্যাকুল হইয়া যে কেহ ইঁহার রূপ দেখিতে উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত হয়েন, ইনি যেন ইঁহার আশ্রিতকে আপনার স্থূল স্থূল আবরণ উন্মোচন করিয়া, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে আপনার যথার্থ স্বরূপ যে সেই রমণীয় দর্শন তাঁহাকেই দেখাইয়া দিয়া থাকেন।

শ্রীগীতা রঙ্গময়ী। জগৎস্বরূপিণী বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার অনুসরণ করা যেমন কঠিন, শ্রীগীতার অনুসরণ করাও যেন সেইরূপ দুরূহ। ভদ্রার সারথ্য-নৈপুণ্যে অর্জ্জুনের রথগতির মত এই বিশ্বনর্ত্তকী কখন জনমণ্ডলার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করেন, পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া যান; মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের খেলার মত কখন ইনি শূন্যে চমকাইতেছেন, কখন মেঘমধ্যে লুক্কায়িত হইতেছেন; সুদীর্ঘ জলাশয়ে বৃহৎ মৎস্যের মত কখন নিকটের জল আলোড়িত করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার দূরে চলিয়া গিয়াছেন; কখন মনে হইল বুঝি ধরিলাম, পরক্ষণেই কোথায় চলিয়া গেল—শ্রীগীতার পশ্চাদ্ধাবন যেন এইরূপ বিস্ময়কর।

জগৎস্বরূপিণী মায়ার চাঞ্চল্যাভ্যন্তরে যেমন স্থির শান্ত রমণীয় দর্শন বিরাজ করেন, শ্রীগীতাবস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিত স্তনী উপনিষদ্ দেবীও যেন এই খানে সেইরূপে অবস্থান করিতেছেন। অধিক কি বলা যাইবে, মহাকাশ, চিত্তাকাশ ও চিদাকাশ ছাইয়া শ্রীগীতার রূপরাশি ত্রিজগৎ চমৎকৃত করিতেছে।

যিনি সমকালে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, যিনি সমকালে পরমাশ্চর্য্যরূপ-ধারিণী মায়ামানুষী, সর্ব্বনরনারীবিজড়িত সর্ব্বস্থাবরজঙ্গমসম্মিলিত বিশ্বরূপিণী, আবার আপন সৃষ্টি আপনি বিনাশ করিয়া, দৃশ্যগরল আপনি নিঃশেষে পান করিয়া, দৃশ্য-প্রপঞ্চ আপন আত্মায় নিঃশেষে পরিপাক করিয়া, যিনি

আপনাতে আপনি,—তাঁহার সমগ্ররূপ দর্শন যে আমাদের মত ক্ষীণপুণ্য, সাধন-কাতর দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সুদূরপরাহত, ইহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে?

গীতা অধ্যয়ন এক জীবনের কেন, যতদিন না জীবন্মুক্তি লাভ হয়, যেন তত জীবনের কার্য্য। জীবন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝি ইহার ভাব স্থায়ীভাবে জীব-চৈতন্য বিন্দুকে, ব্রহ্ম-চৈতন্য সিন্ধুতে মগ্ন করিয়া রাখে না।

মনে হয় দ্বিতীয় বারের আলোচনায় শ্রীগীতা আরও একটু উজ্জ্বলভাবে অসিয়াছেন। এমন কতবার হইতে পারে, কে বলিবে?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীগীতার অনুগ্রহ ভিন্ন শ্রীগীতা বুঝিতে বুঝি পারা যায় না।

যদি কাহারও শরণাপন্ন হওয়া যায়, তবে আশ্রিতকে আশ্রয়দাতার ইচ্ছা অনুসারে চলিতে হয়; নতুবা আশ্রয় গ্রহণটা মৌখিক। যদি শ্রীগীতার আশ্রয় লইতে হয়, তবে শ্রীগীতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ অনুভব করিতে হইলেও, তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

কোথায় তাঁহার আজ্ঞা পাওয়া যাইবে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে বলিতে হয় বেদে পাওয়া যায়; অধ্যাত্মশাস্ত্রমাত্রেই পাওয়া যায়। গীতার মত পুস্তকে বিশেষরূপে পাওয়া যায়।

গীতা-শাস্ত্র হইতে শ্রীভগবানের আজ্ঞাগুলি বাছিয়া লইয়া যিনি যেটি পালন করিতে পারেন তজ্জন্য প্রাণপণ করুন; শ্রীগীতার অনুগ্রহ যে বুঝিতে পারিবেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গীতাগ্রন্থকে মানুষের মত জীবন্ত মনে করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অনেকে মনে ভাবিতে পারেন ইহা কি প্রকার ভক্তি? পুস্তক আবার মানুষের মত কিরূপে হইবে? আবার কেহ কেহ ইহা সত্যও ভাবিতে পারেন। "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। যাহা শ্রীভগবানের হৃদয় তাহা জড় বলিয়া নাই ভাবা হইল—ইহাতে কি কিছু অতিরঞ্জিত আছে? মানুষের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়; এইগুলিকে মানুষ বলা হয় না। স্থূল আবরণগুলিকে জীবন্ত করিয়া যে চৈতন্য পুরুষ বিরাজিত, তিনিই মানুষ।

জড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। গীতা-গ্রন্থের অক্ষরগুলিকে শব্দমাত্র বলা হইলেও সেই শব্দরাশির অর্থ দ্বারা যে আত্ম-

দেব প্রকাশিত তিনিই শ্রীগীতা। ইনিই সমকালে অক্ষর বা অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্ম, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ, ইনিই মায়ামানুষ বা মায়া-মানুষী। জড় আবরণটি মায়া, ভিতরের হৃদয়টিই আত্মদেব বা আত্মদেবী।

এই আত্মদেব বা আত্মদেবীর নাম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন :—

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥
অর্দ্ধ মাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥
ইত্যেতানি জপন্নিত্যং নরোনিশ্চল মানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাহন্তে পরমং পদম্॥

হে অর্জ্জুন! গীতার গুহ্য নাম সকল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ইত্যাদি নাম যিনি নিশ্চল-চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি সর্ব্বদার জন্য জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন, এবং অন্তে পরম শান্ত নিশ্চল আনন্দস্বরূপ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ এই ত্রিপাদের উর্দ্ধে যে পরম পদ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতিলাভ করেন।

সর্ব্বজ্ঞান-প্রয়োজিকা ধর্ম্মময়ী শ্রীগীতাকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমস্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার, গীতাই আমার অত্যুগ্র অব্যয়-জ্ঞান, গীতাই আমার রমণীয় বাসভবন, গীতাই আমার পরম পদ। অধিক কি গীতাই আমার পরম গুহ্য; গীতাই আমার পরম গুরু।

শ্রীভগবানের পরম গুরু যিনি তাঁহাকেও চৈতন্যময়ী বলিতে কি আপত্তি হইতে পারে ?

শেষ কথা। "কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্,ব্যাসো বা ব্যাস-পুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ"—

যাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় কৃষ্ণই সম্যক্ জানেন, অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ ফল অবগত, ব্যাসদেব বা শুকদেব বা যোগী যজ্ঞবল্ক্য বা জনক কিঞ্চিৎমাত্র জানেন তাঁহার সম্বন্ধে অকিঞ্চন এই ছার জীবে কি জানিবে ? তথাপি কোন্ সংস্কারবশে এই অসাধ্যসাধনও ছাড়িতে দাও না, তাহা বুঝিব কিরূপে ? জীব কি আপন ইচ্ছায় এইরূপ কার্য্য করে, অথবা তোমার ইচ্ছায় চালিত হইয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা কে বুঝাইয়া দিবে ? অথবা বুঝিবারই প্রয়োজন কি ?

হে অগতির গতি ! যে দিকদিয়াই লইয়া যাও-হে আত্মদেব-আমাদের এই কর যেন সকল কার্য্যে মানুষ তোমার অনুগ্রহ কামনা ভিন্ন অন্য কামনা না করে, যেন সমস্ত ফলকামনা ত্যাগ করিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে তোমার আশ্রয়ে নিরন্তর থাকিতে পারে। জনন মরণে তুমি মাত্র আশ্রয় দাতা। হে অধমজনের ত্রাণকর্ত্তা ! হে পতিতপাবন ! হে পাপীতাপীর আশ্রয় ! হে ক্ষমাসার ! প্রভু ! কি আর বলিব, প্রার্থনা করিতেও জানি না। তথাপি এই বলি, ভৃঙ্গ যেমন কমল মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে আরাম পায়— তাপত্রিতয় জালামালাকুল আমরা যেন সর্ব্বদা এই জ্বালা অনুভব করিয়া, কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে, তোমার পরমপদে, তোমার মধুর চরণকমলে চিরাস্থিতি লাভ করিতে পারি। হে অব্যক্ত স্বরূপ ! হে বিশ্বরূপ ! হে স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ ! তোমার এই ত্রিবিধ রূপ দর্শন করিব ; এই উৎকণ্ঠস্ফুটিত চিত্তে যেন নিরন্তর তোমাকে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি ; প্রভু ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮,
মহাবিষুব সংক্রান্ত।
বলিহার।

ব্রজলীলা-গান।

জাগ পৌর্ণমাসি! মা কুলকুণ্ডলিনি!
চতুর্দ্দল পদ্মে আছ কি মা নিদ্রে উঠ জননি!
সহস্রদল পদ্মে পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে
জীবাত্মা রাধায় হইয়ে সহায়
মিলন কর ব্রজলীলাকারিণী॥
চিত্রা চিত্ত-পটে পলক রাখিয়ে
দেখাইতে রূপ পশিল হৃদয়ে
সমাধি মিলন ভাবে ভাবিনী॥
ললিতা আচার্য্য কৈল উপদেশ
কৃষ্ণনাম আত্মতত্ত্ব সবিশেষ
শ্রবণে রাধার হ'ল প্রেমাবেশ
বিরাগে অনুরাগিনী॥
বৃন্দা প্রণব ডাকিছে রাইকে লয়ে যেতে ধীর সমীরে
ষট্‌চক্রপরে করাও অভিসার
গোপন স্থানে যাবেন গোপিনী॥
কুল শীল মান সংসার পরিত্যাগ
বিধি ধর্ম্মপ্রতি নাহি অনুরাগ
এ সমাজ ছাড়া কলঙ্কিনী
পরকীয় পর-পতি কৃষ্ণ সঙ্গে
পরকীয় রূপ লীলা কত রঙ্গে
যতেক ব্রাহ্মণী রাস-রস বিলাসিনী
অন্তরে প্রকৃতি বাহ্যে পুংসাচার
তবে হবে এই সেবায় অধিকার
কবে সেবায় মগ্ন হবে মন আমার
হর গোবিন্দের চিন্তা দিবারজনী।

সমাধি অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাইতেছে। ব্রজ-লীলা ও মিলনসমাধি। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মলীলাকে দুইপ্রকার বলা হইয়াছে।

লীলৈব দ্বিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যবহারিকী। বাস্তবী তৎ স্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যবহারিকী। আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাস্তগা কচিৎ। বাস্তবী ও ব্যবহারিকী লীলা এই দুই প্রকার। বাস্তবীলীলা নিজে জানা যায়। ব্যবহারিকীলীলা সাধারণ জীবের জন্য।

কিন্তু বাস্তবীলীলা ভিন্ন ব্যবহারিকীলীলার মর্ম্ম অনুভব হয় না। আবার ব্যবহারিকীলীলা ভিন্ন বাস্তবীলীলার অনুভব হয় না। উপরের গানটিতে বাস্তবীলীলার কথা সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। রচয়িতা যিনিই হউন তিনি যে ব্যবহারিকীলীলাকে বাস্তবীলীলাতে আনিয়া সাধকের সাধনার সুবিধা যাহা তাহাই দেখাইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মিলনসমাধি বা ব্রজলীলা ভিন্ন অন্য প্রকার সমাধির কথাও যোগশাস্ত্রে দেখা যায়।

(১) মনকে শরীর হইতে বিভিন্ন করিয়া পরমাত্মায় রাখার নাম সমাধি। ইহাতে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। ইহা সাংখ্যসমাধি।

(২) "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য বিচারজন্য অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন জন্য সমাধি লাভ হয়। ইহা বেদান্তসমাধি।

(৩) শাম্ভবী মুদ্রা দ্বারা বিন্দু দর্শন করিয়া সেই বিন্দুতে মন রাখাও সমাধি। এই সমাধিতে আকাশের মধ্যে বিন্দু ভাবনা এবং বিন্দুর মধ্যে আকাশ ভাবনা। বিন্দুই জীবাত্মা এবং চিদাকাশই পরমাত্মা। ইহা ধ্যানযোগসমাধি।

শ্রীমতীর প্রণয়।

সখিরে! কি কহিব শ্যাম কি মোহন?
না দিল আমারে বিধি শতেক বদন।
রসনা, করিতে অনুভব প্রকাশিত,
বহুভাব সমাবেশে বচনরহিত।
সহজে অবলা নাহি ভাষা-পরিচয়,
ভাব কহিবারে পদ-সঙ্গতি না হয়।

তথাপি কহিতে কথা মোহন শ্যামের
বড় তৃপ্তি, বড় শান্তি হয় অন্তরের।
শ্যামের প্রসঙ্গ তোরা কহিস্ যখন
কত যে আরতি প্রাণে, কত ফুল্লমন।
শুনিতে শুনিতে সখি শ্যামের বাখান,
ভাবিতে ভাবিতে রূপ, অবশ পরাণ;
ভুলে যাই আপনারে শ্যাম ধ্যান, জ্ঞান,
রাধা, রাধা নাই, শ্যামে নিমজ্জিত প্রাণ।
সখিরে! কি হেরিছি রূপ সে মোহন!
নয়নে প্রথমে হেরি সার্থক জীবন।
সেরূপ জাহ্নবীজল, নেত্র-পরশন
পেয়ে, পাতকিনী হ'ল পাপবিমোচন।
হেরিয়াছি বররূপ সুন্দর কানাই,
মরিতে এখন সখি আর দুখ নাই।
সে মোহন শ্যামরূপ ভুবনের সার
দেখি জীবনের মূল্য মিলিল রাধার।
শ্যামরূপ সখি কিরে! এত প্রলোভন?
কতদিন হেরিয়াছি রূপ সে মোহন,
অন্তরের তৃষা তবু না হ'ল পূরণ;
আঁখিতে অঙ্কিত কেন নহে প্রিয়জন?
সখি রে!
একবার মাত্র হেরি কি, সে তৃপ্তি হয়?
নিরন্তর প্রিয় কেন আঁখি আগে নয়?
ভাগ্যবতী কমলিনী প্রেমনীরে ভাসি
শতদলে সদা ছাখে দীননাথে হাসি।
অভাগিনী রাধা, সখি! দিনান্ত যখন,
মনঃখেদে সারাদিন করিয়া যাপন,
যমুনায় অবগাহে, সন্ত্রাসে গোপনে,
ক্ষণকাল শ্যামরূপ হেরিল নয়নে;

আধ-চোখে আধ-দেখা আশা না মিটিল,
বরং পিপাসা তার দ্বিগুণ বাড়িল।
অতৃপ্ত-বাসনা, সখি! আমি অভাগিনী;
কেবল লাভের মধ্যে গঞ্জনাভাগিনী।
সখি রে রাধার দু'টি মানব-নয়ন,
বঁধুর অসীমরূপ সে দেব-মোহন।
সে সাগর-দিব্যরূপ, চষক নয়নে,
পান করি শেষ, সখি! কভু হয় ক্ষণে?
সখি! শ্যামরূপ হেরি নিতান্ত বিকল,
আবদ্ধ নয়নরূপে হ'য়ে অচঞ্চল।
চলৎ চরণ, শ্যামে হেরিলে অচল,
সেরূপ নেহারি মূঢ় ইন্দ্রিয় সকল।
কিংবা তীক্ষ্ণ গুপ্তদ্বার করি উদ্‌ঘাটন,
মোহিত হইয়া তারা করে বিলোকন।
আমিও বিহ্বল হ'য়ে রূপ করি ধ্যান,
অন্তরে বাহিরে শুধু সেইরূপ জ্ঞান।
অন্য জ্ঞান নাহি চিত্ত বৃত্তি শ্যামময়,
সেরূপ জাগ্রত শুধু—রাধা, রাধা নয়।

ক্ষে—

অহল্যা।

অবতরণিকা।

অহল্যার চরিত্রে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

কেন?

আজকালকার সমাজে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, নানা কারণে কলঙ্কিত। পবিত্র থাকিবার যে সমস্ত উপায় এখনও আছে, সেগুলি নানা কারণে লঙ্ঘন করা হইতেছে। যেখানে রিপুর প্রশ্রয় হয়—সেই সমস্ত কুসঙ্গ করাও হইবে, অথচ পবিত্রও থাকা যাইবে ইহা অসম্ভব। সেজন্য অনেকের জীবনে

অপবিত্রতার কার্য্য করা হইয়া গিয়াছে। রিপুর কার্য্য লইয়া কিন্তু মানুষ চিরদিন থাকিতে পারে না। যৌবনের বেগ কিছু ক্ষীণ হইলেই, মানুষ বুঝিতে পারে অপবিত্রতা ঘৃণার বস্তু। স্বামীকে গোপন করিয়া রিপুর প্রশ্রয়ে কোন কিছু করা, ঘোরতর অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মের ফলও অতি ভয়ানক।

যখন সংসারের ধাক্কা খাইয়া মানুষ কাতর হয়, হইয়া শ্রীভগবান্‌কেই এক মাত্র সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে চায়; এক কথায় যখন কুপথ ছাড়িয়া সুপথে ফিরিতে চায়, তখন তাহাকে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হয়। সে তখন অপবিত্রতার কার্য্য ছাড়িয়াছে সত্য সে তখন ঈশ্বর-উপাসনা করিতে চায় সত্য, সে তখন নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মরূপ ভগবৎ আজ্ঞা পালন করিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে সত্য কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করিবার সময়েও তাহার মন স্থির হইবে না; এক চিন্তা করিতে অন্য অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে, এক ভাবিতে আর ভাবিবে। এই ভাবে অধিকক্ষণ থাকিতেও পারিবে না। কাজেই তাহার চিত্ত স্থির হইবে না। নানা উপায়ে যেমন সংগীতের সাহায্যে বা ধর্ম্মবক্তৃতার সাহায্যে ক্ষণকালের জন্য ভগবৎরস আসিলেও যেমন ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির হইবে অমনি সব ভুলিয়া যেমন ছিল সেইরূপই থাকিবে। সরলভাবে যদি লোকে মনের কথা কয় তবে দেখা যায় অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এইরূপ।

ধর্ম্ম করিতে চাহিলেও ইহারা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য কর্ম্ম করে না বলিয়া ইহারা শান্তি পায় না। আবার যতদিন হৃদয়ের রাজাকে বুঝিতে না পারে, যতদিন তাঁহাতে নির্ভর করিতে না শিক্ষা করে, যতদিন তাঁহাকে অগ্রে স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে অগ্রে জানাইয়া মানসিক, বাচিক ও শারীরিক কর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করে—এক কথায় সর্ব্বকর্ম্ম সেই হৃদয়ের রাজাকে সমর্পণরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ না করে, ততদিন শুধু নৈতিক উপদেশ মত চলিতে গেলে তাহার পদে পদে পদস্খলন হয়। ফলে ঈশ্বরকে যে হৃদয়ে জাগাইতে না পারিয়াছে, সে ব্যক্তি শুধু উপদেশ বাক্য দিয়া চরিত্র গঠন করিতে কিছুতেই পারে না। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইলেও ইনি ধর্ম্মবক্তৃতা বেশ করিতে পারেন, লোককে উপদেশও বেশ দিতে পারিবেন: কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার চরিত্র অন্যরূপ হইবে। এরূপ ব্যক্তির

পোষাকী ও আটপৌরে চরিত্র থাকিবেই। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মজগতে স্থান হইতেই পারে না, কাজেই মনের শান্তিও থাকিতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতেই জীবন কাটে; প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে না। আবার যতদিন উন্নতি হইতেছে ইহা বুঝিতে না পারা যায় ততদিন কিছুতেই উৎসাহ থাকে না। অনুৎসাহে কর্ম্ম করিতে গেলে ভিতরে বহু বিষয়ে বিকৃতি ঘটে। কাজেই নানা প্রকার রোগও জন্মে। শেষে বড় দুঃখে এই জগৎ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়।

আমরা অহল্যাচরিত্রে অহল্যার পাপ কিরূপে হইয়াছিল দেখাইব। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু পাপ করিয়াও আবার পবিত্র কিরূপে হয় তাহা প্রদর্শন করা। এইটাই আধুনিক সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।

যে পাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা ত ঘটিয়াছে কিন্তু পাপের প্রতীকার কিরূপ এবং প্রতীকার করিয়া আবার পবিত্র হওয়া কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্যই অহল্যাচরিত্র অঙ্কন।

ধর্ম্মভাবের শিথিলতা ও শাস্ত্র প্রয়োজন।

১

ধর্ম্মভাবের শিথিলতা

যাহাদের সকল কর্ম্ম ধর্ম্ম-জড়িত, তাহাদের ধর্ম্ম-শিথিলতার কারণ কি?

(১) চার্ব্বাক মত প্রতিষ্ঠা—চার্ব্বাক মতটি এইরূপ। আচার অনুষ্ঠানের ক্লেশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ভাল লাগিবে তাহাই আহার করিবে। শুচি অশুচি মনের ভ্রম। মন শুচি থাকিলেই হইল। বিষ্ঠা ভাণ্ড ত সঙ্গেই আছে; তথাপি তুমি কাপড় ছাড়িয়া, স্নান করিয়া, কি আর শুচি হইবে? মল-ভাণ্ড ধুইলেই কি শুচি হয়? যোগ, উপবাস, ব্রত ইহাদের ক্লেশ কেন করিবে? যাহাতে সুখ পাও তাহাই কর। ক্ষণিক সুখ আবার কি? যতক্ষণ সুখ পাও তাহাই ভাল। নিত্য স্থায়ী সুখ নাই। চর্ম্মপাদুকা পায়ে দিয়া আহার করিতে কোন দোষ নাই। বিছানায় বসিয়া খাইতেও দোষ নাই। চর্ম্মপাদুকা

পায়ে দিয়া দেবতার স্থানে যাইতে কি দোষ? সাহেবেরা ত গির্জ্জাতেও চর্ম্ম-পাদুকা ত্যাগ করেন না, আহারকালেও ত্যাগ করেন না; তাঁহাদের কি ধর্ম্ম হয় না? শুচি অশুচি করিয়া তোমরা দাস জাতি; কিন্তু সাহেব-বিবিরা স্বাধীন জাতি। এই সমস্ত চার্ব্বাক-যুক্তি যখন প্রবল হয়,তখন প্রকৃত ধর্ম্মভাব শিথিল হয়।

(২) শাস্ত্রে অবিশ্বাস:—শাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারিলেই,চার্ব্বাকদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র কুসংস্কারে পূর্ণ। বেদ কৃষকের গান ইত্যাদি মতও চার্ব্বাক মত। শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা, যেমন;—জনক রাজা সীতাকে লাভ করিলেন অর্থাৎ জনক রাজা জমী চাষ করিলেন; এইরূপ ব্যাখ্যাও চার্ব্বাক মত। শাস্ত্রমত অনুষ্ঠান না করিয়া শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিলে, প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রালোচনা হইল না। তখন যথার্থ শাস্ত্রালোচনা বলবৎ সংস্কার লাভ হইল না। সংস্কার না থাকায় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল না।

তবেই হইল চার্ব্বাক—চারুবাক্য—মুর্খরোচক উপস্থিত ক্ষণিক সুখদায়ী বাক্য ও ব্যবহার প্রচার দ্বারা এবং যথার্থ ভাবে শাস্ত্রালোচনা না থাকা জন্য ধর্ম্মের শিথিলতা ঘটে।

যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করেন, সন্ধ্যা-বন্দনাদিও করেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেও চরিত্রগত কোন উন্নতি দেখা যায় না কেন?

ধর্ম্ম-কর্ম্ম দুই প্রকার (১) জ্ঞানপূর্ব্বক বা আত্মভাবনা পূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্ম করা; (২) জ্ঞান বা আত্মভাবনা ত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা। প্রথমটির ফল দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি। জ্ঞানপূর্ব্বকং দেবলোকাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তং প্রাপ্তি ফলম্। আত্মভাবনা না করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল পিতৃলোকপ্রাপ্তি। কেবল পিতৃলোকাদি প্রাপ্তি ফলম্।

শাস্ত্র বলেন—"যে ব্যক্তি আত্মভাবনা করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি করেন, তিনিই প্রশস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন। যিনি ফলকামনা পুরঃসর যজ্ঞাদি করেন, তিনি অপ্রশস্ত ধর্ম্মকর্ম্মকারী। তথাচ শাস্ত্রং আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজী ইত্যাদি। ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারাই সংসারে আসিতে হয়। কিন্তু যিনি পাপ ও পুণ্য উভয়ই করেন, তাঁহার কি হয়?

পাপ-পুণ্যের সমতা হইলে মনুষ্য-যোনি লাভ হয়। পাপ-পুণ্যের অল্পাধিক্যতা জন্য ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত জীব, স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাদি দোষপ্রভাবে পাপপুণ্যজনিত নাম রূপ ও কর্ম্মাশ্রয়রূপ সংসার-গতি লাভ করেন।

জীবের এই যে কর্ম্ম প্রবাহ ইহা কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

সৃষ্টি অনাদি। কর্ম্ম প্রবাহ এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও সূক্ষ্মরূপে ছিল। বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রকৃতিতে কার্য্য-কারণ প্রবাহও যেমন অনাদি ভয়াবহ সংসারও সেইরূপ অনাদি।

বহু দুঃখপূর্ণ সংসারে যাঁহারা বীতস্পৃহ, তাঁহাদের অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞান. সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমেই ভগবান্ ভাষ্যকার যাহা লিখিয়াছেন তদবলম্বনে ইহা লিখিত হইল।

২

শাস্ত্র প্রয়োজন।

শাস্ত্র কোন্‌টি ?

বেদই হিন্দুর শাস্ত্র। বেদই অন্য সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের মূল। যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্র নহে।

বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ?

পরমানন্দপ্রাপ্তি রূপ অভিলষিত ফললাভ এবং সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় জ্ঞাপন করাই বেদের উদ্দেশ্য।

সকল লোকেই ত ঐ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-নিবৃত্তি জন্য ব্যস্ত। ইহা ত সকল মনুষ্যের স্বাভাবিক। তবে আবার বেদের প্রয়োজন কি ?

দেহের ক্ষণিক ইষ্টলাভ বা অনিষ্ট পরিহারের উপায় যেমন প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যায়, স্থায়ী ইষ্টলাভ বা স্থায়ী অনিষ্ট পরিহারের উপায় কিন্তু সেরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যায় না। দেহাতিরিক্ত আত্মার ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহারে উপায় জন্য শাস্ত্র আবশ্যক। জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহারের যে ইচ্ছা হইবে, ইহা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে হয় না।

আত্মা আছেন, জন্মান্তরেও থাকিবেন, একথা ত চার্ব্বাকেরা স্বীকার করে না। জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহারের ইচ্ছা তাহাদের হইবে কেন? এই জন্যই ত অধিকাংশ লোকই দেহের সুখ লইয়া ব্যস্ত। এই জন্মেই সমস্ত ভোগ করিয়া লইতে হইবে—এই ধারণায় ত অধিকাংশ লোক কর্ম্ম করে।

চারুবাক্য যাহারা বলে তাহারা চার্ব্বাক। খাও দাও সুখে থাক। কোন কায়ক্লেশ করিবার আবশ্যক নাই। যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট আছে, তাহা করা উচিত নহে। এইরূপ মুখরোচক, উপস্থিত সুখসাধক বাক্যই সকল অজ্ঞানীরই ভাল লাগিবে।

সাধনা, তপস্যা ইত্যাদি বড়ই ক্লেশকর। সংযম অতিশয় ক্লেশজনক। উপস্থিত ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পরলোকে আত্মার হিত হইবে এই ভাবিয়া, ভোগত্যাগে রুচি অজ্ঞানের হইবে কিরূপে? পশু কি আহার মৈথুনাদির ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারে।

চার্ব্বাকগণ অজ্ঞানীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য মুখরোচক কথা কহিয়া থাকে; কিন্তু জন্মান্তর সম্বন্ধে আত্মার অস্তিত্ব এবং জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহার জন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অধিকাংশ লোকেরই পশ্বাদি সাধারণী বৃত্তি দেখা যায়। ইহাদিগকে শাস্ত্রবিশ্বাসী করিতে পারিলেই, চার্ব্বাক-ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয়। এতদ্ভিন্ন জগতে প্রকৃত কল্যাণ হয় না।

লোকান্তর কি আছে? চার্ব্বাক-মতের অনুসরণ করিয়া, বহু লোকেই এই সন্দেহ করে।

চার্ব্বাকেরা লোকান্তর মানে না; কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র বলেন, লোকান্তর আছে। জ্ঞান এবং পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম, মৃতব্যক্তির অনুগমন করে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহার সেইরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। আপন আপন কর্ম্ম জন্য কেহ মনুষ্য হয়, কেহ বৃক্ষাদিও হয়। পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা স্বর্গলাভ হয়—ইত্যাদি বাক্য শাস্ত্রে দেখা যায়। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

আত্মা যদি প্রত্যক্ষ বা অনুমানের গোচর হইতেন, তাহা হইলে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই বলিয়া গোল তুলিত না।

যাঁহারা দেহান্তর-সম্বন্ধী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই অন্য দেহে সম্ভব ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায় প্রাপ্তি জন্য শাস্ত্র অবলম্বন করেন।

সেই উপায় জ্ঞাপন জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড।

দেখিবার ব্যাকুলতা।

• সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি তুমি অন্তরেও আছ, বাহিরেও আছ; আবার নানা পুণ্য-স্থানে নানা তীর্থে তুমি বিশেষভাবে আছ। কত পুণ্যবান্ তোমায় দেখিয়াছেন। আজও কত সাধক তোমায় দেখিতে পান। আমিও বিশ্বাস করি তুমি আছ। কিন্তু আমিত সকল বিষয়েই অনুপযুক্ত। পুণ্যস্থানে গিয়া তোমায় উগ্রভাবে ডাকিয়া তোমার সাধনা করিবার আয়োজন করিতে ত পারি না। তুমি যে অবস্থায় আমায় রাখিয়াছ, যে সুবিধাগুলি আমার নিজের আয়ত্তে দিয়াছ শ্রীগুরু হইয়া যে সাধনা আমায় করিতে বলিতেছ আমি তাহার সাহায্যেই তোমাকে ডাকিতে প্রাণপণ করি। তুমি ত প্রতি চক্রে আছ। হৃদয় ত বৃন্দাবন, সহস্রার ত অযোধ্যামণ্ডল। বেদে এ কথা আছে। সর্ব্বশাস্ত্রেও আছে। হৃদয়-পুণ্ডরীকে কূটস্থ মধ্যে তুমি নিত্য আছ। আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একবার যদি তুমি কৃপা করিয়া দেখা দাও? এতে তোমার ভার কি! যাহা করিলে তোমার দেখা পাওয়া যায় আমাকে তাহাই করাইয়া একবার দেখা দাও না। আমি পরিশ্রম করিতে কাতর নই; আমি প্রাণপণ করাও গ্রাহ্য করি না। কত ত দেখিলাম, কতদিন সংসারে থাকিলাম; যা লইয়া উন্মত্ত হইতাম তাহার ঘোরও ভাঙ্গিয়াছে। তুমিই ভাঙ্গাইয়াছ। জীবন লইয়া কি করিব যদি তোমার দেখা না পাই। এ ভাব ত তুমিই জাগাইয়াছ। বিপদের উপর বিপদ দিয়া দেখাইয়া দিতেছ সংসারের সমস্তই ক্ষণিক—সবই দুদিনের জন্য। কিছুই থাকিবে না। কিছুই রাখিতে পারিব না। সবই মিথ্যা। একমাত্র তুমিই সত্য। অন্য সমস্তই মিথ্যা। ইহা তুমি বুঝাইয়া দিতেছ। এখন একবার দেখা দাও না। এই ত এত নিকটে আছ। এই ত হৃদপদ্মে আছ এই ত কূটস্থে অর্দ্ধনারীশ্বররূপে আছ। এই ত সহস্রারে পরমাশক্তির সহিত পরম শক্তিমান্‌রূপে মিলিয়া, বিন্দুস্থানে নাম রূপ গুণ সব ছাড়িয়া আপনস্বরূপে আপনি আপনি ভাবে আপন তুরীয় স্বভাবে আছ। আমার মধ্যে এত নিকটে আছ। একবার দেখা দিয়া, আমার বিশ্বাসকে আরও একটু প্রবল করিয়া দাও না। আমার প্রাণ যেন তোমাকে দেখিলে কত আপ্যায়িত হইবে। নিত্যক্রিয়া সারিয়া তোমার দেখা পাইবার জন্য যখন আমি অপেক্ষা করিয়া থাকি সে অপেক্ষাতেও আনন্দ পাই। না জানি তুমি আসিলে—না জানি সত্য

সত্য তোমায় দেখিলে আমার কি হইবে? কল্পনায় যখন ভাবি এই বুঝি তুমি আসিতেছ তখনই এত সুখ পাই কিন্তু তুমি ত শুধু কল্পনার বস্তু নও। তুমি যে সত্য সত্য আছ। সত্য সত্যই কত পুণ্যবান্ লোককে দেখা দাও। তুমি যে আপনিই বল "ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ" আমাকে যেরূপ করিলে ভক্ত করা যায় তাহা করিয়া কি একবার দেখা দিতে নাই? এক বার দেখা দাও না—যাহা করিলে তুমি দেখা দিতে পার তাহা করাইয়া দেখা দিয়া আমাকে তোমার করিয়া লও না? আর আমি কি বলিব। শুধু বিশ্বাসের ধর্ম্ম লইয়া থাকিতে থাকিতে কেন আমার তোমাকে দেখিবার বাসনা জাগে। নাম করি, রূপ চিন্তা করি, গুণ ভাবনা করি—তবুও যে আমার দেখিবার বাসনা জাগে তুমি একবার একটিবার দেখা দাও না? না জানি তুমি কত সুন্দর! তোমার ছবি দেখিয়া চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমায় চক্ষে দেখিলাম না—শুধু নাম শুনিয়া শূন্যে শূন্যে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার সহিত কথা কহিয়া আমার তৃপ্তি সম্পূর্ণ হইল না। আহা! যদি একবার দেখা দিতে? সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে না জানাইয়া কিছুই করিতে ভালবাসেন না—স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু ভাবিলে পাছে ব্যভিচার হয় সেই ভয়ে সতী স্ত্রী কায়িক বাচিক মানসিক সকল কর্ম্ম সকল ভাবনা যেমন স্বামীকে জানাইয়া করিতে চান—আমারও যে সেই সাধ হয়। —যদি তুমি একবার দেখা দাও তবে ত আমার সে সাধ পূর্ণ। আহা! তোমার রূপ শাস্ত্রে পড়িয়া, কল্পনায় ভাবিয়া এমন হই—না জানি তোমায় দেখিলে আমার কি হইবে? কবে দেখা দিবে? কখন দেখা কি দিবে? একবার দেখা দাও না? একবার উপযুক্ত করিয়া, দীন করিয়া দীনবন্ধু তুমি —তুমি এস না। তুমি যে কাঙ্গালের হরি। একবার কাঙ্গাল করিয়া হে হরি এস না। আমি আর ত বলিতে জানি না। আমি যে তোমারই। আমার যে আর কেহই নাই। আমার যে কেহই হইতে চায় না। কেহ আমার নাই হউক তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই—কিন্তু তুমি ত সকলের। তবে তুমি একবার আমায় দেখা দিয়া আমাকে তোমার দাস বা দাসী কর। হে প্রভু! হে দীনদয়াময়! হে কাঙ্গালের ঠাকুর!—হে মাতঃ একবার আমায় সেই প্রিয়দর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া দাও।

মা! তুমি প্রসন্ন হও। আমার আর বলিবার কিছুই নাই।

এই যে দেখিবার ব্যাকুলতা, ইহা একদিন মনে আনিতে পারিলেই যে হইবে তাহা নহে। এই ভাবকে স্থায়ী করিতে না পারা পর্য্যন্ত ধারণাভ্যাসী হওয়া হইল না। ধারণাভ্যাসী হইতে পারিলেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; কারণ ধারণাভ্যাসী যিনি তাঁহার দেহান্তে অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি হইবে। যদিও জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সদ্যোমুক্তি নাই, কিন্তু ধারণাভ্যাসীর সদ্যোমুক্তি না হইলেও ক্রম-মুক্তি হইবেই। ইঁহার আর পতন নাই; শেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উঠিয়া ইনি ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করিবেন। তবে যাহাতে প্রত্যহ ভাবের সহিত স্থায়ীভাবে পূর্ব্বোক্ত সাধনা করিতে পারা যায়, তজ্জন্য নিম্নলিখিত সাধনাই প্রশস্ত। তুমি দেখা দাও এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল রাখিয়া, জপকালে বা প্রাণায়ামকালে বা সন্ধ্যা-আহ্নিককালে নিত্য তিন বেলায় সাধনা করিতে হইবে। করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, তুমি দেখা দাও—তুমি ত আমার কূটস্থে আছ, আমার হৃদ্পদ্মে আছ, আমার সহস্রারে আছ—তুমি দেখা দাও—এই উৎকণ্ঠার সহিত জপ, প্রাণায়াম বা সন্ধ্যায় তাঁহাকে ডাকিলে রস পাওয়া যায়; লয় বিক্ষেপও দূর করা যায়।

এই ভাবে নিত্য ক্রিয়া নিত্য তিন বেলায় অভ্যাস কর, চিত্ত! তোমার মঙ্গল হইবে। নতুবা বৃথাই জীবনভার বহন।

তুমি ও সে।

এই সম্মুখে আমার উপাস্যের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি কি? এখানে তুমিই বা কে? সেই বা কে?

মূর্ত্তিটি তোমার উপাস্য বলিতেছ। মূর্ত্তিটি ত পটের ছবি অথবা দারুমূর্ত্তি বা ধাতু-প্রস্তরের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি তোমার উপাস্য নহে। যেমন পিতা বা মাতা বা স্বামী বা পুত্রকন্যার ফটোগ্রাফটি বা তৈলচিত্রটি ঐ ঐ ব্যক্তি নহে—কিন্তু ছবিটি দেখিয়া ঐ ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ হয় বলিয়াই ছবি তোমার প্রিয়; সেইরূপ উপাস্যের মূর্ত্তি দ্বারা উপাস্যকে স্মরণ করা যায় বলিয়া, উপাস্য মূর্ত্তিটি পূজার বস্তু।

কিন্তু উপাস্যের স্মরণ কিরূপ হয়? উপাস্যের রূপ, উপাস্যের গুণ, উপাস্যের কার্য্য স্মরণই উপাস্যকে স্মরণ। এইটি তটস্থ লক্ষণে উপাস্যকে স্মরণ করা। কিন্তু অন্য একপ্রকার স্মরণ আছে, তাহা স্বরূপ স্মরণ। এই স্বরূপ স্মরণে, উপাস্যবস্তুটি যে সর্ব্ববস্তুমধ্যে আছেন, এবং সমস্ত বস্তুই যে উপাস্য বস্তুমধ্যে আছেন তাহার ভাবনা করিতে হয়।

আমার উপাস্যই সর্ব্বত্র আছেন, আবার আমার উপাস্য বস্তু মধ্যে সর্ব্বপদার্থ আছে—ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভাবনা করিতে পারিলে, এবং ব্যাবহারিক জগতে ইহার ভুল না হইলেই ভক্তিমার্গে যাওয়া যায়।

কিন্তু জ্ঞানমার্গে আমার উপাস্য কিরূপে সর্ব্বব্যাপী, আমার উপাস্যমধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি জীব কিরূপে আছে তাহাই বুঝিতে হয়। এইটি বুঝিতে পারিলে, তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভাবটি ধারণা করা যায়। তাহাতেই রস আইসে, নতুবা শুধু বিশেষণগুলি জানিলে এবং মুখে উচ্চারণ করিলে প্রাণ শুষ্কই থাকে।

জগতে যত কিছু মূর্ত্ত পদার্থ আছে, তাহা সে আর তুমি একত্রে। [সে= চৈতন্য, পুরুষ আর তুমি=চৈতন্য দীপ্তা প্রকৃতি] রূপ, নাম ও গুণ তুমি দিতেছ, কিন্তু চৈতন্যটি সে। নাম রূপ ও গুণ এইগুলি প্রকৃতির, চৈতন্যটি পুরুষ। প্রকৃতির গুণ, প্রকৃতির কার্য্য তোমাতে আরোপ হইলে, তবে তুমি গুণবান্, রূপবান্, কর্ম্মী। তোমার চৈতন্য, প্রকৃতিতে পড়িলে তবে প্রকৃতি অচেতন হইয়াও চেতনের মত প্রতীত হয়েন। তুমি ও সে একত্রে মিলিলে, তবে জড়ের সৃষ্টি।

চৈতন্য সর্ব্বদা অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী হইলেও, প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড অংশে পড়িয়া খণ্ডমত অনুভূত হয়েন। মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য, তাহা খণ্ড-চৈতন্য মত। কিন্তু চৈতন্য যখন আপন স্বরূপে একাগ্র হয়েন, তখনই তিনি আপনার অখণ্ড স্বরূপে যাইতে পারেন। ঘটের মধ্যে যে আকাশ সে আকাশ যখন ঘটেই অভিমান করেন, তখন তিনি খণ্ড ঘটাকাশ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি ঘট অভিমান ত্যাগ করিয়া আপনার আকাশস্বরূপে তন্ময় হয়েন, তখনই খণ্ডই যে অখণ্ড তাহা অনুভব করেন।

তবেই হইল অভিমান থাকিলেই খণ্ড, অভিমান ছাড়িলেই অখণ্ডে স্থিতি। এই অভিমান ত্যাগ, জ্ঞানবিচার ভিন্ন হয় না। আবার জ্ঞান, ভক্তি ভিন্ন জন্মিতেই পারে না। শ্রুতি বলেন "ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাঽপি ন জায়তে"

ভক্তিশূন্য যে জ্ঞান, তাহা সাময়িক আভাস বা জ্ঞানের কল্পনা মাত্র। এ জ্ঞানে ব্যাবহারিক জগতে তোমার আটপৌরে চরিত্র ও পোষাকী চরিত্র থাকিবেই; কিন্তু ভক্তি পূর্ব্বক যে জ্ঞান সে জ্ঞানে বিষয়ে বৈরাগ্য অবশ্যই জন্মিবে।

বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার অনুরাগ আসিবেই। অন্য অভিলাষ ত্যাগ হইয়া যখন ভগবৎ-প্রাপ্তি অভিলাষ মাত্র তোমার রহিল, তখন ভক্তিজন্য ব্যাকুলতা, ভগবর্দ্দশন জন্য উৎকণ্ঠাস্ফুটিতচিত্ত হইবেই। ইহার পরেই ভগবৎ-কৃপা অনুভব হইবে। তখন অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক বিকার দেখা দিল। ইহার পরে বিচার আসিবে। তুমি কে, সে কে, এই বিচার মীমাংসা যখন স্থায়ীভাবে রহিল, তখনই তুমি জ্ঞানী। জ্ঞান আয়ত্ত হইয়া গেলেও নির্গুণ উপাসক যখন শ্রীভগবানের লীলা আস্বাদন করেন, তখনই হরি হইয়া হরি ভজন হয়। তুমি ও সে—ইহার ভিতরে এত। কর বুঝিবে।

কত রকম।

আমার এক আত্মীয়, মাতালের প্রতিজ্ঞাতে লিখিয়াছিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ খাওয়া ছাড়িলাম; কিন্তু শালার মাছি যে বোতলের ছিপিতে বসিয়া মদ টানিয়া খাইবে, তাকি সহ্য হয়? কখনই না। মদটা সব শেষ করিয়া ফেলি। প্রতিজ্ঞাটা না হয় এবার ভাঙ্গিল। মাছি বেটার জন্য প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ তাহাতে দোষ হইতে পারে না। এই রকম কি একটা লেখা ছিল।

মদ-মাতালের প্রতিজ্ঞা ত এইরূপে ভঙ্গ হইতেছে, কিন্তু "পিত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরাং উন্মত্তভূতং জগৎ"—যাহারা মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কত রকমই দেখা যায়।

সন্ধ্যাটি অবশ্য করণীয় প্রত্যহই। একটু জ্বর হইল অমনি সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে সন্ধ্যা বাদ পড়িতে লাগিল। বিচার আসিল কি—না তুমি শরীরটাকে সুস্থ রাখিলে না তা সন্ধ্যা আবার কি করিব? বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় কি সন্ধ্যা হয়? যেন রোজই বাবুর সন্ধ্যা হয়। এই এক রকম। অভিমান কি যেখানে

সেখানে হয়? অত্যন্ত ভালবাসা না থাকিলে কি অভিমান হয়?

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে। বলিতে হইবে, জননি! জন্মজন্মান্তরের পাতকরাশি আমাকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, কাজেই আমি তোমার কাছে যাইতে চাহিলেই ইহারা বাধা দেয়। আমি নানাবিধ যাতনায় ভুগিতেছি সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐত সন্ধ্যার সময় আসিল। তুমি একটু বল্ দাও। আমি এই সময়ে তোমাকে একটু ডাকি, পরে না হয় আপনার দুষ্কৃতিরাশির ফলভোগ করিব। এই আর এক রকম। শেষের রকমটিই ঠিক, আর প্রথম রকমটি মাতালের প্রতিজ্ঞা পাশ ফিরাইয়া লওয়া।

উৎসবের উন্নতি কল্পনা।

একটা দেহ কখন চিরদিন থাকে না। কিন্তু কোন কর্ম্ম যদি মঙ্গল উৎপাদন করে তবে সেই কর্ম্মটা যাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত চলে তাহা করা যাইতে পারে। কর্ম্মটা থাকিল। একটা লোকের অভাব হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন লোকে সেই কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে কর্ম্মটি অনেক দিন ধরিয়া চলিতে পারে।

এখন কথা হইতেছে উৎসব পত্র দ্বারা কি কোন মঙ্গল কর্ম্ম হইতেছে? উৎসব পত্র সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম প্রচার করা হইয়াছিল, তখন বলা হইয়াছিল,—ভগবান্ প্রসন্ন হও, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ইহা চলুক; আর তোমার ইচ্ছা না হয় ইহা বন্ধ হইয়া যাউক। এখনও মূলে তাহাই রহিল। ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া, ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু বহুজনের মধ্যে যে কর্ম্ম চলে, তাহাতে সকলের নিষ্কাম ভাব রাখা নিতান্ত কঠিন। কারণ সকল মনুষ্যের প্রকৃতি একরূপ নহে। সেই জন্য ফলাফলের একটু বিচার করা যাইতেছে। ভবিষ্যতে এই পত্রিকা যাঁহারা চালাইবেন তাঁহাদের জন্য।

উৎসবে কি কাহারও মঙ্গল হইতেছে, ইহাই প্রশ্ন। উৎসব সাড়ে ছয় বৎসর চলিতেছে। ইহার সমালোচনাও অনেক হইয়াছে। যাঁহারা ইহার প্রশংসা করেন না তাঁহারা বলেন বিষয়গুলি বড়ই কঠিন। এরূপ অপ্রশংসাবাদ,

বেশীলোকে করেন নাই! আর যাঁহারা প্রশংসা করেন, এমন কি কোন কোন্ স্ত্রীলোক পর্য্যন্তও লিখিয়াছেন—এই পত্রিকার প্রবন্ধ পাঠে নিরুদ্যম মন উদ্যমে পূর্ণ হয়; যাঁহারা কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন; আবার উকিলশ্রেণীর কেহ কেহ বলেন এই পত্রিকায় কাজের কথাই থাকে। ফলে অনেকেই ইহার দীর্ঘ জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহা উঠিয়া যাউক এই ইচ্ছা প্রশংসাবাদী ও অপ্রশংসাবাদী কেহই করেন না। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মানুষ চক্ষুলজ্জাতেও হয়ত উৎসবের আত্মজনের মুখের উপর খাতিরেও ইহার অপ্রশংসা না করিতে পারেন। কাজেই আমার কাছে হয়ত ইহার প্রশংসাই আসিয়াছে।

গত শ্রাবণের উৎসব পত্র খানির সমালোচনা করিয়াছেন "মেদিনীপুর হিতৈষী"। আরও ৩০ খানি মাসিক পত্রের সমালোচনা মেদিনীপুর হিতৈষী করিয়াছেন। অন্যান্য পত্রিকার সুখ্যাতিও ইনি করিয়াছেন; কিন্তু উৎসব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই পত্রিকার অন্য স্থানে দেওয়া হইয়াছে। (মতামতের বিজ্ঞাপন দেখুন) তদ্দৃষ্টে সকলেই বুঝিবেন ইহা দ্বারা সমাজের যে বিশেষ উপকার হইতেছে ইহাই যেন সমালোচকের অভিপ্রায়।

ধরা গেল ইহা দ্বারা সমাজের উপকার হইতেছে। কিন্তু কি উপায়ে এই পত্রিকাকে বহুদিন স্থায়ী করা যায়, তাহার জন্যই উপস্থিত প্রবন্ধ লেখা হইতেছে।

আমরা উৎসবের জন্য আর কি কি আয়োজন করিব পরে লিখিতেছি; কিন্তু প্রথমেই সকলের নিকট জানাইতেছি যাঁহারা উৎসবের উন্নতি সম্বন্ধে যে কোন সৎপরামর্শ দিবেন, আমরা সাদরে সেই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।

এখন উৎসবের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যাহা করিতে মানস করিয়াছি, তাহা এই:—

(১) উৎসবে একমাস ধরিয়া অভ্যাসের জন্য:—আমরা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি হইতে প্রতি মাসে কতকগুলি শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দিতে থাকিব। ইহা অভ্যাস করিলে জ্ঞানবিচার ও ভাব লইয়া সর্ব্বদা থাকিবার সুবিধা হইবে।

(২) উৎসবে ভাল কথা। স্বাধ্যায়ও যখন সাধনার অঙ্গ, তখন উৎসবের লেখক ও গ্রাহকগণের স্বাধ্যায় করা আবশ্যক। আমরা যে শাস্ত্রে যাহা ভাল কথা পাইব,—জ্ঞানের কথাই হউক বা ভাবের কথাই হউক, তাহা কতক কতক করিয়া যেমনভাবে শাস্ত্রে পাওয়া যাইবে, সেইরূপ ভাবেই প্রতিসংখ্যার প্রথমেই প্রকাশ করিব। এই শাস্ত্র-উপদেশের সহিত আমাদের নিজের মন্তব্য কিছুই থাকিবে না। যদি কোন জ্ঞানের কথা নিতান্ত কঠিন হয়,অথবা কোন ভাব আস্বাদন করা দুরূহ হয়, তখন স্বতন্ত্রভাবে যে যেরূপে বুঝিয়াছি তাহা উল্লেখ করা যাইবে। এই বিষয়ে উৎসবের সমস্ত গ্রাহককে আমারা আহ্বান করিতেছি। যিনি যে শাস্ত্র পাঠ করিয়া শাস্ত্রের যেরূপ উপদেশ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, তাহাই আমরা অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ করিব। কিন্তু কোন্ শাস্ত্র হইতে উপদেশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে। বলিতে হইবে না ইহাতে উৎসবের গ্রাহকদিগের মধ্যে পরস্পর পরস্পারের মধ্যে জ্ঞান ও ভাবের বিনিময় হইতে থাকিবে এবং সকলেরই একটা শাস্ত্রচর্চ্চার উপরে আগ্রহ জন্মিবে। ইহা দ্বারা সাধনার উন্নতি হইবেই।

(৩) উৎসবে চরিত্র। শাস্ত্রপাঠ করিতে করিতে যে সমস্ত চরিত্র আদর্শস্থানীয়, যে সমস্ত চরিত্র অবলম্বন করিলে নিজের চরিত্র-দোষ নষ্ট করা যায়; নিজের শোকের শান্তি হয়; অন্যেরও হইতে পারে; যে চরিত্রের কথা ভাবনা করিলে নিজের লয়-বিক্ষেপ দূর হয়, অন্যেরও হইতে পারে—সেই সমস্ত চরিত্র অঙ্কন। এ বিষয়েও আমরা সমস্ত গ্রাহকদিগকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা নিজে চরিত্র-অঙ্কনে অসুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা শাস্ত্রে যেরূপ পাইবেন সেই-রূপেই চরিত্রটি লিখিয়া পাঠাইলে, আমরাও সেই সেই চরিত্রকে শাস্ত্রমত আরও প্রতিফলিত করিয়া উৎসবে প্রকাশ করিব। এখানেও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আজকার লেখকের কাল্পনিক চরিত্র আমরা গ্রহণ করিব না। ঋষিগণ যে সমস্ত চরিত্র জীবশিক্ষার জন্য শাস্ত্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই সমস্ত চরিত্রেরই আদর করিব। এখানেও যে শাস্ত্র হইতে চরিত্রটি লওয়া হইল, তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে।

(৪) উৎসবে শ্রীভাগবৎ। উৎসব পত্রিকায় ভারত সমর ২য় খণ্ড, কৈকেয়ী, ভদ্রা, মনোনিবৃত্তি, যোগবাশিষ্ঠের বৈরাগ্য প্রকরণ ওমুমুক্ষু প্রকরণ,

গীতামাহাত্ম্য এই পুস্তকগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত সময়ে ঋগ্বেদ সংহিতা, মাণ্ডূক্য উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, শ্রীগীতার শব্দ ও শ্লোক নির্ঘণ্ট এই পুস্তকগুলি চলিতেছে। মাণ্ডূক্য অনেক দিন হইল লেখা হইতেছে না, শীঘ্র হইবে। ইহার উপরে আমরা আর দুই খানি পুস্তকও আরম্ভ করিব। নূতন পুস্তকের প্রথমখানি শ্রীমৎ ভাগবৎ। যে ভাবে শ্রীগীতা বাহির হইয়াছে, সে ভাবে ইহা বাহির হইবে না। ভারত-সমর, যোগ-বাশিষ্ঠ ইত্যাদি পুস্তকের মত শ্রীভাগবৎ বাহির হইবে। ইহাতে মূল শ্লোকের বা স্তবাদির সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত অংশ থাকিবে। কঠিন শ্লোক প্রশ্ন-উত্তর ভাবে লেখা হইবে। ভাগবতের চরিত্রগুলি উপন্যাস-আকারে বাহির হইবে। এই পুস্তক উৎসবে এরূপভাবে বাহির হইবে যাহাতে ভাগবতের ভাব পাঠকের বিশেষরূপে জানা হইয়া যায়। ফলে এই পুস্তক পাঠে ভাগবতের সমস্ত বিষয়ই স্থূলভাবে এবং সাধনার কার্য্যগুলি বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে ও অন্য অন্য পুরাণে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহাও বর্ণিত হইবে।

(৫) উৎসবে আবার গীতা। শ্রীগীতা ৭ম অধ্যায়ের কতক পর্য্যন্ত উৎসবে বাহির হইয়াছিল। এখন শ্রীগীতা স্বতন্ত্রভাবে ১৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। শ্রীগীতার গ্রাহকেরা ১৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। শীঘ্রই বাকী অধ্যায়গুলি যাহাতে পান তাহার চেষ্টা করা হইবে। ৺কাশীধামের পূজনীয় স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস পূর্ব্বে বহু অসমর্থ গ্রাহকের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে জানাইয়া ছিলেন, তোমার গীতা বাহির হইয়া গেলে তুমি যে পর্য্যন্ত উৎসবে গীতা বাহির হইয়াছিল তাহার পর হইতে ইহা আবার উৎসবে বাহির করিতে থাক। সেই অঙ্গীকার মত কার্য্য করিবার সময় এখন আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণের সুবিধা অসুবিধা একটু বিচার করা আবশ্যক।

যাহারা শ্রীগীতা সম্পূর্ণ লইয়াছেন অথচ উৎসবেরও গ্রাহক, তাঁহারা কেহ কেহ উৎসবে পুনরায় গীতা দিতে আপত্তি করিতে পারেন। বলিতে পারেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন লাভ নাই। তাঁহাদিগের নিকটে আমার আবেদন এই, তাঁহারা একখানি গীতা ত পাইয়াছেন; না হয় আর একখানি বেশী পাইলেন।

পুরাতন গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে আরও বক্তব্য এই যে, পুস্তক খানি বিশেষরূপে পাঠ করাই সকলের প্রয়োজন। শ্রীগীতার প্রতি শ্লোকটিই আবশ্যকীয়। সমগ্র পুস্তক এক সঙ্গে পড়ার অবকাশ সকলের না হইতেও পারে, কিন্তু উৎসব পত্রিকা মধ্যে প্রতি মাসে অল্প করিয়া যাহা বাহির হইবে, উৎসব পাঠের সঙ্গে তাহা পড়িয়া ফেলিতে পারিলে কোন ক্লেশ হইবে না; বরং ভালই হইবে। এক মাসের কাগজে গীতার যতটুকু থাকে তাহা পড়িয়া, তন্মধ্যে করণীয় সাধনা যেটুকু থাকে তাহা যদি পুনরায় পাঠ করা যায়, এবং সেই মত কার্য্য করিতে প্রাণপণ করা হয়, তাহা হইলে পুস্তকপাঠের যথার্থ ফল ভাল হয়, ইহাই আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা। পুরাতন গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে আর অধিক কি বলা যাইবে? তবে ইহাও বলা যায়, সমগ্র গীতার মূল্য ১২৸০। এই মূল্য দিয়া সকলে গীতা ক্রয় করিতে পারিবেন না; কিন্তু উৎসবে বাহির হইলে, বৎসরে ১৷৷০ মাত্র দিয়া অসমর্থ গ্রাহকেও ইহা পাইতে থাকিলেন। পূর্ব্বে অনেকেই বলিয়াছেন, এত অল্প করিয়া উৎসবে গীতা বাহির করিলে কতদিনে বাহির হইবে? ততদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য্যও গীতা-পাঠকের থাকিবে না। এখন কিন্তু আর কাহারও সে কথা বলিবার উপায় নাই। সমগ্র পুস্তক ত বাহির হইয়া গিয়াছে; যাঁহারা অপেক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা একসঙ্গে সমস্ত পুস্তক ক্রয় করুন। যাহারা তাহা পারেন না, তাঁহারা উৎসব-প্রকাশিত অল্প অল্প অংশ পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকুন, এবং ঐ অল্প অংশের সাধনা করিতে থাকুন ইহাতেও বিলক্ষণ উপকার আছে। নূতন গ্রাহক এখন হইতে যাঁহারা হইবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য ৭ম অধ্যায়ের প্রথম হইতেই গীতা ছাপিতে থাকিব। ইঁহাদিগকে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতার প্রথম ষট্‌ক টুকু কিনিয়া লইতে হইবে। সুন্দর মলাটে বাঁধান এই খণ্ডের মূল্য ৪৷০। আর আবাঁধা যদি লইতে চাহেন তাহা হইলে ৪৲ টাকায় তাঁহারা পাইবেন। বাকী গীতা উৎসবেই পাইতে থাকিবেন।

(৬) উৎসবের অন্যান্য প্রবন্ধ। উৎসবে পূর্ব্বে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল এখনও সেইরূপ বাহির হইবে সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকগুলিও থাকিবে। এবং হিন্দুধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা যেখানে

তাহারও সমালোচনা অবসর মত দেওয়া যাইবে। ভাল ভাল পুস্তকের সমালোচনাও যাঁহারা করিবেন তাহাও উৎসবে দেওয়া যাইবে।

(৭) উৎসবে গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রই (ব্রাহ্মণের পক্ষে) সকল মন্ত্রের সার। ইহা বুঝিবার জন্য যেখানে যাহা পাওয়া যাইবে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উৎসবে ইহার আলোচনা চলিবে।

(৮) উৎসবের আকার। উৎসব পত্র ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতগুলি পুস্তক থাকিবে ও প্রবন্ধ থাকিবে অথচ ৪০ পৃষ্ঠা যদি রাখা যায় তাহা হইলে অতি অল্প অংশই বাহির হওয়া সম্ভব। অথচ পুস্তক যাহা বাহির হইবে তাহা ৪ পৃষ্ঠার কম বাহির করিলে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির করা যায় না। কারণ আধ ফর্ম্মার কম হইলে পুস্তকাকারেও বাঁধান যাইবে না এবং ছাপার গোলযোগও হইবে। সেই জন্য যদি উৎসবের আকার বাড়ান না যায়, তবে এক সংখ্যায় তিনখানি পুস্তক থাকায় পরের সংখ্যায় আবার অন্য কয়েক খানি থাকিল এরূপ ভাবে চলিতে পারে। আর উৎসবের আকার বর্দ্ধিত করা যায় তাহা হইলে চলিতে পারে।

(৯) আকার বৃদ্ধিতে মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত কি না—বলিতে হইবে না যে আকার বৃদ্ধিতে উৎসবের খরচ বৃদ্ধি হইবে। এখন পর্য্যন্ত উৎসবের খরচ যতদূর সংক্ষেপ করা সম্ভব তাহাতেই চলিতেছে। কার্য্যনির্ব্বাহক যিনি আছেন তাঁহার অতিরিক্ত পরিশ্রমেই ইহা চলিতেছে। যদিও একটি অফিস আছে কিন্তু অন্য লোক রাখিবার অর্থ উৎসবের নাই। ইহার উপরে আবার কাগজের আকার বৃদ্ধি করিলে ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করিলেও, অসমর্থ গ্রাহকদিগের বিশেষ অসুবিধা। ইহা নিবারণ জন্য, উৎসবের গ্রাহকসংখ্যা অন্তত ২,০০০ দুই হাজার হওয়া উচিত। এখন দেখা যায়, বৎসরের শেষে উৎসবের গ্রাহক ১,০০০ বা কিছু কম বা বেশী হয়, আবার বৎসরের প্রথমে ভি, পি, করিয়া দাম আদায় করিবার সময় ৭৫০।৮০০ হইয়া যায়। আবার বৎসর ধরিয়া ঐ ১০০০ বা কিছু বেশী কম হইতে থাকে।

উৎসব এই ভাবে চলিতেছে। আমরা গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি জন্য দুই এক স্থানে বিজ্ঞাপন দিতেছি এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেও বিজ্ঞাপন বিলি করিবার ব্যবস্থা রাখিব। কিন্তু ইহাতেই যে গ্রাহকসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি হইবে, সে

বিষয়ে আমাদের সন্দেহ। ইহার জন্য আমরা উৎসবের গ্রাহক মহাশয়গণকেও সাহায্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। পূর্ব্বে গ্রাহকদিগের চেষ্টায়, উৎসব উপস্থিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে; এখন আবার নূতন উদ্যমে তাঁহারা যদি ইহার প্রচারের চেষ্টা করেন, তবে সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে স্বচ্ছন্দে ২০০০।২৫০০ গ্রাহক যে হইতে পারে না তাহা আমরা মনে করি না। এজন্য সকলের নিকটে আমরা সানুনয় নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা এতৎকল্পে একটু চেষ্টা করিয়া আমাদিগের এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করুন। ইহা না হইলে কিছুতেই সুবিধা হইবে না। এ সম্বন্ধেও যিনি যাহা বলিবেন তাহা আমরা গ্রহণ করিব। যিনি পাঁচজন গ্রাহক করিবেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে একখানি উৎসব বিনামূল্যে পাইবেন।

আমাদের যাহা বলিবার কথা বলিলাম; এক্ষণে যাঁহারা উৎসবের অনুগ্রাহক তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আমরা এই আশ্বিন মাস হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিব। ভাদ্র মাসের কাগজে উৎসবের উন্নতি-কল্পনা পড়িয়া, যাঁহার যাহা বলিবার আছে সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন।

শেষ নিবেদন, এই বৎসর কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ৺পূজা। আমরা আশ্বিন ও কার্ত্তিকের কাগজ একসঙ্গে বাহির করিব। ঐ কাগজে ভাল কথা, শ্রীভাগবত, গায়ত্রী, চরিত্র, গীতা প্রভৃতি কতক কতক দিব। অন্য অন্য বিষয় যেমন চলিতেছে তাহাও থাকিবে। এই সংখ্যা দেখিলেই, সকলে বেশ বুঝিতে পারিবেন ভবিষ্যতে উৎসব কিরূপ চলিবে।

উৎসবের অনুগ্রাহক মহাশয়গণ এই কার্য্যে সত্বর হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সঙ্কল্প ত্যাগ করাই সর্ব্বোচ্চ সাধকের কার্য্য। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ সাধক এখনও হইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র শুভ সঙ্কল্প করিতেই বলেন। যদি আমাদের এই সঙ্কল্প শুভ হয়, তবে শ্রীভগবান্‌কেও ইহা জানাইয়া রাখিলাম। সর্ব্ব সঙ্কল্প তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করাই নিষ্কাম কর্ম্ম করা। যদি শুভ হয় তিনি সহায় হউন; যদি অশুভ হয় ইহা ধ্বংস হউক,—ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

পূজা।

এস এস নারায়ণ, শিবের সেবিত ধন,
এস মনোময় রাজ্যে মানস-মোহন।
চন্দন সুরভিময়, কুসুম তুলসীচয়,
এ দিয়া কি করিব হে পূজা আয়োজন?
তুলসী, চন্দনে মাখি, নয়ন মুদিয়া ডাকি,
এ তোমার বড় প্রিয় করহে গ্রহণ।
কভু থাকি জড়-প্রায়, কখন ভাসিয়া যায়
কভু হাসি, কভু চক্ষে বহে প্রস্রবণ।
কভু দিতে অর্ঘ্য-ফুল, হ'য়ে যায় বড় ভুল,
খুঁজিয়া না পাই গুরো! ও চরণ-মূল।
যে অঙ্গ যখন হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
অথবা জানিনা তুমি সূক্ষ্ম কিম্বা স্থূল।
যত করি আয়োজন, তবুও ওঠেনা মন,
কি জানি কি অঙ্গহীন হয় নারায়ণ।
নতুবা কি দয়াময়, তব চিত্ত স্থির রয়,
নিজ-কৃত কর্ম্মে প্রভু! ভুগি অনুক্ষণ।
দেহস্থ পৃথিবী-অংশে, গন্ধরূপে অবশেষে,
এ দিয়া কি করিব হে তব আরাধন?
ব্যোমরূপে পুষ্প যাহা, চরণে অর্পিব তাহা,
যং রং ধূপ দীপ করি সমর্পণ।
বং বীজাত্মকে নাথ, নৈবেদ্য সাজাব আজ?
তা'হোলে আসিয়া তুমি করিবে গ্রহণ।
হাসি আসে কান্না পায়, তোমারে কি দিব হায়!
তৈজস-সমষ্টি সব তুমি জনার্দ্দন।
তোমার ইঙ্গিতে ধায়, মহাভূত প্রাণ পায়,

চুম্বক নিকটে প্রভু লৌহের মতন।
চারি চক্ষু সম্মিলনে, দেখি রূপ এক মনে,
নাভিচক্রে শত শত কমল বিকাশ।
কমল-কর্ণিকা মাঝে, যেন কোটী শশী রাজে,
রং বীজাত্মক রূপে তুমি শ্রীনিবাস।
ঋতু পক্ষ মাস বর্ষ, জরা মৃত্যু শোক হর্ষ,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আর কিছু নাই।
শূন্য ব্যোম সমুদয়, তোমাতে মিশায়ে রয়,
ক্ষুদ্র আমি এ আমিত্ব মুহূর্ত্তে হারাই।
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হ'তে, পড়ি যেন আচম্বিতে,
রোগ শোক জরা জন্ম, মৃত্যু হাহাকার,
আবার আবার নাথ, দেখি সব পূর্ব্ব-মত,
আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, সেই অহঙ্কার।
আর্ত্ত আমি জগন্নাথ, তুমি দীনজনা তাত,
রক্ষা কর দীনবন্ধু! অধম জনার।
অন্তিমে স্মরণ রেখ, দেখ যেন ভুলোনাক,
বসো বসো জ্ঞানময়! মম রসনায়।
শিব শিব, রাম রাম, বলি যেন অবিরাম,
অলক্ষিতে দুটি পদ দিওগো মাথায়।
স্নিগ্ধ পদতলে পড়ি, আরাম লভিব হরি,
চিরতরে পদতলে রাখিও আমায়।

রা......

সীতোবাচ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥ ৩২॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥ ৩৩॥
মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা॥ ৩৪॥
তৎসান্নিধ্যান্ময়াসৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ॥ ৩৫॥

মহাদেব—জগৎ গম ধাতু ক্বিপ্ করিয়া হইয়াছে। সর্ব্বদাই যে চলিতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অবস্থান্তরিত হইতেছে, তাহাই জগৎ। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতির নাম পরিবর্ত্তন। গতি এই জগৎ। আত্মাই স্থিতি।

স্থিতি আছে তাই গতি। মন যে সর্ব্বদাই স্পন্দন করে চিত্তস্পন্দন কল্পনা তুলে, তাহা মনের সত্তা আত্মা আছেন বলিয়া। গতিটি ইন্দ্রজাল, আত্মাটিই তত্ত্ব। তিনিই শ্রীরাম। তিনি কিছুই করেন না। তিনি আছেন বলিয়া প্রকৃতির বিচিত্র তাণ্ডব হইতেছে।

সংসারে যাহারা বিমূঢ়চিত্ত এবং যাহাদের মন স্বপ্নবৎ আপন অন্তরে ভাসমান অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহারা এই রামতত্ত্ব জানে না। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ মায়ারহিত আত্মদেব শ্রীরামচন্দ্রে মূঢ়গণ আপন অজ্ঞানটি আরোপ করে অর্থাৎ লোকে যেমন পুত্রাদি বিয়োগে বিকল হয়, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রও সীতা বিয়োগে বিকল হইয়াছিলেন ইহা বলে॥ ১৯॥

পার্ব্বতী—আত্মা কিছুই করেন না, প্রকৃতিই সমস্ত করেন। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্যগুলি আত্মাতে আরোপ হয়। এ আরোপ হয় কিরূপে?

মহাদেব—ভ্রমজ্ঞানেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। আত্মতত্ত্ব না জানাই ভ্রম। এই ভ্রমজন্যই আমি করি, আমি দেখি ইত্যাদি ভ্রমের সৃষ্টি। ফলে আত্মা কিছুই করেন না।

এইরূপ পুরুষ, স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া, ভূরিযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া বারম্বার জননমরণরূপ সংসারই প্রাপ্ত হয়। হৃদয়াস্থিত এই রত্নকে ইহারা জানে না।

নির্দ্দোষ রঘুর বংশে, জন্ম বৎস! অযোধ্যানগরে।
বিশ্বামিত্র সঙ্গ লাভ, গতি তাঁর যজ্ঞ রক্ষা তরে ॥৩৬॥
অহল্যা শাপ মোচন, ধনুর্ভঙ্গ, পরে মহেশের।
আমারে বিবাহ, পথে গর্ব্বচূর্ণ, পরশুরামের ॥৩৭॥
অযোধ্যানগরে বাস, আমা সহ, দ্বাদশ বৎসর।
দণ্ডকবন গমন, বিরাধের বধ অতঃপর ॥৩৮॥
মায়ামৃগ বধ আর, ছায়াসীতা পশ্চাৎ হরণ।
জটায়ুর মোক্ষলাভ, কবন্ধের রক্ষত্ব মোচন ॥৩৯॥
শবরী পূজা গ্রহণ, অতঃপর, সুগ্রীব মিলন।
বালীবধ তারপর, তার পর, সীতা অন্বেষণ ॥৪০॥

আনন্দম্ = তত্ত্বেন বিপুলত্বমুপলক্ষ্যতে। যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। ইতি শ্রুতেঃ। নির্ম্মলম্ = রজোহীনম্।

শান্তম্ = প্রপঞ্চোপশমত্বাৎ। প্রপঞ্চোপশমং শিবম্ শান্তম্। ইতি শ্রুতেঃ। নির্ব্বিকারম্ জায়তেঽস্তিবর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে নশ্যতীতি ষড়্ভাব বিকার-হীনম্। ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি গীতোক্তেঃ। অনেনাপরিণামিত্বং সূচিতম্। নিরঞ্জনম্ = অবিদ্যাতৎকার্য্যরূপ তমোহীনম্। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। ইত্যুক্তেঃ। সর্ব্বব্যাপিত্বাদেবাত্মানম্ অততিব্যাপ্নোতীত্যাত্মা। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি শ্রুতেঃ। সপ্রকাশম্ = অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিরিতি। যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ইতি শ্রুতেঃ। অকল্মষম্ = আত্মাপহত পাপ্মা। ইতি-শ্রুতেঃ। সৎআদিশব্দানাং কল্পিতপ্রবৃত্তিনিমিত্ত ভেদাদিহপর্য্যায়ত্বেনসহ-প্রয়োগঃ। যানিত্বভাবমুখেন বোধকানি তেষু ন কাপ্যনুপপত্তিঃ। এবং চাপাততঃ কল্পিতপ্রবৃত্তিনিমিত্ত প্রকারকবোধে বৃত্তে শুদ্ধচিত্তস্য শ্রুতৌ সর্ব্বধর্ম্মরহিতত্বেন ব্রহ্মোক্তয়া ধর্ম্মাংশে কল্পিতত্বগ্রহে শুদ্ধনির্ধর্ম্মক ব্রহ্মবোধঃ সর্ব্বৈঃ পদৈর্ভবতীতি বোধ্যম্। তত্রদুর্ব্বোধস্যাত্মতত্ত্বস্য বোধার্থং পুনঃ পুনঃ শব্দতোঽর্থতশ্চ পরমকরুণাবতী সীতা হনূমতে বোধয়ামাসেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৩ ॥

নন্বেবংবিধো রামশ্চেজ্জগৎ কারণত্বাদ্যসংভবঃ তস্মিন্নিতি কুতো জগদুৎ-পত্ত্যাদীত্যত আহ। মামিতি ॥

অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেঽতিনির্ম্মলে।
বিশ্বামিত্র সহায়ত্বং মখসংরক্ষণং ততঃ ॥৩৬॥
অহল্যাশাপশমনং চাপভঙ্গোমহেশিতুঃ।
মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাৎ ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ ॥৩৭॥
অযোধ্যানগরে বাসো ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধ বধ এব চ ॥৩৮॥
মায়ামারীচমরণং মায়াসীতাহৃতিস্তথা।
জটায়ুষো মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্য তথৈব চ ॥৩৯॥
শবর্য্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ সুগ্রীবেণ সমাগমঃ।
বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ সীতান্বেষণমেব চ ॥৪০॥

কণ্ঠে সুবর্ণের হার রহিয়াছে কিন্তু ভ্রান্ত লোকে বাহিরে যেরূপ তাহার অনুসন্ধান করে সেই রূপ ॥ ২০ ॥

২১। আর যেমন সূর্য্যে অপ্রকাশ [অন্ধকার] কিছুতেই সম্ভব হয় না সেইরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বর [শ্রীরামচন্দ্রে] অবিদ্যা কিরূপে সম্ভব হইবে ? [কারণ অবিদ্যাপারে যে অক্ষর তাহারও পরে রামতত্ত্বের জ্ঞান।

২২। যে পুরুষের চক্ষের দোষ ঘটিয়াছে সেই পুরুষের ঘূর্ণমান চক্ষে গৃহাদি ঘুরিতেছে এইরূপ দর্শন হয় [বাস্তবিক কিন্তু গৃহাদি ঘূর্ণিত হয় না] সেইরূপ নষ্টদৃষ্টি অজ্ঞ পুরুষ আপন দেহ ইন্দ্রিয় অহংকারাদি কৃত কর্ম্ম সমূহকে, দেহ ইন্দ্রিয়াদি অসংস্পৃষ্ট আত্মাতে আরোপ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হয়।

২৩। যেমন প্রকাশটি যদি সর্ব্বদা থাকে তবে সূর্য্য সম্বন্ধে দিন এবং রাত্রির বিভাগ কখনও সম্ভব হয় না সেইরূপ শুদ্ধ চিদ্ঘণ শ্রীরামে জ্ঞান ও অজ্ঞান এই বিভাগ থাকিবে কিরূপে ?

২৪। সেই কারণে পরমানন্দময় বিজ্ঞানরূপ এবং অজ্ঞানের সাক্ষী কমলের ন্যায় বিশাললোচন শ্রীরামচন্দ্রে কখনও অজ্ঞান থাকিতে পারে না। উনি আপনিই মায়ার আশ্রয় এজন্য উঁহাতে মোহকারণ কিছুই থাকিতে পারে না। বাজীকর ইন্দ্রজাল দেখায় উহাকে উহার মায়া মোহযুক্ত করিতে পারে না।

সাগরে সেতু বন্ধন, অতঃপর, লঙ্কাবরোধন।
সংবশে রাবণে যুদ্ধে, বধ করি, ভূভার হরণ ॥৪১॥
বিভীষণে রাজ্যদান, আমা সহ রথ আরোহণে
অযোধ্যায় আগমন, পরে দোঁহে, বসি সিংহাসনে ॥৪২॥
ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্ম, করিলেও আমি আচরণ।
নির্ব্বিকার পরিপূর্ণ আত্মারামে, করে আরোপণ ॥৪৩॥
গতি স্থিতি শোক রাম না করেন কভু,
ত্যাগ বা গ্রহণ কিছু না করেন প্রভু।
পরিণামহীন শান্ত আনন্দ মূরতি
যেমন ভাসান মায়া ভাসেন তেমতি ॥৪৪॥

৩৪। মূলপ্রকৃতিং সর্ব্বজগদুপাদানকারণমিত্যর্থঃ। প্রকৃতিশব্দস্যোপাদানকারণে প্রসিদ্ধেঃ। তত্তদুপাদানকারণানাং মহদাদীনামপ্যুপাদানকারণত্বান্মূলপ্রকৃতিত্বমস্যাঃ। মাং=মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধাং ব্রহ্মণ্যধ্যস্তাং ততো ভেদাভেদাভ্যাং সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং চ অনির্ব্বচনীয়ামনাদিমৈশ্বরীং মায়াম্। ঐশ্বরীত্বং চাস্যা ঈশ্বরস্বরূপাজ্ঞানরূপত্বেনেতি বোধ্যম্। এষাচ জীবাশ্রিতৈবেশ্বরসন্নিধানাত্তদ্রূপেণ বিবর্ত্ততে ইতি বোধ্যম্। মূলপ্রকৃতিত্বমেবস্ফুটয়তি সর্গস্থিত্যন্তকারিণীমিতি। উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রীম্। নন্বেবং। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়। ইতি শ্রুতেঃ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।

যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। ইতি ব্রহ্মপ্রকরণস্থ শ্রুতেশ্চ—

ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বং লভ্যতে তদ্বিরুদ্ধোতেত্যত্রাহ। তস্যা সন্নিধীতি। যথেন্দ্রজালিকমায়াশক্তেঃ তত্তন্মন্ত্রনিষ্ঠায়া ঐন্দ্রজালিকং বিনা ন স্বকার্য্যসামর্থ্যং তথা স্যাঃ শক্তেস্তৎসন্নিধানেনৈব জগৎস্রষ্টৃত্বমিতি তত্রতদুপচারঃ। যথা গৃহিণী বৈশিষ্ট্যেনৈব সিদ্ধস্বরূপস্য গৃহস্থস্য স্বসম্বন্ধজসঙ্কল্পবশবর্ত্তিনী গৃহিণী তথা মায়া বৈশিষ্ট্যেনৈব সিদ্ধস্যেশ্বরস্যস্বসংগজতৎসংকল্পবশবর্ত্তিন্যহমিত্যাহ। অতিন্দ্রিতা তৎসঙ্কল্পিতেঽর্থে নিরালস্যেত্যর্থঃ। তদুক্তং বাল্মীকিয়ে রামং প্রতি কালবচনেন।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল আশ্বিন, কার্ত্তিক। [৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

অর্থচিন্তা ও ভাব-স্মরণ--নিত্য অভ্যাস জন্য।

[প্রতিমাসেই এইরূপ করিবার শুভ সঙ্কল্প করা হইতেছে। এক মাস ধরিয়া প্রত্যহ অর্থ ও ভাবের সহিত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিলে শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ হইয়া যাইবে; মুখস্থ করিবার জন্য কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না। নিত্য কর্ম্মের আদিতে এই গুলির সাহায্যে ঈশ্বর-চিন্তা করিলে মন সরস হইবে। তখন সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি রসের সহিত করিতে পারা যাইবে। ক্রমে লয় বিক্ষেপ কাটিয়া গিয়া নিত্য সত্ত্বস্থ হওয়া অভ্যস্থ হইতে থাকিবে। কর্ম্ম অন্তে একান্তে ইহাদের অর্থ ও ভাব, মনকে একটা শান্ত অবস্থা আনিয়া দিতে থাকিবে। ক্রমে লোকসঙ্গেও স্মরণটি সর্ব্বদা লইয়া থাকিবার সুবিধা হইবে; তখন ভাবনায়, বাক্যে ও কর্ম্মে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া সহজ হইতে পারে। হে ভগবান্! তোমার প্রসন্নতা আমাদের অনুভব-সীমায় আনিয়া দাও। অধিক কি।)

[১]

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ শ্রীভাঃ ॥

পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি। ধ্যান কিরূপে করিব? স্বরূপে তিনি যাহা সেই চিন্তা দ্বারাও ধ্যান হয়; আর তটস্থে তিনি যাহা করেন, সেই চিন্তা দ্বারাও ধ্যান হয়। স্বরূপে তিনি সত্য-স্বরূপ। তিনিই সত্য—সৃষ্ট যাহা কিছু, সমস্তই মিথ্যা। ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা মন, দেহ, জগৎ,—সত্ত্বরজস্তম-গুণের এই ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও, পরমব্রহ্ম, অধিষ্ঠান-চৈতন্য সকলের মূলে আছেন বলিয়া এই ত্রিসর্গ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যেমন সূর্য্য-তেজে যে মরীচিকা উঠে তাহাতে জল ভ্রম হয়, জলে কাচ ভ্রম হয়, কাচে রজত ভ্রম বা জল ভ্রম হয়, অথবা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়—সেইরূপ ব্রহ্মেই এই জগৎ ভ্রম হইতেছে। ব্রহ্মকে ভ্রমজগৎরূপে প্রতীতি হইলেও পরমব্রহ্ম স্বীয় তেজঃপ্রভাবে মায়ার সমস্ত ইন্দ্রজাল নিরস্ত করিয়া আপন মহিমায় আপনি আপনি সর্ব্বদা বিরাজমান। স্বরূপ-চিন্তায় ধ্যান এইরূপে করিতে পারিলে, দৃশ্য-দর্শন মুছিয়া যাইবে। আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হইবে।

তটস্থ-লক্ষণে চিন্তা করিয়াও আমরা সেই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মের ধ্যান করি। তটস্থ-লক্ষণে চিন্তা কিরূপ? সেই পরমব্রহ্ম মূলে আছেন বলিয়াই, এই অসত্য মায়িক জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ তাঁহা হইতেই হইতেছে। তিনি অনুস্যূত বলিয়া জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ রূপ ব্যাপার কার্য্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; আর তিনি অননুস্যূত—ব্যাবৃত্ত বলিয়া আকাশ-কুসুম শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি অলীক পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মই কারণস্বরূপ। প্রতিকার্য্যের কারণস্বরূপে তিনি অন্বিত—অনুস্যূত। যেমন কারণ যাহা, তাহা কার্য্যে আছে কিন্তু কার্য্য যাহা, তাহা কারণে নাই—সেইরূপ ব্রহ্ম, জগতে কারণরূপে আছেন; কিন্তু জগৎ তাঁহাতে নাই। যেমন কার্য্যরূপ ঘটে, ঘটের কারণ মৃত্তিকা আছে কিন্তু মৃত্তিকাতে ঘট নাই সেইরূপ।

তটস্থ-লক্ষণে সগুণ-ব্রহ্ম চিন্তা করিয়া আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি স্বরাট্, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। আবার যে বেদে জ্ঞানী সকলও মোহপ্রাপ্ত হয়েন, সেই বেদসমূহ তিনি আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্রেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে সেই পরমব্রহ্মকে এইরূপে চিন্তা করিয়া ধ্যান করি। [একান্তে এই উভয়বিধ চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মই সত্য, এবং তিনি এই মিথ্যা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ রূপ মায়িক ব্যাপার করিয়া থাকেন ইহার অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে

সাধনার পূর্ব্বে যখন এই চিন্তা আপনা হইতে আসিতে থাকে, তখন আপন স্বরূপের আভাস লইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়। এইরূপে ইহাতে সর্ব্ব-সাধনা সাধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অপূর্ব্বতা লাভ হইবেই]।

---

[২]

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা

মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবির্ম্ম-এধি ॥

বেদস্য ম আণীস্থঃ

শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্

সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি ॥ সত্যং বদিষ্যামি ॥

তন্মামবতু ॥ তদ্বক্তারমবতু ॥ অবতু মাম্ ॥

অবতুবক্তারমবতু বক্তারম্ ॥ ঋগ্বেদ ॥ পাঠারম্ভে শান্তিমন্ত্র ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

[আমি গুরুকৃপায় বহিঃপ্রবৃত্ত আমার শক্তিগুলিকে প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিবার কৌশল শিখিয়া সংযমী হইয়াছি। ভগবতি! ব্রহ্মবিদ্যে! আমায় কৃপা কর]

আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[কেহই প্রলাপ করে না] হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য! তুমি আবির্ভূত হও!

হে বাক্য! হে মন!

তোমরা আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমি অধীত গ্রন্থের বিস্মরণরহিত আলোচনাতে দিবারাত্রকে নিযুক্ত রাখিব। বেদ এই রূপে অধীত হইলে, তবে আমি ঋতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব।

মাতঃ শ্রীব্রহ্মবিদ্যে!

তুমি আমাকে বোধ-শক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে শিষ্য-বোধন শক্তি দিয়া রক্ষা কর।

আবার বলি, হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে!

আমাকে রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে রক্ষা কর। ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

[৩]

গাব ইব গ্রামং, যুযুধি বিবশ্বান্,
বা শ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভিনো ন্যেতুধর্ত্তাদিবঃ
সবিতা বিশ্ববারঃ॥ ঋগ্বেদ॥

হে বিশ্ববার! হে সর্ব্বজন-বরণীয়!

হে সবিতা! হে সর্ব্বপ্রসবিতা! হে দ্যুলোকের ধারয়িতা! তুমি এস।

তোমার নিকটে যাইবার যোগ্যতা আমার নাই, তুমি এস। ধেনুকুল অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া, যেমন শীঘ্র গ্রামাভিমুখে আগমন করে, সেইরূপে তুমি এস। যোদ্ধা যেমন স্বীয় অশ্বের নিকটে আগমন করে, তুমি সেইরূপে এস। দুগ্ধবতী গাভী যেমন প্রফুল্ল মনে হাম্বারবে আপন বৎসের নিকটে আগমন করে, সেইরূপে তুমি এস। স্বামী যেমন ভার্য্যার নিকটে আগমন করেন, তুমি সেইরূপে এস।

---

(৪)

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥বেদ॥
তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ বেদ।
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥বেদ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে
সন্নিবিষ্টঃ॥বেদ॥

যে দ্যুতিশীল, ক্রীড়াশীল পুরুষ, অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বরূপে ভুবনে প্রবেশ করিয়া আছেন, যিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে আছেন—সেই পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

তুমিই অগ্নি, তুমিই আদিত্য, তুমিই বায়ু, এবং তুমিই চন্দ্রমা। তুমিই শুক্র, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই জল, তুমিই প্রজাপতি।

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী, বিশ্বতোমুখ তুমি, তুমি মায়া-অবলম্বনে যেন জাত হইয়া কখনও জরাজীর্ণ মত হও, হইয়া বৃদ্ধের মত দণ্ডগ্রহণ করিয়া চল—ইহাই বঞ্চনা। অন্তরাত্মা তুমি, তুমি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হইয়া সকল মানুষের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রবেশ করিয়া রহিয়াছ।

---

[৫]

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ বেদ।
তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোহখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষোদ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসোজাত শ্চক্ষুঃসূর্য্যস্তব প্রভো!
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতাস্তুতিঃ স্তব্য ইহত্বমেব।
ঈশ! ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোহস্তু ভূয়োহপি
নমোনমস্তে ॥ কাশীখণ্ড।

সর্ব্বপ্রাণীর সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডদেহ বিরাট পুরুষ। এই পুরুষের মস্তক অসংখ্য, চক্ষু অসংখ্য এবং পাদও অসংখ্য। এই পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডগোলক সর্ব্বতো-ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া, দশাঙ্গুলি পরিমিত দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। [অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন]॥

বেদ তোমার নিশ্বাস নিখিল জগৎ তোমার স্বেদবিন্দু, বিশ্বভূত তোমার পাদদেশে, তোমার মস্তক আকাশে। তোমার নাভিদেশে অন্তরীক্ষ লোক, তোমার লোম সকলই বনস্পতি। চন্দ্রমা তোমার মন হইতে জাত। হে প্রভো! সূর্য্যই তোমার চক্ষু। তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত। যে স্তব করিতেছে, সেও তুমি; যাহা স্তব করে, তাহাও তুমি; যাহাকে স্তব করে, তাহাও তুমি। হে ঈশ্বর! তোমার দ্বারাই এই সমস্ত আচ্ছাদন-যোগ্য। তোমাকে নমস্কার; পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

[৬]

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি!

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত,

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি!

দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত,

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি!

নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা

মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যে

তস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি!

প্রাচ্যোঽন্যা নদ্য স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ

পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতি,

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি!

দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি দেবা দর্ব্বীং

পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ বেদ ॥

এই ক্ষয়োদয়রহিত পুরুষের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! চন্দ্র সূর্য্য যথা-স্থানে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন! এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! এই দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌরজগৎ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত। এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গর্গি! নিমেষ ও মুহূর্ত্ত, দিবা ও রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও বৎসর সমূহ নিজ নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! শ্বেতপর্ব্বত সমূহ হইতে পূর্ব্ব-দেশীয় নদী সকল পূর্ব্বদেশে বহিতেছে, অন্যান্য পশ্চিমদেশীয় নদী সকল আপন আপন গন্তব্য দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! বদান্যগণকে মনুষ্যগণ প্রশংসা করিয়া থাকে, এবং দেবগণ যজমানের অনুগত হয়েন, পিতৃগণও দর্ব্বী-হোমের অনুগত হয়েন॥

[৭]

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ
শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয়
তারয় সংসারসাগরতঃ ..

হে সর্ব্বব্যাপক! হে বিষ্ণু! আমার ঔদ্ধত্য দূর কর। আমার মনকে দমন কর। আমার বিষয়-মৃগতৃষ্ণা শান্ত কর। সর্ব্বজীবে যাহাতে আমার দয়া ছড়াইয়া পড়ে তাহা কর। আমাকে ভীম ভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর।

কতদূর হইল পরীক্ষা।

দর্শনে যাহা হয় স্মরণেও তাহাই হয়, অথবা তদপেক্ষা অধিক হয়। যত দিন ইহা না হইতেছে, তত দিন বেশী কিছুই হইল না। যাহা দেখি তাহা চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। তাহাই যখন স্মরণ করি, তখন মানসে তাহাই বিশেষ ভাবে দেখি। চক্ষে যাহা দেখি তাহা সর্ব্বদা পাই না; কিন্তু উহাই যখন মনে গাঁথিয়া যায় তখন উহা সর্ব্বদা পাই।

চক্ষের দেখা যদি দেখার মত হয় তবেই উহা নিত্য ভাবনার বিষয় হইয়া যায়। ভাবনা না করিয়া থাকা যায় না। স্মরণ সর্ব্বদাই হয়। আপনা হইতে যখন যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই ধ্যানের বস্তু। যত দিন তাহা মনে রাখিতে চেষ্টা করা যায় তত দিন ধারণার চেষ্টা হয় মাত্র। ধারণা ঠিক হইয়া গেলেই ধ্যান হয়। ধ্যান লাভ করিতে পারিলে আর কোন ক্লেশ থাকে না। আবার এই ধ্যান যখন বহুকাল স্থায়ী হয় তখন হয় সমাধি। চেতন-সমাধি হইলে এমনটি হয় যাহাতে দেহ থাকিয়াও নাই। জগৎ থাকিয়াও নাই। মন, ধ্যেয় বস্তুর অনুভবে এমন ডুবিয়া যায় যে, অন্য কোন বস্তুর চিন্তা মনে আসিতে পারে না অথচ সর্ব্বদাই সজ্ঞানে থাকা

যায়। জড়-সমাধিতে সুষুপ্তির মত একটা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া সব ভুলিয়া থাকা হয়; আপনাকে আপনিও অনুভব হয় না।

তবেই হইল দেখাটা দেখার মত হওয়া চাই, তবেই দর্শনটিই ধ্যানে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

দেখার মতন দেখাটা কিরূপ?

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া হউক।

রাজা যুধিষ্ঠির, মাতা কুন্তীকে দেখার মত দেখিতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর, মাতার মুখে শুনিলেন কর্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

পূর্ব্বজং ভ্রাতরং কর্ণং পৃথায়া বচনাৎ প্রভো।
তেন মে দূয়তে তীব্রং হৃদয়ং ভ্রাতৃঘাতিনঃ॥

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জ্ঞাতি, বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্রাদি বিনষ্ট হইল। রাজা যুধিষ্ঠির সকলের উদ্দেশে উদক-ক্রিয়া করিলেন। মনে কিছু মাত্র শান্তি নাই। মহাত্মা পাণ্ডবগণ, আপনাদের বিশুদ্ধি সম্পাদন জন্য, এক মাস ধরিয়া পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথী-তীরে বাস করিলেন। সেই সময়ে বহু ঋষি তাঁহাদের নিকট আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন দেবর্ষি নারদের নিকট দুঃখের কথা জানাইলেন। নারদ শোকব্যাকুলচিত্ত রাজাকে সান্ত্বনা করিলেন। মন কিন্তু শান্ত হইল না। নারদ বলিতে লাগিলেন—রাজন্! ক্ষত্রধর্ম্ম মত তুমি বাহুবলে শত্রু বিনাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছ। যাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাও ভয়ঙ্কর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আপনার এখন শোকের অবসর কোথায়? যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন:—

বিজিতেয়ং মহী কৃৎস্না কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াৎ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ভীমার্জ্জুনবলেন চ॥
ইদং মম মহদ্দুঃখং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যদা।
কৃত্বা জ্ঞাতিক্ষয়মিমং মহান্তং লোভকারিতম্॥
সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ঘাতয়িত্বা সুতান্ প্রিয়ান্।
জয়োঽয়মজয়াকারো ভগবন্ প্রতিভাতি মে॥

ভগবন্! সমগ্র পৃথিবী জয় হইল সত্য। কৃষ্ণের বাহুবল-আশ্রয়ে, ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এবং ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে সমরে জয়লাভ হইল সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়

নিরন্তর মহৎ দুঃখানলে সন্তপ্ত হইতেছে। আমি মহালোভী। রাজ্যলোভে সমস্ত জ্ঞাতি বিনাশ করিলাম। আমার অভিমন্যু নাই। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাই। আমিই ইহাদিগকে বিনাশ করাইয়াছি। হায় প্রভু! এই জয় এখন পরাজয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে।

আমার ভ্রাতৃ-বধূ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা যখন কৃষ্ণের মুখে আপনার অতি-প্রিয় পুত্র অভিমন্যুর বিনাশ সংবাদ শুনিবেন, তখন মধুসূদনকে কি বলিবেন? দ্রৌপদী আজ হত পুত্রা হত-বান্ধবা। আমাদের প্রিয়কারিণী দ্রৌপদীর দুঃখ চিন্তা করিয়া, আমি যার পর নাই ব্যথিত হইতেছি।

আমার জননী কুন্তী, কর্ণের সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অতিশয় দুঃখে নিপাতিত করিয়াছেন।

আমি পৃথার বাক্যে কর্ণকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিয়াছি। ভ্রাতৃ-ঘাতী আমি! ভ্রাতৃহত্যা নিবন্ধন তীব্র দুঃখে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। আমি কর্ণার্জ্জুন সহায়ে ইন্দ্রকেও সহজে জয় করিতে পারিতাম।

পৃথিবী হস্তগত করিয়াও রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখী। তিনি নিজে কিছুই করেন নাই। কৃষ্ণের প্রসাদে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে, ভীমার্জ্জুনের সহায়ে রাজ্যলাভ হইয়াছে। আর তুমি আমি? এই দেবদ্বিজ-ভক্তি আমাদের কোথায়? এই কৃতজ্ঞতা কি আমাদের আছে?

আমরা বলিতেছিলাম, রাজা যুধিষ্ঠির মাতাকে দেখার মত দেখিতেন। মাতৃ-দর্শনে যখন ক্রোধের শান্তি হয়, যখন মন সমস্ত ভাবনাশূন্য হইয়া শান্ত হয়, তখনই যথার্থ মাতৃ-দর্শন হয়। আবার মাতার মত যিনি দেখিতে—তাঁহাকে দেখিয়াও ঐ ফল হইবেই।

রাজা যুধিষ্ঠীর বলিতে লাগিলেন :—

দুর্য্যোধনের সভায় দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্ব্বাক্য বলিয়া আমায় কত ক্লেশ দিয়াছিল। তাহাদের দুর্ব্বাক্যে আমার ক্রোধ হইত; কিন্তু এই সহসোৎপতিতঃ ক্রোধঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা প্রশাম্যতি। সহসা ক্রোধের উদয় হইলেও কর্ণকে দেখিয়া আমার এই ক্রোধ শান্ত হইত। আমি এখন বুঝিতেছি কেন হইত? তখন কিন্তু ইহা বুঝি নাই। আবার কর্ণ যখন কুরুসভায় দ্যূতক্রীড়া সময়ে আমার প্রতি বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন

কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। কেন করি নাই? কর্ণের চরণ-যুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছিল।

কুন্ত্যাহি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্ম্মম।
সাদৃশ্যহেতুমন্বিচ্ছন্ পৃথায়াস্তস্য চৈব হ॥

আমি দেখিয়াছিলাম কর্ণের পাদদ্বয় জননী কুন্তার চরণ-যুগলের সদৃশ ছিল। আমি তখন ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু কোন ক্রমেই এতদিন উহার সন্ধান পাই নাই। এখন বুঝিতেছি কেন হইয়াছিল। কর্ণের চরণ-যুগল মাতার শ্রীচরণের মত—তাই এ চরণ দেখিয়া মাতৃ-স্মরণে ক্রোধ-শান্তি হইয়াছিল।

আমরা বলিতেছিলাম এতদিন ত ধ্যান কর, শ্রীভগবানের চরণ-যুগলও চিন্তা কর; কিন্তু কখন কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ—চরণ-যুগল স্মরণ করিবা মাত্র ক্রোধের শান্তি হইয়াছে? কাম দমিত হইয়াছে? স্মরণ মাত্রেই মন বিষয়-ভাবনা ছাড়িয়া কি এক অপূর্ব্ব-ভাবে নিশ্চল হইয়া যাইতেছে? যতদিন ইহা না হয়, ততদিন শ্রীভগবানের চরণ-দর্শন দেখার মত দেখা হয় নাই। শ্রীভগবানের চরণ স্মরণ! স্মরণের মত স্মরণ হয় নাই।

বলিতেছিলাম নাম করিলে, বা স্মরণ করিলে, বা ধ্যান করিলে প্রত্যক্ষ হইবে যে ইন্দ্রিয় শান্ত হইল, মন কাম ক্রোধাদি শূন্য হইল। ইহা যতদিন না না হইতেছে, ততদিন ঠিক ঠিক ভক্তি-মার্গে যাওয়া হয় নাই। নাম করা, স্মরণ করা, ধ্যান করা - মুখে হইয়াছে। মনে প্রাণে হয় নাই। শ্রীভগবানের নাম স্মরণের, শ্রীচরণ-ভাবনার, চরণ-চিন্তার একটি শক্তি আছে।

সেই শক্তি-বলে তোমার ইন্দ্রিয় দমিত হইবে। তোমার রিপু শান্ত হইবে। ইহাই পরীক্ষা করিতে বলিতেছি।

প্রাণ প্রয়াণসময়ে যস্য নাম সকৃৎস্মরন্।
নরস্তীর্ত্বা ভবাম্ভোধি পারং যাতি তৎপদম্॥

এইরূপ স্মরণ যদি জীবনে অভ্যাস হয়, তবেই না অন্তিমে তাঁহার নাম-স্মরণে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়? সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

শ্রীহনুমান্ শতযোজন-বিস্তীর্ণ নক্রচক্র-ভয়ঙ্কর, তরঙ্গাদি-উন্নদ্ধ, আকাশ-মত দুগ্রাহসমুদ্র লঙ্ঘন সময়ে বলিয়াছিলেন:—

কিং পুনস্তস্য দূতোঽহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ।
তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যল্পবারিধিম॥

আমি তাঁহার দাস; তাঁহার হস্তের অঙ্গুরী আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই সামান্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিব।

শ্রীভগবানের নামের বলে কি না পারা যায়? তাঁহার চরণ-চিন্তার কি কিছুই মহিমা নাই? যদি থাকে, তবে আমার শোক কেন যাইবে না? ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কেন হইবে না? রিপু-দমন কোন্ ভার কর্ম্ম?

এস এস বিশ্বাস রাখ—শ্রীচরণ-চিন্তাতে এ সমস্তই হয়। নিত্য পরীক্ষা কর। প্রতি বিপদে স্মরণ কর। প্রতি কার্য্যে অভ্যাস কর। যতদিন না হয় ততদিন প্রতিকর্ম্মে স্মরণ করিতে থাক; এই জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। সংসারে দুঃখ আছে, রোগ-শোকের যাতনা আছে, দারিদ্র্যের উৎ-পীড়ন আছে—সব সত্য। যত দুঃখ থাকে থাকুক, কিন্তু শ্রীভগবানের নামও ত আছে? শ্রীভগবানের নাম স্মরিয়া, চরণ চিন্তা করিয়া করিয়া সব সহ্য করা যায়; সমস্ত ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিশ্বাস রাখ আর নিত্য অভ্যাস কর। পরীক্ষা কর হইতেছে কি না? যদি এখনও না হয়, তবে কাতর হইয়া প্রার্থনা কর—প্রভু! তোমার নামের মহিমা আমি এখনও অনুভব করিতে পারিতেছি না; আমায় কৃপা কর। নিশ্চয়ই বুঝিবে ইহা হয়। নাম-স্মরণে, শ্রীচরণ-ধ্যানে অসাধ্য সাধন হয়; সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য হওয়া যায়। নামের বলে বলীয়ান্ হওয়া যায় অথচ কেহই জানিতে পারে না—এত সহিষ্ণুতা তাঁহার ভক্তের আসে কোথা হইতে? এত নির্ভয় তাঁহারা হয়েন কিরূপে? নাম ছাড়িও না, শ্রীচরণ-চিন্তা ছাড়িও না। নিরন্তর অভ্যাস করিয়া যাও, প্রতি বিপদে নাম-স্মরণে পরীক্ষা কর হৃদয় কত শান্ত হয়; সমস্ত জীবন ধরিয়া অভ্যাস কর, শেষ জয় তোমার হইবেই।

ঐ যে বলিতেছিলাম তাঁহার স্মরণে অসাধ্য সাধন হয়, অদ্ভুত-বলে বলীয়ান্ হওয়া যায়; একটা দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক।

সমুদ্র লঙ্ঘনের পর শ্রীমহাবীর মা'র দর্শন-লাভ করিয়াছেন। শ্রীসীতাকে রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিয়াছেন। জননীর নিকট হইতে তাঁহার কেশপাশান্তস্থিত চূড়ামণি অভিজ্ঞান স্বরূপে হস্তে লইয়াছেন। বিদায় লইবেন। মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—বৎস! সমস্ত বানর ত তোমার মত অতি সূক্ষ্ম বপু।

তোমরা এই মহাসুরদিগের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? মা জানকী জানিয়াও যেন জানিতেছেন না—শ্রীমহাবীর কিরূপ? জানিয়াও যেন আবার জানিতে চান। শ্রীহনুমান্ তখন আপনার পূর্ব্বরূপ দেবীকে দেখাইলেন। যিনি জীবন্মুক্ত, যাঁহার অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত -তাঁহার ইহা কিছুই দুরূহ নহে। সীতা "হর্ষেণ মহতাবিষ্টা।"

নিরতিশয় হৃষ্টা হইয়া দেখিতেছেন—শ্রীহনুমান মন্দর পর্ব্বত সদৃশ; রক্ষোগণ-বিভীষণ,—মহাপর্ব্বত-সন্নিভ। এই কপিকুঞ্জরকে দেখিয়া তাঁহাকে রূপ সম্বরণ করিতে বলিলেন যদি রাক্ষসীরা দেখে তবে ত বিঘ্ন ঘটিবে। শ্রীজানকী বিদায় দিয়াছেন। শ্রীহনুমান প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কতকদূর গিয়া ভাবিলেন—শুধুই মাকে দেখিয়া যাইব? আর কিছু করিয়া যাইব না?

কার্য্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্য বিরোধতঃ।
অন্যৎ কিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধমঃ এব সঃ॥

যে কার্য্যে আসিয়াছি তাহা ত হইল। কিন্তু স্বামীর কার্য্যের ক্ষতি না হয় এরূপ অপর কোন কার্য্য না করিয়া যদি লঙ্কা ত্যাগ করি, তবে ত আমি অধম দূত। একবার রাবণকেও দেখিয়া যাইতে হইবে। কিছু বলিয়াও যাওয়া উচিত। পরে রাম-দর্শনে গমন করিব।

এ সাহস কিরূপে আইসে? আমরা বলি ভক্ত সর্ব্বদা নির্ভয়। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক আমার প্রভু। আমি তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। আমার কেন ভয় থাকিবে? অসৎকার্য্যে তাঁহার ভয় হয় পাছে স্বামীর বিরাগ ভাজন হই। কিন্তু শুভকার্য্যে তাঁহার ভয় কি? তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সমস্ত শুভকার্য্য করা যায়।

মহাবল শ্রীহনুমান তখন রাবণের অশোক-বাটিকাকে একরূপ বৃক্ষশূন্য করিলেন। সংবাদ রাবণের কর্ণে গেল! রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিল। বহু রাক্ষস বিনষ্ট হইল। শেষে ইন্দ্রজিতের হস্তে শ্রীমহাবীর বন্ধন লইলেন। ইচ্ছা করিয়াই লইলেন—রাবণ সম্ভাষণ জন্য। কারণ তাঁহার আবার বন্ধন কি?

যস্য নাম সততং জপন্তি যে-
হজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ।

সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং
যান্তি কোটিরবিভাস্বরং শিবম্॥
তস্যৈব রামস্য পদাম্বুজং সদা
হৃদ্পদ্মমধ্যে সুনিধায় মারুতিঃ।
সদৈবনির্ম্মুক্ত সমস্তবন্ধনঃ
কিং তস্য পাশৈরিতরশ্চ বন্ধনৈঃ॥

যাঁহার নাম সতত জপ করিলে ক্ষণমধ্যে অজ্ঞানকৃত-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, হইয়া সদ্যসদ্যই মুক্তিলাভ করিয়া কোটিসূর্য্যসমপ্রভ তদীয় মঙ্গলময় পরমপদ লাভ করা যায়—সেই শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম সর্ব্বদা হৃদ্পদ্মে সুন্দররূপে ধারণ করিয়া, শ্রীহনুমান্ সকল সময়েই সম্বন্ধ-বন্ধন হইতে মুক্ত ছিলেন। সামান্য ব্রহ্মাস্ত্র পাশে বা অন্য-বন্ধনে তাঁহার কি হইবে?

তথাপি পাশ-বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যেন তিনি ভয়ে ভয়ে লঙ্কার চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। নগরের রাক্ষসগণ মহাক্রোধে শ্রীহনুমানকে মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত করিল। মারুতি নিঃশব্দে সহ্য করিলেন। ইন্দ্রজিত, পিতার সভায় বানরকে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইল; যাইবার সময় বলিয়া গেল "ন লৌকিকো হরিঃ"—এই বানর সামান্য বানর নহে! ইহার শক্তি অলৌকিক। মন্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া যাহা সদ্যুক্তি হয় তাহাই করুন।

ইন্দ্রজিত চলিয়া গেলেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ তখন অঞ্জনশৈল প্রভ কৃষ্ণবর্ণ, সম্মুখে অবস্থিত প্রধান সেনাপতিকে বলিলেন—প্রহস্ত! এই বানরকে জিজ্ঞাসা কর—এ লঙ্কায় কেন আসিয়াছে? এখানে ইহার কার্য্য কি? কোথা হইতেই বা আসিল? আমার এত রাক্ষস বিনাশ কেন করিল? আমার অশোক বাটিকাই বা বৃক্ষশূন্য করিল কেন?

প্রহস্ত শ্রীহনুমানকে অভয় দিল। বলিল—বানর! রাজার সম্মুখে সত্য বল কে তোমায় প্রেরণ করিয়াছে? তোমার কোন ভয় নাই।

শ্রীহনুমান্ তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হইয়া ত্রিলোক-কণ্টক রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে শ্রীরামচন্দ্রকে "মনসা স্মরন্ মুহুঃ" মনে মনে মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া, রাবণকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"শৃণু স্ফুটং দেবগণাদ্যমিত্র হে"
রামস্য দূতোঽহমশেষ হৃৎস্থিতেঃ।
যস্যাখিলেশস্য হৃতাধুনা ত্বয়া
ভার্য্যা স্বনাশায় শুনেব সদ্ধবিঃ॥

হে দেবতা প্রভৃতির শত্রু! স্পষ্ট শ্রবণ কর। কুক্কুর যেমন যজ্ঞের উৎকৃষ্ট হবি হরণ করে, সেইরূপ তুমি তোমার মরণের জন্য যে ত্রিলোকনাথের ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিয়াছ—আমি সেই সকলহৃদয়বিহারী শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রেরই দূত। ইত্যাদি।

মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিলোক বিজয়ী রাবণ। ভয়ানক রাক্ষস সেনা বেষ্টিত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় এই রাক্ষসরাজ আপন সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সভায় একাকী বন্ধন দশায় উপস্থিত হইয়াও এই রাবণকে তিরস্কার করিতেছেন এই মহাবীর। তুমি ত্রিলোকের কণ্টক! তুই কুক্কুরের হবি গ্রহণের মত চুরী করিয়া, নিজের মৃত্যুর জন্য ত্রিলোকনাথের ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিস্! শ্রীহনুমান প্রবল-বলশালী সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও দুর্দ্ধর্ষ রাবণ কম-বলশালী নহে। যাহার ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত—তাহার সভায় তাহার মুখের উপর এই কটুবাক্য বলিতেও মহাবীর ভীত নহেন। কিসে এত নির্ভয়? আমরা বলি ভক্ত যখন শ্রীভগবানকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া কথা কহেন তখন কি তাঁহার ভয় থাকিতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি তাঁহার স্মরণে কি কাপুরুষতা আসিতে পারে? হায়! শ্রীভগবানকে স্মরণও করি কিন্তু চাকুরী যাইবার ভয় রাখি? দুঃখের ভয়ে দারিদ্র্যের ভয়ে ভীত হই। এ কেমন ভক্তি? এ কেমন স্মরণ? তাই বলি, একবার পরীক্ষা কর কতদূর হইল? কপট ভক্ত হওয়া কিছু নয়। যিনি অভয়দাতা তাঁহাকে স্মরণ করিলে ভয় থাকে না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। শক্তিমানের ভজনে মৃত্যুঞ্জয়েরও শক্তি আসিবে। তাঁহাকে ডাকিলে কোন ভয়ই থাকিবে না।

তাঁহার ভক্ত আরও কত নির্ভীক আমরা শ্রীহনুমানের চরিত্রে তাহাও দেখাইয়া শেষ করিতেছি।

শ্রীহনুমান রঘুনাথ-সৎকথা রাবণকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। করুণরসার্দ্র হইয়া, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ এই দুরাত্মাকে সদ্‌উপদেশ দিলেন। বলিলেন:—

বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং
ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ।
দৈবীং গতিং সংসৃতি মোক্ষহেতুকীং
সমাশ্রয়াত্যন্ত হিতায় দেহিনঃ॥

হে রাবণ! সংসারে লোকের গতি বিবেক-বলে বিচার করিয়া দেখ! রাক্ষসী-বুদ্ধি আশ্রয় করিও না। সংসারে মোক্ষের হেতু দৈবী-গতি আশ্রয় কর—ইহাতেই প্রাণিগণের নিরতিশয় হিতসাধন হয় জানিও। আরও বলিলেন :—

ত্বং ব্রাহ্মণো হ্যুত্তমবংশসম্ভবঃ
পৌলস্ত্যপুত্রোঽসি কুবেরবান্ধবঃ।
দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি ন পশ্য রাক্ষসো
নাস্ত্যাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো নহি॥

তুমি ব্রাহ্মণ! উত্তমবংশসম্ভূত তুমি পুলস্ত ঋষির পৌত্র। তুমি কুবেরের ভ্রাতা। যদি দেহাত্মবোধ ছাড়িতে নাও পার, তথাপি বুঝিয়া দেখ তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নও। আর যদি দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, তবে যে তুমি রাক্ষস নও তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

হায়! আজ সমাজ ভরিয়া এই রাক্ষসবুদ্ধি। ব্রাহ্মণবংশে, অতি উচ্চ ঋষির বংশে জন্মিয়াও রাক্ষসের মত আহার-বিহারে রুচি; রাক্ষসের মত সদাচারভ্রষ্ট আমরা। শ্রীহনুমানের এই হিতোপদেশে আমাদের শিখিবারও যে অনেক আছে।

শ্রীহনুমান তত্ত্ব-কথা অনেক বুঝাইলেন। রাবণের আত্যন্তিক মুক্তির সহজ উপায়ও বলিয়া দিলেন। বলিলেন—হে মহামতে! মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

শ্রীহরির প্রতি ভক্তি করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহা হইতে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইরূপে যথার্থ বিষয় অবগত হও; তুমি পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। আজ হইতে এই পুরাণ-পুরুষ, প্রকৃতির পর, পরম বিভু রমাপতি শ্রীহরি শ্রীরামকে ভজনা কর। মূর্খতা ত্যাগ কর। রামকে মানুষ আর ভাবিও না। সীতা "জনকরাজার

কৃষিকার্য্য করা ভাবিও না। শরণাগতবৎসল রামচন্দ্রকে ভজনা কর। শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া, সীতাকে অগ্রে করিয়া, রামকে নমস্কার কর; মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো
ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্।
কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াজ্জনো
ভবাম্বুধের্দুঃখতরঙ্গমালিনঃ॥

মানুষ ভক্তিসহকারে রামচন্দ্রকে পরমাত্মা, অন্তর্যামী, আনন্দময়, অদ্বিতীয় বলিয়া না ভাবিলে, দুঃখতরঙ্গমালাসঙ্কুল ভীমভবার্ণবপারে গমন করিবে কিরূপে?

নতুবা তুমি যেমন আপনার শত্রু আপনি হইয়া, অজ্ঞানময় বহ্নিদ্বারা নিজ আত্মাকে প্রজ্বলিত করিয়া, নিজকৃত পাপরাশির সাহায্যে আপনাকে অধোগত করিতেছে—এরূপ করিলে তোমার মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

এ উপদেশ আজ আমাদের কতলোকের প্রতি প্রযুজ্য? কিন্তু ইহার ফল কি হইল?

রাবণ মারুতির এই অমৃতাস্বাদতুল্য সুমধুর বাক্য শুনিয়া ভিতরে আনন্দিত হইল; কিন্তু বাহিরে কৃত্রিম কোপে অধীরতা দেখাইল—যেন জ্বলিয়া উঠিল, উঠিয়া আরক্তলোচনে মহাবীরকে বলিতে লাগিল। এখন আর প্রহস্তকে দিয়া বলান নাই। এখন নিজেই শ্রীহনুমানকে বলিল:—

কথং মমাগ্রে বিলপস্য ভীতবৎ
প্লবঙ্গমানাধমোঽসি দুষ্টধীঃ।
ক এষ রামঃ কতমো বনেচরো
নিহন্মি সুগ্রীব যুতং নরাধমম্॥

রাবণ ভিতরে বুঝিল! বুঝিয়াও দেখিল দলাধিপতি হইয়া বহুদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। তাই বাহিরে বলিল—অরে! আমি রাবণ রাজা! আমার সাক্ষাতে তোর এই প্রলাপ! তুই দুষ্টবুদ্ধি! তুই বানরাধম। কে তোর রাম যাহার তুই নাম করিতেছিস্? কে তোর সুগ্রীব? তুই কি বলিতে চাস্? আমি সুগ্রীবের সহিত তোর

রামকে অচিরেই বধ করিব। আর তোকে, তোর জনকনন্দিনীকে সকলকে বধ করিব।

ভক্তের নির্ভীকতা কতদূর আমরা তাহাই দেখাইতেছিলাম।

শ্রুত্বা দশগ্রীব বচঃ স মারুতি
বিবৃদ্ধকোপেন দহন্নিবাসুরম্।
ন মে সমা রাবণ কোটয়োধমা
রামস্তদাসোঽহমপারবিক্রমঃ॥

মারুতি দশাননের মুখে রামনিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়াছেন। অত্যন্ত ক্রোধদৃষ্টিতে যেন রাবণকে দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন—রে অধম! তোর মত কোটি কোটি রাবণও আমার সমান হইতে পারে না। আমি রামের দাস। সেইজন্য আমার বিক্রম অপার।

আমরাও বলি যদি শ্রীভগবানের শরণ লইয়া থাক, তবে কি তুমি ভীরু হইতে পার? তবে কি তুমি কাপুরুষ হইতে পার? তবে কি তুমি কোন বিপদে অস্থির হইতে পারে? সেই অভয় পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়াও কি তুচ্ছ সংসারের ভয় থাকে?

তাই বলি, কতদূর হইল একবার পরীক্ষা কর। না হইয়া থাকে, আরও প্রবলবেগে যাহা করিতেছ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। কেন হইবে না? শাস্ত্র কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।

শুভ কথা।

বাক্য ত্রিবিধ স্ক, মা, ৪২৬। শ্রুতি বলেন বাক্য ত্রিবিধ। প্রভুসম্মত, সুহৃৎসম্মত ও কান্তাসম্মত। আধিপত্যশালী প্রভু যেমন ভৃত্যকে (১) "ইহা কর" বলিয়া আদেশ করেন, তদ্রূপ শ্রুতি ও স্মৃতি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রভুসম্মত। 'বাহিরে ভিতরে শুচি হইবে" প্রভুবাক্য।

(২) ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র সুহৃৎসম্মত বাক্য, যেহেতু উহারা সুহৃদের ন্যায় প্রবোধদানে সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করে।

"স্বর্গকামনায় শৌচ পালন করিবে" সুহৃৎবাক্য।

(৩) কাব্যাদি কান্তাসম্মত বলিয়া গণ্য।

বাক্য নামের অঙ্গ ঐ ৪২৬। পূর্ব্বে বিধাতা এই রূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। উহা রজ্জুদ্বারা, গাভীর ন্যায় নাম দ্বারা সম্যক্ আবদ্ধ। সই নাম-প্রপঞ্চ চতুর্ব্বিধ, যথা—ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্য। ধ্বনি নাদময়। বর্ণ অকারাদি। 'শ' 'ব' ইত্যাদি পদ। পদের সমষ্টি --শিব —বাক্য।

পাপ স্থূলে কত প্রকার স্ক, মা, ৪৪০।

(১) পরস্ত্রীসম্ভোগ-সঙ্কল্প; পরদ্রব্যগ্রহণ-সঙ্কল্প; মনে মনে পরানিষ্ঠসাধন, অকার্য্য করণবিষয়ক সঙ্কল্প—এই চারি প্রকার মানস পাপ।

(২) বৃথা বাক্যপ্রয়োগ; অসত্য-ভাষণ; অপ্রিয়কথন ও পরনিন্দা এই চারিটি বাচিক পাপ।

(৩) অভক্ষ্যভক্ষণ, হিংসাসাধন, বৃথা কামসেবন ও পরদ্রব্যগ্রহণ এই চারিটি কায়িক পাপ।

বাক্য মনঃ কায়জ স্থূল পাপ; নরকের হেতু। ইহাদের অবান্তর ভেদ অনন্ত।

নরগণ এই সকল পাপানুষ্ঠান করিলে, মৃত্যুর পর যাতনাভোগার্থ পূর্ব্ব-দেহের ন্যায় অপর একটি শরীর পায়। অতএব নরকসাধক ঐ বিবিধ পাপ পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। ৪৪৩

শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্যভিচার স্ক, মা, ৪৪১।

যে মূঢ় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে সেই শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলে, কিম্বা জীবনধারণার্থ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহার সেই কর্ম্ম সুরাপান-সম পাপজনক।

মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ—জীব দেহ আশ্রয় করিয়া আয়ুষ্কর যাহা কিছু করে তাহার ক্ষয় হইলেই আয়ুক্ষয় হইয়া যায়। আয়ুক্ষয়ের চিহ্ন হইতেছে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হওয়া ও অসৎকার্য্য করা। স্বীয় শরীরের অবস্থা ও বল জানিয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু সেবনে যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন মৃত্যু শীঘ্র আসিবে বুঝিতে হয়। মানুষ তখন কোন দিন অতি ভোজন, কোন দিন একবারে ভোজন ত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ এবং পরস্পর-বিরোধী গুরুতর বস্তু ভোজনে আসক্ত হয়।

কোন দিন ভুক্তবস্তু জীর্ণ হইতে না হইতেই আবার ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রা যায়। কোন কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন বাসনায়, মলমূত্রাদির বেগধারণে প্রবৃত্ত হয়। এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া, শরীরস্থ বায়ুপিত্তকফকে প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলে, রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

কেহ কেহ যদিও কুপথ্যাদি না করে, কিন্তু আয়ুক্ষয়কর কুচিন্তা ও কুকার্য্য করিয়াও মরিয়া যায়। মহাভারত।

আধি ও ব্যাধির উৎপত্তি ও নাশ যোগবাঃ নিঃ পূর্ব্ব ৮১।১০ হইতে। দৈহিক দুঃখই ব্যাধি, আর বাসনাত্মক মানসিক পীড়াই আধি। উভয়ের মূল অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উভয়েরই ক্ষয় হয়।

আধি-ব্যাধিই দুঃখের কারণ। আধি-ব্যাধি নিবৃত্তিই সুখ। জ্ঞানবলে ইহাদের সমূলোৎপাটনই মোক্ষ।

শরীরে আধি-ব্যাধি কখন এককালেই উপস্থিত হয়, কখন বা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, কখন বা পরস্পর পরস্পরের কারণ হইয়া উপস্থিত হয়।

আধির উৎপত্তি -(১) তত্ত্বজ্ঞানের অভাব,(২) তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব (৩) হৃদয়ের লঘুতা পরিত্যাগ করিয়া রাগদ্বেষাদিতে যখন মানুষ আসক্ত হয়, তখন ইহা পাইলাম, ইহা পাইলাম না—এইরূপ উদ্বেগজনিত কুচিন্তা ও জড়তা আইসে। এই সমস্ত প্রতীকার না করিতে পারিলে, ঘন মোহদায়ী আধি বর্ষাকালে মিহিকার ন্যায় আবির্ভূত হয়।

ব্যাধির উৎপত্তি—মূর্খতা জন্য চিত্তজয়ের অভাব ঘটিলে যখন পুনঃ পুনঃ ইচ্ছার স্ফুরণ হইতে থাকে, তখন দূষণীয় অন্নাহার, দুর্দ্দেশ ভ্রমণ, অসময়ে আহার বিহার, দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান, দুর্জ্জন-সঙ্গ, দুর্ভাবনা করা, অনাহার বা অতিরিক্ত আহারে নাড়ীরন্ধ্র কখন অতিশূন্য কখন বা অতিপূর্ণ এইরূপ যখন হইতে থাকে, তখন প্রাণবায়ু অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, হইলে শরীরও বিকলীকৃত হয়; তাহাতে সুস্থতার অভাব হয় এবং দেহে ব্যাধি উপস্থিত হয়। বর্ষা বা নিদাঘ সময়ে নদীর মত নানা বিপর্য্যয় ঘটে।

আধি-ব্যাধি নাশের উপায়—প্রাক্তন বা ঐহিক শুভাশুভ মতির মধ্যে যাহার প্রবলতা অধিক তাহাই আধিব্যাধিক্রমে সংযোজিত করিয়া থাকে।

ব্যাধি দ্বিবিধ—সামান্য ও সার।

ব্যবহারিক পীড়াই সামান্য কিন্তু জনন মরণাদির হেতু যাহা তাহাই সার। অভিমত অন্নপান, স্ত্রীপুত্রাদি প্রাপ্ত হইলে সামান্য ব্যাধির শান্তি হয়। আধি ক্ষয়েও ব্যাধির নাশ হয়; কিন্তু বিনা আত্মজ্ঞানে সার আধির বিনাশ ঘটে না—যেমন রজ্জুবোধ ভিন্ন রজ্জুসর্প জ্ঞানের নাশ হয় না তদ্রূপ।

বর্ষাকাল, নদীতটস্থিত লতাসমূহকে যেমন পাতিত করে, সেইরূপ আধিক্ষয় হইলেই সমস্ত ব্যাধির শেষ হয়। আধি হইতে যে সমস্ত ব্যাধি জন্মে নাই, তাহা দ্রব্য, মন্ত্র, স্বস্ত্যয়ন, চিকিৎসাদি দ্বারা শান্ত হয়। তীর্থাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধী, বৃদ্ধপরম্পরাগত চিকিৎসা ইত্যাদি দ্বারা ব্যাধি দূর হয়।

রোগের মূল কারণ—চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলে দেহও ক্ষুভিত হয়। ব্যাধ-ভয়ে ভীত হরিণের ন্যায় প্রাণিগণ ক্ষুব্ধ হইলে, সম্মুখের পথ দেখিতে পায় না; প্রকৃত পথ ছাড়িয়া তখন ইহারা বিপথে যায়। ঐ বিক্ষোভে প্রাণবায়ু সমভাব ত্যাগ করিয়া, জলে হস্তী প্রবেশ করিলে জল যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া নিজের প্রবাহ-পথ ত্যাগ করে এবং তটের উপরে উচ্ছলিত হয়—সেইরূপ বিষমভাবে গমনাগমন করে। রাজার যথেচ্ছাচারে যেমন বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলতা ঘটে, সেইরূপ প্রাণের বৈষম্যে নাড়ী সকল বিষম ভাব ধারণ করে। প্রাণ বায়ুই অন্নাদিকে রসরূপে পরিণত করে; কিন্তু অন্নাদি সঞ্চরণ সময়ে যদি নিরুদ্ধ হয়, তবে ধাতুবৈষম্য ঘটে, পরে রোগ জন্মে। যে ক্রিয়ায় বায়ুর সমতা হয়, তাহাতে রোগও নাশ হয়।

অধোগতি স্ক, মা, ২১০।

মৃত্যু যে সকলের মস্তকে অধিষ্ঠিত, জনগণ যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আহারেও রুচি হয় না, অকার্য্যকরণের কথা আর কি বলিব? আহা! সর্ব্বজন্মের দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও, কোন কোন মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া, সেই মানব-জন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া ফেলে! ঐ সকল মূঢ়দিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের জন্ম কিসের জন্য? আর জন্মের লাভই বা কি? অন্তঃকরণের সহিত বিচার করিয়া তাহা বলিতে পার? নারীগণ হইতে জীব-জগতের উৎপত্তি হয়;

সুতরাং আমরা তাহাদিগকে নিন্দা করি না ; পরন্তু যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্লজ্জ-ভাবে আসক্ত হয় [লোকনিন্দা হইতেছে তবুও ছাড়ে না] কেবল তাহাদিগকেই নিন্দা করি। পদ্ম জন্মা ব্রহ্মা, জগতের বৃদ্ধি নিমিত্ত মিথুন সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং সেই মিথুনের যথাযোগ্য আচার পালন করাই কর্ত্তব্য ; তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। বহ্নির ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে বান্ধব কর্তৃক যে নারী প্রদত্তা হয় তাহার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই প্রশংসাজনক ও সর্ব্বসুখ-সম্পাদক। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ পরস্পরের যত্নে সাধিত হইলেই সুফলপ্রদ হয়, নচেৎ অনিষ্ট সাধনই হইয়া থাকে। ঐ ১অঃ, ২১০পৃঃ। পুরুষ গণের পরদার সেবার ন্যায় আয়ুক্ষয়কর অপর কোন কর্ম্ম নাই। ঐ ৭অঃ ২৫১পৃঃ।

হায়! কাহাকেই বা বলি, আর কেই বা শুনে। রসরক্তাদি ছয়টি ধাতুর যাহা সার, সেই বীর্য্য যে মূঢ়, যোগ্য যোনি পরিহার পূর্ব্বক কু-যোনিতে নিঃক্ষেপ করে,—যমদেব তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,সে ওষধিদ্রোহী,আত্মদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী, সুদীর্ঘ কালের জন্য তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে ঐ ঐ ২১০ পৃঃ।

উদ্যম—তপস্যা—কামের উপাসনা —পার্ব্বতী ও মহাদেব [স্ক, মা, ৩২৮, ২৮৪, ৩৩৮, ২১৬, ৩৪১, ৩৪৩]

এই সংসার সতত গমনশীল। ঘোর গুহ্য কালাগ্নিতেই আহিত। ইহাতে যাঁহারা "ইহা অদ্য করিব, ইহা কল্য করিব" ইত্যাকার জল্পনা করে,—কাল, নদীবেগের ন্যায় তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া থাকে।

তপস্যা অপেক্ষা আর কিছুই উত্তম নাই। তপস্যাই মহাজনগণের ধন। তপস্যা দ্বারাই সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ হয়।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মন্মথ! তোমার রূপ তিন ভাগে বিভক্ত। তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক।

মুক্তি ব্যতীত অপর যে কামনা তাহাই তোমার তামস রূপ। সুখ-বুদ্ধিতে যে বিষয়-ভোগ-কামনা, তাহা তোমার রাজস রূপ। কেবল মাত্র উপস্থিত প্রয়োজন সাধনার্থ যে কামনা, তাহা তোমার সাত্ত্বিক রূপ। তোমার এই রূপত্রয়ের কোন একটিরও উপাসনা কে না করে?

মহাদেব কহিলেন :—

তপস্যা ব্যতীত শরীর শুদ্ধি হয় না। সুতরাং পার্ব্বতী যদি তপস্যাচরণ না করেন, তবে ইহার অশুদ্ধ দেহের সহিত আমার বিশুদ্ধ দেহের সংযোগ সঙ্গত নহে।

যাহারা দান না করে, তাহারা জন্মান্তরে দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, মূর্খ ও পরাধীন রূপে বিবিধ দুঃখভাজন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ধনবান্ হইয়াও যদি দান না করে, এবং দরিদ্র হইয়াও যদি তপস্যা না করে, তবে তাহাদিগকে কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত করা কর্ত্তব্য।

পার্ব্বতী আরও বলিলেন—এই অস্থায়ী শরীর দ্বারা যদি স্বার্থসাধন না হয়, তবে এই শরীরে ফল কি? তখন তিনি ত্রিসন্ধ্য স্নান ও প্রণবাভ্যাসে সমাসক্ত হইয়া হৃদয়ে ঈশ্বরকে সংস্থাপন পূর্ব্বক মুনিগণেরও সম্মানার্হ হইলেন। ৩৪১।

ছদ্মবেশী মহাদেব পার্ব্বতীকে স্পর্শ করিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে কোন এক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া বলিলেন, যোগাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ করিব। যেহেতু আমি মহাদেব কৃত-সঙ্কল্পা। পরন্তু এক্ষণে উচ্ছিষ্ট হইয়াছি। [একটু ভাবিয়া দেখ, কতবার উচ্ছিষ্ট হইতেছ। এখন আলস্য ত্যাগ করিয়া যোগাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ কর। তবেই পবিত্র হইয়া পবিত্রকে পাইবে] ৩৪৩।

[মহাদেব কে]

মহাদেব সমস্ত জগতের আদি। সমস্ত জগৎই তাঁহার রূপ; সুতরাং তিনি উলঙ্গ। তিনি গুণত্রয়াত্মক শূল ধারণ করেন বলিয়াই তিনি শূলী। এই সংসারই শ্মশান। প্রার্থীদিগের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি শ্মশানে বাস করেন। ধর্ম্মই বৃষমূর্ত্তি। তাই তিনি বৃষভবাহন। ক্রোধাদি দোষ সমুদায়ই সর্প। জগন্ময় মহাদেব সেই সকল সর্পকেও সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া ভূষণরূপে ধারণ করেন। বিবিধ কর্ম্ম সকলই জটা স্বরূপ। তিনি সমস্তই ধারণ করেন। ভেদত্রয় তাঁহার ত্রিবিধ নেত্র। ত্রিগুণময় শরীরই ত্রিপুর-পদবাচ্য। তাহা তিনি ভস্মসাৎ করেন বলিয়া তিনি ত্রিপুরঘ্ন। যে সকল সূক্ষ্মদর্শী মহাদেবকে এই রূপ জানিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভজনা কেননা করিবেন? ৩৪৪

[মহাদেবের উপাসনা করিলে মহাদেব বলেন, পুনঃ পুনঃ সাধনা দ্বারা আমার কৃপায় আমার মত হইবে]

সুখের অন্তরায়।

বিজলী যদি হ'তো ধীর,
কুসুমে পেত ভাষা।
চাঁদের যেত কালিমা মুছি,—
প্রাণের যেত আশা!
জগৎ চির-জাগ্রত
উষাটী হ'তো বন্ধ্যা।
প্রখর হেসে, দিবস শেষে
প্রসবিত না সন্ধ্যা।
চিত্ত-দ্বারে নিত্য পাখী
গাহিত সুখে প্রভাতী।
বন-মধুপ গুঞ্জনে
উঠিত প্রেম-আরতি।
শিশির-মাখা সদ্যঃ ফুলে
ভরিয়া যেত ডালা;
চয়ন্-সুখে জুড়াত হিয়া
শুকাত না গো মালা।

হ (নাটোর)

শ্রীগুরু।

তুমি কি আমার গুরু শ্রীকৃষ্ণ দয়াল ?
অভিনব রসে মগ্ন, কখন সম্পূর্ণ নগ্ন,
গৃহস্থ সন্ন্যাসী চির, শচীর দুলাল।
ত্রিশূল খেটক অসি, কভু ধর চক্র বাঁশী,
গলে দোলে বনমালা চরণে নূপুর।
ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা তরে, পদচিহ্ন বক্ষোপরে
ললাটে তিলক রেখা মরি কি মধুর!
স্বভক্ত-চিত রঞ্জন, স্বজন ভয়-ভঞ্জন,
তুমি কি আমার গুরু যশোদানন্দন ?
গোপেশ গোকুলানন্দ, প্রাণাধিক শ্রীগোবিন্দ
তুমি কি ধরিয়াছিলে রাধার চরণ ?
আপদ-হরণ-কর্ত্তা, অনাথ জনার ভর্ত্তা,
নাগান্তক অঘ বক দুষ্ট-দর্পহারী।
দেবতা কুশলাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাত্মন্ সর্ব্বসাক্ষী,
সূর্য্যকুল সূর্য্য তুমি সরব বিহারী।
তুমি কি আমার গুরু, জগন্নাথ কল্পতরু,
দুবাহু তুলিয়া জীবে করিছ আহ্বান।
দুস্তর সংসার-ব্যাধি, আমি দিব মহৌষধী,
এস এস পাপী তাপী শোক মুহ্যমান্।
জাতি ভেদাভেদ-জ্ঞান, নাহি হেথা নানা ভান,
তুমি কি আমার গুরু কুল-কুণ্ডলিনি ?
স্বয়ম্ভু শিবের পরে, ভুজঙ্গ বলয়াকারে,
আধার-কমল-স্থিতা শিব-কুটুম্বিনী।
প্রভাম্বিতা প্রভাবতী, নিত্য মুক্তা আদি সতী,
রেচক, পূরক তুমি কুম্ভকচারিণী।
অতসী-কুসুম-বর্ণা, হাস্যময়ী সুলক্ষণা,
নূতন যৌবনী দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী।
ন্যায়াধর্ম্ম প্রাণরূপা, জ্ঞান নীতি বিশ্বরূপা,
ভূতেশ নয়নানন্দা নমঃ পীতাম্বরী।
সর্ব্বকামফল-দাত্রী, চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী,
তুমি কি আমার গুরু ত্রিলোক-সুন্দরি ?
প্রিয় পতি-হৃদি মাঝে, দাঁড়াও নির্লজ্জ-সাজে,
তুমি কি আমার গুরু শিবে শবাসনা ?
ভীমরূপা ভয়ঙ্করী. স্থির-নেত্রা দিগম্বরী।
পরা-বিদ্যা দীপ্তিময়ী প্রসন্ন-বদনা।
গভীর গর্জ্জনে হাসি, এলাইয়া কেশরাশি,
কি কর তাণ্ডব লীলা দানব-দলনি ?
তুলি ধীরে সব্য কর, সন্তান সন্তাপ হর।
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে বিশ্ব-প্রসবিনী।
কোমলাঙ্গ শ্যাম তনু, নখরে বিরাজে ভানু,
নবীন কিশোর-রূপ ললিত ত্রিভঙ্গ।
কটিতটে পীতবাস, অধরে জড়িত হাস,
বারিজ ভূষণ-হারে শোভিত শ্রীঅঙ্গ।
বদন নয়ন চারু, তুলি-আঁকা যুগ্ম ভুরু,
তুমি কি আমার গুরু শান্তির নিলয় ?
কপিধ্বজ রথোপরে, অশ্ব বল্গা করে ধোরে,
সারথ্য করিয়াছিলে নিশ্চল অব্যয়।
বাম করে রশ্মি ধ'রি, ঈষৎ বাঁকিয়া হরি,
ক'রেছিলে ধনঞ্জয়ে গীতামৃত দান।
আবার তেমনি ক'রে, বল গুরু ! কৃপা ক'রে,
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো জুড়াক পরাণ।
বহিতে পাপীর ভার, বল এত দয়া কার ?
তুমি কি আমার গুরু রাম রঘুবর ?
প্রাপ্ত-রাজ্য অনায়াসে ত্যেজি, দীন-দণ্ডীবেশে,
দণ্ডক-কাননে যাও রাজ-রাজ্যেশ্বর ?
ননীর প্রতিম রাম, নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম
ব্রহ্মচর্য্য, ধৃতি, সত্য, আর্জ্জব অস্তেয়।
নিজে করি আচরণ, শিখাইলে নারায়ণ,
ধাতার বিধাতা তুমি সর্ব্বলোক-ধ্যেয়।
রাজলক্ষ্মী দিলে বনে, আত্ম-সুখ বিসর্জ্জনে,
এখন কর্ত্তব্য ভরা কাহার পরাণ ?
বৈরাগ্য-মাধুর্য্য মূর্ত্তি, ন্যায়-ধর্ম্ম-মাখা শক্তি,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নাহি ভেদ ব্যবধান।
পশু পক্ষী গুণ গায়, রাম নামে মুক্তি পায়
তুমি কি আমার গুরু শ্রীরাম চিন্ময় ?
সৃষ্টি স্থিতি-লয়কারী, রাবণারি ধনুর্ধারী,
ব্রহ্মা. বিষ্ণু, মহারুদ্র অক্ষয় নিশ্চয়।

রা—

আগমনী।

(১)

রাজপথ পাশে গাহিছে ভিখারী
"আয় মা আয় মা উমা"।
শরৎ এসেছে আয় মা শারদা
আয় আয় হররমা॥

(২)

সারাটি বরষ সহিয়াছে কত
নিদারুণ ক্লেশভার।
দীর্ঘ যামিনী পল পল গণি
চেয়েছে মুখ তোমার॥

(৩)

চিরদুখভরা বাঙ্গালীর মুখে
ফুটেছে হাঁসির রেখা।
আঁধার রজনী হইয়াছে ভোর
শুকতারা দেছে দেখা॥

(৪)

ঐ না বাজিছে বোধন বাজনা
ঐ আগমনী-গীতি।
পূরব গগনে উজল মিহির
প্রকাশে মধুর ভাতি॥

(৫)

শেফালিকা রাশি ফুলপরাগে
গন্ধ বিতরে হরষে।
আসিয়াছে দিন আয় মাতা আয়
পুণ্য নবীন বরষে॥

(৬)

তব শুভ্রকান্তি মধুর প্রতিমা
হৃদয়ে বিতরে শান্তি।
তব মঙ্গল করে অভয় নাশিয়া
নাশ গো সকল ক্লান্তি॥

(৭)

গণেশজননী সন্তান তব
সকল সিদ্ধিদাতা।
ময়ূরপৃষ্ঠে শোভে ষড়ানন
মঙ্গলময়ী মাতা॥

(৮)

কমল আসনে বসেন কমলা
ধনধান্য দায়িনী।
বিদ্যাদায়িনী মাতা বীণাপাণি
অজ্ঞানঘোর-নাশিনী॥

(৯)

দশ দিক তুমি করিছ রক্ষা
দশপ্রহরণ ধারিণী।
অয়ি মঙ্গলময়ি শুভদে বরদে
মাতা করুণারূপিণী॥

(১০)

নয়নে তোমার করুণার ধারা
স্নেহ-ক্ষীরনিধি হৃদয়ে।
পয়োধরে তব ত্রিদিবের সুধা
সন্তান-ক্ষুধা নাশয়ে॥

(১১)

বাহুতে তোমার বিপুল শক্তি
মুক্তি চরণে লুটায়ে।
(চির) মুক্তপুরুষ ভোলানাথ যাহা
আদরে ধরেন হৃদয়ে॥

(১২)

ধন্যরে অসুর ধন্য সিংহ তোরা
পেয়েছ পরমপদ।
ভবের বাসনা চরণযুগল
ক'রেছ চিরসম্পদ॥

(১৩)

সর্প তোমার জনম সফল
করিছ মায়ের কাজ।
বিরাট মহান্ এক নবদৃশ্য
দেখিতেছি আমি আজ॥

(১৪)

মনের কালিমা দাওনা ঘ চায়ে
অন্ধ নয়ন খুলিয়ে।
অপার্থিব হেন রূপরাশি তোর
দেখি যেন মাতা হৃদয়ে॥

(১৫)

দিবস রজনী নাহি থাকে যেন
কাল হ'ক কাল গত।
(তব) চরণের তলে অনন্তের তরে
মস্তক করি নত॥

স

বিবিধ।

১

উপাসনা] উপাসনা করিলে ভাবও কত উঠিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যখন বিদেশে যাত্রা করিলে, কান্না পাইল কি? তোমায় ছাড়িয়া মা! কেমন করিয়া থাকিব, কি করিয়া তোমার স্নেহ-মধুর নয়নের আড়ালে যাইব? কে আমায় ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল দিবে? কাহার কাছে আমি দাঁড়াইব? কাহার পানে চাহিয়া আমি জুড়াইব? পরিশ্রান্ত হইলে কাহার স্নেহরসোচ্ছলিত আনন্দধারা আমার দগ্ধহৃদয় শীতল করিবে, ভাবিয়া চ'খে একবিন্দু জল আসিল কি? বাহিরের পিতামাতা ছাড়িয়া দূরদেশে আসিবার যে একটা শূন্য শূন্য ভাব বোধ হয় সেরূপ কিছু হইল কি? যদি না হইল তবে কি করিলে? উপাসনা না অপাসনা?

২

সন্ধ্যা] বন্ধু সন্ধ্যা করিতেছিলেন—সন্ধ্যা শেষ হইল, তাড়াতাড়ি উঠিয়াই আবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি গবাক্ষের মত খুলিয়া দিলেন। অপর বন্ধু নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, তুমি এতক্ষণ কি করিলে? তুমি যেন আপন মনে কাহার সহিত চুপিচুপি কি বলিতেছিলে? বন্ধু বলিলেন, সে কি! সন্ধ্যা করিলাম। উহা চুপিচুপি কথা নহে উহা সন্ধ্যার মন্ত্র।

বন্ধু] সং করিলে না ধ্যা করিলে! আমি ত দেখিলাম তুমি সং

করিতেছ, ধ্যা করিতে থাকিলে কি এত ইন্দ্রিয়-কোলাহল থাকে? মন্ত্র কি? তাহাও ত গুপ্ত কথা। মন্ত্রি ধাতু হইতে মন্ত্রপদ নিষ্পন্ন। মন্ত্রি ধাতুর অর্থ গুপ্তকথা বলা। পঞ্চভূতে তোমার দেহ ইন্দ্রিয় গঠিত—ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি ভূত, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ভৌতিক এই ভূত ভৌতিক—তোমার জ্ঞানরত্ন অপহরণ করিয়াছে, তোমাকে ভূতে পাইয়াছে, তাই ভূতাবিষ্টের মত 'শন্ন আপোধন্বন্যা' ইত্যাদি কত কি অসম্বদ্ধ বলিতেছিলে—উহা মন্ত্র নহে, দেহ ইন্দ্রিয়াদির নিকট লুকাইয়া মন্ত্রময়ীর সহিত জ্ঞানরত্ন উদ্ধার বিষয়ক মন্ত্রণার কথাকে মন্ত্র বলে। তুমি এই ভাবে সন্ধ্যার মন্ত্র উচ্চারণ কর—তোমার বিশুদ্ধ হৃদয়-কমলে মন্ত্রময়ী আসন গ্রহণ করিবেন।

৩

তীর্থস্নান] দেহকে ত এতদিন স্নান করাইলে, চিত্তকে কখন স্নান করাইয়াছ? একদিম এই দেহের পাদ্য মহাস্নান, গন্ধ চন্দন, বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভন মালিকা ভোগ না হইলে তুমি পাগল হও—মনের কথা কি তোমার একদিনও মনে হয় না? আহা একবার চিন্তা কর দেখি কি অবস্থা ইহার! হতভাগ্য অনাদিকাল হইতে অস্নাত, আহার নাই, নিদ্রা নাই, আরাম নাই, বিরাম নাই, সর্ব্বদা তোমার জন্য বেগারি খাটিয়া মরিতেছে, যখন দেহ ইন্দ্রিয় ঘুমায় তখনও ইহার অব্যাহতি নাই তখন একাকী এই চিত্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি সব সাজিয়া তোমার তৃপ্তির জন্য কত দৃশ্য তোমার সম্মুখে স্থাপন করে! আহা তুমি একবার ইহার দিকে চাহিবে না? ঐ দেখ শাস্ত্র মানসিক তীর্থস্নানের কথা বলিতেছেন ইহাকে একটু অবসর দাও, ইহাকে লইয়া তীর্থস্নানে যাত্রা কর। শোন, শাস্ত্র বলিতেছেন—

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জব মেবচ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থ মেবচ।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
তীর্থানামপি তৎ তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা॥
এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্।
যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম্॥

শাস্ত্রমুখে ভগবান্ বলিতেছেন—দেবি! সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বত্র সরলতা, দান, দম (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) সন্তোষ এই সমুদয় মানসিক তীর্থ, ব্রহ্মচর্য্য পরম তীর্থ, তদ্ভিন্ন প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্যকার্য্য ইহারা মানসিক তীর্থ বলিয়া উদাহৃত। কিন্তু চিত্তের পরমবিশুদ্ধি (অর্থাৎ ভগবদ্ভাবময়তা) ইহা তীর্থেরও তীর্থ। তীর্থ ও ভগবদ্ভাব মধুর মহাপুরুষের সংস্পর্শে তীর্থবাস-সুলভ প্রসাদ ও পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে; এই জন্য ভাগবত-ভাব তীর্থেরও তীর্থ। এই তোমাকে শাস্ত্রমুখে ভগবান্ তীর্থস্নানের কথা বলিলেন। তুমি মনকে লইয়া এই তীর্থেস্নান করিতে থাক, দেখিবে পরমগতি অনাহূতভাবে ব্রহ্মলোক প্রেরিত অমানব দূতের মত তোমার নিকটে আসিবে।

৪

মিলনের উপায়] বিরহিণী বিরহ-বেদনা দূর করিবার জন্য যদি বাহিরে বিচরণ করে, যদি প্রতিবেশিনীর সহিত অন্য কথায় চাপা দিয়া বিরহ-যাতনা ভুলিতে চায়, তবে ক্রমে তাহার ব্যভিচারদোষ ঘটে, সেইরূপ চিত্ত! যদি ভগবদ্-বিরহ বুঝিয়া থাক, প্রাণের 'হা হুতাশ' জুড়াইতে বাহিরে যাইও না, দুঃখ দূর করিতে বাহিরের রূপ রসাদি বিষয়সঙ্গ করিও না ব্যভিচারী হইয়া যাইবে। প্রাণকে প্রাণেশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত কর, তাহার রূপ গুণ স্মরণে ও মানসপূজায় রত কর। তার পর যাহা কর্ত্তব্য তিনিই করিবেন। আপন উদ্ধারের জন্য জনকদুহিতার কার্য্য আপন অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত প্রিয়ভাব স্মরণ ও প্রিয়নাম কীর্ত্তন; সেতুবন্ধন, রাবণবিনাশ প্রভৃতি শ্রীরামের কার্য্য।

৫

ভক্তি ও ভক্ত] ভক্তি রাজ-রাজেশ্বরী, বিশুদ্ধ হৃদয়কমল তাঁহার পবিত্র সিংহাসন। 'আসলে কোথায় আসন দিবে' তুমি তাহারই আয়োজন কর। তিনি ভাব-গ্রাহিণী তিনি আসিবেনই। কপটতা করিও না, সরলপ্রাণে প্রণিহিত মনে আপন কর্ত্তব্য করিয়া চল, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর, ভক্তির সিংহাসন স্থাপন বা সংস্কার কর—তোমার সম্মুখে ভক্তির রাজ্য উদ্ভাসিত হইবে। পূর্ব্বে জ্ঞানের জন্য প্রলুব্ধ হইও না, কর্ম্ম অনর্থক পরিশ্রম মনে করিও না, জ্ঞান-রসিক বশিষ্ঠাদি মহর্ষির কথা মুখস্থ করিয়াছ বলিয়া আপনাকে যথার্থ জ্ঞানী মনে

করিয়া আত্মপ্রতারণা করিও না। কর্ম্ম কর, বিনা কর্ম্মে ভক্তি আসে না, আসিলে তুমি আসনখানাও দিবে না, মিথ্যা কল্পনা বলিয়া ফুৎকারে উড়াইবে—কে তোমার গৃহে আসিতে চায়? আয় ভক্তি? ভক্তি যোগীশ প্রাণবল্লভা, তিনি বিনা আসনে কেন আসিবেন? কোথায় আসিবেন? তাই বলিতেছিলাম কর্ম্ম কর, প্রাণ স্থির কর। প্রাণের চঞ্চলতা, বিষয়কামনায় প্রাণের দীর্ঘশ্বাস! ইহা দ্বারা ভক্তির ঘট চালিত হয়, তাই ভক্তি বসিতে পারেন না। প্রাণ স্থির কর, নাসাদ্বারে প্রাণকে দৌবারিকরূপে স্থাপন কর; আপন অঙ্গজ্যোৎস্নায় তোমার হৃদয়মণ্ডপ উদ্ভাসিত করিয়া ভক্তি আসিবেন। (ক্রমশঃ)

সহকারী সম্পাদক ৺কাশীধাম।

বিশ্বনর্ত্তকী।

যে মায়া মহৎব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র একটী জীবকেও বাদ দেন না, যাঁহার রঙ্গে এই ত্রিভুবন কোথাও শান্ত নাই সেই, মায়ার বর্ণনা কে করিবে? নির্গুণব্রহ্মে মায়া নাই। চৈতন্যদীপ্তা মায়া সগুণব্রহ্মকে লইয়া জীবভাবে নৃত্য করে।

এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে একমাত্র মায়াই নৃত্য করিতেছেন। ভূতল পাতাল, নভস্তল ঐ নটীর পাদবিক্ষেপ ভূমি। তারকাপুঞ্জ ঐ নটীর গাত্রনিঃসৃত স্বেদবিন্দু। ঐ নটীর গগনরূপ মুখে, চন্দ্রসূর্য্যরূপ কুণ্ডল দোদুল্যমান। মেঘমালারূপ দশা (পাড়) বিশোভিত নীলাম্বর, ব্রহ্মাণ্ড নাট্যশালার অভিনেত্রীর পরিধেয় বাস। বিবিধ রত্নখচিত সপ্তসাগর ঐ অভিনেত্রীর হস্তবলয়। ঐ অভিনেত্রী প্রহর দিবস পক্ষ প্রভৃতি রূপ নেত্র কটাক্ষপাতে অম্বরতল উদ্ভাসিত করিতেছে। কুলপর্ব্বত সকল ঐ অভিনেত্রীর শিরোভূষণ কিরীটাদি, কিরীট কখন অবনমিত কখন উন্নমিত হইতেছে। স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী উহার হারযষ্টি। গঙ্গাসলিলে প্রতিবিম্বিত শশী ঐ হারের চন্দ্রকান্তমণি। সান্ধ্যমেঘ উহার করপল্লব, তাহা কখন বাহিরে বিকম্পিত কখন বা তিরোহিত। ভুবনবাসীজনগণ ঐ অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, তাহা আবার অবিরত ঝন্‌ঝনায়িত হওয়ায় ঐ নাট্যশালা অতি মনোহর হইতেছে। বলা হইতেছে এই ব্যোমাত্মক

রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিণী নর্ত্তকী নিয়তই জগতের অভিনয় করতঃ নৃত্য করিতেছে। সুখদুঃখ দশা ঐ নাট্যরঙ্গের নটীর রসভাব পরিস্ফুটকরণ। এই সংসার-নাটকের অভিনয়ে, বিবিধ বিকারতরঙ্গপূর্ণ নিয়তিবিলাস বিষয়ে পরমেশ্বর সর্ব্বদা সাক্ষী হইয়া সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ তিনি উক্ত নটী ও নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন।

এই বিশ্বনর্ত্তকীর নৃত্য অনুসরণ করিতে পারে এই ত্রিভুবনে এমন লোক কেহ নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্ত জীবে কি করিতে পারে? অপরাপ্রকৃতি পরাপ্রকৃতি, ঈশ্বর, সগুণব্রহ্ম সকলকে লইয়া ইঁহার রঙ্গ। কর্ম্মী, বিশ্বাসী-ভক্ত, অর্দ্ধজ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলের উপর ইঁহার সমান অধিকার। জড়প্রকৃতি চেতনপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই ইঁহার রঙ্গমঞ্চ। আপনিই রঙ্গমঞ্চ, আপনিই অভিনেত্রী, আপনিই দর্শক, আপনিই রঙ্গ। বলা যায় না, ধারণা করা যায় না এ রহস্য কি?

ব্রহ্মে উঠিয়া ব্রহ্মকেই আবরণ ইঁহার প্রথম ক্রীড়া। শুধু তাহাই নহে, পরমশান্ত সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে আবরণ করিয়া অন্তরূপে দেখান ইঁহার দ্বিতীয় রঙ্গ। আপনার গুণে সেই রমণীয় পরমপুরুষকে গুণবান্ করিয়া আপনি মায়াবিনী বিশ্বনর্ত্তকী, আর তিনি মায়াবী বিশ্বনর্ত্তক। নৃত্য করিতে করিতে তিনি আকাশের ন্যায় ভীষণ দেহ ধরিয়া সেই মায়াবী পুরুষের অর্চ্চনা করেন, সেই পুরুষও তাঁহার ন্যায় বিশাল শরীরে নৃত্য করেন।

অব্যক্ত অবস্থায় থাকিয়াও বিশ্বনর্ত্তকীর রঙ্গের বিরাম নাই। পরমশান্ত পরমপুরুষকে লইয়া কোন এক অব্যক্ত দেশে কোন এক অব্যক্ত বেশে আসিতেছেন। পুরুষ আদি প্রেমিক আর তিনি আদি প্রেমিকা।

ইনিই বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে শুকদেবের পশ্চাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাইয়াছেন; জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠদেবকে পুত্রশোকে অধীর করাইয়া গলদেশে প্রস্তর বাঁধাইয়া প্রাণত্যাগে ছুটাইয়াছিলেন ইনিই। আবার ইনিই ব্রহ্মহত্যা হইবে ভয় দেখাইয়া বিপাশার অধিষ্ঠাত্রী-দেবীকে ব্যাকুল করিয়া বশিষ্ঠদেবকে পাশমুক্ত করাইয়াছেন। শুভ্রশ্মশ্রু পরমভক্ত নারদকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাঁহার গর্ভে বহু সন্তান সন্ততি—আবার তাহাদের পুত্র কন্যা এই সব করাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যে পরিবৃতা মৎস্য-জননীর ন্যায় রঙ্গসলিলে ভাসাইতেছেন, খেলা করাইতেছেন, আবার ভয় দেখাইয়া জলমগ্ন করাইতেছেন—আবার স্ত্রীবেশ

ঘুচাইয়া; দাড়ী পরাইয়া, চমৎকার ভাবে আপনার মূর্ত্তি আপনাকে দেখাইয়া বলাইতেছেন এ কি—অমন সুন্দর কমনীয় মুখে এই কর্কশ কেশরাশি! গাধীব্রাহ্মণকে এককণেই চণ্ডাল করিয়া, রাজা করিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইতেছেন; আবার রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এক রাত্রির এককণেই দ্বাদশ বৎসরের দুঃখ ভোগ করাইতেছেন—কে ইহার লীলার সংখ্যা করিতে পারে?

বদ্ধ জীবের উপরে ইহার ক্রীড়া কি অদ্ভুত! কাহাকেও রাজেশ্বর করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী করিয়াছেন কাহাকেও আবার বা বৃক্ষতলা সার করিয়া দিনযামিনী দুঃখে কাঁদাইতেছেন, আবার কেহ বা সব শূন্য হইয়া আনন্দে গাহিতেছে—

কেহ সংসারে এসেচে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্যধন রে।
আমার দরিদ্রেরই ধন দু'খানি চরণ
যতনে পরেচি হায় রে॥

এক দণ্ডে হাস্য ক্রন্দন, এক দণ্ডেই শীতে কম্পমান, পরক্ষণেই গাত্রদাহ—কি এই বিচিত্র রঙ্গ! তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্মাণ্ড-রঙ্গমঞ্চে এই বিশ্বনর্ত্তকীর অভিনয় কে বর্ণনা করিতে পারে?

কে এই মায়া? তিনি নৃত্য করেন কি নিমিত্ত?

"যিনি চিদাকাশ শিব তিনিই মহাকাল, আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দনশক্তিই মায়া—মহাকালী। মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। পবন ও পবনস্পন্দ যেমন একই পদার্থ, উষ্ণতা ও অনল যেমন একই পদার্থ—সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দনশক্তি সর্ব্বদা এক। স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয় সেইরূপ ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা শিব নামক নির্ম্মল শান্ত চিদাত্মাও লক্ষিত হন। ঐ চিন্মাত্র শান্ত শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম বলেন। স্পন্দ শক্তি তাঁহার ইচ্ছা। নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনই সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্মে ইচ্ছা নাই সগুণে আছে। আবার ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্যপ্রকাশ করিয়া থাকে। সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা নগর নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ ঐ নিরাকার শিবের ইচ্ছা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্যনামে সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া প্রকৃতিনামে দৃশ্যাভাসে অনুভূত, উৎপত্তি

প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বাড়বাগ্নি জ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া শুষ্কা নাম ধারণ করেন। উৎপল বর্ণ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি চণ্ডিকা; একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া জয়া. সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধা; সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া। বলে ইঁহাকে কেহ আঁটিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম অপরাজিতা। ইঁহার মহিমা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম দুর্গা। প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি—এই জন্য ইহার নাম উমা (উ, ম, অ)। গায়ক অর্থাৎ জপকারীদিগের ইনিই পরমার্থ স্বরূপ বলিয়া "ইঁহারই নাম গায়ত্রী। সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম সাবিত্রী। স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইঁহার নাম সরস্বতী।। ইনিই সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে অকারাদিমাত্রা ত্রিতয়শূন্য শব্দ ব্রহ্মনামক প্রণবের নাদভাগের সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন এবং হৃদয়পদ্মের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহরনামক শিবের মস্তকের ভূষণ বিন্দুরূপা ইন্দুকলা বলিয়াও ইনি উমা।

আর্য্যগণ ইঁহারই পূজা করিতেন। আর্য্যবংশধরগণ প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ ভাবে ইঁহার আগমন লক্ষ্য করিয়া শরৎকালে ইঁহাকে দুর্গা ভাবিয়া এখনও পূজা করেন; অমাবস্যায় ইহাকে কালী ভাবিয়া পূজা করেন; অন্যান্য সময়ে অন্য মূর্ত্তিতে ইঁহার পূজা করেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি পূজা নিরর্থক পুতুলপূজা নহে। অজ্ঞানীরা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিমাপূজার নিন্দা করে। যাঁহারা একটু ভিতরে ঢুকিয়াছেন তাঁহারা অজ্ঞানীর শত চীৎকারেও এই রমণীয় পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইতে পারেন না। চিরদিন ইহা আছে; চিরদিনই ইহা থাকিবে। একটু সংযমী হইয়া—ছেলেখেলা করিতেছ না ভাবনা করিয়া একটু ভক্তিভাবে এই জগৎজননীর পূজা করিয়া দেখ দেখিবে ব্রহ্ম উপাসনার এত সহজ উপায় আর নাই হইতেও পারে না। তোমার ব্রহ্ম-উপাসনা বিশ্বাসের ধর্ম্ম আর এই পূজা বিশ্বাসের ধর্ম্মকে অনুভবসীমায় আনয়নের সুন্দর পন্থা।

শ্যামা।

শ্মশানে নাচ আঁধার মেখে
রাজার মেয়ে শ্যামা।
বিজলি হাসি খল খল
উজলে নাহি সীমা।
অন্ত নাই প্রান্ত নাই
একি মা মূরতি!
চিকুর ঘন কাদম্বিনী
আঁধিয়া জড়ে রাতি।
ঘোরা, ভীমা, ভৈরবী
জুড়ি' ভুবন সারা।
বক্ষে শত গঙ্গা বহে
শত যমুনা ধারা।
শত চন্দ্র সুরজ-ভাতি
স্মিত বদনে খেলে।
বিশ্ব ভোলা ভব তাই
চরণে পড়ে ঢলে'।
বন কুসুম তরু লতা
অর্ঘ্য হেন রাজে।
কবি বাঁশরি রিনি ঝিনি
নুপুর তাহে বাজে।

হ (নাটোর)

সন্ধ্যা।

অহরহঃ সন্ধ্যাম্ উপাসীত

ইহার অর্থ কি ?

অহরহঃ অর্থে অহঃ + অহঃ = প্রতিদিন ইহাই শব্দার্থ। কিন্তু ইহার লক্ষ্যার্থে 'সদা সর্ব্বদা'; ইহাই বুঝায় উপাসীত -(উপ + আস্ + বিধিয়াৎ)— বিধি লিঙে বিধি বা নিয়মবোধ জন্মায়। উপ—সমীপে আস্—অর্থে বসা—সমীপে বসা বক্তব্য।

কাহার ?

সন্ধ্যা - সম্ + ধ্যৈ + অল্—সম্যক্ প্রকার ধ্যান। সম্যক্ ধ্যান সদাসর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

ধ্যান কাহার ?

ধ্যেয় ভিন্ন ধ্যান নিরর্থক। যেমন পদার্থ দৃষ্টির বিষয়; পদার্থ ভিন্ন দর্শনের যোগ্যতা নাই—দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য নাই, তেমনি ধ্যেয় ভিন্ন ধ্যান নাই। তাই ধ্যান বলিলেই ধ্যেয়ের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। ধ্যেয়ই

ধ্যানকে আনিয়া দেয়। কিন্তু এখানে ধ্যেয় ও ধ্যান অভেদার্থক। ধ্যান ও ধ্যানসাধ্য ধ্যেয় উভয়ে জড়িত হইয়া ধ্যান শব্দের লক্ষ্যার্থ হইয়াছে। যেমন কোন পরিচিত ব্যক্তির বা পরিচিত দ্রব্যের নাম উল্লেখ না করিয়াই তৎসম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলেই সেই পরিচিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তদ্রুপ এ-স্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। সন্ধ্যা বলিলেই পূর্ব্ব-পরিচিত কোন ধ্যেয় পদার্থের বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই জন্য 'ধ্যান' করিবে এই কথাই বোধ উদয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

ধ্যান কি? ধ্যান সাধ্য ধ্যেয় ও ধ্যান একার্থ বোধক তখন ধ্যান কোন্ জিনিস?

সমস্ত চিত্তবৃত্তির বিলোপ সাধন করাই ধ্যান। চিত্ত এক সময়ে নানাবিধ তরঙ্গ তুলে, নানাবিষয়ের স্মরণ করাইয়া দেয় এবং মানস রাজ্যে এক ঘোর আলোচন সৃষ্টি করে যে উপায়ে তাহার সংহার করিয়া স্থিরতা বা সাম্যভাব আনয়ন করা যায় তাহাই ধ্যান।

দেখা যায় একটু চুপ করিয়া বসিলেই কত কি মন চিন্তা করিয়া ফেলে ইহাই চিত্তের মলিনতা; মলিন চিত্তই এককালে বহুচিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। চিত্তের বহুমুখীন বৃত্তি সংহার করিয়া একমুখীন করাই ধ্যানের উদ্দেশ্য। একমুখীন অর্থে একাগ্র করাই ধ্যান। তাহা হইলেই হইল একাগ্রতাই ধ্যান। একাগ্রতাই যদি ধ্যান হয় তবে কোন বিষয়কে অগ্র করিয়া এক হইবে? সেই অগ্র বিষয়টাই কি ধ্যেয়?

হাঁ সত্য বলিয়াছ। সেই অগ্র বিষয়টী ধ্যেয়। বহু অগ্র হওয়াই বিক্ষেপ আর এক অগ্র হওয়াই ধ্যান। এখন দেখ এই একটী কি? যাহাকে লইয়া চিত্ত সাম্যভাবে অবস্থান করিবে সেই একটী কোন জাতীয় পদার্থ? ইহা কোন্ ধর্ম্ম বিশিষ্ঠ?

দেখ চিত্ত যখন বিষয় সংস্পর্শে বাস করে তখন ইহা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে বহুক্ষণ একদিকে অগ্র হইয়া থাকে না, অন্ততঃ কোন বিশেষ বিষয়ে একদিকে অগ্র হইলে ইহার বিষয় ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।

বিষয় ধর্ম্ম কি? বিষ্কিনোতি বধ্নাতি ইতি বিষয়—যাহাতে বদ্ধ করে তাহাই বিষয়; বন্ধন করে কে? বিষয়ের মধ্যে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যাহা বন্ধন করে? ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকট জনিত সুখ সাধন, তাহা হইলেই হইল

বিষয় সুখসাধন ধর্ম্মদ্বারা চিত্তকে বদ্ধ করে; এই বন্ধনের নাম আসক্তি; তবেই হইল আসক্তি ধর্ম্ম বিশিষ্ট কোন এক বিশেষ বিষয়ে চিত্ত কখনই বহুক্ষণ ধারণ করা যায় না; ইহা সকলেরই অনুভব যোগ্য। তাই বলা হইয়াছে বিষয় ধর্ম্ম লোপ না হইলে কোন পদার্থে চিত্তকে একাগ্র করা যায় না।

তাহা হইলেই হইল বিষয় আসক্তির নিদান নহে; বিষয়ের কোন বিশেষ ধর্ম্মই আসক্তির নিদান। বিষয়ে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যদ্বারা চিত্ত ক্ষণপ্রভার মত কোন্ বিষয়ের রসাস্বাদন করিয়া বিষয়ান্তরে রসের লোভে ছুটিয়া যায়?

দেখ প্রত্যেক পদার্থের দুইটী করিয়া শরীর আছে একটী লক্ষ্য বা দর্শন যোগ্য অপরটী অদৃশ্য। যাহা লক্ষ্য বা ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই বাহ্য তাহাই স্থূল শরীর; যাহা ইন্দ্রিয়গোচরের অযোগ্য তাহাই অন্তর বা সূক্ষ্ম শরীর। যেমন তোমার শরীরের হস্ত পদ ইন্দ্রিয় আকার ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গোচর; কিন্তু মন, বুদ্ধি ইত্যাদি তদ্রূপ নহে; মন, বুদ্ধি কি দেখা যায়? মন, বুদ্ধি দেখা যায় না সত্য কিন্তু অনুমানে ইহার প্রত্যক্ষ হইতেছে; মন, বুদ্ধি, প্রাণ না থাকিলে এই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য সাধিকা শক্তি থাকে না; প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইহারাই প্রতি নিয়ত শক্তি যোগাইতেছে তাই এই দেহ জীবিত ও ক্রিয়াশীল নতুবা জড়; প্রাণ, মন, বুদ্ধি এইগুলি সূক্ষ্মশরীর আর এই দেহ স্থূল শরীর। সেই জন্য ইন্দ্রিয়ের অপর নাম বহিঃকরণ; আর মন ও বুদ্ধির নাম অন্তঃকরণ। সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থের বাহিরে যেমন দৃশ্যমান অবয়ব আছে তেমনি ভিতরে প্রাণ মন স্থানীয় অপর একটী সূক্ষ্ম বা অন্তঃশরীর আছে তাহাই এই বিষয়ের মূল। তোমার ইন্দ্রিয়ের সহিত এই বিষয়ের ইন্দ্রিয় স্থানীয় রূপ রস ঘ্রাণই ত আসক্তি জন্মায় আর এই রূপরস ঘ্রাণ ভুলিয়া যাও চিত্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ভুলিয়া যাইবে। ভুলিয়া স্থির হইবে। স্থির হইয়া দেখিবে সর্ব্বজীবে, সর্ব্বভূতে, জড়ে ও চেতনে অলক্ষ্যে থাকিয়া শক্তি বর্ত্তমান আছে, সেই শক্তিই আপন শক্তিতে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও বিভিন্নরূপে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। শক্তি অংশে সর্ব্বজীব এক; পার্থক্য, আকার গত। শক্তি জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র অব্যাহত ভাবে ঘোর গতিতে এই বিশাল জগৎ চালন করিতেছে। সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণভূত এই শক্তি ওতঃ প্রোতভাবে বিরাজমান আছে। এই শক্তি অংশে চিত্তকে ধারণা কর দেখিবে চিত্ত বিষয়ের বাহ্য অংশ ভুলিতেছে। একমুখীন হইতেছে। শক্তির

অসীমত্ব বিশালত্ব চিন্তা করিয়া চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও কি অপূর্ব্ব রস পাইতেছে। এই বিশালতা চিত্তের রসাস্বাদনকে শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহাও চিত্তের আসক্তির পদার্থ। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নাই। নিখিল জগৎপ্রসবিনী ত্রিলোকপালিনী সর্ব্ব জীবের সর্ব্বভূতের অন্তরবাসিনী শক্তিই তোমার একাগ্রতার লক্ষ্য। তাহা হইলে দেখ ধ্যানই ধ্যেয় আনিয়া দিল।

এই শক্তির উপাসনাই কি সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা শক্তির উপাসনা। তবে কিছু বিশেষ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শক্তি অলক্ষ্য বা ইন্দ্রিয়াতীত; এই শক্তির কার্য্য দুই প্রকার। শক্তি, শক্তি অংশে এক হইয়াও কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। একের নাম প্রবৃত্তি অপরের নাম নিবৃত্তি; প্রবৃত্তি নিম্নমুখাভিগামিনী, নিবৃত্তি ঊর্দ্ধমুখাভি-গামিনী। প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন প্রকৃতির অধীন হয়—তখন মনও স্থূল এই দৃশ্যদর্শন-রাজ্যে আসিয়া পড়ে—আর যখন নিবৃত্তির অধীন হয় তখন মন ইন্দ্রিয় ও জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে বিচরণ করে। অধঃ অর্থে ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ; ঊর্দ্ধ অর্থে বিশাল বা অসীম। এই বিশালতাই বা অসীমতাই সুখের মূল। তাই এই নিবৃত্তিমার্গ গামিনী শক্তিই উপাসনীয়া অপরা নহে; অপরের উপাসনা ইন্দ্রিয় ও মন স্বভাবতঃই করে; স্বভাবতঃই মন ইন্দ্রিয়ও বিষয়ে গমন করে; এই স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার জন্যই নিবৃত্তিপথ-গামিনীর আশ্রয় গ্রহণ। এই নিবৃত্তিমার্গ-গামিনী শক্তিই "বরণীয়ভর্গ" বা গায়ত্রী। "বরণীয়ভর্গ"ই বিভিন্নরূপে বিভিন্নমূর্ত্তিতে বিরাজমানা ইনিই দশ-মহাবিদ্যা ইনিই চণ্ডী গীতা; ইনিই সতী সাবিত্রী, রাধা, দুর্গা, ইত্যাদি মায়িক দেহধারণ করিয়া লীলা করিয়াছেন এবং বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। তাই গায়ত্রী মূলতঃ শক্তির উপাসনা ইহার উপাসনায় সকলের উপাসনা হয়। স্বরূপে বরণীয়ভর্গ তটস্থে কালী, দুর্গা ইত্যাদিকে উপাসনা কর সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে। চিত্তে পরমানন্দ রসের অনুভব করিবে।

আচ্ছা গায়ত্রী কি তান্ত্রিক না বৈদিকমতোক্ত দেবী ?

বেদ ও তন্ত্রবিরোধী নহে; পরস্পরে বিশেষ একতা আছে। বেদ যাহা বলেন তন্ত্র সমন্বয়ে তাহাই বলেন তন্ত্র যাহা বলিয়াছেন বেদ তাহা খণ্ডন করেন নাই। উভয়েই জীবের কল্যাণার্থে প্রচারিত।

বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান বিভিন্ন; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে উভয়ই এক কথা বলিয়াছেন। উভয়েই জ্ঞান ও কর্ম্ম সমকালে অভ্যাসের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব, জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম বাতুলতার অনুষ্ঠান। তবে বৈদিক ও তান্ত্রিককর্ম্ম বিভিন্ন প্রকারের। গায়ত্রী যেমন একদিকে 'ছন্দসাং মাতঃ' বেদমাতা; তেমনি অপর দিকে 'গায়ত্রীতন্ত্রে' গায়ত্রীকে সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপা বলা হইয়াছে। ইনিই কুলকুণ্ডলিণী, ইনিই জীবচৈতন্য ইনিই দুর্গারূপে দশপ্রহরণধারিনী, মহাবিদ্যারূপে অশেষ কল্যাণবিধায়িনী।

এস আমরা সকলে মিলিয়া এই 'ছন্দসাং মাতঃ' 'সৃষ্টিস্থিতি অন্তকারিণী' মহাশক্তির শরণাপন্ন হই তাহা হইলে আমরা কখন মন বাক্য ইন্দ্রিয় দ্বারা বিপথে যাইব না। প্রতিদিনে তিনবেলায় সামর্থ্যে অহরহঃ ইহাকে আত্মনিবেদন করি বিশেষ উপলক্ষে দুর্গা, বাসন্তী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা ইত্যাকার বিভিন্নমূর্ত্তিতে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া কৃতার্থ হইয়া যাই। ইহাতে আত্মহিতসাধন হইবে আত্মহিতকারীই পরোপকারে সমর্থ। তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা দেশের হিত হইবে। এই উপাসনায় আমরা মনে প্রাণে কর্ম্মে, ধর্ম্মে, এক হইব। এই উপায়ে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরশান্তি লাভ করিবে।

নিত্য ধ্যানের বিষয়—

আত্মস্বরূপ চিন্তাই উপাসনা। উপাসনার উদ্দেশ্য স্বরূপে যাওয়া।

আচ্ছা, স্বরূপের চিন্তা করিব কিরূপে?

কেন, তুমি নিত্য যে কাজ কর, তাহার মধ্যেই স্বরূপ চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। আর্য্যঋষিগণ যেমন বেদ, বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদ্ ইত্যাদি গ্রন্থাদি রচনা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন—তেমনি আবার সেই জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবার জন্য সহজভাবে সাধারণের বোধের অনুরূপ —সন্ধ্যা, গায়ত্রী ইত্যাদি নিত্যক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা, গায়ত্রী—অল্প ও সংক্ষেপ; সহজ ভাবে বুঝিলে সহজ অর্থ; কিন্তু ইহার তত্ত্ব অতি গভীর, এবং এই অল্পাক্ষর মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত তত্ত্বের সন্নিবেশ রহিয়াছে। এক গায়ত্রীর অর্থ ই যথেষ্ট।

আমি বুঝিতেছি না, আপনি বুঝাইয়া দেন।

দেখ, সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় এই তিনটী চিন্তার প্রধান জিনিস। সাংসারিক

জীবের দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই চিন্তায় সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মই এক মাত্র সৎআশ্রয় আর সমস্তই অসৎ; এই সত্যস্বরূপের সৃষ্টি সঙ্কল্পেই সৃষ্টি, স্থিতি সঙ্কল্পে স্থিতি এবং লয়সঙ্কল্পে লয়। সত্যস্বরূপের এই তিনটী গুণ-ময় অসংমূর্ত্তি। এই গুণময়মূর্ত্তি তিনটী সগুণ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। প্রাণায়ামে এই কথাটী আছে। এই তিন দেবতার ধ্যান দ্বারা জগতের এই ত্রিবিধ অবস্থা চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া লও; এবং অন্যান্য চিন্তা বাদ দিয়া এই চিন্তা মননের বিষয় কর। তাহা হইলে মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা স্থান পাইবে না। এই চিন্তা দ্বারা যখন চিত্তের সাম্যভাব আসিবে, তখন পরমতত্ত্বের চিন্তার অবসর হইবে। ইহাই প্রথম ধ্যানের বিষয়।

যেই চিত্ত, বালকের উচ্ছৃঙ্খলক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিষ হইতে মুক্ত হইল তখনই "অঘমর্ষণ মন্ত্র" চিন্তা কর। ইহাই স্বরূপ হইতে কিরূপে বিকৃতি হইল; কিরূপে স্বরূপের অছন্দ স্পন্দনে জগৎ উৎপন্ন হইল; এই সমুদ্র, দিবারাত্রি, কাল, পৃথিবী নভোমণ্ডল, যাহা আমাদের ব্যবহারিক জগতের জননী—এই চিন্তাই সমতাভাব প্রাপ্ত চিত্তের দ্বিতীয় চিন্তা। ইহার দ্বারা চিত্ত আপন স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার পন্থা পাইবে। সৃষ্টির প্রণালী জানিয়া তাহার বিপরীত পথে স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার উপায় নির্দ্দেশ কর। তাহা হইলে চিন্তায় দুইটী জিনিস পাইলে।

১ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়—

ত্রিবিধ গুণ বৈষম্যের প্রধান কার্য্য।

২। সৃষ্টি স্বরূপ ও স্বরূপের বিকৃতি।

এই দুইটীই সগুণব্রহ্মের উপাসনা।

তৃতীয়—সবিতা প্রসবকর্ত্তা শুদ্ধ তেজঃস্বরূপ সবিতাই এই দ্বৈতময় জগৎ-ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা। ইনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অন্তর্ব্বর্ত্তী চৈতন্য; ইনিই সূক্ষ্মতেজঃরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন ইনি স্থূলরূপে বিশ্বকে আলোক ও তাপদান করিয়া সমস্ত লোককে পালন করিতেছেন ইনি অশেষ কল্যাণপ্রদ মঙ্গলমূর্ত্তি সেইজন্য সকল দেবতাকেই ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী মনে করিয়া ধ্যান করা হয়। এই সৌরমণ্ডলই স্থূল সাকার দেবতার আসন; এই জগতে ইনিই সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ।

অতএব যে দুইটি চিন্তার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা এই স্থূল সবিতা ও অন্তর্য্যামী তেজস্বরূপ সবিতার মধ্যবর্ত্তী মনে করিয়া ধ্যান করিবে।

চতুর্থ—গায়ত্রী উপাসনা।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয় এবং শেষোক্ত বিষয়টির জন্য অজ্ঞজীবের বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তিকে এই শাস্ত্রীয়মার্গ দ্বারা পরমতত্ত্বস্বরূপ গায়ত্রীতত্ত্বে নিবেশ করিতে হইবে; ইহাই এই সন্ধ্যার সঙ্কেত।

গায়ত্রীদেবী সৃষ্টিস্থিতি লয়শক্তির জননীস্বরূপ। গায়ত্রী প্রকৃতির সাম্যমূর্ত্তি; এই পরমাপ্রকৃতির পরেই পরমপুরুষ। পরমপুরুষের অঙ্গবিলাসিনী শক্তিই এই গায়ত্রী; প্রকৃতির শক্তি দ্বারা মুহ্যমান জীবের এই প্রকৃতির উপাসনাই প্রথম প্রয়োজন; যখন গায়ত্রী ধ্যান দ্বারা চিত্ত সম্যক শান্তভাব লাভ করে তখন পরমতত্ত্ব আপনিই হৃদয়ে আসিয়া প্রবেশ করে। এই পরমব্রহ্ম-বোধক পদার্থ প্রণব। এই প্রণব সমস্ত মন্ত্রের মূল বা বীজ এই প্রণব অগ্রে উচ্চারণের বিধান এই জন্য। উদ্দেশ্য ও উপায় একত্র সন্নিবেশ ইহাই শাস্ত্রের কৌশল। জীব যেন উদ্দেশ্যের অন্বেষণে আসিয়া উপায়ের মধ্যেই আপনাকে না হারাইয়া ফেলে তজ্জন্য সর্ব্বত্রই এই ওঁকার বিরাজমান। তাহা হইলেই পাইলে—

১ম। সগুণ দেবগণ।

২য়। স্বরূপ ও বিকৃতি।

৩য়। অন্তর্যামী সবিতা।

৪র্থ। পরমব্রহ্ম প্রতীক গায়ত্রীতত্ত্ব।

প্রভাতে—মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় এই উপাসনায়ব্রতী হও নিশ্চয়ই পথ পাইবে।

আঃ (মালদহ)

গায়ত্রী।

গান আর ত্রাণ এই দুইটি কথা তোমাতে পাই। গান কেনা ভাল বাসে? জগতে কেনা গান গায়? বা গাহিতে চায়? গান ছন্দমত শব্দ। সকল গান শব্দ বটে কিন্তু সকল শব্দ গান নহে। ছন্দমত শব্দই গান।

যে গান গায় তারে তুমি ত্রাণ কর, এই জন্য তুমি গায়ত্রী। কোন্ গান? কোন্ গানটি গাইলে তুমি ত্রাণ কর? সেই গানটিই তুমি নও যে সে গানটি গায় তারে তুমি ত্রাণ কর।

কেন এ গানের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? গান গাইলে আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দই তোমায় স্পর্শ করিতে পারে। আনন্দই যেন তোমার সমান বস্তু। সমান না হইলে মিশিতে পারা যায় না। সমান না হইলে মিলন হয় না!

সংগীতের আনন্দ তোমার সমান পদার্থ। সংগীতের আনন্দ হয় সুরে আর ভাবে। যাহারা ভাব বুঝিতে নাও পারে তাহারাও মিষ্টস্বরে আনন্দ পায়। আবার সুরের মধ্যে যাহারা ঢুকিতে পারে না, যাহারা তান লয়মান নাও বুঝে তাহারা কণ্ঠস্বরে আনন্দ পায় বা গানের ভাবে আনন্দ পায়। এমন কি সুর ঠিকমত না হইলেও ভাবযুক্ত হইলে, গায়কের ভাব থাকিলেও গান মিষ্ট লাগে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ তার হয় যার সুর, তান, মান লয় ভাব সকলগুলি অনুভব হয়। না জানি কতই আনন্দ তাহার হয়।

সুর ত আঁকা যায় না! সুরের কথা বলা হইবে কিরূপে? এই গানের অক্ষর ২৪টি। আর ইহাতে তিনটি পদ ৮ অক্ষর করিয়া। এই তিনটি পদ পুনঃ পুনঃ ছন্দমত উচ্চারণ করিলেই এই গান হয়। এই ত্রিপদার আদিতে ও অন্তেও ঘনীভূত স্বর সমষ্টি বা সুর সমষ্টি বা শব্দ সমষ্টি একটি—এবং তাহার যে বিশ্বব্যাপী স্বর-লহরী, যে লহরীতে জগৎ ভরিয়া যায়, সেই বিশ্বব্যাপীর কথা তাহার পরে।

এখন সুর বাদ দিয়া শুধু ভাবের কথা একটু বলিব।

যে মহা সঙ্গীতে জগতের ত্রাণ হয় সেই শ্রবণ মনঃরসায়ন কথা মধুর করিয়া কিরূপে বলি? গান গাহিতে না জানিয়া শুধু কথায় বলিলে কি তোমার ভাল লাগিবে? তোমার কাছে কি পৌঁছিবে? যদি পাখীর মত কলধ্বনি হয়, যদি অব্যক্ত মধুর ধ্বনি ব্যক্তভাবে শ্রবণে প্রবেশ করে, যে সঙ্গীত ঘন হইয়া স্পষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করে যাহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, পশিয়া প্রাণ আকুল করে। না জানি কতেক মধু ঐ নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলগো কেমনে পাইব সই তারে—যদি রসের কথায় রসভঙ্গ না হয়, যদি ছন্দের বিষয়ে ছন্দভঙ্গ না হয় তবেই সুন্দর হয় তবেই ত মধুর হয় তবেই সে ভাব মিলিত স্বরলহরী—সঙ্গীত রাণী তুমি

তোমার কাছে পৌঁছিতে পারে, তবেই ত সে ব্যাকুল সঙ্গীত, সঙ্গীত—মাতৃকার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। কিন্তু ইহা কিরূপে হইবে? রসস্বরূপিণী স্বরসবতী সরস্বতী তুমি। তুমি জিহ্বাগ্রে না বসিলে কে কবে ভাবের কথা ভাবে বলিতে পারে? কে কবে মধুর ভাবকে মধুর ভাষায় মিলাইতে পারে?

ওঁকার পঞ্জর শুকি; উপনিষদ উদ্যানকেলীকলকণ্ঠি বীণাস্বাদন উল্লাসপরা সঙ্গীত মাতৃকা—তোমায় বন্দনা করি! তুমি এই বিশ্বসঙ্গীতের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া দাও—তুমি এই গান নিজে গান করিয়া কেমন করিয়া ত্রাণ হয় বুঝাইয়া দাও।

২

আদিতেও প্রণব অন্তেও তাই। মধুময় অমৃতময় ওঙ্কার ঝঙ্কার উঠিতেছে, উঠিয়া বিস্তৃত হইতেছে, দিগদিগন্ত মুখরিত করিতেছে, করিয়া আবার সেই ঝঙ্কার ওঙ্কারে মিশিতেছে। গুঞ্জনমত্ত মধুব্রত মধুর গুঞ্জন তুলিয়া চারিদিক আপ্যায়িত করিয়া আপনাতে আবার সেই গুঞ্জন টানিয়া লইতেছে। সুন্দর বীণা ত্রিতন্ত্রীতে নাচিয়া নাচিয়া সঙ্গীত উদ্গীরণ করিয়া তন্ত্রীবদ্ধ বীণায় মিশিয়া রহিতেছে। মধুর প্রভাতে সূর্য্যরশ্মি জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যেই পশিতেছে। বিশ্বনর্ত্তকী বিশুদ্ধ তালমানে নৃত্য করিয়া, নৃত্য জড়িত সুখ সঙ্গীতে পৃথিবী আকাশ পরিপূরিত করিয়া, আপন নৃত্য-গীত আপনাতে গুটাইয়া, আপন কমনীয় অঙ্গ ঈষৎ আপনমনে কাহাকে যেন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আবার স্থির হইয়া আপন ভাবে দাঁড়াইতেছে। সৃষ্টি উঠিয়া স্থিতি লাভ করিয়া আবার লয় হইতেছে। প্রণবে সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখাইতেছে। শুধু সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ব্যাপারটি মাত্র নহে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আছেন। প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে; কর্ম্ম ও কর্ত্তা এক সঙ্গে। সৃষ্টি কর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্টি কর্ম্ম।

সৃষ্টাদির কর্ত্তা কে? যিনি সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করেন। যিনি কর্ম্ম করেন তিনি কর্ত্তা। পাছে ক্রিয়া দেখিয়া কর্ত্তাকে দেখা না হয় তাই কর্ত্তা সর্ব্বদাই ক্রিয়া সঙ্গে। শুধু সৃষ্টি নহে স্থিতি ও লয় পর্য্যন্ত। প্রণবের এই ভাবের মূর্ত্তি, সমষ্টি ভাবে এই অপূর্ব্ব জগৎ আর ব্যষ্টি ভাবের মূর্ত্তি রজতগিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংশ দেবাদি-দেবের বক্ষে মেঘশ্যামা গলিতচিকুরা ব্রহ্মাণ্ডকোটিমুণ্ডাভিরামা বরাভয়প্রদা গিরিবালিকা। কোথাও বা নবীন জলধরমণ্ডিত তড়িৎলতিকা, দুই এক।

প্রণবটি আকারে এই সমষ্টি বিশ্বরূপ এবং ব্যষ্টি ইষ্টদেবতা, কিন্তু ভাবে ইহা সীমাশূন্য, কোন আকার নাই, কোন মূর্ত্তি নাই। পাছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকার দেখিয়া সীমাশূন্য ভাবটি ছাড়িয়া যায় সেই জন্য ভাষার যতদূর সামর্থ্য তাহাতে বলা হইতেছে ইহাই মহাব্যাহৃতি—এই প্রণবই ভূর্ভুবস্বঃ এই মহাব্যাহৃতিই সপ্তব্যাহৃতি, ইহাই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে!

এই জল-স্থল, তরু-লতা, পশু-পক্ষী, পর্ব্বত, সমুদ্র যাহার উপরে তাহাই ভূলোক পৃথিবীমণ্ডল। ইহার উপরে একটা অবকাশ-যাহাকে আমরা আকাশ বলি যাহা এই পৃথিবীর মত কত সৌরজগত ধারণ করিয়া আছে। এই আকাশ, এই অন্তরীক্ষই ভূবলোক। ইহার উপরে দেবতাদিগের রাজ্য স্বর্গ। তাহার উপরে আবার আমাদের দৃশ্য অবকাশ অপেক্ষা আর এক বৃহৎ অবকাশ ইহাই মহ লোক। ইহার উপরে জনলোক। এই লোকে মহাপ্রলয়ের পর সমস্ত সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে, উঠিয়া স্বর্লোক, ভুবলোক ও ভূলোক ব্যাপিয়া পড়ে। ইহার উপরে তপোলোক—যে লোকে নিত্য সন্ন্যাসী চিরব্রহ্মচারী সনক সনন্দ সনাতনাদি তপস্যা করেন। ইহার উপরে সত্যলোক যেখানে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমপুরুষ সর্ব্বদা আপন ভাবে অবস্থান করিতেছেন যাঁহাকে সেই বিশ্বব্যাপী পরম পদ বলে। শরীরের মধ্যে ষট্‌চক্রের উপর সহস্রার সপ্তব্যাহৃতির প্রতিকৃতি।

কে এই প্রণব? ইনিই মহাব্যাহৃতি। ইহার পরেই ত্রিপদা গায়ত্রী। "ছন্দসাংমাতঃ"

ছন্দ তাহার নাম যাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিলে সবই অসচ্ছন্দ হইয়া যায়, সমস্তই রোগরূপে পরিণত হয় কিছুই আর সুস্থ থাকে না, স্বচ্ছন্দে থাকে না।

গায়ত্রীর অক্ষরগুলির একটিও যদি যথাস্থান চ্যুত হয় তবে আর ইঁহার গানে ত্রাণ হয় হয় না। কাজেই যেমন বর্ণ বিন্যাস আছে সেইরূপ অর্থই হইবে।

গায়ত্রী কে? সেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তার বরণীয় ভর্গ—উপাসনীয় শক্তি। "তৎ" এই জন্য তস্য।

শুধু শক্তির দিকে দৃষ্টি করিলে পাছে শক্তিমানে দৃষ্টি না পড়ে—শুধু জগতের ব্যাপারে দৃষ্টি দিলে পাছে জগৎ কর্ত্তাকে ভুল হয় সেই জন্য সেই প্রসবিতার শক্তি বলা হইয়াছে।

এই ভর্গের, এই শক্তির স্থুল অংশটির ধ্যান করা হইবে না, শক্তির ইন্দ্রিয়

গ্রাহ্য ব্যক্ত ব্যাপারটি ধ্যানের বস্তু নহে, কিন্তু বরণীয় ভর্গটি ধ্যেয় বস্তু। শক্তির যে অন্তর্ভাগটি সেই সবিতার দিকে ছুটিয়াছে, সূর্য্যের যে রশ্মিগুলি বাহিরের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ প্রকাশ করে, ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে প্রেরণ করে, বিষয়কে প্রকাশ করে, তাহা ইহার বরণীয়ভর্গ নহে। যে শক্তি কল্যাণ পথে, ঊর্দ্ধপথে প্রধাবিত হইয়া পরম পদকে প্রকাশ করে তাহাই উপসনার বস্তু।

ভর্গই মহাশক্তি। ইহা একদিকে দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকাশ করে। ইহা পাপ পথ। আবার অন্যদিকে এই ভর্গ ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী। ইহা বিষয়াতীত পরম পদের দিকে প্রবাহিত। ইহা ইহার কল্যাণ পথ। আপ, জ্যোতি, রস, প্রাণ বা অমৃত সকলের ভিতরে রহিয়া ইহা ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাপ্ত ওঁকার। ভর্গ একমূর্ত্তিতে ঘোরা রজস্তম ভাবে দৃশ্যপ্রপঞ্চে প্রকট অন্যভারে অঘোরা শান্ত সত্ত্বভাবে ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিত!

লতিকা বৃক্ষকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতেছে। স্থূল দৃশ্যটি বিষয় কিন্তু ইহাতে শক্তি শক্তিমানের দিকে ছুটিতেছে এই ভাবটি সাত্ত্বিক। দৃশ্য-প্রপঞ্চের সর্ব্বত্রই একটি মহাশক্তি স্থূলে দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হইয়াও সূক্ষ্মে আপনি শক্তিমানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বীজগত শক্তি বৃক্ষরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইয়াও নিঃশেষ হইতেছে না। আর কিছু যেন করিতেছে। প্রস্তর খণ্ডে শক্তি প্রয়োগ করিলে প্রস্তর দৌড়িয়া যায় পরে শক্তি ফুরাইলে থামিয়া যায়। বীজ গত শক্তি সে ভাবে থামিয়া যায় না। বৃক্ষ ফল ফুলে পরিণত হইয়া, আবার কিছুদিন জগৎ প্রপঞ্চে স্থিতি লাভ করে, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মে আবার বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মাইয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া শেষে মহাপ্রলয়ে কোন্ শক্তিমানে লয় হইয়া যায়।

শক্তির বাহিরের প্রকাশমান প্রবাহটি পরিত্যাজ্য কিন্তু ভিতরের প্রবাহমান প্রবাহটি উপাসনীয়।

সেই সবিতার বরণীয় ভর্গ বলিয়া পাছে ভর্গ বা শক্তি মাত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া যায় তাই ভর্গ বলিয়াই বলিতেছেন দেবস্য। আদিতে তস্য সবিতুঃ অন্তে দেবস্য। শুধু শক্তিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেতেছে না। দেবস্যটি, লক্ষ্য করিতে হইবে। দেবের শক্তি—শক্তি জড়িত শক্তিমানটিকে ধ্যান করি। শুধু দেবতাটি চিন্তার বিষয় নহেন—পারা যায় না তাই। যন্ন বেদাঃ বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি। শুধু ব্রহ্ম—যখন শক্তির সহিত

যুক্ত নহেন তিনি আপনি আপনি। তখন সৃষ্টি নাই। অন্য কিছুই নাই। কে কাহার উপাসনা করিবে? তাই শক্তি জড়িত শক্তিমানই উপাসনার বস্তু। তাই সবিতুর্দেবস্য বরেণ্যংভর্গঃই উপাসনার বস্তু। এই বরণীয় ভর্গকে ধ্যান করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

হিমালয় ভ্রমণ। পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তি স্থান এ, এল বোস এণ্ড কোং। ১৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ বড় বাজার পোষ্ট আফিস। কলিকাতা। যাঁহারা হিন্দুর প্রধান তীর্থ বদরিনারায়ণ, কেদার, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী দর্শনে গমন করিবেন এই পুস্তকখানি তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শক। তীর্থযাত্রার সংবাদ, এখানিতে আছে। ঠিক হিন্দুভাবে লেখা এরূপ পুস্তক আর একখানিও আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই পুস্তকখানি লিখিয়া তীর্থযাত্রীর একটি অভাব দূর করিয়াছেন। তীর্থ-যাত্রী মাত্রকেই আমরা এই পুস্তকের এক একখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ১ম ও ২য় ভাগ। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান লোটাস লাইব্রেরী ২৮।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বাবু বঙ্গসাহিত্যে এক জন প্রধান লেখক ছিলেন। এই পুস্তকের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধেই বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর কি, কিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম, তত্ত্বমসী, বেদ সম্বন্ধে কথা, প্রকৃতি, নিরামিষ ভোজন, ভালবাসা, সতীতেজ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাশীল গ্রন্থকার ধর্ম্ম ও সমাজের জটিল প্রশ্ন সমূহ সহজ করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মটি কি বুঝাইতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে এক জন কর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান শূন্য কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন না এবং কর্ম্মশূন্য জ্ঞানকেও আদর করিতেন

না পুস্তকের সর্ব্বত্রই আমরা তাহার আভাস পাই। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে।

৺কৃষ্ণধন বাবু শুধু নির্গুণ ব্রহ্ম মানিতেন। এই জন্য সগুণ ব্রহ্ম ও অবতার বাদের কথা তাঁহার নিকটে কল্পনারূপে দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রে দেখি ব্রহ্মের রূপ মানুষে কল্পনা করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন মায়াই ব্রহ্মে ঈশ্বর ও জীব ভাব কল্পনা করে। শ্রুতি মতে এবং যুক্তিতেও নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম ও অবতার ইহার কোন একটি অবিশ্বাস করিলে আর্য্যঋষিদিগের অভিপ্রায় বুঝা যাইবে না। এই একটি বিষয় ভিন্ন এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই অমূল্য রত্ন ছড়ান আছে। শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই পুস্তকের ভূমিকায় ৺কৃষ্ণধন বাবুর ধর্ম্ম পিপাসা, ৺কৃষ্ণধন বাবুর অন্তর্দৃষ্টি, ৺কৃষ্ণধন বাবুর সাধনা ও আন্তরিকতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞান পিপাসুর নিকঠ পুস্তক খানি বিশেষ আদরের ইহা বলাই বাহুল্য। মূল্য ২৲ টাকা।

ব্রহ্মবিদ্যা—এখানি একখানি মাসিক পত্রিকা। মূল্য বার্ষিক২৲ টাকা। রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এমএ, বিএল, এই পত্রিকার সম্পাদক। উপযুক্ত সম্পাদক মহাশয় দ্বারা পরিচালিত এই পত্রিকা যে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা গত বৈশাখ হইতে ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত পাঁচ সংখ্যা পাইয়াছি। সকল সংখ্যাতেই জ্ঞান ও ভক্তির প্রবন্ধে এই পত্রিকা বিশেষ পাঠ্য। এইরূপ মাসিক যত অধিক বাহির হইবে ততই মঙ্গল। আমাদের প্রার্থনাঃ—এই সাধনাহীন দেশে জ্ঞানের অবস্থা বা ভক্তির অবস্থা বলিয়া যাহাতে সেইরূপ অবস্থা লাভ করা যায় তাহায় সাধনার আলোচনা আজ কাল কার দিনে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পন্থা—(নবপর্য্যায়) মূল্য ১॥৹ এই প্রাচীন পত্রিকা আবার নূতন ভাবে বাহির হইতেছে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায় এমএ, বিএল, শ্রীযুক্ত বারানসী মুখোপাধ্যায় এমএ, বিএল, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এমএ—ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। বলা বাহুল্য এই পত্রিকা খানি ও সুন্দর রূপে পরিচালিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত, হর গৌরী, মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা, দীক্ষা, অদ্বৈত বাদ, তীর্থদর্শন, রথ যাত্র, নির্গুণ ভক্তি, বৃন্দাবন লীলা প্রভৃতি প্রবন্ধে এই পত্রিকা সুশোভিত।

বহু প্রবন্ধই সুখপাঠ্য এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখাতে পূর্ণ। এইরূপ মাসিক পত্র দ্বারা যে সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে না না কারণে আমরা পুস্তক ও সংবাদ পত্র-গুলি মনোমত করিয়া সমালোচনা করিতে পারিলাম না। বারান্তরে সংবাদ পত্রের সমালোচনা বিশেষরূপে করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের অশ্বল ব্রাহ্মণ।

প্রস্তাবনা।

রামোনাম বভূব হুঁ তদবলাসীতেতি হুঁ তৌ পিতুঃ
বাচা দণ্ডককাননে নিবসত স্তামাহবদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণেনেতি পুরাতনীং নিজকথা মাকর্ণ্যমাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক্বধনুর্ধনু ধুর্ধনুরিতি প্রোক্তাগিরঃ পান্তবঃ॥

পোপাল বড় চঞ্চল, বড় অশান্ত। গোপালের জন্য সমগ্র বৃন্দাবন অস্থির-ব্রজবাসিগণ কেহ ভয়ে কেহ ভালবাসায় সর্ব্বদা ব্রজরাজ শিশুর চিন্তায় ব্যস্ত। যশোমতী? আর আহার নাই নিদ্রা নাই অন্য গৃহকার্য্য করিবার উপায় নাই যশোদা সর্ব্বদাই কৃষ্ণগত প্রাণা কৃষ্ণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে প্রণিহিতনয়না, জননী একটু অন্যমনস্ক হইলেই শিশু অনর্থ করিয়া বসে।

কিন্তু আজ গোপাল বড় শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জননী বলিয়াছেন বাবা, আজ তুমি দৌরাত্ম্য করিও না আমি তোমাকে অতি মধুর পুরাণকথা বলিব, গোপাল উপকথা শুনিবার লোভে শান্ত হইয়াছে মার কোলে বসিয়া শতসাধমাখা মায়ের চখের উপরে কমলদলতুল্য আপন লোচনদ্বয় স্থাপন করিয়া সময় অপেক্ষা করিতেছে যশোদা বলিতে আরম্ভ করিলেন কোমল করপল্লবে গোপালের কুসুম সুকুমার সুঅঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে যাশোদা স্নেহমন্থর বচনে বলিলেন—বাছা গোপাল, শোন—

যশোদা] রাম নামে এক রাজপুত্র ছিলেন।

গোপাল] হুঁ।

যশোদা] তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল সীতা।

গোপাল] হুঁ

যশোদা] তাঁহারা উভয়ে পিতার আজ্ঞায় দণ্ডককাননে নির্ব্বাসিত হইয়া বাস করিতেছিলেন এই অবস্থায় দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করে।

শিশু এতক্ষণ আনন্দ-মুকুলিত নয়নে জননীর কথায় হুঁ দিতে দিতে অপূর্ব্ব রামলীলা শুনিতেছিলেন, কিন্তু সহসা শিশুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল 'দুরাত্মা রাবণ সীতাহরণ করিল' এই কথা শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই দণ্ডকারণ্যবাস প্রিয় সহচরী আদরিণী সীতা, সেই জানকীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, সীতাহরণ, রাবণের দৌরাত্ম্য, যুগপৎ দণ্ডকাবাসের চিত্র গোপাল-হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে মাতৃক্রোড় হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পরিধানে পীতাম্বর আপন অঞ্চলের সহিত মাথার চূড়া ময়ূরপুচ্ছের সহিত যশোদা আপন হৃদয়ের সহিত কম্পিত হইলেন। ব্রজশিশু সহসা বলিয়া উঠিলেন কই লক্ষ্মণ ধনু কই ধনু কই শীঘ্র ধনু দাও ধনু দাও।

বৎস! সীতার এই দুরবস্থার স্মৃতি ও তৎসহচরী ভগবানের এই বাণী তোমাদিগের রক্ষার কারণ হউক।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! এ চিত্র বড় মধুর, তদপেক্ষাও মধুর ভগবানের হৃদয়ে মাধুর্য্যের নিকটে ঐশ্বর্য্যের পরাজয়। ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর, মায়া তাঁহার চরণাশ্রিতা সেবিকা, ভগবান্ বৈকুণ্ঠের জ্ঞানশক্তি অকুণ্ঠীত তথায় ভ্রম সম্ভবে না, তথাপি ভগবান্ আদরিণীর মান বাড়াইতে ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া মাধুর্য্যের মাধুরী প্রদর্শন করিলেন, প্রাণাধিকা সীতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করিতে যাইয়া নিত্য প্রকাশমন বিমল ঐশ্বর্য্যকে আত্মবিস্মৃতি দ্বারা যেন কলঙ্কিত করিলেন। এ উদাহরণ বড় মধুর। কিন্তু এখানে উহা বলিলেন কেন? এখন ত উপনিষদ্ বলিবেন সঙ্কল্প ছিল।

আচার্য্য] বৎস উপনিষদ্ই বলিব, কিন্তু বিদ্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ আবশ্যক। কেন না বিনা পাপক্ষালনে হৃদয়ে বিদ্যাপ্রতিভাত হয় না ভগবানের এই মধুর রূপস্মরণাত্মক মঙ্গলাচরণে হৃদয়সংযত ও প্রক্ষালিত হইয়া বিদ্যাধারণার উপযুক্ত হয় এই জন্য পরমবিদ্যার প্রারম্ভে এই চিত্র তোমার শুশ্রূষু হৃদয় সমীপে অঙ্কিত হইল।

এতদ্ভিন্ন এই চিত্র তোমার নিকটে অঙ্কিত করিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই:—

তুমিও আপনাকে জগজ্জননী উপনীষদ্‌দেবীর ক্রোড়শায়ী শিশু মনে কর, তাঁহার শ্রীমুখে স্বীয় মধুর পূরাণ কথা শ্রবণ করিবার লোভে শান্ত হও আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হও তুমি যে মায়াকল্পিত সংসারমৃগতৃষ্ণায় আত্মবিদ্যার কথা ভুলিয়াগিয়াছ, এবং কামরূপী রাবণ যে তোমার আত্ম-বিদ্যা অপহরণ করিতেছে তুমি যে পথের কাঙ্গাল হইয়া কতকাল কাটাইয়াছ শ্রুতিমুখে জীবের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিতে শুনিতে তোমার চিত্তেও প্রাচীন স্মৃতি জাগ্রত হউক, তুমি কামরূপী রাবণের বিনাশে বদ্ধপরিকর হও, এবং প্রণবধনুর অনুসন্ধানে প্রণিহিত হও।

ব্রহ্ম] গুরুদেব! এ আবার কোন্ মধুর অবস্থার কথা আমাকে বলিতে-ছেন। আমি অজ্ঞান তিমিরে জন্মান্ধ, আপনি এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যের চিত্র আমার নিকট আনয়ন করিতেছেন, মহারাজ দুষ্মন্ত অভিসম্পাতবলে অপগত স্মৃতি হইয়া মহর্ষি লালিত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার পর হংসবতীর বর্ণ-পরিচয়কালীন গীতিকা শ্রবণে যেমন কাহারও জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন আমার অন্তরাত্মাও যেন ঠিক তদ্রূপ কাহারও জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে আপনি যে আত্ম-বিদ্যার কথা বলিলেন কে ইনি আমি জানি না কেমন এই অনবদ্যাঙ্গী আমি জন্মান্ধ কখনও দেখি নাই কিন্তু আপনার প্রদর্শিত এই অস্ফুট সুখঃস্বপ্নে আমার অন্তরাত্মা বড়ই আকুল হইয়া উঠিতেছে। অভিজ্ঞান লাভে রাজর্ষি দুষ্মন্তের পুনরায় স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, ভগবান্ কোন্ অভিজ্ঞান লাভে আমার হৃদয়ে স্মৃতিলাভ ঘটিবে? আমি কি পুনরায় হারানিধির দর্শন লাভ করিতে পারিব?

আচার্য্য] বৎস! উপনিষদ্ বিদ্যাই আত্ম বিদ্যা-লাভের অভিজ্ঞান অঙ্গুলি মুদ্রা। এই বিদ্যা অধিগত হইলেই তোমার চিত্ত অভিজ্ঞান প্রাপ্ত দুষ্মন্তের ন্যায় স্মৃতির মুর্ম্মুর-দহনে দগ্ধ ও বীত মল হইয়া জ্ঞান প্রসাদ বা পর বৈরগ্য লাভ করিবে, এবং এই ইহারই পরে স্বর্গাগত মাতলির ন্যায় ব্রহ্ম লোকাগত অমানব পুরুষ তোমার আত্ম-বিদ্যার সহিত চির মিলিত করিয়া দিবেন।

ব্রহ্ম] ভগবান্ আমি যে বড়ই অপরাধী আমি কর্ম্ম চণ্ডাল, আমার কি এই উপনিষদ্ বিদ্যা শ্রবণে অধিকার আছে?

আচার্য্য] যাঁহার চিত্ত বেদাদি অধ্যয়ন, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বীতমল হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মই নিত্য তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য পরোক্ষ ভাবে ইহার বিবেক লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য ঐহিক স্রক্ চন্দন বনিতাদি

ক্রমশঃ

শ্রীভাগবত।

প্রার্থনা।

শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘনস্বরূপিণে
কৃষ্ণায় চানন্ত সুখাভিবর্ষিণে।
বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধ হেতবে
নুমোবয়ং ভক্তিরসাপ্তয়েঽনিশম্॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

যিনি সর্ব্বশোভাসম্পন্ন, যাঁহার স্বরূপ সৎচিৎ-আনন্দঘন এবং যিনি অনন্ত সুখবর্ষণ করেন; যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গের হেতু, সেই কৃষ্ণকে আমরা ভক্তিরস প্রাপ্তি জন্য নিয়ত নমস্কার করি॥

যাঁহার কৃপা বাক্‌শক্তিহীনকে বাচাল করে; যাঁহার কৃপা গতিশক্তিহীনকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ স্বরূপ মাধব লক্ষ্মীপতিকে আমি বন্দনা করি॥

শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ ॥

শ্রীভাগবত।

—:০*০:—

অবতরণিকা।

অবতরণিকার আলোচ্য বিষয়।

(১) নিজে নিজে যতদূর পারা যায় সেইরূপে শ্রীভাগবত পাঠে লোভ কেন? লাভ কি?

(২) লাভালাভ দেখিয়া যে কর্ম্ম তাহা কতদূর নিষ্কাম?

(৩) শ্রীভাগবত পাঠে লাভ প্রদর্শন—

(ক) মঙ্গলাচরণ হইতে।

(খ) রাজা পরীক্ষিত-চরিত্র হইতে।

(৪) ব্রহ্মজ্ঞানীর ভাগবত পাঠ কি আবশ্যক?

(৫) কোন্ শ্রীভাগবত অবলম্বনীয়?

(৬) শ্রীভাগবত কতদিনের গ্রন্থ? ইহার প্রচার কিরূপে হয়?

(৭) শ্রীভাগবতের শ্রোতা।

(১) লোভ ও লাভ :—আমি কি পারিব? এই কার্য্য কি আমা দ্বারা হইবে? পারিব কি না পারিব, হইবে কি না হইবে—তাহা তুমি জান: আমি তোমায় না জানাইয়া কোন কর্ম্ম যেন না করি এই আমার কর্ম্ম-জীবনের সাধ। এই আমার নিষ্কাম কর্ম্ম।

আমার কত দুঃখ! আমি তোমার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পাই না? তোমার দ্বাররক্ষী আমায় যাইতে দেয় না। আমি যে এখনও সর্ব্ববিধ কর্ম্ম তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারিলাম না; এখনও তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিতে আমার মনে থাকে না; আমি যে এখনও তোমায় মনে-প্রাণে ভালবাসিতে পারিলাম না। যদি পারিতাম, তবে কি তোমায় না জানাইয়া, তোমায় গোপন করিয়া চিন্তা করা, কথা কওয়া বা কর্ম্ম

করা রূপ বেশ্যাবৃত্তি আমি করিতে পারিতাম? ব্যভিচারিণীর স্বামীর মন্দিরে প্রবেশের কি অধিকার আছে? অভক্ত জনে তোমার কাছে কি যাইতে পারে?

কবে আমার কর্ম্ম-জীবনের সমস্ত কর্ম্ম—কি মানসিক,কি বাচিক, কি কায়িক সকল কর্ম্ম তোমায় না ভুলিয়া হইবে? যদিও আমার প্রবেশাধিকার নাই তথাপি—তথাপি তুমি জান; আর কেহ জানুক বা না জানুক তুমি জান আমি আর ব্যভিচার করিতে চাই না; তুমি জান আর বেশ্যাবৃত্তি করিতে আমার ইচ্ছা নাই, তুমি জান আমি তোমারই হইতে চাই।

সর্ব্বজীবের সুহৃদ্ তুমি, আমি কত কি করিয়া ফেলিয়াছি। তথাপি আমিও ত জীব। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং তুমি, তবে তুমি ত আমারও সুহৃদ্। আমি ত তোমারই। এই যে কি করিতে যাইতেছি—আমি তোমায় জানাইলাম। ফলাফল তুমিই জান।

এই কর্ম্ম করিতে কি অনুমতি পাইলাম? একবার যদি উদয় হইয়া বলিয়া দিতে? চিরদিনই চিত্তের প্রসন্নতাকে তোমার অনুমতি ভাবিয়া কর্ম্ম করিলাম। এখন মনে হয় যদি এক ক্ষণকালের জন্যও উদয় হইয়া বলিয়া দিতে, তবে আমার কি হইত? কেন এরূপ করা কি তোমার বড়ই ভার? আহা! আমি কি এই অভিমান তোমার উপরে করিবার যোগ্য? আমি কি তোমায় ভালবাসিতে পারিলাম যে তোমার উপর অভিমান করিব? আমি কি সকল অভিলাষ ত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীচরণ-প্রাপ্তি মাত্র অভিলাষ রাখিয়াছি যে, আমি তোমার উপর অভিমান করিব? না না অভিমান করিবার অধিকার আমার নাই। আমি উপযুক্ত হই নাই তাই তুমি এস না? তুমি যে এসনা—মঙ্গলময় তুমি—ইহাও বুঝি আমার মঙ্গলের জন্য। তুমি আসিলে হয়ত আমার অহঙ্কার বাড়িয়া যাইবে। তুমি দেখা দিয়া অনুমতি দিলে হয়ত আমি দাম্ভিক হইয়া যাইব, তাই তুমি না দেখা দিয়াই আমার মঙ্গল করিতেছ।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত অনুমতি পাইলাম না; তবুও যে এই গুরুতর কার্য্যে হাত বাড়াইতেছি?

আমার একটু বলিবার কথা আছে তুমি কি শুনিবে? শ্রীভাগবত মনের মত করিয়া পড়ি—এ লোভ আমার কেন হয়? কেন হয় অন্তর্য্যামী তুমি—তোমাকে বলিতে আমারও ইচ্ছা হয়।

স্কন্দপুরাণে—বিষ্ণুখণ্ড—শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে তুমি উদ্ধবের মুখে রাজা পরীক্ষিতকে বলিয়াছ "হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ ভিন্ন কাহারও কদাচিৎ আত্মবোধ হয় না।" ঋতে কৃষ্ণ প্রকাশন্তু স্বাত্মবোধো ন কস্যচিৎ"। যখন তুমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের চর্ম্ম-চক্ষের গোচর হইয়াছিলে, তখন সকলে তোমায় দেখিয়া ধন্য হইয়াছিল। সাধুগণ তোমায় দেখিয়া, তোমায় বুঝিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। অসাধু হৃদয় ও তোমায় দেখিয়াছিল, আকৃষ্টও হইয়াছিল; কিন্তু তোমায় বুঝিল না। না বুঝুক, তথাপি তোমায় দেখিবার ফলে তাহাদেরও পূর্ব্বপাপ অনেক ক্ষয় হইয়াছিল; কেবল সংশয় করিত বলিয়া, সম্যক্ দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের সদ্গতি হইয়াছিল। কিন্তু এখন? এই ঘোর কলিযুগে? কলিযুগের সঞ্চার হইবা মাত্রই তুমি ধর্ম্ম ও জ্ঞান লইয়া নিজধামে প্রস্থান করিয়াছ "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ" এখন লোক সকল অজ্ঞান অন্ধকারে আর কিছুই ত দেখিতে পায় না তাই উদ্ধব বলিতেছেন "জীবগণের হৃদয়ে এখন তোমার প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে? শ্রীভাগবত বলিতেছেন-"কলৌ নষ্টদৃশামেব পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥" নষ্টদৃষ্টি জনগণের হৃদয়ে তোমার প্রকাশের জন্য ভাগবত-সূর্য্য উদয় হইয়াছেন;

শ্রীগীতা বলিতেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।

তুমি চিরদিনই সৃষ্টির প্রতি পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছ; স্বধামে বিশেষরূপে আছ, আর তোমার সৃষ্টজগতেও সমকালে আছ; কোথাও যাও নাই, তোমার অভাব কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না; কিন্তু অজ্ঞানী মূঢ়গণ—যোগমায়া সমাবৃত তুমি—তোমার মায়া-যবনিকা উত্তোলন করিয়া তোমায় দেখিতে পায় না। স্কন্দপুরাণও বলিতেছে "তৎ প্রকাশস্তু জীবানাং মায়য়া পিহিতঃ সদা"॥ জীবগণের হৃদয়ে তোমার প্রকাশ হয় না—কেননা তোমার প্রকাশকে তোমার মায়া আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে।

হায়! এই কলিযুগে প্রায় সকল লোকেই অল্পায়ু ও অলস। প্রায় সকলের বুদ্ধি নিতান্ত হীনতেজঃ। সকলেই বিঘ্নসমূহে ব্যাকুল ও রোগাদি দ্বারা নিপীড়িত। জীব এখন বহু শাস্ত্র শ্রবণাদি দ্বারা-স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা, নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। এখন পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও দুঃখ করেন—বলেন "যখন তুমি স্বীয় চরণকমলের

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে আমার বক্ষঃস্থল চিহ্নিত করিয়া চলিয়া যাইতে, তখন নবোদ্গত দূর্ব্বাদিচ্ছলে আমার অঙ্গে রোমোদ্গম হইত। আহা! মধুসূদনের শ্রীচরণোদ্ধৃত ধূলিপটলে আমার কত শোভাই হইত! কিন্তু এখন? 'এখন সেই মুখ-কমল ত আর চূর্ণ-কুন্তলে পর্য্যাকুল হইয়া বিকশিত হয় না—এখন ত আর সেই কমলপলাশনয়নযুগলে সুশোভিত সুপ্রসন্ন বদনে সেই মোহন হাস্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পাই না।''

বল, জীব এখন তোমার প্রকাশ কিরূপে দেখিবে? স্কন্দপুরাণ স্পষ্ট করিয়া বলেন ''অষ্টাবিংশ দ্বাপরের অবসানে যখন শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং নিজ মায়া উৎসারিত করেন, তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়। হে রাজন্! সে কাল এখন অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপে শ্রীহরির প্রকাশ হয়, শ্রবণ কর।

"অন্যদা তৎপ্রকাশস্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র ভাগবতৈর্যদা।
কীর্ত্যতে শ্রূয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিশ্চিতম্ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং যত্র শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেববা।
তত্রাপি ভগবান্ কৃষ্ণো বল্লবীভির্বিরাজতে ॥
ভারতে মানবং জন্ম প্রাপ্য ভাগবতং ন যৈঃ।
শ্রুতং পাপপরাধীনৈরাত্মঘাতস্তু তৈঃ কৃতঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং নিত্যং যৈঃ পরিসেবিতম্।
পিতুর্মাতুশ্চ ভার্য্যায়াঃ কুলপংক্তিঃ সুতারিতা ॥
বিদ্যাপ্রকাশো বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শত্রুজয়োবিশাম্।
ধনং স্বাস্থ্যঞ্চ শূদ্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ ॥
যোষিতামপরেষাঞ্চ সর্ব্ববাঞ্ছিতপূরণম্।
অতো ভাগবতং নিত্যং কো ন সেবেত ভাগ্যবান্ ॥
অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতং লভেৎ।
প্রকাশো ভগবদ্ভক্তেরুদ্ভবস্তত্র জায়তে ॥"

অন্য সময়ে [যখন পৃথিবী অবতারশূন্য হয় তখন] শ্রীমৎভাগবত হইতে শ্রীহরির প্রকাশ হয়। যেখানে ভাগবতগণ শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করেন বা শ্রবণ করেন, সেখানে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীভাগবতের এক বা অর্দ্ধ-

শ্লোক যেখানে পাঠ হয়, সেখানে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ পত্নীগণ সহ বিরাজ করেন। ভারতে মানব-জন্ম পাইয়া পাপবশে যাহারা ভাগবত শ্রবণ না করে, তাহারা আত্মঘাতী। যাঁহারা নিত্য শ্রীভাগবত সেবা করেন, তাঁহারা পিতা, মাতা ও পত্নীর কুলপরম্পরা উদ্ধার করেন। শ্রীভাগবত হইতে বিপ্রগণের বিদ্যা প্রকাশ হয়, রাজগণের শত্রুজয় হয়, বৈশ্যগণের ধন লাভ হয় এবং শূদ্রগণের স্বাস্থ্য লাভ হয়। নারীগণের এবং অন্যান্য সকলের ভাগবত শ্রবণে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। অতএব কোন্ ভাগ্যবান্ না ভাগবত নিত্য সেবা করিবেন?

"অনেক-জন্মের পুণ্য-বলে শ্রীভাগবতের শ্রবণ লাভ হয়, ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন হয় এবং হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্ভব হয়।"

তাই বলিতেছিলাম "কৃষ্ণ প্রকাশো ভক্তানাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ" শ্রীভাগবত হইতেই ভক্তগণের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ হয়েন, শ্রীভাগবত পাঠে এই লাভের কথা শুনিয়াই লোভ হইয়াছে। শ্রীভগবত পাঠে তুমি উদয় হইবে, এই জন্য এই আয়োজন।

(২) ইহা কতদূর নিষ্কাম। শাস্ত্র ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলেন। ফলাকাঙ্ক্ষা ত এই কার্য্যে বিলক্ষণ—ইহা কি নিষ্কাম কর্ম্ম?

না ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। দেহে অহং-অভিমান ছুটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কোন বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের মত নিষ্কাম ভাবে হইতেই পারে না। অহং-অভিমান আমার যায় নাই। কাজেই কোন কর্ম্মই আমার নিষ্কাম ভাবে হয় না। এরূপ স্থলে শ্রুতি বলেন—অকামো বিষ্ণুকামঃ। বিষ্ণুর প্রীতি-কামনায় যাহা করা যায় তাহা নিষ্কাম। শাস্ত্র আরও বলেন—"যদি সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে না পার, তবে শুভ কামনা কর। যদি কর্ম্মত্যাগ সম্পূর্ণরূপে করিয়া সন্ন্যাস লইবার অধিকার তোমার না জন্মিয়া থাকে, তবে শুভ কর্ম্ম কর। এই শুভ কামনা মত শুভ কর্ম্ম করিতে করিতে তুমি নিষ্কাম হইতে পারিবে। নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে,তোমার সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যাইবে। তখন সন্ন্যাসে তোমার অধিকার জন্মিবে। তোমার বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান জন্মিবে।"

একবারে সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগে অসমর্থ বলিয়াই এই শুভ সঙ্কল্প। শেষ ফল তুমিই জান।

(৩) লাভের কথায় লোভ। তাই এই উদ্যোগ। এই লাভটা বহু প্রকারের হইতে পারে। দুই প্রকার লাভ মাত্র দেখাইতেছি।

(ক) মঙ্গলাচরণ হইতে লাভ।

(খ) পরীক্ষিত চরিত্র হইতে লাভ।

(ক) মঙ্গলাচরণ শ্লোকটিতে যে কত লাভ, তাহা পূর্ণভাবে বলিতে পারিব না। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ইহা আমরা বিশেষ করিয়া দেখাইব। এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখি—এই শ্লোকের অর্থটি বুঝিয়া একান্তে যদি সেই অর্থ-আলোচনাজনিত ধ্যান করা যায় তবে বুঝি সর্ব্বসিদ্ধি হয়। এই শ্লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া, শ্রীভাগবতকে কেহ কেহ বেদান্তের ব্যাখ্যা বলেন। এই শ্লোকটির "ধীমহি" পদের ব্যবহারে কেহ ইহাকে বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা বলেন। আবার এই শ্লোকটিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদান্ত ও গায়ত্রীর সহিত যে ব্রজলীলা এক—তাহাও পূজ্যপাদ জীবগোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ দেখাইয়া থাকেন।

(খ) রাজা পরীক্ষিতের চরিত্র আলোচনায় যে আমাদের কত লাভ, তাহা এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ হইল। জীবন আর ৭ দিন মাত্র থাকিবে। রাজা প্রায়োপবেশন করিয়া মৃত্যুর জন্য গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা পরীক্ষিত পাণ্ডবদিগের একমাত্র বংশধর। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবের সখা, তাঁহাদের বংশে অবৈষ্ণবের জন্ম হইবে ইহার সম্ভাবনা কোথায়? রাজা বিষ্ণুরাত্ পরম বৈষ্ণব; তথাপি রাজার দ্বারা অপকর্ম্ম সংঘটিত হইল। এই পরীক্ষিতের জন্ম সময়ে একবার ব্রহ্মশাপ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মশাপ হইতে পরীক্ষিতকে রক্ষা করেন; কিন্তু ব্রহ্মশাপ কখন নিষ্ফল হয় না। অশ্বত্থামার ব্রহ্মশাপ আবার অন্যমূর্ত্তিতে রাজা পরীক্ষিতের উপর পতিত হইল। আসন্ন মৃত্যুতে কর্ত্তব্য কি, রাজা সমবেত ঋষিগণকে এই প্রশ্ন করিলেন। তখনও শ্রীভাগবতবক্তা ভগবান্ শুকদেবের তথায় আগমন হয় নাই। ঋষিদিগের কেহ বলিলেন দান কর, কেহ বলিলেন যজ্ঞ কর, কেহ বলিলেন তপস্যা কর। ইহার মধ্যে শ্রীশুক স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন। তিনি রাজাকে হরি কথা শ্রবণে পরামর্শ দিলেন। সপ্তাহ ধরিয়া রাজা শ্রীভাগবত শ্রবণ করিলেন। ভক্তির কথা শেষ হইল। শ্রীশুকদেব তখন রাজাকে বলিলেন, রাজন্! "মরিবার ভয়" রূপ পশুতুল্য অবিবেক বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। দেহ পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি জন্মিয়াছে অতএব নষ্ট হইবে। দেহাদি ব্যতিরিক্ত যে তুমি, তুমি সেরূপ নও। দেহের মত তুমি কখন বিনষ্ট হইবে না। তুমি পুত্র পৌত্রাদি

শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ ।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগঃ ।

কৃষ্ণভক্তেরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে ।
ইতি বিজ্ঞান যোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ । শ্রীধরঃ

যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্যঃ সেব্যঃ সর্ব্ব যোগিনাম্ ।
তং বন্দে পরমানন্দ ঘনং শ্রীনন্দনন্দনম্ ॥ শ্রীমধুসূদনঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ! যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥

হে পার্থ! ময়ি [আ] সকলজগদায়তনত্বাদিনানাবিধ[আ]বিভূতিভাগিনি [শ] বক্ষ্যমাণ বিশেষণে [শ] পরমেশ্বরে আসক্তমনাঃ [ম] আসক্তং বিষয়ান্তরপরিহারেণ সর্ব্বদা নিবিষ্টং মনো যস্য তব সত্বম্ যদ্বা [রা] মৎপ্রিয়ত্বাতিরেকেণ মৎস্বরূপেণ গুণৈশ্চ [ম] চেষ্টিতেন মদ্বিভূত্যা বিশ্লেষে সতি তৎক্ষণাদেব বিশীর্য্যমাণস্বভাবতয়া ময়ি সুগাঢ়ং [রা] বদ্ধমনাঃ [ম] অতএব মদাশ্রয়ঃ [শ] অহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য [শ] স মদাশ্রয়ঃ [ম] মদেকশরণঃ যো হি [শ] কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী [শ] ভবতি, [শ] স তৎসাধনং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। [শ] অয়ন্তু যোগী মামেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। হিত্বাঽন্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনাঃ [শ] ভবতি। যদ্বা [ম] রাজাশ্রয়ো ভার্য্যাদ্যাসক্তমনাশ্চ রাজ-

ম ব
ভৃত্যঃ প্রসিদ্ধো মুমুক্ষুস্তু মদাশ্রয়ো মদাসক্তমনাশ্চ মদ্দাস্যসখ্যাদ্যেক-

ব শ্রী শ
তমেন ভাবেন মাং শরণং গতঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্ মনঃ সমাধানং কুর্ব্বন্।

ম শ্রী আ
ষষ্ঠোক্তপ্রকারেণ অভ্যসন্ অসংশয়ং অবিদ্যমানঃ সংশয়ং যত্র জ্ঞানে তৎ

আ ব ব
যথা স্যাৎ তথা কৃষ্ণ এবং পরং তত্ত্বমতোঽন্যদ্বেতি সন্দেহশূন্যো মৎপার-

ব নী
তম্য নিশ্চয়বানিত্যর্থঃ যদ্বা ঈদৃশো যোগং যুঞ্জন্ সমাধিমনুতিষ্ঠন্ ত্বম্পদার্থ

নী
বিবেককালে যদ্যপি সার্ব্বজ্ঞ্যমস্তি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্" ইত্যাদি বচনাৎ,

নী
তথাপি স্বস্মাদন্য ঈশ্বরোঽস্তি ন বেতি পাতঞ্জল-কপিলয়োর্ব্বিবাদস্তার্কিক-

নী
মীমাংসকয়োর্ব্বা স্বেশ্বরনিরীশ্বরয়োর্ম্মতভেদাৎ সংশয়ঃ কারণাজ্ঞানাচ্চ;

নী
অসমগ্রং তৎ সার্ব্বজ্ঞ্যমিতি মত্বা আহ অসংশয়ং সমগ্রমিতি। সমগ্রং

রা শ শ ব
সকলং সমস্তং বিভূতিবল শক্ত্যৈশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্নং মাং সর্ব্বেশ্বরং যথা

শ ব শ
যেন প্রকারেণ যেন জ্ঞানেন বা জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণৈবমেব ভগবানিতি

নী শ্রী
তৎ তং প্রকারং ইদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমাতে আসক্ত-মন অতএব আমি মাত্র আশ্রয় এইরূপ হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে—যে জ্ঞানে কোন সংশয় থাকিতে পারে না—এইরূপ সন্দেহশূন্য জ্ঞানে যেরূপে আমার সমস্ত বিভূতিবল-শক্তি-ঐশ্বর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন আমাকে জানিতে পার তাহা শ্রবণ কর ॥১॥

অর্জ্জুন—যোগারূঢ় অবস্থায় মনকে আত্মসংস্থ করিয়া "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এই পর্য্যন্ত যিনি উঠিলেন, তিনি হইলেন গীতোক্ত যোগী। গীতোক্ত যোগী অপেক্ষা যুক্ততম যোগীকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলিতেছ। যিনি যুক্ততম, তিনি "মদ্গতেনান্তরাত্মনা" হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে "ভজতে যো

মাং" হয়েন বলিতেছ। যিনি যুক্ততম, তিনি তোমাগত প্রাণ হইবেন এবং তোমাকে ভজনা করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, সাধনার প্রথমেই যে নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে বলিয়াছ, তাহাতেও ত তোমার ভজনা হয় বলিতেছ; তবে নিষ্কাম-কর্ম্মীর সাধনা এবং যুক্ততমের ভজনা ইহাদের পার্থক্য কি? নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা কোন্ গুণে যুক্ততম-যোগ শ্রেষ্ঠ, তাহা
নী
আমাকে ভাল করিয়া বলিয়া দাও। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যো মাং ভজতে স মে যুক্ততমো মতঃ" ইত্যুক্তম্। তত্র কীদৃশং পূর্ব্বোক্ত নিষ্কামকর্ম্মযোগাপেক্ষয়া বিলক্ষণং তব ভজনম্? কেন বা গুণেন পূর্ব্বযোগাপেক্ষয়া তস্য যুক্ততমত্বম্?

ভগবান্—নিষ্কাম কর্ম্মের দুই অবস্থা। নিম্নতম অবস্থায় কর্ম্ম করা মুখ্য। কর্ম্ম হওয়াই চাই, সেই জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের উচ্চ অবস্থায় কর্ম্মটা গৌণ। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই মুখ্য। নিম্নতম নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হয় তাহা লক্ষ্য কর। এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী বলেন, হে ভগবান্ তুমি প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হইয়া আমার এই আত্মহিতকর বা দেশহিতকর, বা লোকহিতকর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দাও। আমি লোকহিতকর কর্ম্ম করিতে চাই; কিন্তু আমি শক্তিহীন, তুমি শক্তি না দিলে আমি এ কর্ম্ম কিছুতেই নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। এই কর্ম্মে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই, আমার নিজের কোন সুখেচ্ছা নাই। আমার দেশের লোকের বড় দুরবস্থা হইয়াছে; আমি আপন ভোগ-কামনা জন্য কর্ম্ম করিতেছি না, আমি লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহা দূর করিবার জন্য তোমার শরণাপন্ন হইয়া করিতেছি। তুমি আমার মধ্যে আসিয়া কর্ম্ম করিয়া দাও— "আমি করিতেছি" এরূপ অভিমানও যেন আমার না থাকে। আর দেশহিতকর কর্ম্ম যাহা আমি করিতে যাইতেছি; তাহা ত তুমিই করিতে বলিয়াছ। ইহা তোমার প্রিয় কর্ম্ম। আমি তোমার আজ্ঞাপালন জন্য কর্ম্ম করিতেছি। নিকৃষ্ট নিষ্কাম-কর্ম্মীর বাহিরের কর্ম্ম এইরূপ। পূজা আহ্নিক ইত্যাদিতেও ঐ ঐ কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য প্রার্থনা থাকে। উহাদের দ্বারাও লোকহিতকর কার্য্যের জন্য শক্তি চাওয়া হয়। এই ভাবে ইঁহারা কর্ম্ম করেন। আমার সাহায্যে, আমার প্রসন্নতা লাভ করিয়া, তিনি কর্ম্ম করেন দশের সুখের জন্য বা জগতের উন্নতি জন্য বা আত্মহিত জন্য। তবেই দেখ, কর্ম্ম করাই এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মীর মুখ্য লক্ষ্য। তাই বলিতেছি, কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া নিষ্কাম কর্ম্মের নিম্নতম অবস্থা। শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ যেখানে মুখ্য, কর্ম্ম যেখানে গৌণ, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। সর্ব্বোচ্চ নিষ্কাম-কর্ম্মী ও যুক্ততম প্রায় একরূপ। কারণ যিনি যুক্ততম, কর্ম্ম করা তাঁহার গৌণ। আমার প্রসন্নতা, আমার সেবা, আমার ভজনা ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্ম্ম দ্বারা যদি আমার সেবা হয় তাহাই হউক, অথবা চিন্তা দ্বারা যদি আমার সেবা হয় তাহাই তিনি করেন, অথবা ধ্যান উপাসনা দ্বারা যদি আমার সঙ্গ হয় তাহাই তিনি করেন। "জগতের হিত করা" ইহার ভার তিনি আমার উপরে দিয়া আমার সঙ্গে থাকিতেই ইচ্ছা করেন। যদি আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করেন। করিয়াই আবার আমাকে লইয়া থাকেন। আমি যখন

অবতার গ্রহণ করি, তখন তিনি আমার সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ রূপে আইসেন,—আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া। সেই সময়ে আমার জন্য তিনি কর্ম্ম করেন। কিন্তু ঐ সময়েও সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকেন। নিষ্কাম কর্ম্মীর সহিত যুক্ততমের প্রভেদ এই যে, নিষ্কাম-কর্ম্মীর আত্মা অশুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হয়, আর যুক্ততমের আত্মা শুদ্ধ বলিয়া তাঁহার আর কর্ম্মের আবশ্যক নাই; তিনি আমার সহিত আনন্দভোগ জন্য ভজনা লইয়া থাকেন। আমার সহিত কথা কওয়া, আমায় সাজান, আমার সেবা—এই সমস্তে তিনি আমাকেই ভোগ করেন।

অর্জ্জুন—লোকে বলিতে পারে যাঁহারা দুঃখীলোকের সেবা করেন, তাঁহারা ত তোমার প্রধান ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ যিনি যুক্ততম, তিনি জগতের হাহাকার গ্রাহ্য করেন না। গ্রাহ্য করেন নিজের সুখ। ভগবান্‌কে লইয়া তিনি সুখ করেন; তিনি ধ্যান-ধারণায় আনন্দ করেন; তিনি সমাধি-সুখে থাকেন; আর জগতের লোক হাহাকার করে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নাই। এরূপ স্বার্থপর লোক শ্রেষ্ঠ কিরূপে?

ভগবান্—এই হিসাবে লোকে আমাকেও ত বেশী স্বার্থপর বলিতে পারে। জীবের দুঃখ ত সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও ত সর্ব্বদা তাহাদের দুঃখ দূর করি না। নিতান্ত মূঢ় ও নিতান্ত ভ্রান্ত লোকে তাহাদের নাস্তিকতা-বশে আমার উপর দোষারোপ করে, এবং আমার উপর আমার যে সমস্ত ভক্ত নিতান্ত নির্ভর করে, তাহাদের উপর স্বার্থপরতাদি দোষ দেয়। এই সমস্ত লোকে আমাকে বিশ্বাস করে না, আমার উপর নির্ভরতা রাখে না—ইহাদের জ্ঞান নাই। যদি ইহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে ইহারা দেখিতে পায়—জীবরূপে আমিই সর্ব্বত্র খেলা করিতেছি। কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। যে জাতি যেমন কর্ম্ম করে, সেই জাতি সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে। যাঁহারা এখন যুক্ততম হইয়াছেন, তাঁহারাও একদিন "জীবে দয়া" করিবার কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। যতদিন লোক-সঙ্গে থাকিতে হয়, ততদিন সর্ব্বজীবে আমাকে স্মরণ রাখিবার জন্য জগতের কার্য্য করিতে হয়। পরে নিষ্কাম-কর্ম্মী যখন একান্তে আইসেন, তখন তিনি আমাতে তাঁহার আত্মাকে মিশাইতে অভ্যাস করেন। এই অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই। এই অবস্থায় সিদ্ধিলাভ করিলে, তিনি আমার মত জ্ঞানসম্পন্ন হয়েন। আমার "চাপরাশ" না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি জগতের কোন মায়িক ব্যাপারে লিপ্ত হন না। আমার আজ্ঞা ব্যতীত তিনি কিছুই করেন না। কিন্তু যখন আমার আজ্ঞা লাভ করেন, তখন দেশহিতৈষী বহু দৌড় ধাপ করিয়া যাহা না পারেন, তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ মাত্রে জগতের গুরুতর কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করেন। এইরূপ যোগী, ভক্ত, এবং জ্ঞানী সকলকালেই আছেন। জীব দুঃখে হাহাকার করে আর তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান লইয়া যে গিরি-গুহায় সমাধিস্থ থাকেন তাহা নহে। শ্রীভগবান্ যে জীবের সমস্ত অবস্থা জানিয়াও সময় অপেক্ষা করেন, জীবের কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি রাখেন,—ভগবান্ বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত, যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগী ইঁহারা সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও জীবের কর্ম্মফল ভোগের জন্য অপেক্ষা করেন; এবং জীব যে লোকহিতকর কর্ম্ম করে, ইহাও তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে। সমাজে যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা নিষ্কারণে

হয় না। ইহাতে শ্রীভগবানের এবং সাধুসজ্জনের ইচ্ছা আছে। যে যেমন অধিকারী, সে সেইরূপ কর্ম্ম দিয়া সমাজের তদানীন্তন অবস্থার উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করে। অধঃপতিত সমাজ একেবারে উচ্চ অবস্থায় যাইতে পারে না বলিয়া, কর্ম্মশূন্য জ্ঞানালোচক, কর্ম্ম বাদ দিয়া শুধু চিন্তা বা ধ্যানশিক্ষা দ্বারা সমাজের উপকার করিতে চাহেন। ইহাতে সমাজের এক প্রকার ব্যাধি দূর হইয়া অন্য প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আবার কেহ কেহ জ্ঞানে লক্ষ্য না রাখিয়া, নিত্যকর্ম্মাদিতে মনোনিবেশ না করিয়া, শুধুই লোকহিতকর কর্ম্ম করিতে দৌড়ধাপ করেন। ইহার ফলও পূর্ব্বের মত। শ্রুতি এই জন্য কর্ম্মশূন্য জ্ঞান ও জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম উভয়কেই বহু দোষের আকর বলিতেছেন। জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম বরং ভাল, কিন্তু কর্ম্মশূন্য জ্ঞান সমস্ত দোষে দুষ্ট। কিন্তু যাঁহারা সমকালে নিত্যকর্ম্ম, জীবসেবাকর্ম্ম এবং প্রতিকর্ম্মে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভকেই কর্ম্মকরার একমাত্র উদ্দেশ্য ভাবনা করিয়া শাস্ত্রালোচনার সহিত কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই একদিকে জগতের কল্যাণ-সাধন ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ কর্ম্ম দ্বারা নিজের চিত্তশুদ্ধি করিয়া এক সঙ্গে জগদুদ্ধার ও আত্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন। বেদের শিক্ষা ইহাই। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা করিবে, তাহাই জীবকে ভ্রষ্টপথে লইয়া যাইবে। তবে কখন কখন ভ্রষ্টাচারও আবশ্যক বলিয়া সাধুগণ—এরূপ কার্য্য সমাজে যখন চলে—তখনও নিশ্চেষ্ট থাকেন। এখন বুঝিতেছ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা যুক্ততম অবস্থা কিরূপে শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—যাহারা ভণ্ড, তাহারা যথাসময়ে বিড়ম্বিত হইবেই। তাহাদের পতন অধিক করিবার জন্যই, তুমি কিছুদিনের জন্য তাহাদের ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিয়া থাক। আর মূঢ় লোকে ভাবে যে, পাপ কার্য্য করিয়াও ত বেশ উন্নতি হয়। ইহারা স্থূলদর্শী বলিয়া বুঝিতে পারে না—ভণ্ডামীর দণ্ড সমূলে বিনাশ ও সবংশে উচ্ছেদ। আবার যাহারা ভাবে যে, প্রকৃত যোগী, বা ভক্ত, বা জ্ঞানী স্বার্থপর, তাহারা মূঢ়তম।

ভগবান্—প্রথম ষট্কের মুখ্য উপদেশ "ত্বম্পদার্থের শোধন"। জীবের আত্মা, প্রকৃতির বশ বলিয়া ইহা বিষয়াসক্ত। বিষয়াসক্তিই চিত্তকে সর্ব্বদা অশুদ্ধ রাখে। কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। এই জন্য কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক সাধনা দ্বারাই ত্বম্পদার্থের শোধন হয়। এই সাধনার অঙ্গ নিষ্কাম কর্ম্ম, আরুরুক্ষু যোগ এবং যোগারূঢ়-অবস্থা। যোগারূঢ় সাধক যখন যুক্ততম-অবস্থা লাভ জন্য মদ্গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহ আমার ভজনা আরম্ভ করেন, তখন তিনি "তৎপদার্থ" নিষ্ঠ হয়েন। মধ্যম্ ষট্কে "তৎপদার্থ" বা "উপাস্যচিন্তা" কিরূপ তাহা জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে -ইহাই উপদেশ করিতেছি। প্রথম ষট্ক কর্ম্ম-সন্ন্যাসাত্মক-সাধন-প্রধান ত্বম্পদার্থ শুদ্ধিবিশিষ্ট। মধ্যম্ ষট্ক ব্রহ্ম-প্রতিপাদন-প্রধান তৎপদার্থ ব্যাখ্যা-বিশিষ্ট। প্রথম-ষট্কে যোগ-প্রমুখ আত্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে; দ্বিতীয়ে ভজনীয় ভগবানের রূপ বলা হইবে।

অর্জ্জুন—"ময্যাসক্তমনাঃ" ও "মদাশ্রয়ঃ" এই দুইটি না বলিয়া শুধু মদাশ্রয় হইয়া যোগ কর বলিলেই ত হইত?

ভগবান্—ময্যাসক্তমনাঃ ও মদাশ্রয়ঃ উভয়ই আবশ্যক কেন, তাহা লক্ষ্য কর। মন্ত্রী

রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি রাখিতে পারে। সেইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মী আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, দেশ উদ্ধার জন্য কর্ম্মে আসক্তি রাখিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত যোগী যিনি হইবেন, তাঁহার অন্য কুত্রাপি আসক্তি রাখিলে যোগ হইবে না। কারণ ইহাতে একনিষ্ঠা হয় না। এই জন্য আমার আশ্রয়ে থাকিয়া, অন্য সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগ করিতে হইবে, তবে ভক্তি-মার্গে অধিকার হইবে। পরমপুরুষের স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা ভক্তিমার্গের সাধনা যে পরিপুষ্ট হয়, এখন তাহাই বলা হইবে।

যতদিন নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসে জোর রাখিবে, ততদিন সংসারে থাকিতে হয়। পরে আত্মসংস্থ যোগাভ্যাসের সময় "রহসিস্থিতঃ" হইতে হইবে। তজ্জন্য "শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" ইত্যাদি বলিয়াছি। এই সমস্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। "শুচৌদেশে" প্রভৃতির ব্যাখ্যা যাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবে কূটস্থ-দেশ ইত্যাদি করেন—তাঁহারা সাধকদিগকে সংসার ছাড়িয়া একান্তে যাইতে হইবে বলিলে পাছে তাহারা সাধনা ছাড়িয়া দেয়—সেই জন্য শিষ্যের মনোরঞ্জনের হেতু দুর্ব্বলতা করেন মাত্র। একান্ত সেবা ভিন্ন "ময্যাসক্তমনাঃ" পূর্ণভাবে হইতেই পারে না। সিদ্ধাবস্থায় কোন নিয়ম নাই।

অর্জ্জুন—এখন যুক্ততম হইতে হইলে, ভক্তিযোগ পরিপক্ব করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক তাহাই বল।

ভগবান্—যুক্ততম হইতে হইলে আমাকে জানা চাই। আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অনুভব চাই। শুধু পরমাত্মা আছেন এই বিশ্বাস মাত্র রাখিলে, যুক্ততম হওয়া যাইবে ন ; সেই জন্য অনুভব-যুক্ত জ্ঞানের কথাই বলিতেছি ॥১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

অহং (শ) তে তুভ্যং সবিজ্ঞানং (শ) বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তং (শ) ইদং জ্ঞানম্ অপরোক্ষং (আ) জ্ঞানং চৈতন্যং (আ) "জ্ঞানং শুদ্ধপ্রজ্ঞানঘনং ব্রহ্ম," (নী) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ (নী) অশেষতঃ কাৎস্ন্যেন (শ) সাধনকলাপসহিতম্ (নী) সাধনফলাদিসহিতত্বেন (ম) নিরবশেষং (ম) বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি (শ) যজ্ জ্ঞানং নিত্যচৈতন্যরূপং (ম) জ্ঞাত্বা বেদান্তজন্যমনোবৃত্তি- (ম)

বিষয়ীকৃত্য ইহ ব্যবহারভূমৌ ভূয়ঃ পুনঃ অন্যৎ কিঞ্চিদপি জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনম্ ন অবশিষ্যতে অবশিষ্টং ন ভবতি সর্ব্বস্য তদন্তর্ভাবাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠান-সন্মাত্রজ্ঞানেন কল্পিতানাং সর্ব্বেষাং বাধে সন্মাত্রপরিশেষাৎ তন্মাত্রজ্ঞানেনৈব ত্বং কৃতার্থো ভবিষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥২॥

আমি তোমাকে অনুভব-সংযুক্ত এই জ্ঞান বিশেষরূপে বলিতেছি। ইহা জানিলে, ইহ-জগতে পুনরায় অন্য জ্ঞাতব্য আর অবশিষ্ট থাকে না ॥২॥

অর্জ্জুন—শ্রুতি বলেন "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতম্" ইতি। হে ভগবান্। কাহাকে অনুভব করিলে অন্য সমস্তই অনুভূত হয়? অনুভবের সহিত জ্ঞান, তাহার স্থায়িত্ব জন্য সাধনা তুমি বলিবে—এই পরমাত্ম-তত্ত্ব—শাস্ত্র যাহা বিবৃত করেন এবং অনুভব দ্বারা যাহা লাভ করা যায়—তাহা জানিলে আর জানিতে বাকী থাকিবে না। বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান ইহা একটু স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান্—শাস্ত্রীয় কর্ম্ম এবং শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে যে আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই পরোক্ষ-জ্ঞান। কিন্তু ইহার অনুভব যখন হয়, তখনই বিজ্ঞানের সহিত আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ হয় ॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

মনুষ্যাণাং শাস্ত্রীয়জ্ঞানকর্ম্মযোগ্যানামধিকারিণাং সহস্রেষু অনেকেষু মধ্যে কশ্চিৎ একঃ পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থং ফলসিদ্ধিপর্য্যন্তং সত্ত্ব-শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং যততি প্রযত্নং করোতি। যততাম্ অপি সিদ্ধানাং সিদ্ধিপর্য্যন্তং যতমানানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ একঃ

ম ম ম শ্রী শ
শ্রবণমনননিদিধ্যাসনপরিপাকান্তে মাম্ ঈশ্বরম্ আত্মানং তত্ত্বতঃ যথাবৎ
ম আ ম
প্রত্যগভেদেন 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি গুরূপদিষ্টমহাবাক্যেভ্যঃ বেত্তি
ম ম
সাক্ষাৎকরোতি অনেকেষু মনুষ্যেষু আত্মজ্ঞানসাধনানুষ্ঠায়ী পরম-
ম শ
দুর্ল্লভঃ,সাধনানুষ্ঠায়িষ্বপি মধ্যে ফলভাগী পরমদুর্ল্লভ ইতি কিং বক্তব্যমস্য
ম শ্রী
জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। তদেবমতিদুর্ল্লভমপ্যাত্মতত্ত্বং তুভ্যমহং
শ্রী
বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥৩॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কচিৎ দুই এক জন সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত [অন্য সমস্ত ইচ্ছা ও অনাবশ্যক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইহাই করিব এইরূপ) যত্ন করেন। সিদ্ধিপর্য্যন্ত যত্নপরায়ণ সহস্র সাধক মধ্যে কচিৎ কোন ব্যক্তি সমস্ত তত্ত্বের সহিত আমার (আত্মতত্ত্বের) সাক্ষাৎ অনুভব করেন ॥৩॥

অর্জ্জুন—তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানা—ইহার অর্থ কেহ বলেন প্রকৃতিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, এবং জীবচৈতন্যতত্ত্ব সহ পরমাত্মতত্ত্ব জানাই তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানা। ইহাই আত্মতত্ত্ব। আবার কেহ বলেন—ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-সমন্বিত তোমাকে জানাই তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানা। এখানে কোন্ অর্থ তুমি বলিতেছ ?

ভগবান্—পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতেই তুমি দেখিবে—আমি আত্মতত্ত্বের জ্ঞানই তোমাকে বলিব বলিতেছি। ভক্তগণ, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-সমন্বিত আমাকে জানা এই ব্যাখ্যা করেন। আমি এখানে কিন্তু তাহা বলিতেছি-না।

অর্জ্জুন—কোন্ প্রকার অধিকারী আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন ?

ভগবান্—পূর্ণভাবে আত্মতত্ত্বের অধিকারী নিতান্ত দুর্ল্লভ। আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি সকলের ভাগ্যে হয় না। দেখ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি মনুষ্য আছে। আবার জীব কত আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। মনুষ্যের মধ্যেই কেহ কেহ মৎকল্পিত কর্ম্ম ও শাস্ত্রাদির পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব জানিতে যত্ন করেন। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। উহাতে সিদ্ধিলাভে যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা সহস্রের মধ্যে দুই একটি। প্রায় মনুষ্যই ভোগে আসক্ত। ভোগকে তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্যকেই প্রতিনিয়ত অভ্যাস করেন, তাঁহারাই কল্পনা, স্মৃতি এবং

না জাগে। অহং জাগিলেই দ্রষ্টাভাব। অহংটি সৃষ্টি-বীজ। অহংটি দৃশ্য-বীজ। দ্রষ্টাভাব মধ্যেই এই অহংরূপ সৃষ্টি বীজ সর্ব্বদা আছে।

যাহাতে পার এই অহং ভুলিয়া শান্ত হও দ্রষ্টাভাব জাগিবেই না। তখন দৃশ্য-ভাবও নাই।

তাই বলা হইতেছে, তুমি স্বীয় অনুভব-বলে যেমন হৃদয়ের স্বপ্ন সঙ্কল্প ও মানস রাজ্যাদি বুঝিতে পার, সেইরূপ দৃশ্য-পদার্থও হৃদয়ে আছে বুঝিতে পারিবে।

যেমন স্বচিত্তের কল্পনাপ্রভব পিশাচ বালককে বিনাশ করে সেইরূপ দৃশ্য-রূপিণী পিশাচী দ্রষ্টাকেই হনন করে।

রাম—অহো কি দুঃখ! জীব সর্ব্বদাই "অহং" "মম" ইত্যাকার করিতেছে। অহং নাশ কিরূপে হইবে? দৃশ্যদর্শনই বা ছুটিয়া যাইবে কিরূপে?

বশিষ্ঠ—ইহার জন্য এই যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ। হতাশ হইও না। আমি তোমাকে আশান্বিত করিবার জন্য, এক্ষণে সংক্ষেপে অহংনাশ-তত্ত্ব ও দৃশ্য দর্শন বিনাশতত্ত্ব বলিতেছি, সমস্ত গ্রন্থে ইহা বিশেষ করিয়া বলিব।

আত্মাই প্রকৃত দ্রষ্টা। আত্মার দৃশ্যবস্তু হইতেছে মন বা চিত্ত। মন আত্মচৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়া যখন দ্রষ্টা সাজেন, তখন ইনি জগৎ দর্শন করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,আত্মাই চিত্ত বা মনকে দেখিতে দেখিতে মহামনরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন।

এখন দেখ—আত্মা মনরূপে বিবর্ত্তিত হইলে, মন হইয়া নানা সঙ্কল্প তুলিতে থাকেন। অহং বহুস্যাম্ তখনকার কথা।

আত্মা মনের সহিত এক হইয়া গেলেও, বরাবর এক হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার স্বভাবে এক হইয়া থাকিতে দেয় না।

সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন ক্রমাগত তীরের দিকে ছুটিয়া আসিয়া আছাড় খাইতেছে, আর তীরে ফেনরাশি ছড়াইয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই সমুদ্রে মিশাইতেছে—চতুষ্পাদ পরম শান্ত আত্মার মায়াপরিচ্ছিন্ন পাদ মহামনরূপে বিবর্ত্তিত হইলেও, শ্বাসের মত একবার বাহিরে আসিতেছেন আবার ভিতরে আপনস্বরূপে মিশিতেছেন।

অহং বলিয়া বাহিরে আইসেন, আবার সঃ বলিয়া ভিতরে মিশেন। ইহাই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ দেবতার অজপা জপ।

অত্যন্ত বাহিরে আসিয়া স্থূল বিষয় ভোগ করেন, তখন ইঁহার যে অবস্থা

তাহার নাম জাগ্রত অবস্থা। কিছু বাহিরে আসিয়া সূক্ষ্ম সংস্কারে ভোগ যখন করেন, তখন ইঁহার স্বপ্নাবস্থা। আবার সান্নিধ্যে মিলিত হইবার কালে যখন কারণ-শরীরে আনন্দময় কোষে থাকিয়া চেতোমুখ হইয়া আনন্দ ভোগ করেন, তখন সুষুপ্তি অবস্থা। আবার যখন খণ্ডচৈতন্য আপন অখণ্ড স্বরূপে ঐক্যজ্ঞান লাভ করিয়া পরিপূর্ণ হইয়া স্থিতিলাভ করেন, তখনই তুরীয় অবস্থা। ইহাই আপনি আপনি ভাব। ইহাই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ-প্রাপ্তি।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাই আত্মার মায়া-আশ্রয়ে দীর্ঘ-স্বপ্ন।

এখন দেখ, আত্মার এই দীর্ঘ-স্বপ্ন ভাঙ্গিবে কিরূপে? আত্মা আপনা ভুলিয়া মনকে আমি বলিলেও, একবারে মন হইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারেন না। একবার মন হয়েন, পরক্ষণেই মনের দ্রষ্টা হয়েন। এই দ্রষ্টাবস্থায়, মনকে তিনি জড় বলিয়াই বুঝিতে পারেন। তাঁহার চৈতন্যের ছায়া পড়িয়া জড় মন চেতন মত হইয়া থাকে—ইহা জানিয়া আত্মা যখন আপনার দ্রষ্টাভাব আর বিসর্জ্জন করেন না, তখন তিনি আপনার দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান করেন। জীবাত্মা এই দ্রষ্টাভাবে স্থিতিলাভ করিবার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা করেন। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" ইহার সাধনা করেন, অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মনকে নিবৃত্তি-মন দ্বারা উদ্ধার করেন। ইহাই আত্মশুদ্ধি। ইহার জন্য যোগে মনকে প্রত্যাহার করা চাই, পরে ভক্তি দ্বারা মনকে একাগ্র অবস্থায় লইয়া যাওয়া চাই; কিন্তু সমাধি-লাভ করিতে পারিলেও সব হইল না জানিও।

ইদং প্রমার্জ্জিতং দৃশ্যং ময়া চাত্রাহমাস্থিতঃ।
এতদেবাক্ষয়ং বীজং সমাধৌ সংস্মৃতি স্মৃতেঃ ॥৩২॥

"আমি দৃশ্য-মার্জ্জন করিয়াছি—আমি দৃশ্য-মার্জ্জন করিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছি" সমাধিকালেও এইরূপ সংস্কার থাকে। সেই সংস্কার পুনঃ-সংসারের অক্ষয় বীজ;—ঐ বীজ পুনঃ পুনঃ সংসার-অঙ্কুর প্রসব করিবেই। তবেই দেখ, জ্ঞানশূন্য সবিকল্প সমাধিতে মুক্তিলাভ হইল না। যদি বল নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা পরমপদে স্থিতিলাভ করিব, তাহাও হয় না। কারণ—

"সতি তস্মিন্ কুতো দৃশ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতা"। দৃশ্যজ্ঞান থাকিতে থাকিতে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে কিরূপে?

প্রতিদিন জীব সুষুপ্তিকালে পরমশান্ত অবস্থা লাভ করে। কিন্তু সুষুপ্তি-ভঙ্গে যাহা ছিল, তাহাই আবার হয়। সেইরূপ—

ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইহাখিলম্।
জগদ্দুঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতম্ ॥৩৪॥

সুষুপ্তি-ভঙ্গের মত সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেও, আবার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ-পরিপূর্ণ জগৎ ভাসিয়া উঠিবেই।

প্রাপ্তং ভবতি হে রাম! তৎ কিন্নাম সমাধিভিঃ।
ভূয়োনর্থ নিপাতে হি ক্ষণসাম্যে হি কিং সুখম্ ॥৩৫॥

হে রাম! ক্ষণিক সাম্যাবস্থা লাভে সুখ কি—যদি সমাধি-ভঙ্গে আবার অনর্থ-ভোগে নিপতিত হইতে হয়।

অনন্তকাল নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকিব যদি ইহা কেহ মনে করেন, তাহাও ভ্রম। কারণ মনরূপ মূল দৃশ্য-পদার্থ থাকিতে থাকিতে দৃশ্য-মার্জ্জন কিছুতেই হইবে না। যত্নবান্ যোগীও ইহা আনিতে পারিবেন না। এপর্য্যন্ত কোন যোগীর নির্ব্বিকল্প সমাধি পাষাণ-তুল্য স্থিরত্বলাভ করিতে পারে নাই—ইহা সকলের অনুভব-সিদ্ধ।

ন চ পাষাণতা তুল্যা নির্ব্বিকল্পসমাধয়ঃ।
কেষাঞ্চিৎ স্থিতিমায়ান্তি সর্ব্বৈরিত্যানুভূয়তে ॥৩৯॥

জ্ঞানশূন্য সমাধি লাভেও যখন তুরীয়পদে স্থিতিলাভ করা যায় না তখন যাহারা জগৎ মিথ্যা—জগৎ নাই—এইরূপ অভ্যাসে দৃশ্য-মার্জ্জন করিতে চায় তাহারা প্রলাপ বকে মাত্র।

নেদং নেদমিতি ব্যর্থ-প্রলাপৈনোপশাম্যতি।
সঙ্কল্পজনকৈর্দৃশ্য ব্যাধিঃ প্রত্যুত বর্দ্ধতে ॥২৪॥

জগৎ নাই—জগৎ নাই—সমস্ত মিথ্যা এই ব্যর্থ প্রলাপ দ্বারা দৃশ্যবোধরূপ ব্যাধির শাম্য হয় না, অধিকন্তু ব্যাধি বৃদ্ধিই পায়; কারণ মৌখিক বাক্য, মানসিক সঙ্কল্পের জনক। এই জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া, নিত্য কি, অনিত্য কি, ভোগ ত্যাগ করিয়া, ইহার বিচার করিবে। পরে আত্মাতে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি শ্রদ্ধা, সমাধান ইত্যাদি গুণগুলি স্ফুরিত করিতে হইবে। পরে আমি বদ্ধ, আমাকে মুক্ত হইতে হইবে—এই মুমুক্ষা দৃঢ়ভাবে জাগাইতে হইবে। সর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া, পরে

গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বিচারে জীব ও ব্রহ্মের একতারূপ জ্ঞান লাভ হইবে।

পূর্ব্বে বলিলাম তুমি, আমি, জগৎ ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞান যতদিন থাকিবে, ততদিন দৃশ্য-দর্শন থাকিবেই। এই ভ্রম দূর করিবার জন্যই, তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্য বিচার আবশ্যক।

দেখ দৃশ্য-দর্শন রূপ ভ্রম কতদূর প্রসারিত। সম্মুখে জগৎ দেখিতেছ, ইহাও যেমন দৃশ্য-দর্শন রূপ ভ্রম—সেইরূপ তোমার স্থূল দেহ, তোমার মন, তোমার কারণ দেহ বা 'আমি কে, আমি জানিনা' রূপ অজ্ঞান—এই সমস্তই মিথ্যা দৃশ্য-দর্শন। দেহ আছে এই ভ্রম সর্ব্বদাই লোকের সঙ্গে আছে, তার পর মন আছে, অজ্ঞান আছে—ইহাও মানুষ সহজে ভুলিতে পারে না। সেই জন্য সমস্ত সাধনা শেষ করিয়া, তত্ত্বমস্যাদি বিচার না করা পর্য্যন্ত, সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি হইতেই পারে না। শ্রীভগবানে ভক্তি যাহাদের নাই, তাহারা কোটিকল্পও যদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপ লইয়া থাকে, তাহা হইলেও হইবে না।

রাম—বুঝিলাম নিষ্কাম কর্ম্ম, ভক্তিযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ ইত্যাদির পরে বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ হইবে। এখন বলুন, তত্ত্বমসির বিচারে এই জ্ঞান কিরূপে লাভ হইবে?

বশিষ্ঠ—উৎপত্তি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকেই ব্রহ্মবিজ্ঞান কিরূপে হইবে তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। এখানে ঐ শ্লোকের উল্লেখ করিয়া "তত্ত্বমসি বিচার" সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এখানে ইহাও বলিয়া রাখি, প্রথমে অভ্যাস রাখিও—আকাশের মত ব্রহ্মই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল বস্তুর ভিতরে বাহিরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। জীব যাহা কিছু করিতেছে, তাহা পরিপূর্ণ আত্মার সহিত হইতেছে। ইহা স্থূল কথা। প্রকৃত কথা এক আত্মাই আছেন, জগৎ যাহা আছে ও দেখা যাইতেছে তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত ভাসিয়াছে। সর্ব্বদা এই ভাবটি অভ্যাস করিতে হইবে। তাহার পর তত্ত্বমস্যাদির বিচার।

রাম—এখন বলুন, ব্রহ্মবিজ্ঞান কিরূপে লাভ হইবে?

বশিষ্ঠ—শ্রবণ কর।

বাগ্‌ভাভি ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ভাতি স্বপ্ন ইবাত্মনি।
যদিদং তৎ স্বশব্দোথৈ র্যো যৎ বেত্তি স বেত্তি তৎ॥

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

নিত্য অভ্যাস ও শুভ কথা।

উত্থানে—প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সৎচিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎস্বপ্নজাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥ শ্রীশঙ্করঃ

প্রভাতে হৃদয়ে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ স্মরণ করি। এই আত্মতত্ত্বই সৎচিৎ আনন্দ। ইহাই তুরীয় ব্রহ্ম। ইনিই পরমহংসদিগের গতিস্বরূপ। ইনিই প্রত্যহ স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি অবস্থায় যাওয়া আসা করেন। এই কলাতীত—অংশ-শূন্য ব্রহ্মই আমি। আমি ভূতসমষ্টি নহি। [আত্মতত্ত্বই ব্রহ্ম। ইহাই শক্তি শক্তিমান্—হরপার্ব্বতী, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব] ইহার স্মরণ ও অনুভবেই মানুষের মুক্তি।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥
বেদ। কেন উপনিষদ্॥

সেই আত্মতত্ত্ব ব্রহ্ম শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের

প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। ইহাকে এইরূপে জানিতে পারিলে, ধীরগণ বিষয়াভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোক হইতে গমন করিয়া অমরত্ব লাভ করেন॥

যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশবিনা কল্পকোটিভি স্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ বেদ॥ ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্॥

জন্মান্ধ ব্যক্তির রূপজ্ঞান যেমন হয় না, সেইরূপ গুরূপদেশ ভিন্ন কোটি-কল্পেও তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতস্তন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ শ্রীভাগবত

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র বায়ু অনুপম স্তব দ্বারা যাঁহাকে মহামহিমান্বিত বলেন, সামগানকারী ঋষিগণ অঙ্গপদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদে যাঁহাকে গান করেন, যোগিগণ ধ্যানযোগে তদ্গতচিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন, দেবতা ও অসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতাকে নমস্কার।

ত্বং ব্রহ্মা ত্বং চ বৈ বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নিবরুণো বায়ুস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং নিশাকরঃ॥ বেদ॥

বেদ আবার বলিতেছেন, তুমি ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি বায়ু, তুমি ইন্দ্র, তুমিই চন্দ্র॥

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাদ্ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায়জগতাং তং জানকীশং ভজে॥

বিশ্বোদ্ভব স্থিতি লয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।

আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥

যে অব্যয় চিন্ময় প্রভু পৃথিবীর পাপভার হরণ জন্য দেবতাগণ কর্ত্তৃক সম্যকরূপে প্রার্থিত হইয়া পৃথিবীতলে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাবণাদি রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করিয়া এবং জগতের পাপহরা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুনরায় যিনি আত্ম ব্রহ্মরূপ গ্রহণ করেন, সেই জানকীপতিকে আমরা ভজনা করি। একমাত্র এই প্রভুই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গের হেতু—মায়াকে আশ্রয় করিয়াও ইনি মায়াতীত, ইনি অচিন্ত্যমূর্ত্তি, আনন্দঘন নির্ম্মল নিজ বোধরূপ; ইনিই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, এই সীতাপতিকে আমি নমস্কার করি। [যিনি আত্মতত্ত্বব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বরূপ এবং তিনিই মায়া-মানুষ বা মায়া মানুষী]

শয়নমন্ত্র—সপ্তর্ষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্তরক্ষন্তি
সদমপ্রমোদম্। সপ্তাপঃ স্বপতো
লোকমীয়ুস্তত্রজাগৃতোঽস্বপ্নজৌ
সত্রসদৌচ দেবৌ ॥ বেদ ॥

ভৃগু অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষি এই শরীরে (চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ এই সপ্ত অবয়বে) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। জাগ্রত অবস্থায় ইঁহারা স্বতঃ প্রমোদ-শূন্য এই দেহরূপ দেবযজন ভূমি রক্ষা করেন। স্বপ্নকালে ইহারা সুপ্তজীবের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই অবস্থায় অস্বপ্ন (হিরণ্যগর্ভরূপ দেবতা) জাত-প্রাণ-অপানরূপ এই যজ্ঞভূমিস্থিত দেবদ্বয় জাগ্রত থাকেন।

স্কন্দপুরাণ হইতে।

১। নারী আসক্তি—সর্ব্বজন্মের দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও কোন কোন মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া সেই মানব জন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া ফেলে। [নারীজনে আসক্ত ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইলেও লোক সমাজে বিখ্যাত লোকদিগের নিকটে আপনাকে আপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র অনুভব করে এবং ভিতরে নিজের নীচত্ব অনুভব করে] ঐ সকল মূঢ় দিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য তোমাদের জন্ম কিসের জন্য !

নারী হইতে জীব জগতের উৎপত্তি, সুতরাং আমরা তাহাদের নিন্দা করি না। কিন্তু যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্লজ্জ ভাবে আসক্ত হয়, তাহাদিগকে আমরা নিন্দা করি।

জগতের বৃদ্ধি জন্য ব্রহ্মা মিথুন সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং সেই মিথুনের যথাযোগ্য আচার পালন করাই কর্ত্তব্য; তাহাতে কিছু মাত্র দোষ নাই। বহ্নি ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে বান্ধব কর্ত্তৃক যে নারী প্রদত্তা হয় তাহার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই প্রশংসাজনক এবং সর্ব্বসুখ সম্পাদক।

রক্ত রসাদি ছয়টি ধাতুর যাহা সার, সেই বীর্য্য যোগ্য যোনি পরিহার পূর্ব্বক যাহারা কু-যোনিতে নিক্ষেপ করে—অথবা অন্য উপায়ে বৃথা নষ্ট করে—যমদেব তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে ওষধিদ্রোহী, আত্মদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী। সুদীর্ঘকালের জন্য তাহাদের অধোগতি হইয়া থাকে।

২। মৃত্যু যে সকলের মস্তকে অধিষ্ঠিত, জনগণ যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আহারেও রুচি হয় না, অকার্য্য করণের কথা আর কি বলিব?

৩। এই সমগ্র জগৎ ছায়ার ন্যায় উৎপত্তি-ক্ষয়যুক্ত। ধন, আয়ু, যৌবন বারনারীর ভ্রূবিলাস সদৃশ ক্ষণস্থায়ী।

৪। দুঃখই সংসার-সাগরের আবর্ত্ত, অজ্ঞান ইহার প্রবেশ-পথ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার জল, ক্রোধ ইহার পঙ্ক, মদ ইহার কুম্ভীর, লোভ ইহার বুদ্‌বুদ্, অভিমান ইহার পাতাল সমান গভীরতা, প্রাণিবর্গ ইহার শোভাসম্পাদক যানশ্রেণী; ঈদৃশ সংসার-সাগর-মগ্ন জনগণকে একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

৫। বিত্ত অসার, যদি তাহার সার দান তাহাতে না থাকে। ঐরূপ বাক্য অসার যদি তাহাতে সত্যরূপ সার না থাকে; আয়ু অসার যদি তাহাতে কীর্ত্তিরূপ সার না থাকে এবং কলেবর অসার যদি তাহা দিয়া পরোপকার রূপ সার উদ্ধার না করা হয়।

৬। দেবাসুর সকলের পক্ষে মনুষ্য-জন্ম অতীব দুর্লভ। সেই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া এমন আচরণ করিবে যাহাতে নরকে যাইতে না হয়।

মনুষ্য জন্মে পরম লাভ।

মনুষ্য-জন্মে পরম লাভ কি ?

"অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ" মৃত্যুকালে নারায়ণ স্মরণই পরম লাভ।

এ কথা বলেন কে ?

রাজা পরীক্ষিৎ মুমূর্ষু। জীবন আর সাতদিন মাত্র থাকিবে। রাজার পূর্ব্ব-পুণ্যফলে জীবন্মুক্ত পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব, যদৃচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-ব্রতধারী মুমূর্ষু রাজার নিকটে আগমন করিলেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন যে, মুমূর্ষু অথচ মুমুক্ষু তাহার কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশুকদেব বলিতে লাগিলেন :—

রাজন্! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্নই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ। গৃহী ব্যক্তি পঞ্চসূনা পাপেই তৎপর। আত্মজ্ঞানশূন্য গৃহী, গৃহ-কার্য্যে আসক্ত থাকিয়া পঞ্চ প্রকার প্রাণিহিংসা কার্য্যেই রত থাকে। আমরা কে, কি করিতেছি, উত্তরকালে আমাদের কি হইবে, কি প্রকারেই বা নিস্তার পাইব—ইহারা এই সমস্ত আলোচনা করে না। ইহাদিগের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে।

কিন্তু ইহারা বৃথা আয়ুঃ ক্ষয় করে। রাত্রিকালে নিদ্রা ও স্ত্রী-সঙ্গে রঙ্গরসে যাপন করে। দিবাভাগের পরমায়ুঃ, ধনোপার্জ্জনের উদ্যম ও কুটুম্বাদি ভরণে ব্যয় করে।

প্রত্যহ স্পষ্টই দেখিতে পায়--দেহ নশ্বর, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ কাহারও থাকে না ; তথাপি আসক্তি অন্ধ ইহারা দেখিয়াও দেখে না। যদি দেখিত, তবে মোক্ষার্থীর কর্ত্তব্য যে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির স্মরণ, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন তাহার অনুষ্ঠান ভুলিত না।

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর আত্মা কি, অনাত্মা কি ইহার বিচার, পরে একান্তে অষ্টাঙ্গ যোগ—এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যে শ্রীহরির স্মরণ তাহাই মনুষ্য-জন্মের লাভ। পরে অন্তিমে নারায়ণের স্মরণই পরম লাভ। "অন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ" এই বাক্য মুমূর্ষু পরীক্ষিতের প্রতি ভগবান্ শুকদেবের উক্তি।

শাস্ত্রে আর কোথাও কি এই উপদেশ আছে ?

"ভৃগ্বাদন্তে স্মৃতিস্তব" পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইলে, তিনি শ্রীভগবান্‌কে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি জ্ঞানের কথা বলিয়া বলিলেন—

তস্মাৎ তদ্‌ভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তিশঙ্কা বিজ্ঞান শঙ্কানৈব সুখং তথা॥
অতস্তৎপাদযুগলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি।
স্যাৎ তদ্‌ভক্তিমতাং সঙ্গোঽবিদ্যাযাভ্যাঃ বিনশ্যতি॥

হে ভগবান্! তোমাকে যাহারা ভক্তি করে না, তাহাদের শতকোটি কল্পেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই। তাহাদের জ্ঞানও হয় না, সুখও হয় না। অতএব তোমার শ্রীপাদপদ্মে জন্ম জন্ম যেন আমার ভক্তি হয়, তোমার ভক্তসঙ্গ যেন হয়, ইহাতেই অবিদ্যার নাশ হয়।

শ্রীভগবান্ তাঁহার স্তবে প্রসন্ন হইলেন বলিলেন—

প্রসন্নোঽস্মি তব ব্রহ্মন্! যৎতে মনসি বর্ত্ততে।
দাস্যে তদখিলং কামং মা কুরুষাত্র সংশয়ম্।

তোমার যাহা প্রার্থনা তাহাই পূর্ণ করিব, সংশয় করিও না; তখন ভগবান্ পরশুরাম বলিতে লাগিলেন:—

যদি মেঽনুগ্রহো রাম! তবাস্তি মধুসূদন!
তদ্ভক্তসঙ্গস্তৎ পাদে দৃঢ়াভক্তিঃ সদাস্তমে॥

হে রাম! হে মধুসূদন! যদি আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে তবে এই কর যেন সর্ব্বদা তোমার ভক্তের সঙ্গ আমার লাভ হয় আর সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্মে আমার দৃঢ়াভক্তি থাকে।

প্রভু! আমার আর এক প্রার্থনা;—

স্তোত্রমেতৎ পঠেৎ যস্তু ভক্তিহীনোঽপি সর্ব্বদা।
ত্বদ্‌ভক্তি স্তস্য বিজ্ঞানং ভূয়াদন্তে স্মৃতিস্তব॥

এই স্তোত্র যে পাঠ করিবে, সে ভক্তিহীন হইলেও যেন তোমার প্রতি সে ভক্তি-লাভ করিতে পারে; তাহার জ্ঞান যেন লাভ হয়, আর অন্তিমে তোমাকে সে যেন স্মরণ করিতে পারে।

শাস্ত্র বলিতেছেন—অন্তিমে তোমার স্মরণই পরম লাভ।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে শ্রীকৌশল্যাদেবীকে বলিয়াছিলেন—মাতঃ, তোমার এই স্তব ও আমার সহিত তোমার কথা—যে ইহা পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে,

সে "মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ"—সে মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে, পারিলেই তাহার পরম লাভ হইবে।

সমস্ত জীবন ধরিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে "অন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ" হইবে?

যে ব্যক্তি সকল চিন্তা, সকল বাক্য ও সকল কার্য্য শ্রীভগবানের অনুমতি লইয়া করিতে অভ্যাস করিতেছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা রূপ কার্য্যটিকে প্রধান কর্ত্তব্য জানিয়া অন্যান্য যথা-প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইয়াও অন্য কর্ম্মের আদিতে, বিরামকালে এবং অন্তে ভগবান্‌কে লইয়াই থাকিতে হইবে ইহা বুঝিয়াছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা করিবার কার্য্যটি জানিয়া এক মুহূর্ত্তও বৃথা সময় নষ্ট করে না—সেই ব্যক্তিই অন্তিমে তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে স্মরণ করিতে সমর্থ।

সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিবার জন্যই প্রথমে প্রাতে, স্নানান্তে (মধ্যাহ্নে) এবং সন্ধ্যায় নিয়ম পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইবে। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যিনি যাহা পাইয়াছেন, তিন সন্ধ্যায় তাহা করিতে হইবে। অন্য সময়ে যেমন যেমন অবসর পাইবে, তখনও ভগবানের নাম জপ বা ধ্যান বা আত্ম-বিচার লইয়া থাকিতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায় তাহার ভিতরেই ইষ্টদেবতা আছেন সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে। যখন যাহা ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইতেছে, তাহাই শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত ইহা বুঝিয়া অচঞ্চল থাকিতে হইবে। যদি দুঃখের তাড়না আইসে- সেই সময়ে শ্রীভগবানের নাম জপ করিয়া করিয়া, তাঁহারই চরণ চিন্তা করিয়া, তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। লোকসঙ্গে যখন থাকিবে, তখন সবই তিনি ভাবিয়া সকল ব্যাপার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সকল মনোবেদনা তাঁহাকেই জানাইতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস প্রবল হইলে তবে মরণ সময়ে যে তাঁহার স্মরণ হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ করিতে অভ্যাস করেন না, তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার কৃপা কিরূপে লাভ করিবেন?

সর্ব্বদা নাম জপ, রূপ ধ্যান; সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কথা কওয়া; শাস্ত্র পাঠ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া—ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া ফেল; অন্তিমে চিন্তামণির চরণ-চিন্তা তাঁহারই কৃপায় আসিবেই। যতক্ষণ জাগিয়া থাক তাঁহাকে স্মরণ

করিতে চেষ্টা কর, তবেত নিদ্রাকালেও তাঁহার স্মরণ থাকিবে; নতুবা কখন কখন একবার করিয়া প্রার্থনা মাত্র করিলে—বলিলে হে ভগবন্ অন্তিমে যেন তোমার দেখা পাই—এইরূপ মৌখিক প্রার্থনায় কিছুই হইবে না জানিও। এইরূপে যে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা তাহাও আত্ম-প্রতারণা। যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা বিষয়েরই সেবা করেন; তাঁহারা বিষয় লাভের জন্যই যেন ভগবান্‌কে এক একবার স্মরণ করেন মাত্র—ইহাতে কখনই মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ করা যাইবে না।

যখন শরীর সুস্থ থাকে তখনই যখন তাঁহাকে স্মরণ করিতে যাও তখন কত বিঘ্ন আইসে—আর সেই মৃত্যুকালে যখন শত বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকিবে, তখন কি তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিবে?

নিত্যকর্ম্ম কখন শিথিল করিও না, সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব বাক্য, সর্ব্ব ভাবনা, তাঁহাকে জানাইয়া করিতে অভ্যাস কর—ইহাতে আলস্য করিও না; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর—অন্তিমে শ্রীহরির স্মরণ-রূপ পরম লাভ তোমার হইবেই।

আর আত্ম-প্রতারণা করিও না। লোকের মুখে বা শাস্ত্রে তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব শুনিয়া—তিনিই একমাত্র সত্য ইহা লোকমুখে শুনিয়া যদি মনে কর তোমার আত্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে; যদি মনে কর তুমি সোঽহং হইয়াছ, তবে তোমার মত ভ্রান্ত আর কে?

এ কথাও সত্য যে, যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহাদের মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না; তাঁহারা এই জীবনেই এই জগতেই তাঁহার সহিত মিশিয়া যান। যেমন সুষুপ্তিকালে সকল মানুষই বা সকল জীবই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু এই মিলন প্রকৃতি দ্বারাই হয়; ইহা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াই হয়। সেই জন্য আবার সুষুপ্তিভঙ্গে পূর্ব্বসংস্কার জাগে, জাগিয়া আবার এই দেহে তাহাদিগকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে; কিন্তু জীবন্মুক্ত, সাধনা দ্বারা জ্ঞাতসারে সেই পরিপূর্ণ অধিষ্ঠান চৈতন্যের সহিত অন্তিমে মিশিয়া যান। তাই বেদ বলিতেছেন,—ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে।

জীবন্মুক্তের যে মুক্তি তাহাই সদ্যোমুক্তি; কিন্তু অন্তিমে যে ইষ্টদেবতার স্মরণ ইহাতে ক্রমমুক্তি হয়। সদ্যোমুক্তির কথা শুনিয়া আমি জীবন্মুক্ত হইয়াছি, সোঽহং জ্ঞানী হইয়াছি আমার আর জপাদি করিতে হইবে না—ইত্যাদি মনে ভাবা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। জীবন্মুক্তির সাধনা করিয়া তবে প্রত্যক্ষ

কর—জীবন্মুক্ত হইলে কিনা ? যতদিন না জীবন্মুক্তির সমস্ত অবস্থা লাভ করিতেছ ততদিন কপট জীবন্মুক্ত না হইয়া সর্ব্ব ভাবনা, সর্ব্ব ব্যক্য, সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে মনে থাকে কি না দেখ ; সমস্ত ব্যাপার তাঁহার অনুমতি লইয়া করিতেছ কি না দেখ, সতী-স্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করাকে ব্যভিচারিণী হওয়া মনে করেন—তুমিও সেইরূপ কোন ব্যভিচার করিতেছ কি না দেখ। যদি এই সমস্ত দেখিয়া বুঝিতে পার জীবন্মুক্তি হয় নাই তবে অন্তে নারায়ণ স্মরণের জন্য কর্ম্ম কর। কারণ যাঁহারা ক্রমমুক্ত হইতেও পারিলেন না তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিতে হইবে। কিন্তু এই জন্মে যাহা ছিলেন তদপেক্ষা নিকৃষ্ট যোনিতে গমন করিতে না হয় এই জন্য উপায় কি ?

কোন ধর্ম্মে বলা হয়, একবার মানুষ হইয়া গেলে আর নীচ যোনিতে নামিতে হয় না। ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। শাস্ত্রপ্রমাণে এবং যুক্তিতে ইহা প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিতে দেখা যায় যাহারা রিপুর প্রশ্রয় দেয়, এই জন্মেই তাহাদের মুখে পশুর ভাব আসিয়া যায়। ভিতরে পশুভাব আসিয়া গেলে এই দেহের অন্তে মানুষটি যে পশু হইয়াই জন্মিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

আবার শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায়, পাপকর্ম্মকারীকে নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট যোনিতে যাইতে হইবে। "কপূয়চরণা" ইত্যাদি মন্ত্রে বেদ ইহা দেখাইতেছেন। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ইত্যাদি শ্লোকে গীতা ইহার সমর্থন করিতেছেন ; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণও তাহাই বলিতেছেন। ভাগবত দৃষ্টান্ত দিতেছেন, ভরতরাজা মৃগশিশু চিন্তা করিয়া মৃগদেহ প্রাপ্ত হয়েন। নহুষ রাজা স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া সর্প হইয়াছিলেন ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রমাণ থাকিতে যাঁহারা বলেন একবার মানুষ হইলে আর পতন নাই তাঁহাদের এই আত্ম-প্রতারণায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বলিতে চাই অন্তকালে যদি নারায়ণ স্মরণ হয়, তবে মনুষ্যকে আর অধম যোনিতে যাইতে হয় না। এরূপ ব্যক্তি ক্রমমুক্তি লাভ করেন। জীবন্মুক্তের সদ্যোমুক্তি যদি না হয়, তবে যাহাতে ক্রমমুক্তি হয় তাহার আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"অন্তে নারায়ণের স্মরণ" এই কলিযুগে কি কোথায় হয় ?

অনেকের হয় শুনিয়াছিলাম। কখন পূর্ব্বে স্বচক্ষে দেখি নাই। সম্প্রতি যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম নানা কারণে তাহাই উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

বহু পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লেখা ছিল। যাহা পরে ঘটিবে পূর্ব্ব হইতে যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি সেইজন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিলেন, ঘটনার পরে ইহা বোধ হইল।

সন ১৩১৯ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ বেলা ৮ টার সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধের দেহান্ত হইল। ৺প্রবোধ বিবাহ করে নাই। বয়স বোধ হয় ৪০ হইয়াছিল। চিরদিনই ব্রহ্মচর্য্য করিতেছিল। সাধনা জন্য নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া শেষে হরিদ্বারে গমন করে। ইচ্ছা ছিল, হৃষীকেশ ও উত্তরকাশী এই দুই স্থানেই থাকিবে। কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালার সমস্ত ভার পূজনীয়া ৺মাতাজী তপস্বিনী প্রবোধের হস্তেই দিয়া যান। মহাকালী পাঠশালা ত্যাগ করিয়া সাধনার জন্য হরিদ্বারে থাকিতেই থাকিতেই জ্বর হয়। পরে কলিকাতায় চিকিৎসা জন্য আনা হয়। জ্বর কালাজ্বরে পরিণত হয়। গত জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণের ৪ দিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া দেহান্ত হয়। যাঁহারা পূর্ব্বে প্রবোধকে ভাল অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মুখেই শুনিয়াছি প্রবোধকে ঋষির মতই বোধ হইত। কিন্তু ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া অস্থি মাত্র সার হইয়াছিল। শেষ অবস্থায় কথা প্রায় কহিত না। কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যে ভাবে নারায়ণের স্মরণ করিতে করিতে তনুত্যাগ হইল, তদ্দৃষ্টে বুঝিলাম শাস্ত্রবাক্য সম্পূর্ণ সত্য। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান যাঁহারা করেন ভগবান্ অন্তিমে তাঁহাদিগকে কখনও ত্যাগ করেন না।

প্রবোধের শেষ সময়ে সীতারাম নাম ডাকান হইতেছিল। একদিকে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন ; অন্যদিকে আমি শ্রীগীতার এক অধ্যায় ও নাম রামায়ণ সম্পূর্ণ পাঠ করিলাম। সীতারাম সীতারাম বলান হইতেছে। প্রবোধ আপনিই ধরাগলায় নারায়ণ নামও বলিতে বলিল। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম সীতারাম এই নাম বলা হইতেছিল। ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ঠিক হইতেছে। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি নিকটে আনা হইল। হস্ত তখন কাঁপিতেছে সেই অবস্থাতে শ্রীভগবানের চরণ স্পর্শ করিল এবং জানাইল চরণোদক দেওয়া হউক। গঙ্গাজল চরণে লাগাইয়া মুখে দেওয়া হইল। তাহাই পান করিল। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, নাম ডাকান হইতেই ছিল, চরণোদক পান হইল, শ্রীগীতা ও রামায়ণ পাঠ শেষ হইল। ইহার দুই মিনিট পরে দেহান্ত হইল। মুখের বিকৃতি হইল না। গলার ঘড়ঘড়ানি হইল না। চক্ষুর বিকৃতি হইল না। স্থির সহজ দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতে দেখিতে—যেন কাহারও সঙ্গে দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইল। এই জীবনের সব শেষ হইল।

স্বচক্ষে ইহা দেখিলাম। এক বর্ণও অভিরঞ্জিত নহে। অন্তে নারায়ণঃ স্মৃতি যাঁহাদের হয় তাঁহারা সারূপ্য লাভ করিয়া ভগবানের লোকে গমন করেন শাস্ত্র বহুস্থানে ইহা দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রমত মনুষ্যজীবনে ইহা অপেক্ষা পরম লাভ আর নাই। তাই বলি, দিন থাকিতে থাকিতে নিরন্তর যথাসাধ্য ডাকিয়া যাও। শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

সমস্ত সাধনা।

যখন বসিতে যাইতেছ তৎপূর্ব্বে আপনাকে আপনি দুঃখী করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

দুঃখী করিব ?

কেন দুঃখ কি কখন কর নাই ? দুঃখ কি কখন পাও নাই ? দুঃখী কি কখন হও নাই ?

কি বলিতেছ ?

যখন শোক পাইয়াছিলে তখন যেমন লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলে তখন যেমন বলিয়াছিলে আর যে সহ্য করিতে পারি না—এ যাতনা যে আর দেখা যায়না—সত্য সত্যই প্রাণ যেন আর রাখিতে পারি না—দেখিতে দেখিতে শ্বাস যেন বদ্ধ হইয়া আসিয়া অকথ্য যাতনা দিতেছে। এই সমস্ত দুঃখ ত ভোগ করিয়াছ, তবে সেই দুঃখের স্মরণে বাধা কি ?

স্মরণে কি হইবে ?

স্মরণে বৈরাগ্য আসিবে। আর কোন কিছুতেই রুচি হইবে না। আপনাকে আপনি দুঃখী ত বল, কিন্তু কেহ তাস খেলিতে ডাকিলে লোভ সম্বরণ কর না। সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলে বেশ যাও। হাসি ঠাট্টাও ত বেশ আছে। তবে নিরন্তর ত দুঃখ লইয়া নাই।

তাই বলিতেছি হৃদয় ত সত্য সত্যই শ্মশান হইয়াছে। স্মৃতিতে এই হৃদয়-শ্মশানে প্রিয়জনের চিতা জ্বাল। তাহাদের শেষকালকার কাতর ভাব স্মরণ কর ; করিয়া দুঃখী হও। দুঃখী হইয়া বিচার কর তোমারও এই দিন আসিবে কি না ? তখন কি করিবে ? অনাথের নাথ ভিন্ন কোন জীবের গতি নাই। তাঁহাকে নিত্য স্মরণ ভিন্ন গতি নাই, গতি নাই।

নিত্য স্মরণ করিব কিরূপে ? মনে যে থাকে না ?

তাই ত বলিতেছি দুঃখ জাগাইয়া দুঃখী হও। হইয়া শরণাপন্ন হও। তথাপি মন এমনই বস্তু এ অবস্থাতেও নানা কথা তুলিবে। যাহা ভাবনা তুলিবে তুমি তাহা লক্ষ্য কর, করিয়া প্রতি ভাবনাটি উঠিবার সময় তাঁহাকে জানাও। সেইরূপ কথাটি যখন মুখ হইতে বাহির হইতে যাইতেছে তখনও জানাইও এবং কর্ম্ম যাহা কিছু করিতে যাইতেছ প্রথমেই তাহা জানাও। জানাইতে অভ্যাস করিলে কি হইবে ? কি হইবে ? তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িবে।

দৃষ্টি পড়িলে কি হইবে?

তাহার চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিবে।

তার পর?

তারে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে এত শান্ত হইলে কিরূপে? আমি কি শান্ত হইতে পারিব?

আমার মত হও। পারিবে।

কিরূপে হইব?

আমি যে ব্যবহারিকী লীলা দেখাইয়া আসিয়াছি তাহা প্রতিজীবের মধ্যে যে বাস্তবী লীলা হইতেছে তাহাই। তুমিও মন কর্তৃক মায়াসাগরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে আনীত হইয়াছ। কপট দুর্ব্বৃত্ত তোমায় তোমার রমণীয় দর্শনের নিকট হইতে ছলনা করিয়া অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। তোমার উপর আসক্ত বলিয়া, এখনও তোমাকে বিনাশ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মন তোমাকে তোমার প্রিয় ভুলাইতে চায়, ভুলাইয়া তোমায় ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে চায়।

কত লোভ দেখাইতেছে, কত কাকুতি মিনতি করিতেছে। তুমি কি আমার মত ব্যভিচার-ভয়ে কম্পিত হও? হইয়া নিরন্তর আমার প্রভুকে স্মরণ কর? অনাহারে অনিদ্রায় সর্ব্বদা স্মরণ কর? পাছে অসাবধান হইলে অনিষ্ট ঘটায়।

আমি সর্ব্বদা ডাকি একবার এস। এত যে ভাল বাসিতে, একবার দেখ আমার দশা কি হইয়াছে! এস, আমাকে এই মায়াসাগর হইতে উদ্ধার কর; এই মায়াপুত্রের হস্ত হইতে উদ্ধার কর। তুমিও নিরন্তর এই রূপ কর; শেষে আমার মত তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবে?

আহা! বড় সুন্দর! আর যাহা যাহা করিতে হইবে সব বলনা।

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান তিনই আবশ্যক। যত প্রকার কর্ম্ম হইতে পারে, কি মানসিক, কি বাচিক, কি কায়িক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম শ্রীভগবান্‌কে জানাইয়া করিতে অভ্যাস করাই প্রথম অবস্থার সাধনা। ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। সকলেই ইহা পারে। বলিতে গেলে ইহাই ধর্ম্মমন্দিরের ভিত্তি। যিনি কর্ম্মার্পণ অভ্যাস করেন নাই, তিনি উচ্চ সাধনা লইয়া থাকিলেও ব্যভিচার করিতেছেন।

(১) লোকসঙ্গে লৌকিক কর্ম্মকালে তাঁহার অনুমতি লইয়া কথাটি পর্য্যন্ত কহার অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাতে সুখ অত্যন্ত অধিক। তার

পর কর্ম্মফল একবারে চিন্তা না করিয়া, তাঁহাকে মনে ভাবিয়া, সর্ব্ব ফলকামনা তাঁহাতে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। ক্রমে ঈশ্বর যে সন্তুষ্ট হইতেছেন তাহা নিজে নিজেই বুঝা যাইবে। ইহাই হইল লোকসঙ্গে লৌকিক কর্ম্মকালে ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করার অভ্যাস। ইহা প্রথম।

(২) একান্তে বৈদিক-কর্ম্মকালে যাহা যাহা সঙ্কল্প উঠিবে তাহাই তাঁহাকে জানান। ইহা হইল সমস্ত ভাবনা তাঁহাতে অর্পণ। চিত্ত যাহা যাহা ভাবনা তুলিবে, শোকতাপ তুলিবে, সুখদুঃখ তুলিবে, তাহা জ্যোতির অভ্যন্তরবর্ত্তী তোমাতে অর্পণ চাই। রজস্তমও সে সত্য ; কিন্তু এ তাহার সংসার-মূর্ত্তি। রজ ও তমের আবির্ভাব কালেও তাহাতে ব্যাকুল না হইয়া, তাহার এই মূর্ত্তি মনে করিয়া, নিত্যসত্ত্ব মূর্ত্তিতে ঐ সমস্ত অর্পণ করিতে অভ্যাস ইহাই দ্বিতীয়।

(৩) ইহার পরে উপাসনা। জপকালে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং [শ্রীমহাবীর যেরূপে প্রথম দর্শনকালে লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপে] মস্তকে ধারণ করিতেছি স্মরণ করিয়া করিয়া জপকালে সর্ব্বার্পণ আরও প্রবল করা। এই পর্য্যন্ত কর্ম্ম, প্রার্থনা ও উপাসনা হইল। উপাসনাকালে খণ্ড অখণ্ডে মিলিত হইতেছে স্মরণ করিয়া শান্ত হইয়া তাহাই দেখা।

(৪) শান্ত হইয়া গিয়া আত্মচৈতন্য অনুসন্ধান করা হইল শেষ। খণ্ড-চৈতন্যকে অখণ্ড চেতনে মিলাইবার জন্য যে উপাসনা তাহার পরে চৈতন্য সর্ব্বত্র ভাসিতেছেন ইহার ভাবনা করা। প্রথমে বিশ্বাসে ইহা করিতে হয়। পরে চিত্ত যত যত একাগ্র হইবে, ঘটমধ্যস্থ আকাশ যত যত ঘট ছাড়িয়া আপনাকে আপনি দেখিতে পারিবে, ততই ইহা বুঝিতে পারিবে যে ঐ ঘটাকাশখণ্ডই অনন্ত সীমাশূন্য মহাকাশ মাত্র। কেবল ঘট উপাধিতে মন রাখা হইয়াছিল বলিয়া খণ্ডমত বোধ হইতেছিল। আমিও অখণ্ড-চৈতন্য ইহা অনুভবে আসিলে দৃশ্য-দর্শন আর থাকিবে না, জগৎ দর্শন ও দেহ-দর্শন ভুল হইয়া যাইবে। সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকিয়াও আর কিছুই দেখা হইবে না—সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও ব্যবহারিক কার্য্য অবুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া যাইবে। ইহাই মুক্তি।

প্রতিদিন মানুষের দুঃখনিবৃত্তি হয় ; প্রায় সকলেরই হয়।

যত ভীষণ যাতনাই হউক না কেন, অত্যন্ত প্রিয়জনের বিনাশজনিত যে

শোক, অথবা ভীষণ ব্যাধিজনিত যে শোক তাহাও মানুষ ভুলিয়া যায়। সকলেই যায়।

যখন স্থূল দেহে স্থূল জগতে থাক তখন সবই থাকে; যখন নিদ্রায় সূক্ষ্ম জগৎ লইয়া থাক তখন সব থাকে না। থাকে স্থূলের সূক্ষ্ম সংস্কার। আবার যখন স্বপ্নশূন্য নিদ্রা হয়, যখন সুষুপ্তি হয় তখন কোন কিছুই থাকে না। হয়ত সমস্ত দুঃখই থাকে, কিন্তু যে ভোগ করিবে সে থাকে না; সে থাকে না বলিয়া কিছুই থাকে না। কিছুই থাকে না বলিয়া কোন দুঃখও থাকে না।

মানুষ তখন কোথায় যায়? দেহটা থাকে অন্য লোকে দেখে। কিন্তু যে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছিল সে যেন কোন একটি বস্তুর সঙ্গে এক হইয়া যায়। এক হইয়া গেলে আর শোকতাপ থাকিবে কিরূপে? এক হইয়া গেলেই বুঝি পরমানন্দ-প্রাপ্তিতে মানুষ স্থিতিলাভ করে। বিন্দু, সিন্ধুর সহিত মিশিয়া গেলেই, এক সিন্ধু মাত্র থাকে।

তবেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় পাওয়া গেল। জানা গেল জাগ্রৎ অবস্থায় সব থাকে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে, আর সুষুপ্তি অবস্থায় আর কিছুই থাকে না। জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে, পরে তুরীয়ে সজ্ঞানে স্থিতিলাভ করাই সমস্ত সাধনা।

যোগকা বারমাসা।

প্রথম মহিনা আষাঢ় লাগো শোধো কায়াকো,
বাহর দৃষ্টি পবন নহি আবে ভীতর ছায়াকো;
পঞ্চ তত্ত্বকা নগর বসায়া নখ শিখসে নিকো,
নয়ন নাসিকা কয়ন্ মুখন্‌সে কাম চলা যাকো
উস্‌কা খোজ করো বাসা।
(ধ্রুপদ) সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ১ ॥

শিখসে=শিখা পর্য্যন্ত।
নিকো=উৎকৃষ্ট।
যাকো=যাহার। বাসা=মনুষ্য।

আষাঢ় মাস। তোমার শরীর শুদ্ধ কর। বহির্মুখ দৃষ্টি ও বাহিরে প্রবাহিত বায়ু, অন্তরস্থ পরমপুরুষের ছায়াকে স্পর্শ করুক। পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা গঠিত নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত একটি উৎকৃষ্ট নগর। এই নগরের কার্য্যসমূহ নয়ন, নাসিকা, কর, মুখ ইত্যাদির দ্বারা হইয়া থাকে। হে মনুষ্য! তুমি উহার অনুসন্ধান কর। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ১ ॥

শাঁবন নাম সারকো জপ্‌লে অজপা জপ মনমে,
কর নহি হিলে, জিভ্‌ ন ডোলে সোহং জপ্‌নেমে,
ইঙ্গল পিঙ্গলকে মারগ্‌মে ডোর গহো তন্‌মে,
কাল না ব্যাপয়, সদা সুখী হো রহো সুযুম্নামে,
কি সোহং নাম হয় খাসা,
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরন্‌ হো আশা ॥ ২ ॥

শ্রাবণ মাস। ভিতরে মনে মনে সর্ব্বজপের সার অজপা জপ কর। এই সোহং জপে করমালার আবশ্যক নাই, জিহ্বাও নাড়িতে হয় না। ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়া চল। কাল তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। তুমি সর্ব্বদা সুখে সুষুম্নার মধ্যে অবস্থান কর। অতি উৎকৃষ্ট এই সোহং জপ। সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ২ ॥

ভাদো ভরম মিটাবো গুরুকি সেবা কছু করনা,
গগনগুফাকে মারগ্‌মে তুম্‌ ধীরজসে চলনা,
খম্ভা এক কেঁওয়াড়ী দ্বাদশ জিস্‌মে হঁয় লাগি,
বৈকুণ্ঠপুরী বো দশম্‌ দ্বারা জঁহা জ্যোতি জাগি,
ন লাগে ওঁহা কাল ফাঁসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ৩ ॥

ভাদ্র মাস। শ্রীগুরুর কিছু সেবা করিয়া ভ্রমসমূহ দূর কর। ধৈর্য্য সহ-

---

হিলয়=নড়া।
ডোলয়=নড়া।
মারগ্‌=মার্গ।
খম্ভা=স্তম্ভ।
কেঁওয়াড়ী=দ্বার।
ডোরগহো=চলো।
তন্‌মে=শরীরে।

কারে গগন গুফার ভিতর দিয়া চল। ইহাতে একটি স্তম্ভ ও দ্বাদশটি দ্বার আছে। ইহার ভিতরে বৈকুণ্ঠপুরী ও তাহার উপরে দশম দ্বার—যেখানে সর্ব্বদা চৈতন্যময় জ্যোতি বিরাজমান। এই স্থানে আসিলে যমের ফাঁসি লাগিবে না। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৩ ॥

কুম্বার কুমতি বিসরাবো কোই অন্তর ধ্যান ধরে,
নাভিকমলমে স্থরতি লগাকে আতম্ নজর পরে,
অমর অডোল পুরুষ এক রহতা শূন্য অঠারিমে,
স্বয়ং প্রকাশা, আপহি ঝলকা দশ্‌ম্ দ্বারেমে,
ন লাগে ওঁহা ভুখ প্যাসা,
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ৪ ॥

আশ্বিন মাস। সমস্ত কুচিন্তা ত্যাগ করিয়া অন্তরে তাঁহার ধ্যান কর। নাভিকমলে ধ্যান কর, তাহা হইলে আত্মদেবের উপর দৃষ্টি পড়িবে। এক জন অমর অচল পুরুষ ভিতরের উর্দ্ধতন শূন্যস্থ প্রকোষ্ঠে থাকেন; তিনি স্বয়ং প্রকাশ, দশম-দ্বারে তাঁহার জ্যোতি সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। সেখানে ক্ষুধা পিপাসা লাগে না। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৪ ॥

কাত্তিক কমল অষ্টদল ভিতর অগম জ্যোতি দরশে,
চমকে বিজুলি, মেঘ গরজতা, অমৃত জল বরষে,
উল্‌টা কমল মূলকে নীচে বহেঅমীকা ধারা,
চাঁদ স্থরয্‌কা তেজ ন যাবে জঁহা গগন দ্বারা,
ওঁহা হম দেখা তাম্মাসা,
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ৫ ॥

কার্ত্তিক মাস। ভিতরে অষ্টদল-কমল প্রস্ফুটিত হইলে উহাতে নিরুপম জ্যোতি দৃষ্টি-গোচর হয়। বিদ্যুৎ চমকিত হয়, মেঘ গর্জ্জন করে, পরে অমৃত ধারা বর্ষিত হয়। অধোমুখ এই কমলের নীচে অমৃতময় নদী প্রবাহিত। সেই

কুম্বার=আশ্বিন। অডোল=অচল, স্থির।
বিসরাও=বিস্মৃত হও। অটারি=উপরের প্রকোষ্ঠ।
স্থরতি=ধ্যান।
অমীকা=অমৃতের।

গগনে চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। আমি সেথানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক"॥ ৫ ॥

অগহন আশা লগি হমারি গগনগুফা মাহি,
বজ্র কেঁওয়াড়ী লগি ডগরমে সহজ খুলে নাহি,
গুরু কৃপাসে ওঁহা করো কোই হিকমতকে কাজা,
উলট্ পবনকি ঠোকরমারো খোলো দরবাজা,
ওঁহা পর শুনো শব্দ খাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ৬ ॥

অগ্রহায়ণ মাস। আমার গগনগুফাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল। পথে বজ্রময় দ্বার অতিক্রম করিতে হইবে। উহা সহজে খোলে না। ঐ দ্বার খুলিবার জন্য কৌশল আবশ্যক। বিপরীত পবনের ঘা মারিয়া দ্বার খুলিয়া ফেল। তাহার পর সেথানে এক অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৬ ॥

পুষ পিয়া পরদেশ আপনা খোঁজ করো ভাই,
জনম্ জনম্‌কা সংশা তেরা সভি ছুটি যাই,
ঘট্ বিচ্ দেখো গুরুরূপসে অলখ্ পিয়া ছায়া,
পূরণ কৃপা কর্‌কে ব্রহ্ম ঋষিকো বতলায়া কিয়া ভরমোকা নাশা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ৭ ॥

পৌষ মাস। আমার প্রিয়জন বিদেশে আছেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি পাই, তবে জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইবে। নিজ শরীর মধ্যে গুরুরূপী প্রিয়জনের অলক্ষ্য ছায়া দর্শন কর। তিনি নিরতিশয় কৃপা করিয়া, ব্রহ্মঋষিকে সমস্ত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, সমস্ত মোহ দূর করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৭ ॥

মাহি — মধ্যে। ডগরমে — পথে।
হিকমতকে — কৌশলের।
সংশা — সংশয়। সভি — সমস্ত।
ঘট্‌বিচ্ — ঘটমধ্যে — শরীরের মধ্যে।
পূরণ — পূর্ণ। বতলায়া — বলিয়াছেন।

লাগত মাঘ অগমকি বাণী শুনো সমুঝ্ বারে,
ভরমজাল ভবসাগরসেঁ। তুম সদা রহে ন্যারে,
উসি কানসে শুনো গগনমে অনহদ্ বাজত হয়,
শূন্য মহলকে ভিতরমেঁ শিবশক্তিবিরাজত হয়,
বনায়া খুব কৈলাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হো আশা॥ ৮॥

মাঘ মাস। হে বুদ্ধিমান্, তুমি ঐ অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহ-জাল ছিন্ন কর এবং ভবসাগর হইতে দূরে অবস্থান কর। শূন্যস্থিত প্রকোষ্ঠে শিব শক্তি সদা বিরাজমান। আহা, কি সুন্দর কৈলাস সৃষ্টি করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক॥ ৮॥

ফাল্গুন ফাঁস লগে নিজ মন্‌মে লিয়ে হাথ ডোরি,
পাঁচ চোরবা বসে দেহমে সদা করয় চোরি,
বহুত করো কোই যতন কিসীকে কাবু না আবে,
নর নারী বা সকল দেবতা সবকো ভরমাওয়ে,
জিন্‌হোকা সারা পরগাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হো আশা॥ ৯॥

ফাল্গুন মাস। দেহস্থ কামাদি পঞ্চ চোর রজ্জুহস্তে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে, সুবিধা পাইলে ইহারা মনের গলায় ফাঁসি দেয়। বিশেষ চেষ্টা করিলেও ইহারা কাহারও বশীভূত হয় না। ইহারা দেবতা মনুষ্য সকলকেই ভুলাইয়া

লাগত = আরম্ভ হইল।
অগম = আগম, বেদ।
সমুঝবারে = বুদ্ধিমান্।
ন্যারে = দূরে।
ডোরি – রজ্জু।
কাবু – অধিকার বশ।
ভরমাওয়ে – ভুলাইয়া দেয়।
সারা – সর্ব্বত্র।
পরগাশা – প্রকাশযুক্ত, পরাক্রমশালী।

দেয়। ইহারা সর্ব্বত্র পরাক্রমশালী। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক।

চৈত্র চেতকে বগিয়ামে তুম্ খোঁজো দিনরাতি,
শূন্য মহল্‌মে দীপক্ জল্‌তা বিনা তেল বাতি,
যতন করয় বহুতেরে দরশ কোই যোগীজন পাবে.
ষট্‌চক্র কি খোল কেঁওয়াড়ী উপর চড় যাবে,
জিন্‌হোকা ছুঠা ভব ত্রাসা।
ন লাগে ওঁহা কালকা ফাঁসা
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হোয়ে আশা ॥ ১০ ॥

চৈত্র মাস। চিত্তরূপ উদ্যানে তুমি দিবারাত্র অনুসন্ধান কর। সেখানে শূন্যগৃহে তৈল ও বর্ত্তিকাবিহীন প্রদীপ জ্বলিতেছে। বিশেষ যত্ন করিলে যোগীজন ইঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন। এই গৃহে ষট্‌চক্ররূপ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া উপরে উপরে উঠিলে ভবভয় দূর হয়। সেখানে কালের ফাঁসি গলায় পড়িতে পারে না। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ১০ ॥

বৈশাখ বাত এক শুনো চরণকো গুরুকে শরণকো হো রহনা,
ছাড় বাসনা সকল জনোসে ছোটে হো রহনা,
ত্যাগো মান গুমান গরিবী হিরদে ধর লেনা,
হো ভলাই উতনি দীনপর দয়া কর দেনা,
বনো তুম্ দাসনকো দাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হোয়ে আশা ॥ ১১ ॥

বৈশাখ মাস। একটি কথা বলি শ্রবণ কর। সর্ব্বদা গুরুর শরণাপন্ন থাকিও। সর্ব্ববাসনা ত্যাগ কর, সর্ব্বাপেক্ষা অণু হইয়া থাক, মাস অভিমান ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে দীনতা আনয়ন কর, দীনজনের প্রতি দয়া কর। তোমার ভাল হইবে। তুমি তাঁহার দাসের দাস হও। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার বাসনা পূর্ণ হউক ॥ ১১ ॥

গুমান — অভিমান, অহঙ্কার।
চেতকা বগিয়া — চিত্তরূপ উদ্যান

জেঠ জাগ্‌তি জ্যোতি কি মহিমা চার বেদ গাবে,
গুরুগৌরীসুত কহে তুম্‌হারা পার নহি পাবে।
নেতি ধৌতি বস্তি কর্‌কে দেহশুদ্ধি কর্‌লেহ্‌
খানা পিনা চলনা ভাষণ থোড়াসা রাখলেহ্‌
ব্যর্থ মত্‌ যানেদে শ্বাসা।
ব্রহ্মমুহূর্ত্তমে কাকতুণ্ডিসে বায়ু পিয়ো ভাই,
শেষনাগকে তুল্য তুম্‌হারি আয়ু বড় যাই।
বিষয় বেদ গ্রহভূমি সম্বৎ মাঘ কৃষ্ণ মানো
সোমবার পঞ্চমী যোগ কি যুক্তি লিখি জানো
আগে ইয়্‌হ সংসার কি ঝাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥১২॥

জ্যৈষ্ঠ মাস। চতুর্ব্বেদ চৈতন্যময় জ্যোতির মহিমা গান করেন। শ্রীগণেশ বলেন ইঁহার অন্ত পাওয়া যায় না। তুমি সম্প্রতি নেতি, ধৌতি, বস্তি ক্রিয়া দ্বারা দেহ শুদ্ধ কর। পান, ভোজন, ভ্রমণ, কথন অল্প করিয়া কর। বৃথা শ্বাস প্রশ্বাস ব্যয় করিও না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কাকতুণ্ডে বায়ু পান কর, অনন্ত নাগের তুল্য তোমার আয়ু বাড়িয়া যাইবে। সংবৎ ১৯৫০ মাঘ সোমবার পঞ্চমী—যোগের সমস্ত বিষয় উক্ত হইল। ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া, সংসার-জাল অতিক্রম কর। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক।

ইতি শ্রীগৌরেন্দ্রব্রহ্মর্ষি বিরচিত।

জাগ্‌তি—জাগরণশীল, চৈতন্যময়।
গুরুগৌরীসুত—শ্রীগণেশ।
বিষয়—৩৬ প্রকার, বেদ—৪, গ্রহ—৯, ভূমি—১
বিষয়+বেদ+গ্রহ+ভূমি—৫০
ঝাসা—মোহজাল।

নামনামী অভেদ।

গুরু আনুগত্য ব্যতীত কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া, অথবা অগাধ বিদ্যা-বুদ্ধি থাকিলেও কখন সাধ্য-সাধন বস্তুর নির্ণয় করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র এই জন্যই গুরু আনুগত্যের এত প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। শুধু কেবল মাত্র গুরুমন্ত্রটি কর্ণে গেলেই যে, সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন বা সর্ব্বার্থ লাভ হইয়া গেল এমন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু-উপদেশ-অনুযায়ী কর্ম্ম ব্যতিরেকে কখনই বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারা যায় না। এই গুরু আনুগত্য গ্রহণ না করিয়া, সাধ্য-সাধন তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইয়া এবং তদ্বিষয়ক অনুশীলন করিয়া পরিশেষে অনেকে নাস্তিকতাই লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু অতি সামান্য মাত্র জ্ঞান থাকিলেও, এক মাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই তদীয় উপদেশানু-সারে অভিলষিত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজসাহির অন্তর্গত রামপুর গ্রাম নিবাসী তপনানন্দ মিশ্র একজন অসাধারণ পণ্ডিত, এমন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। কিন্তু উপযুক্ত গুরু অভাবে তিনি কোন বিষয়ই সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। "শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়াই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য"—এই বিষয় সর্ব্বদাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল ; মন ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, একদিন রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখিলেন।

"অদ্য হইতে সপ্তাহ পরে প্রভাতে পদ্মানদীর কূলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

এই স্বপ্ন দর্শনান্তে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অতি কষ্টে সপ্তাহ-কাল অতিবাহিত করিলেন।

তপনানন্দ পদ্মানদীর কিনারায় দাঁড়াইয়া আছেন, কিছুক্ষণ পরেই মহা-ভাগবৎ লক্ষণসম্পন্ন এক অতি সুন্দর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। সেই অলোকসামান্য রূপ দেখিয়াই তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন, কোন কথা না বলিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। বহুক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তপনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—

সাধ্য সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥

বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কেমনে জুড়াই প্রাণ কহ দয়াময় ॥

প্রভু! আমি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপন বুদ্ধিতে এতদিন জগৎপিতা হইতে দূরেই আসিয়া পড়িয়াছি। আমার এক্ষণে উপায় কি? তখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কহিতেছেন,—

নামী-নামে ভেদ নাই তাই বলি অবিরাম,
কুটিনাটি পরিহরি জপ কর সদা নাম।
ভক্তি-লাভ হবে নামে, সে ভক্তির পরিণাম,
প্রেম,—সে প্রেমেতে কৃষ্ণ, তাই বলি জপ নাম।

তদ্বিষয়ক শাস্ত্র প্রমাণ।

যথা,—
নাম্না চ লভ্যতে ভক্তি ভক্ত্যা চ প্রেম লভ্যতে।
প্রেম্নঃ গোবিন্দলাভস্যাৎ অতো নাম্ন পরং নহি ॥

মহাপ্রভু আরও বলিলেন,—

আর এক উপদেশ শুন সাবধানে,
জ্ঞান-বুদ্ধি বাক্যে যাঁর না পায় সন্ধানে।
তার তরে বিচার বিতর্ক নাহি ক'রে,
দয়া কর ব'লে সদা কাঁদিবে কাতরে।
বিশেষ বলিনু এই বিচার ক'রো না;
রোদন ব্যতীত কভু শ্রীপদ মিলে না ॥

শ্রীনিতাই চাঁদ শীল।
ফিয়ার লেন, কলিকাতা।

আমারে ক'রো না উদাসী।

সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী,
তুমি, আমারে ক'রোনা উদাসী।
গাহে পাখী বনে,
প্রভাত গগনে—
ঐ যে অরুণ হাসি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
অনিমিষে আমি চাহি কতবার,
ফুটে যবে ধীরে কিরণ উষার,
সান্ধ্য-গগনে তেমনি আবার
ছড়ান কনক রাশি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
ভোর বেলা নিতি ঘুম থেকে টেনে,
পুনঃ যেন নব-জীবন দানে,
কে যেন ছুটায় পবন গহনে—
করম ক্ষেত্রে আসি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
পাতার ঘোমটা টানি' দিয়া মুখে,
কাঁপে ফুল ঐ কানন বুকে,
ছড়ায় গন্ধ থেকে থেকে থেকে—
মৃদুল মলয়ে ভাসি'।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
জীবন আমার নহেত স্বপন,
চিরদিন আমি নিত্য নূতন,
কি কায সাধিতে কোন প্রয়োজন,
বুঝেছি কেন বা আসি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।

সন্ধ্যা যখন পড়িবে হেলে,
আমার সুখের মরণ কোলে,
কোন্ ফাঁকে আমি যাইব চলে,
রাখিয়া সাধের বাঁশী।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।

শ্রীহ (নাটোর

বিবিধ।

স্বরূপ স্মরণ। রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় শ্রীসীতাদেবী স্বয়ং অগ্নি গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া, অপহরণের জন্য আপন ছায়া-মূর্ত্তি পর্ণ-কুটীরে রাখিয়াছিলেন। পরে যথা সময়ে রাবণ-বিনাশের পর ছায়া সীতা পরীক্ষাচ্ছলে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়, এবং অগ্নি হইতে প্রকৃত সীতার উদ্ধার হইয়াছিল।

ইহা অধ্যাত্ম-রামায়ণের কথা। অধ্যাত্ম-রামায়ণ কি জান? অধিষ্ঠাতা আত্মরামের কথাকেই অধ্যাত্ম-রামায়ণ বলে। তোমার আত্মরূপী রামের আজ্ঞায় তুমি তোমাকে ছায়াময়ী করিয়া কামরূপ রাবণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ; আর প্রকৃত তুমি প্রকৃত নিষ্কাম প্রকৃতি আত্মরামের চিরসঙ্গিনী। জ্যোতিরভ্যন্তরে যেখানে আত্মরাম সর্ব্বদা বিহার করেন সেইখানেই প্রকৃত তুমি রহিয়াছ। তাই বলি সর্ব্বদা মনে রাখিবে এই দেহরূপ আকাশ-কানন তোমার সুখের নহে, কেবল রাম ভুলাইবার উপকরণ মাত্র। ইহা বুঝিয়া প্রতিদিন জ্যোতিরভ্যন্তরে উপস্থিত হইবার জন্য এই ছায়া-মূর্ত্তি ভূত-শুদ্ধির বহ্নি-যোগ দগ্ধ কর চিত্তশুদ্ধি-ময় বিশুদ্ধ বেশ ধারণ কর, দেখিবে তোমার আত্মরাম সর্ব্বদা তোমাকে ওতপ্রোত ভাবে আলিঙ্গন করিয়াই আছেন, তাহারই কোলে ঘুমাইয়া তুমি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলে, স্বপ্নভঙ্গে স্বামিক্রোড়-সুপ্তা সতীর মত তোমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে।

সহঃ সম্পা
৺কাশীধাম।

সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করেন। "ইহা আমার হউক" এই বাসনা-বশে চিত্তের যে বিষয়ের প্রতি অনুধাবন, তাহাই কল্পনা। যাহা অনুভূত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার মনে মনে আলোচনাই স্মৃতি। সঙ্কল্প ত্যাগ ভিন্ন আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোচনাতেও বিশেষ কিছু হয় না। সিদ্ধি-লাভে যত্ন করা ত বহু দূরে, আবার যত্নে সফল-মনোরথ মনুষ্য-সহস্রের মধ্যে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পরিপাকান্তে গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার জনিত আমার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারেন, এরূপ মনুষ্য নিতান্ত দুর্লভ।

অর্জ্জুন—এত লোক ত "ঈশ্বর ঈশ্বর" "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করেন, তুমি কেন বলিতেছ প্রকৃত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ নিতান্ত বিরল?

ভগবান্—ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়াও বহুলোকে ধর্ম্মের নাম করিয়া আপন আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ব্যস্ত। ইহারা আত্ম প্রতারণা ধরিতে পারে না। ইহাদের মতে "ঈশ্বরের প্রিয়কর্ম্ম করাই" জীবের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রিয়কর্ম্ম করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য তাঁহারা সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর সাধক। এই প্রিয়কার্য্যও আবার কিরূপ ভাবে করিতে হইবে তাহাতে দৃষ্টিরাখা এরূপ সাধকের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য। ভিক্ষুককে অন্ন দাও, বস্ত্র দাও কিন্তু যদি অভিমান রাখ আমি ভিক্ষুকের দুঃখ দূর করিতে যাইতেছি, তবে তোমার কর্ম্মে "অহং কর্ত্তা" অভিমান থাকিল বলিয়া তাহা ভগবানের নিকট পৌঁছিল না। ঐ কর্ম্মে তোমার বন্ধন হইল। কিন্তু ভিক্ষুককে অন্ন বস্ত্রাদি দান দ্বারা আমি ঈশ্বরের সেবা করিতেছি এই ভাবে যদি তুমি দরিদ্রের সেবা কর, তবে কর্ম্মে তোমার লক্ষ্য থাকে না, থাকে সেবার দ্বারা ঈশ্বর-প্রসন্নতা লাভে। ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্ম। নিষ্কাম-কর্ম্মের কর্ম্ম-অংশ দ্বারা জগচ্চক্র চলিতে থাকে। সমকালে জগতের কর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ দ্বারা মুক্তিপথে চলা—ইহাই আমার উপদেশ। এইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিতে হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, "অহং কর্ত্তা" এই অভিমান বর্জ্জিত হইয়া, শ্রীভগবানের প্রসন্নতা-লাভ জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে যখন সিদ্ধিলাভ হয় তখন তাহাকে বলে কর্ম্মজা সিদ্ধি। কর্ম্মজা সিদ্ধির দ্বারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া তত্ত্বের সহিত আমাকে জানার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাধকদিগের মধ্যে কেহ নিষ্কাম কর্ম্মের ঘরে আটকাইয়া থাকেন। কেহ বা প্রার্থনার ঘরে আটকাইয়া থাকেন। ইঁহারা ভক্ত নহেন বিশ্বাসী মাত্র। ভক্তিমার্গে উঠিতে হইলে নিষ্কাম-কর্ম্ম, আরুরুক্ষুযোগ এবং আত্মসংস্থযোগ লাভ করিয়া পরে যুক্ততম হইয়া আমাকে জানিতে হইবে। অন্তরে আমার প্রকাশ অনুভব করিতে হইবে, অন্তরে আমার মুখ হইতে আমার কথা শুনিতে হইবে, আমার সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত হইতে হইবে। আমার সহিত পরিচিত হইলে তবে ভক্তি লাভ হইবে। আমাকে জানিলে তবে ভক্তি—আমাকে জানিলে, তবে আমার প্রেম লাভ করিতে পারিবে, আমাকে যথার্থরূপে ভাল বাসিতে পারিবে। এই প্রকৃত ভক্তির জন্য—এই প্রকৃত ভালবাসার জন্য জ্ঞানের কথা পাড়িতেছি। যে ভক্তিতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা নাই, আত্মসাক্ষাৎ-কারের ইচ্ছা নাই, আমাকে জানিবার বাসনা নাই তাহা বিশ্বাস মাত্র—ভক্তি লাভের নিম্ন সোপান মাত্র—তাহা ঠিক ভক্তি নহে। আমাকে না জানিলে আমার পূজাও হয় না। "দেবে

পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ” ? বিশ্বাসে প্রার্থনা পর্য্যন্ত হয়। জীবন্তভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে জ্ঞানানুষ্ঠানে বাসনা হয় –তখন ভক্তি মার্গে উঠা হয়। তাই বলিতেছিলাম—বহুলোক আমার আশ্রয়ে আইসে—তাহাদের কর্ম্ম-সম্পাদনার্থ। তাহারা ঠিক আমাকে চায় না—চায় তাহাদের আপন আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে—চায় সমাজ সংস্কার করিতে, জাতির উন্নতি করিতে, দেশ রক্ষা করিতে। তাহারা বুঝেনা যে আমাকে পাইলে তাহাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা আর থাকে না। আমি যে ভাবে জীবের উদ্ধার করি, তাহারাও সেই ভাবে তখন জীবের উদ্ধারে সমর্থ হয়। এই সমস্ত কারণে বলি—বহুলোকে বহুমতলবে কর্ম্ম করে—কিন্তু আমাকে চায় কয়জন? যাহারা কিন্তু আমাকে চায়, আমি তাহাদেরই। এখন বুঝিতেছ—তত্ত্বতঃ আমাকে ভাবনা বা জানিতে প্রকৃত ইচ্ছা হওয়া কত দুর্ল্লভ? এখন তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে হইলে কোন্ কোন্ তত্ত্ব জানিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর ॥৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

শ
ভূমিরিতি পৃথিবী-তন্মাত্রমুচ্যতে। ন স্থূলা। ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা ইতি

শ নী ম
বচনাৎ। স্থূলভূম্যাদেশ্চ বিকৃতিমাত্রত্বাৎ। সাঙ্খ্যৈর্হি পঞ্চতন্মাত্রাণ্যহ-

ম
ঙ্কারো মহানব্যক্তমিত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ; পঞ্চমহাভূতানি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রি-

ম
য়াণি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি উভয়সাধারণং মনশ্চেতি ষোড়শবিকারা

উচ্যন্তে। এতান্যেব চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি। তত্র ভূমিরাপোঽনলো-

ম
বায়ুঃখমিতি পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশাখ্য পঞ্চমহাভূতসূক্ষ্মাবস্থারূপাণি

ম
গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাত্মকানি পঞ্চতন্মাত্রাণি লক্ষ্যন্তে। তথাচ—ভূমিঃ

আ হ নী শ্রী
গন্ধতন্মাত্রং আপঃ রসতন্মাত্রং অনলঃ রূপতন্মাত্রম্ বায়ুঃ স্পর্শতন্মাত্রং

শ শ শ
খং শব্দতন্মাত্রং মনঃ, মনসঃ কারণমহঙ্কারঃ; বুদ্ধিঃ অহংকারণকারণং

নী শ নী নী
সমষ্টিবুদ্ধির্মহত্তত্ত্বম্ এব চ অহঙ্কারঃ অহঙ্করোমীত্যনেনেত্যহঙ্কারো মূল

শ শ
প্রকৃতিঃ ; যদ্বা অহঙ্কার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্। যথা বিষসংযুক্তমন্নং

বিষমুচ্যতে। এবমহঙ্কারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহঙ্কার ইত্যুচ্যতে।

শ
প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য। অহঙ্কার এব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং

শ শ শ
লোকে ; ইতীয়ং যথোক্তা মে মম প্রকৃতিঃ ; প্রকরোতীতি ঐশ্বরী

শ ম
মায়াশক্তিঃ মায়াখ্যা পরমেশ্বরী শক্তিরনির্ব্বচনীয়-স্বভাবাৎ ত্রিগুণাত্মিকা

নী ম শ
জড়প্রপঞ্চোপাদানভূতা অষ্টধা অষ্টভিঃ প্রকারৈঃ ভিন্না ভেদমাগতা ॥৪॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইরূপে আমার প্রকৃতি এই আটভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৪॥

অর্জ্জুন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—ইহারা না বিকৃতি ?

ভগবান্—সাংখ্যমতে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র ; অহঙ্কার, মহান্ এবং অব্যক্ত এই আটটি প্রকৃতি এবং পঞ্চস্থূলভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উভয় ইন্দ্রিয় মন এই ষোড়শ-প্রকার বিকৃতি। সাংখ্যমতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। এখানে ভূমি, আপ্, অনলাদিকে আমি পঞ্চতন্মাত্র বলিতেছি। "মূল প্রকৃতি রবিকৃতিঃ, মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত ষোড়কশ্চ বিকার ইতি"।

অর্জ্জুন—ভূমি অর্থে পৃথিবীতন্মাত্র গন্ধ, অপ্ অর্থে জলতন্মাত্র রস—এইরূপে কষ্টকল্পনা করিয়া না বুঝিয়া স্থূলভূত বুঝিলে কি দোষ হয় ?

ভগবান্—প্রথমতঃ ভূমি জল ইহারা প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। দ্বিতীয়তঃ ত্রয়োদশের ষষ্ঠ শ্লোকে মহাভূতান্যহঙ্কারো পঞ্চচেন্দ্রিয় গোচরাঃ ইত্যাদিতে 'মহাভূতানি' অর্থে সূক্ষ্ম ভূতকেই লক্ষ্য করিয়াছি—"মহাভূতানি চ সূক্ষ্মাণি ন স্থূলানি"। ইহা ১৩৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হইবে। তৃতীয়তঃ সৃষ্টিতত্ত্বে অবিদ্যা, মহান্, অহং ইহাদের পরে পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি। পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি আরও পরে। ভূম্যাদির পঞ্চতন্মাত্র অর্থ না করিয়া স্থূল ভূত অর্থ করিলে সৃষ্টিক্রমে দোষ পড়ে।

অর্জ্জুন—প্রকৃতি (১), প্রকৃতি-বিকৃতি (৭), বিকৃতি (১৬) এইরূপ নামকরণ কেন হইয়াছে ?

ভগবান্—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ম্ তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি। সাংখ্য ইহাই বলিয়াছেন।

সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা যাহা তাহাই অব্যক্ত। ইহাই মূল প্রকৃতি। প্রকৃতির গুণ-বৈষম্যে মহান্ সৃষ্টি হইল। মহান্ যাহা তাহাতে বুঝাইতেছে মহামন বুদ্ধি ও চিত্ত। মহান্ হইতে অহঙ্কার হইল। মহান্টি হইল মূল প্রকৃতির বিকৃতি, কিন্তু ইহা অহংকরের প্রকৃতি। আবার অহংকারটি মহানের বিকৃতি, কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি। আবার পঞ্চতন্মাত্রই হইতেছে অহংকারের বিকৃতি, কিন্তু পঞ্চভূতের প্রকৃতি। তবেই দেখ, অব্যক্তকে মূল প্রকৃতি বলিলে মহান্, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র ইহারা একবার প্রকৃতি আবার বিকৃতি হইতেছে; এইজন্য এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হইয়াছে। সাংখ্য মূল প্রকৃতিকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া অন্য সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিতেছেন। আমি বলিতেছি আমার প্রকৃতি আটভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কথাটা একই। আমার সহিত সাংখ্যের কোন ভেদ নাই।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয়, স্থূলভূত ইত্যাদির সৃষ্টি কিরূপে হইল?

ভগবান্—মূল প্রকৃতির কার্য্য মহান্। মহানের কার্য্য অহংকার। মূল প্রকৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধা বলিয়া তৎকার্য্য মহান্ ও ত্রিবিধ। "সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্ ইতি স্মৃতেঃ। যেমন মহান্ ত্রিবিধ সেইরূপ তৎকার্য্য অহংকারও ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহংকার, রাজস অহংকার ও তামস অহংকার।

সাত্ত্বিকাহংকারাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবা মনশ্চ জাতম্। সাত্ত্বিক-অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়-দেবতা ও মন হইয়াছে। দেবতাঃ তাশ্চ চক্ষুষো রবিঃ শ্রোত্রস্যদিক্, ত্বচোবায়ুঃ, রসনস্য বরুণঃ ঘ্রাণস্যাশ্বিনৌ বাচোঽগ্নিঃ, পাণ্যোরিন্দ্রঃ, পাদয়োরুপেন্দ্রঃ, পায়োর্মিত্রঃ, উপস্থস্য প্রজাপতি-রিতি। সূর্য্য, দিক্, বায়ু, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি—ইঁহারা ইন্দ্রিয় দেবতা—ইঁহারা সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন। সাত্ত্বিক অহংকারকে বৈকারিক অহংকার বলে।

রাজসাহংকারাৎ দশেন্দ্রিয়াণি জাতানি। রাজসানিন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ"। রাজস অহংকার হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় জাত। রাজস অহংকারের নাম তৈজস অহংকার।

"তামসাহঙ্কারাৎ সূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতানি জাতানি" তামস অহংকার হইতে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র জন্মে। পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূলভূত (ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদি) জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে আকাশের সহিত বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু সহিত তেজ—এইরূপে সমস্ত সৃষ্টি হইল।

আবার ভূত-পঞ্চকের রজঃ অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ সৃষ্ট হইল। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণে সমুদায় জড় দেহ এবং উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি হইল।

সৃষ্টির আর আর যাহা তন্মধ্যে সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদিরূপ অহংকারের কার্য্য হইতে হইল সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ। ইহারই লিঙ্গশরীর। ইহারই নামান্তর সূত্র। সেই সূত্র হইতে সমষ্টিরূপ বিরাট্ পুরুষ জন্মিলেন।

অর্জ্জুন—কিরূপে এই সমস্ত সৃষ্টি হইল' তাহা বুঝিব কি প্রকারে ?

ভগবান্—ভূতসমূহ তন্মাত্রময়। ভূমি গন্ধময়, জল রসময়, তেজ রূপময় ইত্যাদি। ভূমিকে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় আনয়ন কর, করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভূমির তন্মাত্র। অন্য অন্য ভূত সম্বন্ধেও তাই। অতি সূক্ষ্ম ভূমিই গন্ধ। ভূম্যাদি স্থূল ভূতের সারই হইতেছে গন্ধতন্মাত্র। এজন্য বলা যায় পঞ্চভূতগুলি তন্মাত্রময়।

ভূমি অপেক্ষা তন্মাত্র ব্যাপক। ব্যাপক বস্তুকে ব্যাপ্য বস্তুর আত্মাও বলা হয়। "অততিব্যাপ্নোতীত্যাত্মা"।

আত্মা শব্দটি এইজন্য বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। পঞ্চতন্মাত্রকে এই হেতু পঞ্চভূতের কারণ বলা যায়।

অর্জ্জুন— প্রকৃতির অন্য বিকার যে মন বুদ্ধি অহংকার এই সম্বন্ধে এখন বল।

ভগবান্— ভূমি অপ্ ইত্যাদিতে যেমন ভূমি অপের কারণ তন্মাত্র লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেইরূপ মন বুদ্ধি অহংকারের কারণ যাহা, এক্ষণে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এখন দেখ মনের কারণ কি? মন কি? না যাহা সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক। যাহা না থাকিলে সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতে পারে না, তাহাই না সঙ্কল্প বিকল্পের কারণ? অহং অভিমান না করিলে সঙ্কল্প বিকল্প উঠে না, এই জন্য অহংকারকে মনের কারণ বলা হইতেছে। অহংকার এই জন্য প্রকৃতির ষষ্ঠভাগ। যাহারা মন অর্থে মনের কারণ এইরূপ ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পনা বলিতেছে, তাহাদের ধারণা করা উচিত ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ ইত্যাদি অত্যন্ত স্থূল, ইহাদের পরেই ইহাদের কারণ মন হইতে পারে না। সৃষ্টি-ব্যাখ্যায় স্থূল কার্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম কারণ উল্লেখ করাই উচিত, ইহাই সংহারক্রম। আবার অতি সূক্ষ্ম কারণ হইতে ক্রম অনুসারে স্থূল কার্য্য দেখান আবশ্যক, ইহাই সৃষ্টি-ক্রম। অতএব ভূমিরাপো ইত্যাদিকে তন্মাত্র বলিলে তাহার পরে যাহার সৃষ্টি তাহা মন নহে, কিন্তু মনের কারণ অহংকার। বেদান্তক্রম ও সাংখ্যক্রমে মহামন্ বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এবং অব্যক্ত মহান্, অহং ও মন ইহাদের ব্যাখ্যা ২৪৩ পৃষ্ঠায় দেখ।

প্রকৃতির ষষ্ঠ বিকার হইল অহংকার। অহংকারের উৎপত্তি মহত্তত্ত্ব হইতে। যেমন সঙ্কল্প বিকল্প জাগিবার পূর্ব্বে অহংভাগ জাগে—আমি বোধ না থাকিলে আমার সঙ্কল্প এ বোধ যেমন থাকে না সেইরূপ আমি বোধটি জাগিবার পূর্ব্বে একটি মহানের বোধ জাগে—অহং ইহা জাগিবার পূর্ব্বে একটা বৃহৎ কিছু ভাসে, এই বৃহৎটি মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বকে মহামন, বুদ্ধি ও চিত্তের মিলিত নাম দেওয়া হইতেছে।

বুদ্ধির কারণ মহত্তত্ত্বকে সপ্তম প্রকৃতি বলা হইতেছে ইহা, অন্যরূপেও বুঝিতে পার। পঞ্চতন্মাত্রের অগ্রে অহংসৃষ্টি হইয়াছিল এবং অহংসৃষ্টির অগ্রে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল ইহাও পূর্ব্বে দেখান হইল। এখন দেখ বুদ্ধি হইতেছে নিশ্চয়াত্মিকা। ব্যষ্টি মন যেমন সঙ্কল্প বিকল্পা-

ত্মিকা, ব্যষ্টি বুদ্ধিও সেইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা। ব্যষ্টি বুদ্ধির কারণ সমষ্টি বুদ্ধি। এই সমষ্টি বুদ্ধিকেই মহত্তত্ত্ব বলা যায়।

প্রকৃতির অষ্টমভাগ হইতেছে অবিদ্যা—ইহা শ্লোকোক্ত অহংকারের কারণ। অহংকার অর্থে অহংকারের কারণ অবিদ্যাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান না থাকিলে অহংকার আসিতেই পারে না। নিজের স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে অন্যরূপ দেখা—ইহাই মূল অহং-পূর্ব্বিকা অজ্ঞান।

অবিদ্যা হইতেছে প্রকৃতির সত্ত্ব গুণের মলিন ভাব। যখন সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণ নির্ম্মলভাবে থাকে না, যখন ইহা রজ ও তম গুণের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন ঐ মলিন সত্ত্বগুণকে বা মিশ্রিত সত্ত্বগুণকে অবিদ্যা বলে; কিন্তু অব্যক্তা প্রকৃতি যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে থাকেন, যখন রজ ও তম একেবারে অভিভূত থাকে, তখন ইহার নাম মায়া। অপরা প্রকৃতির কথা বলা হইল, এখন পরা প্রকৃতির কথা শোন ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

বা , শ
ইয়ং অষ্টধাভিন্না মে প্রকৃতিঃ অপরা নিকৃষ্টাঽশুদ্ধাঽনর্থকারী সংসার-
শ যা শ ম
রূপা বন্ধনাত্মিকা জড়ত্বান্নিকৃষ্টা। ইতঃ তু যথোক্তায়াস্তু ক্ষেত্রলক্ষণায়াঃ
ম শ্রী যা ম
প্রকৃতেঃ সকাশাৎ অচেতন-ভূতায়াঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদ্বা অন্যাং বিলক্ষণাং
বা শ শ
জীবভূতাং জীবরূপাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং
ম রা ম শ বা
চেতনাত্মিকাং মে মদীয়াং প্রকৃতিং পরাং প্রকৃষ্টাং অজড়ত্বাদুৎকৃষ্টাং
নী ব যা শ্রী
বিদ্ধি জানীহি। হে মহাবাহো পার্থ! যয়া জীব প্রকৃত্যা চেতনয়া
শ্রী শ ম ম
ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া প্রকৃত্যা ইদং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকং অচেতনজাতং
যা ম ম
জগৎ ধার্য্যতে স্বতো বিশীর্য্য উত্তভ্যতে। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য

নামরূপে ব্যাকরবাণি” ছান্দোগ্য (৬।২।৩) ইতি শ্রুতেঃ। নহি জীব-রহিতং জগদ্ধারয়িতুং শক্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫॥

ইহা [অষ্টভাগপ্রাপ্তা আমার প্রকৃতি] অপরা। ইহা হইতেও অন্যরূপ আমার জীবরূপা প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতি জানিও। হে মহাবাহো পার্থ! ইহা দ্বারা জগৎ বিধৃত হইয়া আছে ॥৫॥

অর্জ্জুন—অপরা প্রকৃতিও যেরূপ তোমার প্রকৃতি, পরা প্রকৃতিও সেইরূপ তোমারই প্রকৃতি। তথাপি অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্টা, আর পরা প্রকৃতি উৎকৃষ্টা। তোমার সহিত তোমার প্রকৃতির কি সম্বন্ধ? জীবকেই পরা প্রকৃতি বলিতেছ। অপরা প্রকৃতি অচেতন। পরা চেতন। চৈতন্যও প্রকৃতি কিরূপে? প্রকৃতি কি? আবার পরা প্রকৃতি বা চেতন জীব, অপরা প্রকৃতি বা অচেতন জড়কে ধরিয়া আছে কিরূপে? অত্যন্ত জড় যে প্রস্তরখণ্ড উহাতেও কি জীব আছে? অত্যন্ত জড় যে স্বর্ণ লৌহাদি ধাতু উহাতেও কি জীব আছে? আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ইহারাও কি জীবরূপা পরা প্রকৃতি দ্বারা বিধৃত? গীতাতে এপর্য্যন্ত যতগুলি কঠিন তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছ, তন্মধ্যে এই প্রকৃতি-তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে। কারণ এই প্রকৃতি-তত্ত্ব দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন বলিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ হইতেছে না, প্রকৃতিই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে; মায়াই জ্ঞান হরণ করিতেছে বলিয়া জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইতেছে না। জড়-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থান হইতেছে না। তুমি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া আমি যাহাতে চিরতরে তোমাতে থাকিতে পারি, তাহা করিয়া দাও।

ভগবান্—আমিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে ক্ষেত্রকে ধারণ করিয়া আছি জানিও। ক্ষেত্রই শরীর। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব-চৈতন্য। আমি তোমার সমস্ত সংশয় দূর করিতেছি, তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ধৈর্য্য যে রাখে না, সে কখনও কোন তত্ত্ব জানিতে পারে না; ইহা আমি জানিয়াছি। তুমি বল আমি বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত শুনিতেছি।

ভগবান্—শ্রুতি বলেন—হরিঃ ওমন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজঃ একোনিত্যোযস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ। যস্যাহপঃ শরীরং যো অপোঽন্তরে সঞ্চরন্ যমাপো ন বিদুঃ। যস্য তেজঃ শরীরং যস্তোজোঽন্তরে সঞ্চরন্ যং তেজো ন বেদ। যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরে সঞ্চরন্ যং বায়ু র্ন বেদ। যস্যাহকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরে সঞ্চরন্ যমাকাশো ন বেদ। যস্য মনঃশরীরং—বুদ্ধিঃশরীরং ইত্যাদি। আমিই বহু হইয়া সকলের

মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ধরিয়া আছি। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইহাই শ্রুতি। যদি বল যিনি পরিপূর্ণ তিনি আবার প্রবেশ করিবেন কোথায় ও কিরূপে? আকাশ গ্রামে প্রবেশ করিল যেমন বলা যায় না—পরমাত্মা সৃষ্টি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ইহাও সেইরূপ বলা যায় না। তাঁহার সৃষ্টিরূপে ভাষাও যেরূপ, আপনাদের মধ্যে আপনার প্রবেশও সেইরূপ। একথা পরে বুঝিবে।

এখন দেখ—শরীর হইতেছে ক্ষেত্র এবং জীব চৈতন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহে চৈতন্য না থাকিলে, দেহ পচিয়া যায়, দেহ ক্রমে পড়িয়া যায়—ইহার অণুপরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। জীব চৈতন্য ক্ষণকালের জন্যও দেহকে ভুলিয়া বাহিরের বস্তুতে যদি মনঃসংযোগ করেন—তুমি রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হও, তাহা হইলেত দেহটা পড়িয়া যায়; ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে চৈতন্যই দেহটাকে ধরিয়া রাখে এবং চৈতন্য আছেন বলিয়াই দেহরূপ যন্ত্র দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য চলে। এই চেতনাত্মিকা প্রকৃতিকে আমার পরা প্রকৃতি বলিতেছি। এই চেতন প্রকৃতির সহিত আমার পার্থক্য আছে। একথা পরে বুঝাইতেছি। এখন আমি এইমাত্র বলিতেছি যে আমি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। আমি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বত্র ভাসিনা। মায়া সাহায্যে পরিচ্ছিন্ন-মত হইলে যখন ঐ পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে আমি অহং অভিমান করি, তখনই আমি প্রকৃতিকে অবচ্ছিন্ন চৈতন্য-মত প্রকট হই। তাই বলিতেছি, ক্ষেত্রজ্ঞ না থাকিলে ক্ষেত্রকে ধরিয়া থাকিবার কেহ থাকেনা। স্থূলভাবে ধরিয়া থাকা কি বলিলাম, সূক্ষ্মভাবে এই কথা পরে বলিতেছি।

অর্জ্জুন—"ইয়ং অপরা"—এই অপরা প্রকৃতি—অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় প্রকৃতিকেই ত তুমি অপরা বলিতেছ? সাধারণ লোকে যাহাকে অন্তর্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ বলে, তাহা এই অপরা প্রকৃতি। কিন্তু জড় প্রকৃতিকে নিকৃষ্ট বলিতেছ কি জন্য?

ভগবান্—জগতে যাহা কিছু দুঃখ আছে—যতদিন পর্য্যন্ত তুমি এই দুঃখকে সত্য বলিয়া ভাবিতেছ—তুমি জানিও ততদিন তুমি প্রকৃতির বশে রহিয়াছ। প্রকৃতি সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ প্রভু হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকেই আবরণ করিয়া রাখে। যেমন পানা, জল হইতে জন্মিয়া জলকেই ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ। মায়ার একটি শক্তির নাম আবরণ-শক্তি। খণ্ডমত হওয়াও এই আবরণ-শক্তির কার্য্য। ইহাই ভ্রম। মায়াকে সর্ব্বলোক-বিমোহিনী এই জন্য বলে। আবার জগতের যাহা কিছু বিরোধ তাহা প্রকৃতিই ঘটাইতেছে। প্রকৃতির মধ্যেই বিরোধী পদার্থ আছে। ইহার সত্ত্ব রজ ও তম গুণ পরস্পর বিরোধী। ইহারা সর্ব্বদা একত্রও থাকিব আবার বিবাদও করিবে। যেখানে প্রকাশ সেই স্থানেই প্রকাশের আবরণ একটি আছে, আবার সেই আবরণকে সরাইবার জন্য একটি চেষ্টাও আছে। প্রকাশটি সত্ত্ব, আবরণটি তম, এবং চেষ্টাটি রজ। এই তিনটীতে সর্ব্বদা বিরোধ লাগিয়াই আছে। রজ ও তম যখন অভিভূত হয়, তখন সত্ত্ব প্রকাশ হয়েন। মনে কর দেহের স্বাস্থ্য। দেহ ছন্দবত স্পন্দিত হইলেই বলা হয় ইহা সুস্থ আছে, স্বচ্ছন্দে আছে। কোনরূপে ছন্দ ভঙ্গ হইলেই প্রকাশের একটি আবরণ পড়ে। ছন্দটিই প্রকাশ—ছন্দভঙ্গটি তম। ছন্দভঙ্গ হইলে যে

সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনম্।
রাবণস্য বধো যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ ॥৪১॥
বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়া সহ।
অযোধ্যাগমনং পশ্চাৎ রাজ্যে রামাভিষেচনম্ ॥৪২॥
এবমাদীনি কর্ম্মাণি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি ॥৪৩॥
রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতো হি তথা বিভাতি ॥৪৪॥

২৫। এই বিষয়ে হে পার্ব্বতি! আমি তোমাকে অতি গুপ্ত অতি দুর্লভ এবং মোক্ষ প্রদানে সমর্থ সীতারাম ও হনুমানজীর সংবাদ বলিতেছি।

২৬।২৭। পূর্ব্বে রামাবতারকালে শ্রীরামচন্দ্র সংগ্রামে দেবতাগণের কণ্টক রণগর্ব্বিত রাবণকে সপুত্রবলবাহনের সহিত বিনাশ করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমানাদি মিত্রবর্গ সহিত অযোধ্যায় আগমন করেন।

২৮। বশিষ্ঠাদি মহাত্মা কর্ত্তৃক রাম সীতার সহিত অভিষিক্ত হইলেন এবং সিংহাসনে সমাসীন হইয়া কোটিসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

২৯। সম্মুখে দেখিলেন শ্রীহনুমান অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। মহামতি শ্রীহনুমান সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়াছেন, তাঁহার ধনজন প্রভৃতি কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই—কেবল জ্ঞানলাভই তাঁহার প্রয়োজন।

৩০। হনুমানকে এইভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া রাম, সীতাকে বলিলেন দেবি! তুমি হনুমানকে আমার স্বরূপের তত্ত্ব বল। এই মহাবীর সর্ব্বপ্রকার পাপশূন্য, ইনি জ্ঞানলাভের যথার্থ পাত্র; কারণ ইনি তোমার ও আমার প্রতি নিত্য ভক্তিমান্।

৩১। লোকবিমোহিনী শ্রীজানকী তখন শ্রীরামের যে স্বরূপতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে নিসংশয়রূপে অবস্থিত ছিল তাহাই শরণাগত শ্রীহনুমানকে বলিতে লাগিলেন। [লোকবিমোহিনী এই বিশেষণ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, যিনি

শ্রীমহাদেব বলিলেন

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু, ভক্তে ডাকি, কহেন আপনি।
অনাত্মা, পরাত্মা, আত্মা, তত্ত্ব কথা, বলিতেছি আমি ॥৪৫॥
আকাশের ভেদ যথা, দেখা যায়, ত্রিবিধ মহান্।
এক জলাশয়ে ছিন্ন; দুই—দেখ মহাকাশ নাম॥
অন্য প্রতিবিম্ব নাম, ত্রি-আকাশ আছে বিদ্যমান ॥৪৬॥
আত্মার ত্রিবিধ নাম, সেই মত, জানিহ নিশ্চয়।
বুদ্ধিতে চৈতন্য পড়ি, খণ্ডমত, এক আত্মা হয়॥
দ্বিতীয়টি পূর্ণ আত্মা, মায়াধীশ, মায়ামাখা তিনি।
তৃতীয় চৈতন্য সেই, বিশ্বরূপে, পরমাত্মা যিনি ॥৪৭॥
বুদ্ধির আভাসে জন্ম, কর্ত্তাপণা—ইহার আরোপ—
অবোধ করয়ে তাঁহে, বুদ্ধি যার হইয়াছে লোপ।
সাক্ষী তিনি নির্ব্বিকার, খণ্ডহীন, পুনঃ তাঁহে জীবত্ব আরোপ ॥৪৮

সংক্ষিপ্যোহপরাংল্লোকানেকস্ত্বং মায়য়া সহ।
ভার্য্যয়াশুভয়া দেব্যা মাং ত্বং পূর্ব্বমজীজনঃ॥ ইতি।

এবং চ মদগত জগৎস্রষ্টৃত্বাদেস্তত্রারোপ ইতি ভাবঃ॥

৩৫।৩৬।৩৭। যদ্যপি মায়াশবলে ঈশ্বরে এব জগদুপাদানত্বং নিমিত্তত্বং চ। জগতস্তদুপাদানং মায়ামাদায়তামসীম্। নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্মতদ্গিরা। ইত্যভিযুক্তোক্তেস্তথাহপি বিশিষ্টস্য বিশেষণবিশেষ্যোভয়ানতিরেকেণ মায়াগতস্য তস্য ভগবত্যারোপেণৈব তথা ব্যবহার ইত্যাহ। তদিতি। যতস্তৎসান্নিধ্যা-ন্ময়াস্থষ্টমতস্তৎস্রষ্টৃত্বাদি অবুধৈস্তৎস্বরূপানভিজ্ঞৈস্তত্রারোপ্যতে রজ্জৌ সর্প ইবেতি ভাবঃ। এদেবদ্রঢ়য়িতুং কানিচিৎস্বকৃতানি তত্রারোপ্যাণিদর্শয়তি। অবোধেত্যাদি॥

৩৯-৪২॥ মায়ামারীচমরণং=মায়াগৃহীত মৃগরূপ মারীচমরণমিত্যর্থঃ। মায়া-সীতাহৃতিরিতি। তদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ে।

রামস্যসুভগাং ভার্য্যাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালনোদিতঃ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ॥

ততো রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনুমন্তমুপস্থিতম্।
শৃণু তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যাত্মানাত্মপরাত্মনাম্ ॥৪৫॥
আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্।
জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি।
প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ ॥৪৬॥
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যমেকং পূর্ণমথাপরম্।
আভাসস্তপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধাচিতিঃ ॥৪৭॥
সাভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি।
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বং চ তথাঽবুধৈঃ ॥৪৮॥

লোককে মোহযুক্ত করেন, তিনিই আবার ভক্তকে মোহমুক্তও করেন]।

৩২। শ্রীসীতা বলিলেন হে হনুমন্! রামকে তুমি পরব্রহ্ম জানিও। ইনি সৎচিৎ আনন্দরূপ আর দ্বৈতরহিত। ইনি স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত উপাধি নির্ম্মুক্ত, সত্তামাত্র, কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন।

৩৩। ইনি আনন্দপুরুষ [ভূমা] নির্ম্মল রজস্তমরহিত শান্ত [প্রপঞ্চোপশম] বিকারশূন্য, মায়া বা অবিদ্যারূপ অঞ্জন [কালিমা] রহিত। ইনি সর্ব্বব্যাপী আত্মা। ইনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ। ইনি পাপশূন্য। [যিনি ব্রহ্ম তিনিই।রাম] যে অনন্ত নিত্যানন্দ চিদাত্মায় যোগিগণ রমণ করেন, রামপদে সেই পর-ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হয়।

৩৪। এইরূপ হইলে জগৎ উৎপন্ন হইল কিরূপে? উত্তরে বলিতে-ছেন :—যিনি চেতন অচেতন জগৎ সৃজন করেন, যিনি সৃজন করিয়া জগতের স্থিতি জন্য লোকপালদিগকে নিযুক্ত করেন, যিনি জগতের সংহার করেন, আমা-কেই সেই মূল প্রকৃতি জানিও। সেই রামরূপ পরমাত্মার সন্নিধি মাত্রেই, তাঁহার সমীপমাত্র হইলেও, আমি আলস্যরহিত হইয়া এই সংসার সর্ব্বদা রচনা করি। (মূল প্রকৃতি বলে তাঁহাকে, যিনি সর্ব্বজগতের উপাদান কারণ। মহদাদিও এই মূল প্রকৃতি। কারণ মহৎ হইতেছে তাঁহার আদি বিকার। আমি এই জগদিন্দ্রজাল তুলি কিন্তু অবুধ জনে আমার কার্য্যটি তাঁহাতে অধ্যাস করে।

বুদ্ধিতে আভাস মিথ্যা, দর্পণেতে মুখচ্ছবি মত।
অবিদ্যার কার্য্য ইহা, মিথ্যা মায়া,—ত্রিধা ভেদ যত–
অবিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মে, সর্ব্ব ভেদ, বিকল্পরহিত ॥৪৯॥
আভাস চেতন, হয়ে অবিচ্ছিন্ন, পূর্ণ তৎসনে।
করয়ে মিলন, একত্ব স্থাপন, তত্ত্বমসি গুণে ॥৫০॥
যবে মহাবাক্যবলে, ঐক্যজ্ঞান, জীবব্রহ্মে হয়।
অবিদ্যা-প্রপঞ্চসহ, নিঃসংশয়ে, তবে হবে লয় ॥৫১॥

গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে।
সমাহর্ত্তুং মনশ্চক্রে তাপসঃ কিল কামিনীম্ ॥
বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃত্বা দাশরথিং পতিম্।
জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা ॥
প্রপদ্যে পাবকং দেবং সাক্ষিণং বিশ্বতোমুখম্।
আত্মানং দীপ্তবপুষং সর্ব্বভূত হৃদিস্থিতম্ ॥ ইত্যাদ্যষ্ট শ্লোকামুক্তা।
ইতিবহ্ন্যষ্টকং জপ্ত্বা রামপত্নী যশস্বিনী।
ধ্যায়ন্তীমনসাতস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা ॥
অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ।
আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসানির্দহন্নিব ॥
সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেচ্ছয়া।
সীতামাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়ত ॥
কৃত্বাতু রাবণবধং রামো লক্ষণ সংযুতঃ।
সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ ॥
সাপ্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ।
বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপিতাম্ ॥
দগ্ধামায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ।
রামায়াদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽসৌ সুরপ্রিয়ঃ ॥
এতৎ পতিব্রতানাং বৈ মাহাত্ম্যং কথিতং ময়া।
স্ত্রীণাং সর্ব্বাঘশমনং প্রায়শ্চিত্তং পরং স্মৃতম্ ॥ ইতি ॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজনিত যে স্বাত্মপ্রকাশ তাহাই বাগ্‌ভা। ইহা দ্বারা ব্রহ্মবিৎ হওয়া যায়।

রাম- ব্রহ্মবিৎ কাহাকে বলে?

বশিষ্ঠ—আপনি আপনি ভাবে যে স্থিতি তাহাই হইতেছে স্বতত্ত্ব। এই তত্ত্বটি যিনি সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ।

রাম—তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজনিত স্বপ্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মবিৎ যিনি হইবেন, তিনি কে?

বশিষ্ঠ—ইনি জীবাত্মা। ইনিই ব্রহ্ম।

রাম - জীবই ব্রহ্ম কিরূপে?

বশিষ্ঠ—জীব যখন আপন পারমার্থিক নিত্যমুক্ত পূর্ণস্বরূপে প্রকাশ হয়েন, তখন তিনিই ব্রহ্ম। নিত্যমুক্ত পূর্ণ যিনি, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই আছেন। উপাধি দ্বারা তিনিই জীবরূপে কথিত হয়েন। উপাধিটি অজ্ঞান-কৃত। উপাধিটি না থাকিলেও যিনি আছেন, তিনিই আছেন।

রাম—তবে কি জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই? জীব ও ব্রহ্ম কি অভেদ?

বশিষ্ঠ—জীব ও ব্রহ্মে যে কোন ভেদ নাই ইহা ঠিক নহে। যদি ভেদ না থাকে, তবে শাস্ত্র জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দূরকরণে এত প্রয়াস পাইয়াছেন কেন? জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ তাহাও বলা ঠিক নহে। কারণ জীব ও ব্রহ্ম যদি অভেদ, তবে অভেদ প্রমাণ করিতে যাওয়া নিরর্থক। যাহারা অভেদ তাহারা ত এক হইয়া আছে; এককে আবার অভেদ প্রমাণ করা কি?

রাম—কথাটা আশ্চর্য্য মত লাগিতেছে। ভেদ বলাও ঠিক নহে, অভেদ বলাও ঠিক নহে—তবে কি বলা যাইবে?

বশিষ্ঠ—ভেদও নাই, অভেদও নাই; কিন্তু একটি কাল্পনিক ভেদ আছে। কল্পনায় ভেদ দাঁড়াইয়াছে। কল্পনা ছাড়িয়া দিলে বাস্তবিক অভেদ। কাল্পনিক ভেদটি ভাল করিয়া ধারণা করা আবশ্যক। কল্পনা দ্বারা জীব, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

রাম—এ কল্পনা কার? কে এই কল্পনা করিয়া বাস্তবিক অভেদ যাহা, তাহাতে ভেদ ঘটাইতেছে? জীবের মধ্যে ভেদ কল্পনা যিনি তুলিতেছেন, তিনি কি জীব হইতে স্বতন্ত্র কেহ?

বশিষ্ঠ—অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী যিনি, তাঁহারই কার্য্য ইহা। মায়াকে অঘটন

ঘটনা-পটীয়সী বলা হয়। মায়ার দুইটি শক্তি। একটি বিক্ষেপ, একটি আবরণ। এই মায়া জীবকে অধীন করিয়া, অবিদ্যা নাম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মের উপর মায়া ভাসিয়া হন এক ঈশ্বর, আবার ঈশ্বরের উপর অবিদ্যা ভাসিয়া হন বহু জীব।

স্থির-জলরাশির মত পরমশান্ত জ্ঞানানন্দ নিত্য ব্রহ্মই আছেন। স্থির-জলে তীর-তরুর ছায়া পড়িল। স্থির-জলের সহিত ব্রহ্মের তুলনা করা হইতেছে। জলাশয়ের তীর আছে, তীর-তরুর ছায়াও জলাশয়ে পড়িতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে তীরও নাই, তরুও নাই, তরুচ্ছায়াও নাই। তথাপি কল্পনা করা হইল; ব্রহ্ম হইতে একটা কিছু উঠিয়া যেন একটা ছায়া ভাসিল। এই ছায়াটা মায়া। "মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ" মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্বান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" শ্বেতাশ্বতর উপ। পদার্থ সকল যদ্দ্বারা মীত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয় তাহাই মায়া। প্রকৃতি ও মায়া এক।

মায়া সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। মায়া এক, কিন্তু মায়ার বিকার বহু। বহুবিকার-যুক্ত মায়াই অবিদ্যা। বহু হওয়া হয় যদ্দ্বারা—তাহাই মায়ার বিক্ষেপ শক্তি। এই বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা মায়িক বৈচিত্র্য-সৃষ্টি।

জলের উপর তীর-তরুর ছায়া পড়িল। মনে করা হউক, জল সর্ব্বত্র অচঞ্চল থাকিয়াও যেখানে ছায়া ভাসিয়াছে সেইখানে পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হইল। ত্রিপাদ ব্রহ্ম, পরমশান্ত অবস্থায় সর্ব্বদা আছেন। একপাদের বিন্দু-স্থানে মায়া ভাসিয়া, অখণ্ড ব্রহ্মকে যেন খণ্ডমত করিল। আর ব্রহ্ম যেন তরুর ছায়াকে একটা কিছু বলিয়া দেখিলেন। এখানে ব্রহ্মের দ্রষ্টাভাব আসিল। ব্রহ্ম দ্রষ্টা, এবং মায়া বা তীর-তরুর ছায়া দৃশ্য। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্য জড়। ব্রহ্ম, মায়াকে দেখিতে দেখিতে উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন। "স্বয়মন্ত ইবোল্লসন্" আপনিই আপনি আছেন। তীর-তরুর ছায়া দেখিয়া—তৎপরিচ্ছিন্ন মত জল, আপনাকে ভুলিয়া আপনিই মায়া এইরূপ উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যে যে ভেদ ছিল, সেই ভেদ এখন নাই। এখন দ্রষ্টাই আপনাকে দৃশ্য বোধ করিলেন। এই যে ভেদ ভাবটি ভুলাইয়া দেওয়া, ইহাই মায়ার আবরণ-শক্তির কার্য্য। আবরণ-শক্তি দ্বারা ভেদটি আবৃত হইল। একটিতে আর একটি বোধ হইল। রজ্জুতে ও সর্পে একটা ভেদ ছিল। আবরণ-শক্তি এই ভেদ আবৃত করিয়া, রজ্জুকেই সর্প দেখাইল।

এইরূপে অবিদ্যা যত যত নৃত্য করিতে লাগিলেন, যত যত ইহার খণ্ড হইতে লাগিল—চৈতন্যও আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে তত তত খণ্ডমত বোধ করিয়া, জীব-ভাবে বদ্ধ হইতে লাগিলেন। বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা খণ্ড হইতে লাগিল, আর আবরণ-শক্তি দ্বারা দ্রষ্টা-দর্শনের যে ভেদ সেই ভেদ আবৃত হইতে লাগিল।

ব্রহ্ম বাস্তবিক সকল অবস্থাতে একই আছেন। কিন্তু দ্রষ্টা-দৃশ্যের ভেদ রহিত হওয়ায়, পূর্ণ-চৈতন্য খণ্ড-চৈতন্য মত হইলেন। তখন আপনার স্বরূপের সহিত, আপনার পূর্ণত্বের সহিত, খণ্ড-চৈতন্যের একটা কাল্পনিক ভেদ দাঁড়াইল। মায়ার আবরণ-শক্তি দ্বারা এই ভেদ কল্পনা করা হইল। ইহাই অস্তি-ভাতি প্রিয়ের উপর মিথ্যা মায়িক নামরূপের আবরণ পড়া। "ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা" ইহার অর্থ মানুষে ব্রহ্মের নামরূপ দিয়া মূর্ত্তি-কল্পনা করা নহে; মায়াই ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করিলেন এবং অবিদ্যা ঈশ্বরকে জীবরূপে কল্পনা করিলেন। এই কল্পনাই বন্ধন। এই বন্ধনও স্বাপ্নবন্ধ। আত্মার উপর স্বপ্নে কল্পনা জাগিয়া, একটা স্বাপ্ন-বন্ধন পড়িল। তাই বলা হইতেছে, ব্রহ্মাই বাগ্‌ভাভি-র্ম্মহাবাক্যজাখণ্ডাকারবৃত্তীদ্ধ স্বপ্রকাশৈ ব্র্হ্মবিৎ স্বতত্ত্বং সাক্ষাৎকৃতবৎ সৎ ভাতি পারমার্থিক নিত্যমুক্ত পূর্ণস্বরূপেণ প্রকাশতে। জীব-ব্রহ্মই বাগ্‌ভাতে—মহাবাক্যজনিত অখণ্ডাকার বৃত্তি-প্রজ্বলিত সপ্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মবিৎ হইয়া, স্বতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া, আপন পারমার্থিক নিত্যমুক্ত পূর্ণস্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। ঈশ্বরকে পূর্ণ বলা হয়, কারণ মায়াও আপেক্ষিক ভাবে পূর্ণ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণ না হইলে, অন্য সমস্ত অপেক্ষা পূর্ণ।

রাম—তবে জীবের মুক্তি, মহাবাক্য জন্য বৃত্তি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু দ্বারাই হইতে পারে না?

বশিষ্ঠ—না অন্য কিছু দ্বারাই হয় না।

রাম—তৎ কুতঃ? তাহা কিরূপে তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ—যতো যদিদং দেহেন্দ্রিয়াদি বিয়দাদি চ দৃশ্যং বন্ধরূপং আত্মনি প্রত্যগাত্মভূতে ব্রহ্মাণ্যেব স্বপ্ন ইবাবিভূ´তং ভাতি।

কারণ এই দেহ ইন্দ্রিয় আকাশাদি যে দৃশ্য তাহাই বন্ধন। ইহা স্বপ্নের ন্যায় আত্মাতে ভাসিয়াছে মাত্র। নিজের দেহ দেখিয়া যদি সর্ব্বদা ভাবনা করিতে পার—আত্মার উপর যে কল্পনা ভাসিয়াছিল তাহাই স্থূল হইয়া দেহ হইয়াছে, জগৎ

দেখিয়াও যদি ভাবিতে পার রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত জগৎটা ব্রহ্মবিবর্ত্ত তাহা হইলে শীঘ্র উন্নতি লাভ করিবে।

রাম—দৃশ্য বন্ধনটা স্বাপ্নবন্ধ মাত্র। নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিয়া যদি কেহ আপনাকে বদ্ধ বলিয়া কল্পনা করে তাহাও যেমন, জীবের বন্ধনও সেইরূপ? কল্পনা ছাড়িলেই ত তবে মুক্ত হওয়া যায়।

বশিষ্ঠ—হাঁ কল্পনা ছাড়িলেই হয়। কিন্তু মায়ার ঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়া সেই ঘুমে স্বপ্ন দেখা হইতেছে—সেই স্বপ্নে মনে করা হইতেছে আমি বদ্ধ। স্বপ্ন না ভাঙ্গিলে এই স্বপ্ন-বন্ধন দূর হইবে না। তাই বলিতেছি—নহি সাপ্নবন্ধনিবৃত্তিঃ প্রবোধতিরিক্তং সাধনমপেক্ষত ইতি ভাবঃ। না জাগিলে স্বপ্নের বন্ধন অন্য কিছুতেই নিবৃত্তি হইবে না।

বশিষ্ঠ—এখন বলুন প্রবোধ কিরূপে হইবে—স্বাপ্নবন্ধনই বা ছুটিবে কিরূপে?

তৎব্রহ্ম, যোঽধিকারী স্বশব্দোথৈঃ শ্রবণাদ্যুপায়ৈ র্যং যাদৃশং তত্ত্বতস্তথা বেত্তি অহমেব ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকরোতি স তৎ প্রাগুক্তং পূর্ণনিত্যমুক্ত ব্রহ্মভাবরূপং মোক্ষফলমপি বেত্তি জীবন্নেব সাক্ষাদনুভবতি।

অধিকারী হইয়া যিনি সেই ব্রহ্মকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যেরূপে তত্ত্বত জানিবেন অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম বলিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, তিনি জীব হইয়াও পূর্ণ নিত্যমুক্ত ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষফল সাক্ষাৎ অনুভব করিবেন।

রাম—পূর্ব্বে বলিলেন জীব তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন; এখন বলিতেছেন—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। তত্ত্বমসির বিচার ও শ্রবণ মননাদি সাধনা কি এক প্রকার, না ভিন্ন ভিন্ন?

বশিষ্ঠ—বিবিদিষা সন্ন্যাসে যাঁহার অধিকার, তিনি শ্রবণ মননাদি সাধনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন। বিবিদিষা সন্ন্যাসে জ্ঞানলাভ পর্য্যন্ত হইবে। কিন্তু বিদ্বৎ সন্ন্যাসে এই জন্মেই জীবন্মুক্তি হইবে। এই অবস্থায় বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সম্পূর্ণ রূপে সাধিত হইবে। তত্ত্বমসির বিচারই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিশিষ্ট।

রাম—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার করিতে পারিলে স্বাত্ম প্রকাশ হইবে। অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য যে এই প্রপঞ্চ ইহা দ্বারা আত্মার স্বরূপ অপ্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নষ্ট হইলেই আত্মা আপনার ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবেন। এখন বলুন তত্ত্বমসির বিচার কিরূপ?

উৎসব

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, পৌষ ও মাঘ। [৯ম ১০ম সংখ্যা।

"সত্যং পরং ধীমহি।"

পরমেশ্বর তুমি। তুমিই আবার হৃদয়েশ্বর। রাজার রাজা তুমি। তুমিই আবার হৃদয়ের রাজা। সকল হৃদয়ের রাজা তুমি। ধনী দরিদ্র, বৃহৎ ক্ষুদ্র, যেখানে যে আছে যত বড় হউক বা যত ছোট হউক, কাহারও বিলাপ করিবার কিছু নাই—কাহারও বলিবার নাই যে তুমি আমার প্রাণেশ্বর নও। আর আমি! অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণিত, শতবার প্রতিজ্ঞা করি শতবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি। শতবার বলি আর অপরাধ করিব না, শতবার কর্ম্মদুরাচার হইয়া পড়ি। শতদুঃখে জর্জ্জরিত অনন্ত পদস্খলনে অনুতপ্ত—রাজার রাজা তুমি তোমাকেও আমি বলিতে পারিব আমার তুমি? স্বামীগৃহ হইতে যে বাহির হইয়া গিয়াছে, যে শতশতবার ব্যভিচার করিতেছে সেও কি আর সতীস্ত্রীর মত বলিতে পারিবে আমার প্রাণেশ্বর তুমি?

বুঝি পারে বলিতে। তুমি যে ক্ষমাসার। তুমি সাধুর সাধু। তুমি যে ক্ষমা কর। করিয়া আবার তোমার করিয়া লও। এই ত সাহস। এই ত ভরসা। তবে এস পাপীতাপী একবার নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া, নিজের ব্যভিচার স্বীকার করিয়া—আর বেশ্যাবৃত্তি করিব না বলিয়া, ক্ষমা চাই। আর ইন্দ্রিয় সুখকে সুখ বলিব না বলিয়া, আর ক্ষণিক সুখকে সুখ না

ভাবিয়া—ইন্দ্রিয়ারাম হওয়াই যে আত্মরামকে ত্যাগ করা ইহা স্থির জানিয়া—একবার তাঁহারে জানাই, তাঁহারই কাছে শক্তি চাই। চাহিয়া একবার সেই স্বামীর স্বামীকে দেখি একবার সেই রাজার রাজাকে হৃদয়ের রাজা বলিয়া ভালবাসি, একবার সব অভিলাষ ছাড়িয়া সেই চরণের অভিলাষ করি, একবার অন্ত কাঙ্গালিনী না হইয়া কেবল কৃষ্ণকাঙ্গালিণী হইয়া তারে দেখি।

আহা কেমন তুমি! তুমি ঈপ্সিততম, তুমি দয়িত তুমি রমণীয়দর্শন। তুমিই বিশ্বব্যাপী, তুমিই বিষ্ণু তুমিই আমার ভিতরে তুমিই আমার বাহিরে। তুমি সর্ব্বস্থানে উদয় হইতে পার। পটের ছবিতেও তুমি, মাটির ঠাকুরেও তুমি, অনলে অনিলেও তুমি, আকারেও তুমি নিরাকারেও তুমি, তুমি বড় সুন্দর, তুমি অতি মনোহর।

আহা কেমন তুমি! কেমন করিয়া বলিব? তুমি আপন মহিমায় আপনি মহিমান্বিত, তুমি আপন গরবে আপনি দাঁড়াইয়া আছ। তোমার কাছে কাহারও কুহক খাটে না। যে মায়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশকেও কুহকে ফেলে, সেই মায়ার সমস্ত কুহক তুমি নিরস্ত করিয়া আপন সত্যস্বরূপে, আপন পরমরূপে, তুমি আপনিই আপনি। তাই ঋষিরা বলেন ধাম্নাস্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি। তুমি একবার চর্ম্মচক্ষের সম্মুখে এস। তুমি ত অনেকের কাছে আসিয়াছ অনেক মূর্ত্তিতে আসিয়াছ, একবার এস। এই যে প্রাণশূন্য মূর্ত্তি—তুমি এস, আসিলেই ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। এস, আসিয়া জানাইয়া দাও তুমি আসিয়াছ। একটিবার দেখা দাও—দিয়া আমাকে চিরতরে দাসী করিয়া দিয়া যাও। আর তোমায় কিছুই বলিব না।

তুমি আর দ্বিতীয়বার না আসিলেও আমি তোমার জন্য প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, সুখ দুঃখ সমস্ত ভুগিব—তোমার জন্য সকল চক্ষুর অন্তরালে গিয়া কাঁদিব। কাহাকেও আর কিছু বলিব না—কাহাকেও আর মন্দ ভাবিব না—কিছুই ভাবিব না।

কবে আসিবে? কবে আমায় দেখা দিবার মতন করিবে? আমি প্রলাপ বকিতেছি। তুমি কি আসিবে? আছই ত। দেখা কি দিবে? সে তুমিই জান। আমাকে আশা দাও। আমি তোমার অপেক্ষায় রহিলাম।

পাওয়া।

১। বিশ্বাসে পাওয়া। ৩। ভাবে পাওয়া।
২। কর্ম্মে পাওয়া। ৪। সত্যে পাওয়া।

১। বিশ্বাসে পাওয়া : তুমি সর্ব্বত্র আছ এই বিশ্বাস আসিল কিরূপে? এই বিশ্বাসের মূল শ্রুতি। যুক্তি দ্বারাও শ্রুতির সত্যতা প্রমাণ হয়।

শ্রুতি বলেন একমাত্র তুমিই সত্য অন্য সমস্ত মিথ্যা। শ্রুতি আশ্রয়ে ভাগবত বলেন ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইয়াও যে সত্যমত দেখায় সে কেবল মূলে তুমি আছ বলিয়া। যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।

একমাত্র সত্যস্বরূপ তুমি সকলের মূলে আছ কোন্ প্রমাণে ইহা জানা যায়?

আমার কাছে যে জগৎটা আছে ইহা কোন্ প্রমাণে জানা যায়? না এটা আমার অনুভবে পাই—ইহাই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ। যখন ইহার অনুভব থাকে না তখন বলি ইহা নাই। তবে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে হইলে তাহা কাহারও অনুভবে পাওয়া চাই। কাহারও অনুভবে নাই এমন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে বা অতল সমুদ্রতলে যদি কিছু থাকে তবে তাহা কাহার অনুভব আছে?

তোমার আমার অনুভব সেখানে না থাকিতে পারে; কিন্তু যখন বলিতেছ তাহা আছে তখন কাহারও অনুভবে উহারা আছে। বিনা অনুভবে কাহারও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই জন্য বলা যায় যখন জগৎ আছে বলিতেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছি যে তুমি মূলে আছ বলিয়া মিথ্যাজগৎও সত্যমত দেখাইতেছে। তুমি সর্ব্বত্র আছ ইহার একটা যুক্তি দেওয়া গেল। আরও কত যুক্তি কত লোক দিতে পারেন।

আচ্ছা মনে করা হউক তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে আছ। যে যুক্তি জানে না সে যেন ইহা বিশ্বাস করিল। কিন্তু ইহাতে তাহার লাভ কি?

যাহা বিশ্বাস করিল তাহার ব্যবহার করুক—তবেই সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে তাঁরে স্মরণ রাখিতে পারিবে। একবারও তাঁরে ভুল হইবে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ভাল করিয়া বল।

শ্রবণ কর। মনে কর সম্মুখে এই নারিকেল গাছটি তুমি দেখিতেছ।

গাছটি দেখিয়া তুমি ভাবিতেছ তুমি আছ তাই গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। তুমি গাছটিকে দেখিতেছ, অনুভব করিতেছ, জানিতেছ; কিন্তু বৃক্ষটি তোমায় দেখিতেছে না, অনুভব করিতেছে না, জানিতেছে না। তুমি সকলকে জানিতেছ, তোমায় কেহ জানিতেছে না।

আচ্ছা গাছটি ত তোমাকে অনুভব করিতেছে না। কিন্তু তুমি ত গাছকে অনুভব করিতেছ। আর আমিও ত গাছকে অনুভব করি। সব সময়ে অনুভব করি না সত্য কিন্তু যখন এখানে আসি, যখন দেখি, তখন ত অনুভব করি। গাছকে তবে এক সঙ্গে তুমি আমি উভয়েই অনুভব করি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে আমার অনুভবে গাছের যে অস্তিত্ব আছে আর তোমার অনুভবে গাছের যে অস্তিত্ব, এই দুই অস্তিত্ব—কি এক প্রকার না ভিন্ন ভিন্ন?

যাহার জ্ঞান যেরূপ তাহার অনুভবও সেইরূপ। তুমি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ কাজেই তুমি সমস্তই জানিতেছ, আমি সকল বিষয় জানি না কাজেই গাছের যেটুকু জানি বা আমার ইন্দ্রিয় জ্ঞানে আমি সেটুকুই অনুভব করি।

তুমি সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে সমস্ত বস্তু জ্ঞান আমি দর্শনকালে আমার ভাবে জানি—এই পার্থক্য।

প্রেমিক যেমন পৌর্ণমাসী রজনীতে চাঁদ পানে চাহিয়া চাহিয়া পিয়ার মুখ মনে ভাবিয়া বলে—হে চন্দ্র! আমিও যেমন তোমায় দেখিতেছি সেও তেমনি তোমায় দেখিতেছে, তোমাতে আমাদের চারি চক্ষু মিলিত হইয়াছে, তুমি তাহা দেখিতেছ, আমিও তাহা দেখিতে পাই না, সেও তাহা দেখিতে পায় না। তাই আমরা এত জ্বলিতেছি। তুমি তোমার শীতল করে তাহাকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ কর, আবার আমাকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে স্পর্শ কর, তবে তোমার সাহায্যে আমরা উভয়ে উভয়কে স্পর্শ করিয়া শীতল হইব; ভক্তও সেইরূপ যদি বলিতে পারেন—হে বৃক্ষ! যাহার অনুভবে তুমি সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া আছ, আর আমার এই ক্ষণিক অনুভব যে সেই অনুভব সমষ্টির এক কণা মাত্র, আমাকে এইটি যদি তুমি দেখাইয়া দাও তবে আমার বিন্দুপরিমাণ অনুভবকে সেই অনুভব-সিন্ধুতে একবার নিমজ্জিত করিয়া দেখি কি হয়? একবার দেখি এইরূপ করিলে তাহার কোন সংবাদ মিলে কি না?

প্রতি বস্তু দর্শনে বা প্রতিবাক্য শ্রবণে বা প্রতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে যদি এইরূপ একটা চিন্তা আইসে আর অন্য চিন্তা না আইসে তবে ত সর্ব্বদাই

তোমাকে মনে রাখা যায়। বিশ্বাসে পাওয়া তাহাই যাহাতে সর্ব্বদাই ঈশ্বরচিন্তা লইয়া থাকা যাইতে পারে। তুমি ত সর্ব্বদা সকল বস্তুকে দেখিতেছ,ইহারা তোমায় কিন্তু দেখিতে পাইতেছে না—এই ভাবে বিশ্বাসে পাওয়ার কথা বলা গেল। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, ফুলফল আবার আকাশ, বায়ু, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, নদী, তরঙ্গ, জল, অগ্নি, পৃথিবী এই সমস্ত দেখিয়া যখন পূর্ব্বের মত ভাবনা সর্ব্বদা চলে তখন বিশ্বাসে পাওয়ার ফল হয়।

(২) কর্ম্মে পাওয়া। বিশ্বাসে পাওয়াটি সর্ব্বদা থাকে না, যদি তাহার সহিত কর্ম্মে পাওয়াটি না থাকে। মোটা কথায়—যাহা ভাবি, যাহা বলি, যাহা করি তাহাতে যদি তোমার ভাবনা না থাকে কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত সময়ে গাছ দেখিয়া তোমার ভাবনা হয় মাত্র ইহাতে কিন্তু একপ্রবাহ থাকিবে না।

কর্ম্মে পাওয়া বলে তাহাকে যখন প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্যকথন পূর্ব্বে, এবং কথনও বাক্যকথন সময়ে এবং হস্তপদাদি দ্বারা কর্ম্ম করিবার সময়ে, যখন ভাবনা, বাক্যকথন ও হস্তপদাদি দ্বারা কর্ম্ম—সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিয়া করা হয়, সর্ব্বকর্ম্ম তোমার অনুমতি লইয়া করা হয়—তোমার প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া করা হয়—যখন আর কোন কর্ম্মকালে—ভাবনায় বাক্যে বা কর্ম্মে একবারের জন্যও তোমায় ভুল হয় না তখন কর্ম্মে তোমায় পাওয়া হইল।

(৩) ভাবে পাওয়া। বিশ্বাসে পাওয়া ও কর্ম্মে পাওয়া ইহাতে যদিও তোমার স্বরূপ কিছুই জানা গেল না; কেবল বিশ্বাস করা হইল তুমি সর্ব্ব-ব্যাপী, তুমি সমস্তই জান, তুমি সমস্তই করিতে পার, আমায় দেখাও দিতে পার। যাহা কিছু আমার করার থাকে—কি ভাবনা কি বাক্য কি হাতে পায়ে কর্ম্ম, এই সমস্ত তোমাকে জানাইয়া করিলে ভাব হয়। তোমাকে জানাইলেই কেমন একটা ভাব যেন আইসে, এই ভাবে বড় আনন্দ হয়। সতীস্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করিতে পারে না—ব্যভিচারিণী হইবার ভয়ে নিজের ভাবনা পর্য্যন্ত স্বামীর গোচর করিতে চায়, ভক্তও সেইরূপ সকল ভাবনা, সকল কথা, সকল কার্য্য, তাহাকে জানাইয়া করিতে করিতে সর্ব্বদা তাহার একটা সঙ্গ লাভ করে সেই সহবাসে একটা সুখ হয়। ক্রমে এই সুখ ঘনীভূত হইলে উভয়ে উভয়ের সঙ্গ করিয়া, উভয়ে উভয়ের সহিত কথা কহিয়া এক অতিশয় সুখ পাওয়া যায়; তাহাই ভাবে পাওয়া।

(৪) সত্যে পাওয়া। ভাবে পাওয়াটা ঘনীভূত হইলে সত্যসত্যই পাওয়া

যাহার যাহা তাহাই হয়। ইহা নিজ বোধরূপ। এ সম্বন্ধে বলাটা "গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ" ॥ অধিক কি।

হিন্দুশাস্ত্রে তন্ত্রমত।

(কোন রাণীর লেখা)

[আমরা অত্র সম্বন্ধে যে লেখাটি প্রকাশ করিতেছি তাহা একজন স্ত্রীলোকের লেখা। তিনি কুলবধূ—বড় ঘরের মেয়ে—রাণী। রাণী হইয়াও নিতান্ত কঠোরতা অবলম্বনে সাধনা করেন। আজকাল সমাজে ইহা বিরল। কোন প্রকারে লেখাটি আমাদের হস্তগত হয়। যিনি লিখিয়াছেন তিনি যদি উৎসবে এই লেখা না দেখেন তবে তাঁহার লেখা যে প্রকাশ হইল, তাহা তিনিও জানিবেন না। অনেক সাধক পণ্ডিতের লেখায় আমরা এরূপ শাস্ত্র সমন্বয় দেখি নাই। অথচ যিনি পূর্ণমাত্রায় অন্তঃপুরচারিণী এ লেখাটি তাঁহার]

নমঃ বিশ্বগুরবে ॥

"ঋষিগণ সমস্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তন্ত্রেরও তাহাই অভিমত; [তবে] তন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে উহা কোন জাতি বা সমাজ বিশেষের বা বর্ণ-বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উহাতে মানব জাতি মাত্রেরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

তন্ত্রমতে যাঁহারা গুরুমুখে দীক্ষা ও উপদেশ পাইয়া ব্রহ্ম-বিদ্যা সাধনপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন তাঁহারা স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন অথবা যে কোন জাতিই হউন, তাঁহাদের পার্থিব স্ত্রীপুরুষাদি ভেদ, স্থূল দেহাভিমান এবং জাতি বর্ণ অভিমানাদি (কিছু থাকে না) সমস্ত অভিমানাদি রহিত হইয়া তাঁহারা এক নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। ঐভাবযুক্ত ব্যক্তিকে "শিব" বলা যায়।

তন্ত্রের চরম জ্ঞান শিবোঽহং এবং প্রার্থনীয় (লক্ষ্য) পরামুক্তি বা মোক্ষ। উহা হওয়া সাধন সাপেক্ষ। চিত্তবৃত্তি নিবৃত্তিই সমস্ত সাধনার মূল সোপান। তবে উহা কেবল কঠোরতা দ্বারা হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-যোগের আবশ্যক হয়। পুরাকালে যাঁহারা গুরুগৃহে ছাত্রাবস্থায় থাকিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতেন তাঁহারা সকলেই "ভক্ত" ছিলেন; গুরুই তাঁহাদের উপাস্য ছিল।

গুরুভক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া গুরুর মধ্য দিয়া তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেন। তন্ত্রেও সেই গুরুভক্তি করিবারই উপদেশ আছে। ইহা প্রথমাবস্থা। এই প্রথমাবস্থায় কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাকে পাশব কল্প বা পশ্বাচার বলে। পশ্বাচার প্রথমে অবলম্বন না করিলে কোন আচারই স্থির বা সংযত ভাবে আচরিত হয় না। এবং চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই হেতু ভক্তিযোগ বিশিষ্ট হইয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করিয়া পশ্বাচারে গুরুর উপদেশমতই চলিতে হয়।

তৎপরে গৃহস্থ হইবার ইচ্ছা হইলে যিনি উক্ত পশুভাবে শ্রদ্ধাশীল তিনি ঐ নিয়মে থাকিয়া ভক্তিপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস ও যবন হরিদাস প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় পশ্বাচারী হইয়া কঠোর ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দিব্যাচারে প্রবেশ লাভ করিয়া ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। আর যাঁহারা পশ্বাচার কঠোরতা পালনে অক্ষম তাঁহারা স্মৃতিসম্মত বিধিতে পশু ও বীর মিশ্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুবাক্য অনুসারে জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যাঁহারা যোদ্ধা তাঁহারা কেবল বীরভাব ও জ্ঞানযোগ দ্বারা সিদ্ধ। অথবা যাঁহারা একেবারে সংসার বা ইহজগৎকে অস্বীকার করেন তাঁহারাও কেবল জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হন।

দিব্যভাবই চরমভাব। যে আচারই অবলম্বন করা হউক শেষে চিত্তনির্ম্মল হইয়া দিব্যাচারে প্রবেশ না করিলে ফলোদয় নাই। এবং অভক্তের বা অবিশ্বাসীর কোন আচার অবলম্বনেই উপকার হয় না। ভক্তি বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সদ্‌গুরুই তান্ত্রিক বা বৈদিক সাধনায় সিদ্ধি দিতে পারেন। তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রের সকল বিধিরই চরমফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। বিশেষ এই—ভক্ত ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে পান আর জ্ঞানী নিজ ও পর প্রত্যেকের আত্মাতেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার দর্শন প্রাপ্ত হন। ফল কথা গীতাতে শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহাই সারতম। বিবিধ শাস্ত্রের বিবিধ প্রকার পন্থা। প্রত্যেকেরই মূলতত্ত্ব ভক্তি, বিশ্বাস ও ভগবানকে আত্মসমর্পণ করা। অধিকারী ভেদে ও অবস্থা ভেদে ক্রিয়া ভেদ হইয়া থাকে। তন্ত্রেও বিবিধপ্রকার ক্রিয়া অনুসারে বিবিধ প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাগযজ্ঞাদি এবং ব্রতাদিতে পুণ্য ও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানপথ ছাড়া মোক্ষ হয় না।

পুনশ্চঃ—তন্ত্রমতে যতক্ষণ জীব ও ব্রহ্ম এই ভেদজ্ঞানের অনুভব থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে কোন পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন পথে থাকিতে হইবে। যখন জীব ও ব্রহ্ম অভেদ অনুভব হইয়া প্রতিবস্তুতে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে সেই অবস্থাকে দিব্যভাব বলে। দিব্যভাবে সিদ্ধি হইলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয় এবং ভক্ত ও ভগবান এক হইয়া এক অখণ্ড ভাব প্রাপ্ত হন। ভক্ত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের ভাব লইয়া সেই জ্ঞানে ভগবানকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভগবানের মধ্যেই বিশ্বদর্শন করেন। এবং জ্ঞানীগণ "সোঽহং" এই মহাবাক্যের ভাব লইয়া নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই ভগবদ্দর্শন পাইয়া থাকেন।

ভক্তেরাও জ্ঞানী, জ্ঞানীরাও ভক্ত। জ্ঞানীগণ প্রথমে জ্ঞানপথ ধরিয়া হন জ্ঞানী এবং ভক্তগণ প্রথমে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া পরে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন। ভক্ত ভগবানের মধ্যেই জগৎ ও জ্ঞানী জগতের মধ্যে ভগবানদর্শন করিয়া থকেন এই পার্থক্য। তন্ত্র এই দুইয়ের এক পন্থা লইয়া ভগবানের বা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া লয় হইতে বলেন।

উতলা।

হিয়া মাঝে কার যেন বাঁশী শোনা যায়।
কে যেন গভীর সুরে—
ডাকিছে হৃদয়-পুরে,
আকুল প্রেমের ভাবে—"আয় সখী আয়"।
গৃহকাজে আনমনা—সখির পরাণ;
বসি হৃদি-উপকূলে—
মন-কদম্বের মূলে,
কে গো সে বাজায় বাঁশী হয়রে পরাণ?
মন ডাকে মন বাঁশী—"বেলা বহে যায়"।

কেমনে যাইব কাছে,
কর্ম্ম-বন্ধ টানে পাছে ;
শত বাধা পায় পায় জড়াইয়া যায়।
পথের রেখাটী ওই দ্রুত মুছে যায়।
আঁধারিয়া আসে নিশি,
কেমনে পাইব দিশি ?
উদাসী পরাণ যে গো করে—হায়! হায়!
বাজায়ে মোহন বাঁশী পথপানে চায়—
হৃদয় কুটীরে রাধা
প্রাণ বাঁধা মন বাঁধা,
বাঁশীও বলেছে ডেকে বেলা বহে যায়!
সারাটী পরাণ সখি! কেড়ে নিতে চায়!
সে কি মানে কুল-লাজ—
সে বোঝে না গৃহকাজ,
সেতো জানে হিয়া তারি চরণে লুটায়!
তারো কি সহেনা কাল—বেলা বহে যায়!

মৃঃ—

উপাসনা-তত্ত্ব।

(১)

উপাসনা করা কি ঠিক ? লোকে বলে খোসামুদি।
সর্ব্বদা ছুটিয়া বেড়ান কি ঠিক ?
সর্ব্বদা ছুটিয়া বেড়াইতে ত কেহই পারে না।
না পারিয়া কি করে ?
বসিতে চায় ; বিশ্রাম করিতে চায়।
ছুটিয়া বেড়ান ও বসা বা বিশ্রাম করা উভয়েই তবে স্বাভাবিক নিশ্চয়ই।

উপাসনাও তবে স্বাভাবিক।

উপাসনা কি তবে বসা বা বিশ্রাম করা ?

তা ছাড়া আর কি ? পরমশান্ত পরমরমণীয় যিনি তাঁহার সমীপে বসা বা বিশ্রাম করাই উপাসনা। সেই পরম-রমণীয়দর্শনের সমীপে বসিতে বসিতে তাঁহাকে ছুঁইতে ইচ্ছা করে। চুম্বকের সমীপে লৌহ আনীত হইলেই যেমন চুম্বক লৌহকে টানিয়া লয়, সেইরূপ সেই রমণীয়দর্শনের সমীপে বসিতে পারিলে তিনি এমন আকর্ষণ করেন যাঁহাতে তাঁহাকে স্পর্শ করা হইয়া যায়; হইয়া গেলে তিনি যেমন শান্ত সেই শান্তভাবে স্থিতিলাভ করাও হইয়া যায়।

উপাসনা তবে সমীপে বিশ্রাম এবং স্বরূপে স্থিতি ?

হাঁ। উপাসনার এই দুই অর্থ। (১) উপ-সমীপে, আসন-বসা বা স্থিতি। (২) ক্রমে যখন সমীপ আর থাকে না তখন একেই যে স্থিতি, আপনি আপনি ভাবে যে স্থিতি তাহাই উপাসনার শেষ অর্থ, শেষ ফল।

(২)

কাহার উপাসনা করা উচিত ?

প্রতি ছুটিয়া বেড়ানার কোলে কোলে যে বিশ্রাম আছে, প্রতি কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে অকর্ম্ম বা বিশ্রাম আছে সেই বিশ্রামটি ধরিতে পারিলে সেই বিশ্রাম যে চিরশান্ত জ্ঞানময় আনন্দময় পরমবিশ্রামকে দেখাইয়া দেয় সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপের উপাসনাই কর্ত্তব্য।

আমরা কি ইঁহারই উপাসনা করি ?

হাঁ। যিনি জলে স্থলে; অনলে অনিলে; যিনি অম্বরে অবনীতলে; যিনি সর্ব্বব্যাপী; পরম শান্তিই যাঁহার স্বভাব; যাঁহার পরমপদ সতত গমনশালিনী স্পন্দনাত্মিকা এক পরমাশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত; সর্ব্বগতির ভিতরে যে পরম স্থিতি, আমরা তাহা ধরিয়াই সেই চরমস্থিতির উপাসনা করি।

এই স্থিতির নাম কি ?

শুধু স্থিতির কোন নাম নাই। তবে গতিজড়িত স্থিতির, শক্তিজড়িত মঙ্গলময়ের—পরমশিবের প্রিয় নাম প্রণব, ওঁকার।

আমরা কি ওঁকারের উপাসনা করি ?

হাঁ। আমরা "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"—সেই পরমশান্ত সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু-নামাখ্য পরমমঙ্গলময়ের পরমপদ যাহা তাহারই উপাসনা করি।

সকল ভাল লোকে কি ইঁহারই উপাসনা করেন ?

হাঁ—সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। যাঁহারা সুর—যাঁহারা দেবতা—যাঁহারা বাহুবলের উপরেও চিত্তজয়রূপ যে পরমবল আছে সেই বলে বলশালী, যাঁহারা ষড়্‌রিপু জয়জনিত পরমবলে বলীয়ান্, যাঁহারা মন ইন্দ্রিয়াদি অসুর জয় করিয়া সুর হইয়াছেন, যাঁহারা প্রাণজয়ে প্রকৃত সুর, সেই সুরেরা সেই তত্ত্বজ্ঞানিগণ যাঁহাকে প্রতিনিয়ত দর্শন করেন; সুরগণ যাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তৎকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া তাঁহার পরমপদে স্থিতিলাভ করেন, আমরা সুরদিগের প্রদর্শিত ওঁকার নামাখ্য মায়াজড়িত ব্রহ্ম, গতিজড়িত পরমস্থিতির উপাসনা করি। চরম লক্ষ্য জ্ঞানানন্দে পরমস্থিতি।

সর্ব্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণুর পরমপদের সমীপে উপবেশন করিতে হইলে কি করিতে হয় ?

ওঁকারই সেই পরমপদ। যে মহাশক্তির খেলায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইতেছে—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যে বিন্দুস্থানে উঠিয়া উঠিয়া, স্থিতিলাভ করিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে ; যে প্রবণরূপ মায়াশবলিত সগুণব্রহ্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিজড়িত, যাঁহার অঙ্গে অ উ ম, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত, যে ওঁকারের মধ্যে সেই পরমপদের বিন্দুস্থানে প্রকৃতিপুরুষজড়িত অর্দ্ধনারীশ্বররূপী পরম দেবতা সদা বিরাজিত, ষড়্‌চক্রের শেষ চক্রের ভিতরে ওঁকাররূপী সগুণব্রহ্মের শিরোভাগে যে বিন্দু, যে বিন্দু সেই পরমপদে প্রবেশ করাইতে সমর্থ, যে বিন্দুতে পৌঁছিলে মায়ার তরঙ্গ আর বিমোহিত করিতে পারে না, আমরা সেই পরমপদের উপাসনা করি।

(৩)

কিরূপ সাধনায় এই উপাসনা বা সমীপস্থিতি ও আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ হয়।

সমীপস্থিতিই ভক্তিমার্গ এবং আপনি আপনি স্থিতিই জ্ঞানমার্গ।

উপাসনা-তত্ত্বে এই দুই মার্গের কথা বলিয়া আমায় চিরতরে তোমার কর, এই আমার—

এই তোমার চিরসাধ। যতদূর সরল ভাবে বলা যায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ক্রমশঃ—

আস্তিক ও নাস্তিক।

আস্তিক—ঈশ্বর আছেন, তিনি জীবকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন—বলেন তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ—বলেন সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব, ইত্যাদি বাক্যে আমার প্রাণ ভরিয়া যায়, আমি বড় আনন্দ পাই।

শ্রুতি যখন অমরত্বের কথা বলেন তমেব "বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি" "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" যে কৈবল্যের নাম মুক্তি, যে কেবল ভাবে থাকার নাম আপনি, আপনি আপনি ভাবে স্থিতির নাম মুক্তি—মৃত্যু অতিক্রম করা—এই অমরত্বের কথা আমার বড় ভাল লাগে। [যাহারা পরকাল মানে না শাস্ত্রমতে তাহারাই নাস্তিক। আমরা সাধারণ অর্থই আলোচনা করিতেছি।

নাস্তিক—আমারও লাগে কিন্তু যদি মৃত্যু অতিক্রম করা কথাটা কথার কথা না হইত। শাস্ত্র বলেন বটে "জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" জরামরণ হইতে মুক্তিজন্য যিনি আমার আশ্রয় লাভ করেন—শ্রুতিও বলেন বটে—জ্ঞানলাভে মানুষ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে, কিন্তু জরা আইসে নাই, বৃদ্ধত্ব আইসে নাই এমন সাধকও কই দেখিলাম না। শাস্ত্রে শুনি বটে চির বালক, কখন কোন রোগ নাই; কিন্তু এত সাধক দেখি, কেহ কি ঐ অবস্থায় গিয়াছেন তুমি দেখিয়াছ? যোগীরা বলেন যোগের নানা ব্যাপারে অমর হওয়া যায়, কিন্তু এত লোক যোগ করে অমর হইতেছেন এ চিহ্নও ত কাহাতেও পাই নাই। না পরীক্ষা করিয়া কিরূপে কথাগুলি মানিয়া নি বল।

আস্তিক—বলিতে পার নাস্তিকতার কথায় দুঃখ কেন আইসে?

নাস্তিক—দুঃখ ত কতই হয় কিন্তু হইলে কি করিব বল? তুমিও ত কত শোক পাইয়াছ—কতবার শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়াছ; নিতান্ত প্রাণের বস্তু যাহারা তাহাদিগকে সঙ্কটে পড়িতে দেখিয়া কত তুলসী দেওয়াইছ, কত মৃত্যুঞ্জয় জপ করাইয়াছ, কত স্তব স্তুতি নিজেও করিয়াছ, কত প্রার্থনা করিয়াছ—বল শ্রীভগবান কি তোমার সে কথা শুনিলেন? বল তুমি কি করিয়া বিশ্বাস করিবে? যদি একজন লোককে

তুমি মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখ—কাতর হইয়া যদি কেহ তোমার নিকট উদ্ধার কর বলিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করে, তুমি স্থির থাকিতে পার না! আর তিনি? তুমি না হয় সংসারী, তুমি না হয় পামর বিষয়ী, কিন্তু যাঁহারা সংসারে সাধু বলিয়া পরিচিত, শত শত লোকে যাঁহাদের কথা শুনিতে যায়, যাঁহাদের একটু আদর পাইলে লোকে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, যাঁহারা যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী একাধারে সব; বিপদে পড়িয়া রক্ষা জন্য তাঁহাদিগকেও ত ভার দিয়াছ, কত কাতর হইয়া তাঁহাদেরও শরণাপন্ন হইয়াছ, কিন্তু কি ফল ফলিয়াছে বল? নাস্তিকতায় দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু বল দেখি সাধু, সন্ন্যাসী, ভাল লোক, যে যাহা বলিলেন তাহা করিয়াও তুমি কি মুমূর্ষুর দুঃখ কিছু নিবারণ করিতে পারিয়াছিলে? সকল সাধুই ত তোমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন "মরিবে না" কিন্তু সাধুর কথাও মিথ্যা কেন হইল? এই সমস্ত দেখিয়াও কি বলিতে চাও পরীক্ষা করা উচিত নহে? অবিশ্বাস যে আপনা হইতে আইসে।

আস্তিক—এইরূপ ঈশ্বর অবিশ্বাসী লোক কি অনেক?

নাস্তিক—অনেক বল কি? আজ কাল প্রায় লোকই এইরূপ। আবার ইহার নজীর দেখাইবার পুস্তকও অনেক।

আস্তিক—শাস্ত্রে কি এইরূপ দেখিয়াছ?

নাস্তিক—চার্ব্বাকাদির যুক্তি শাস্ত্র খণ্ডন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মত খণ্ডন করিলে কি হয়—সেই সব মত বহুলোকের হৃদয়ে রাজত্ব করে। কত ইংরাজী পুস্তকে—এবং তাহার অনুবাদ পুস্তকে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস প্রচারিত হইতেছে।

Goethe calls him—the founder of Christianity—Jesus -a Schwarmer, a fanatic ; he may much more rightly be called an opportunist. But he is an opportunist of an opposite kind from those who in politics, that wild and dream like trade, of insincerity, give themselves this name.

ম্যাথিউ আরণল্ড গেটে সম্বন্ধে যাহা বলেন অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। W. B. Ronfeldt গেটের জীবনী-লেখক বলেন Goethe continually declares war against the doctrine of self-denial on self-abstinence—that is to say in all cases where no special end is to

be gained thereby—and pronounces false and blasphemous the maxim "All is vanity". ঐ লেখক বলিতেছেন that all is not vanity is indeed almost the substance of Goethe's philosophy অনেক বিষয়ে Mathew Arnold গেটের শিষ্য। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ইঁহার মত এই :—
Our religion, parading evidences such as those on which the popular mind relies now; our philosophy pluming itself on reasonings about causation and finite and infinite being; what are they but the shadows and dreams and false show of knowledge? The day will come when we shall wonder at ourselves for having trusted to them, for having taken them seriously; and the more we percieve their hollowness, the more we shall prize the breath and finer spirit of knowledge offered to us by poetry.

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহার মূলে নাস্তিকতা আছে। আমরা Edwin Arnold এর Light of Asia হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নাস্তিকতা দেখাইতেছি।

I am like all these men
Who cry upon their gods and are not heard,
Or are not heeded—yet there must be aid!
For them and me and all there must be help!
Perchance the gods have need of help themselves,
Being so feeble that when sad lips cry
They cannot save! I would not let one cry
Whom I could save! How can it be that Brahma
Would make a world and keep it miserable,
Since, if, all-powerful, he leaves it so,
He is not good, and if not powerful, He is not god?

প্রাণ প্রয়াণ সময়ে মানুষের যে অসহ্য যাতনা হয়, তাহা দেখিয়া কোন মানুষই স্থির থাকিতে পারে না। ঈশ্বর তাহা দেখিয়া সাহায্য না করিয়া স্থির থাকেন কিরূপে? অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া যে তোমার শরণ লয়, তোমার যদি সামর্থ্য থাকে তখনই তুমি তাহার দোষাদোষ বিচার না করিয়া ক্ষমা কর। আর ঈশ্বর?

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি আবার দয়াময়, তিনি অকথ্য, অসহনীয়, যম-যাতনায় অধীর ব্যক্তির কাতর প্রার্থনাও ত শ্রবণ করেন না। ঐরূপ ব্যক্তির জন্য তাহার আত্মীয় স্বজন, বা সাধু সজ্জনের কাতর প্রার্থনাতেও এই পরম করুণাময় পরমেশ্বর কর্ণপাত ত করেন না? ইহাতে কি বুঝা যায়? বলিতে হইবে না কি মৃত্যু যাতনা নিবারণের শক্তি তাঁহার নাই, মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে তিনি পারেন না। অতএব তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন।

অথবা যদি শক্তি থাকিয়াও তিনি দয়া না দেখান, তবে তিনি দয়াময় নহেন, তিনি উত্তম পুরুষও নহেন।

আস্তিক—ভাই নাস্তিক! তোমার কথায় আমি বড়ই ব্যথিত হইতেছি। তুমি মানুষভাবে ঈশ্বরকে বুঝিতে গিয়া যে ভয়ানক বিষ উদ্গীরণ করিতেছ তাহাতে তুমি জগতের অনিষ্টই করিতেছ। তোমার সঙ্গ—

নাস্তিক—সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু আমার নাস্তিকতা খণ্ডন কি তুমি করিতে পার?

আস্তিক—অত্যন্ত কষাঘাত না খাইলে তুমি ফিরিবে না।

নাস্তিক—তুমি ঠিক করিতেছ না। আমিই কি শুধু এই কথা বলিতেছি? চার্ব্বাক, বুদ্ধ সকলেই ত এই শিক্ষা দিয়াছেন।

আস্তিক—সেই জন্যই ত এই কর্ম্মভূমি ভারতে চার্ব্বাক-মতের এবং বৌদ্ধ নাস্তিকতার স্থান হয় নাই। ইহারা ভোগভূমিতে তাড়িত হইয়াছে।

নাস্তিক—তা হউক। তুমি কি ঐ সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে মানুষের বুদ্ধিগম্য বিচার দ্বারা আমাকে বুঝাইতে পার যে, নাস্তিকের অবিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আস্তিক—পারি, শ্রবণ কর। একজন প্রণয়ে আর একজনকে টাকা ধার দেয়। ক্রমে প্রণয় কিছু শীতল হইলে, প্রণয় যুড়াইয়া গেলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন টাকাটা চাহিল তখন একটা বিরোধ লাগিল। উভয় ব্যক্তিই একই প্রভুর ভৃত্য। প্রথম ব্যক্তি যখন প্রভুর কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তির নামে নালিশ করিল—বল দেখি তুমি যদি সেই প্রভু হও, তুমি কি করিবে?

নাস্তিক—সহজ উত্তর। সকলেই যাহা করে আমিও তাহাই করিব।

আস্তিক—সকলে কি করে?

নাস্তিক—প্রভু বলিবেন যখন টাকা ধার দিয়াছিলে তখন কি আমাকে জানাইয়া দিয়াছিলে? আমি ত শত শত বার বলিতেছি, যে যাহা করিবে আমাকে

জানাইয়া করিও। যদি না কর, তবে তজ্জন্য তোমরা আপন পাপে আপনি বদ্ধ হইবে এবং বিষম যাতনা পাইবে।

আস্তিক—শ্রীভগবান্‌ও সেই ভাবে সতত জীবকে বলিতেছেন—যাহা কর, যাহা ভাবনা কর, আমাকে জানাইয়া কর। যদি জ্ঞানভক্তি এখনও তুমি লাভ করিতে নাও পারিয়া থাক তথাপি বিশ্বাসে সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে উদ্ধার করিবই। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ"। "জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" শ্রীভগবান্ ত এই সমস্ত আশ্বাস বাক্য দিয়া রাখিয়াছেন, এখনও দিতেছেন; বল তোমার নাস্তিকতার স্থান কোথায়? তুমি বলিতেছিলে তিনি রক্ষা করেন না। পৃথিবীর বিপদ যখন যখন হয় তখন দুষ্টকে দমন করিয়া সাধুকে কে রক্ষা করে? ধ্রুব প্রহ্লাদকে কে রক্ষা করিয়াছিল, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ কে করিয়াছিল, তুমি আজ পর্য্যন্ত জীবনে যত কিছু কদর্য্য কার্য্য করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিয়া কে তোমায় এখনও জীবিত রাখিয়াছেন? ভাই! বৃথা বাক্যে ফল নাই। তুমি শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত ভক্তি-যোগ ও তাহার ব্যাখ্যা অগ্রে পড়িয়া আইস। পরে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তবে আবার কথাবার্ত্তা কওয়া যাইবে।

ভুলিয়া যাওয়া ভাল না নিত্য স্মরণ ভাল?

পতিপ্রাণা বিধবার বিস্মরণ প্রয়োজন না সর্ব্বদা স্মরণ প্রয়োজন?

ভুলে যাও। হাড় মাস চিন্তায় কি হইবে? ঈশ্বরচিন্তা কর শান্তি পাইবে।

ভুলিতে ত পারি না। জীবনের উজ্জ্বল সময়ে যাহা যাহা করিয়াছি তাহাই যে তাহার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। আমি যখন কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া থাকি তবে মনে হয় সে যেন আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে একান্ত ভালবাসিত। আমাকে কতবার একান্তে লইয়া একান্তের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিয়াছে। বায়ু স্পর্শ করিলে মনে হয় সেই স্পর্শ করিল। আকাশ দেখিয়া তাহাকে মনে হয়—অগ্নি দেখিয়া, সূর্য্য দেখিয়া, যেন সে তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া রহিয়াছে, মনে হয়—সে যে আমার শিখাইয়াছিল সূর্য্য, অগ্নি,

ভ্রূমধ্য, হৃদয়পদ্ম এই সকল স্থানে তাহাকে ধ্যান করিবে। আমি ভুলিব কিরূপে? সে যখন কোথাও যাইত, তখন আমি তাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম—কাহারও পায়ের শব্দ হইলে সে আসিল বলিয়া ছুটিয়া যাইতাম। এখন সে নাই, এখনও যে তাই হয়। আমি একা শুইয়া থাকি, মনে হয় সে কাছে শুইয়া আছে। ইহা যে নিত্যই হয়। বিছানা করিতে গেলেই মনে হয় সে শুইবে, তাই ভাল করিয়া শয্যা প্রস্তুত করি—আমার তখন মনে থাকে না যে সে নাই। আহার প্রস্তুত করিতে গেলেও তাই হয়। এই গৃহের প্রতি বস্তুতে সে মিশিয়া রহিয়াছে। আমার পরিচিত জগতের সর্ব্ব-বস্তুতে সে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাকে ভুলিব কিরূপে? তুমি বল হাড় মাস চিন্তা করিয়া কি হইবে? আমি বলি হাড় মাস কি? আকাশে, পর্ব্বতে, সমুদ্রে, পুষ্পে, বৃক্ষে প্রতিমাতে, বায়ুতে, বিদ্যুতে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, চন্দ্রে, তারায় ফেনায় সর্ব্বত্র মিশিয়া থাকিতে পারে? এত হাড় মাস নয়। হাড় মাস শ্মশানে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। এ যাহা আমি সর্ব্বত্র দেখি তাহা যে মনোময় মূর্ত্তি। ইহা ভুলিব কিরূপে?

আচ্ছা যদি ইহা হয় তবে তুমি ইহাই নিত্য স্মরণ কর। ভুলিও না।

তবে যে তত বড় সাধু আমায় বলিলেন—ঐ চিন্তা ভুলিয়া যাও। ঈশ্বর-চিন্তা কর। নতুবা গতি লাগিবে না?

তিনি জ্ঞানী পরমহংস। তিনি জ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন। জগতে সমস্ত নামরূপই মিথ্যা। এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য। তোমাকে একবারে সেই সত্য-ব্রহ্মে যাইতে বলিয়াছেন। তুমি কিন্তু জ্ঞানমার্গে সেখানে যাইতে পারিবে না। তোমাকে ভক্তিমার্গ ধরিয়া তথায় যাইতে হইবে।

জ্ঞানমার্গে সেখানে কিরূপে যাইতে হয়?

জ্ঞানপথটি বড় কঠিন। এক মাত্র বিচার অবলম্বনে সে পথে উঠা যায়।

জ্ঞানপথটি কি?

এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য। অন্য সমস্ত মিথ্যা। তুমি চেতন, তুমি জড় নহ। যিনি চেতন তিনিই আত্মা। তিনিই ব্রহ্ম। তোমার দেহ, তোমার মন—এই দুইই মিথ্যা। এক মাত্র সত্যস্বরূপ তোমাতে এই মিথ্যা মন, এই মিথ্যা দেহ ভাসিয়াছে। মরীচিকাতে যেমন জল ভাসে, রজ্জুতে যেমন সর্প ভাসে সেইরূপ। ফলে মরীচিকা ও রজ্জুই আছে—জল ও সর্প আদৌ নাই। মায়াই এক মাত্র

সত্যস্বরূপ চৈতন্যে এই মিথ্যা তরঙ্গ তুলিয়াছে। জ্ঞানী এই মিথ্যাকে বিচার দ্বারা মিথ্যা জানিয়া—মিথ্যার আত্যন্তিক অভাব জানিয়া মিথ্যা মুছিয়া সত্যস্বরূপে অবস্থান করেন। জগৎও নাই, জগতের কোন কিছুই নাই। একমাত্র সত্যস্বরূপ চৈতন্যই আছেন। আর কিছুই নাই। ইহা বিচার দ্বারা অনুভব করিয়া জ্ঞানী আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করেন। তুমি যেমন সুষুপ্তিকালে সব ভুলিয়া আপনি আপনি থাক সেইরূপ। এই স্থিতিলাভ করিলেই জীবন্মুক্তি হয়।

এই স্থিতি কি আমার পক্ষে অসম্ভব?

সম্ভব কি অসম্ভব তুমি আপনি ঠিক কর। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি; শুনিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে তোমার পক্ষে ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব কি অসম্ভব।

কি বল।

তুমি যখন নৌকা করিয়া কোথাও যাও—নৌকা তীরবেগে যখন চলে, তখন তুমি তীরতরুকে কিরূপ অবস্থায় দেখ?'

দেখি তীরতরু ছুটিতেছে।

সত্যই কি তীরতরু ছুটিতে থাকে?

না। তা ত ছুটে না। তরু এক স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকে মনে হয় যেন ছুটিতেছে।

হাঁ। তীরতরু কোথাও যায় না। মনে হয় ছুটিতেছে। কিন্তু ইহা মিথ্যা। তুমি সত্য কথাটি জান তথাপি মিথ্যা ব্যাপারটি মন হইতে তাড়াইতে পার না। সেইরূপ গতিশীল জগৎটি মিথ্যা। এই মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া যখন তুমি ইহা নাই নিশ্চয় করিয়া কিছুই আর দেখিবে না, তখন তুমি জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিবার উপযুক্ত হইবে।

ইহা কি পারিবে?

ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তবে কি করিব?

নিরোধ সমাধি ভিন্ন জ্ঞানে স্থিতি হইবে না। নিরোধ না পার, একাগ্র হইতে অভ্যাস কর। স্বামীবিয়োগে তোমার একাগ্রতা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। তোমার চিত্ত সর্ব্বত্র স্বামীর ভাবনা ভাবিতে পারিতেছে।

ইহাতে কি ঈশ্বর-ভাবনা হইবে?

হাঁ হইবে। একটু মিলাইয়া লইতে হইবে।

কিরূপে ?

হিন্দুমহিলার পতিনারায়ণ ব্রতই ইহা।

আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। শাস্ত্রযুক্তি দিয়া বুঝাইতে হইবে।

শোন। তুমি যাহাকে স্বামী বলিতে, তাহা জড় নহে তাহা চেতন। তাহা দেহ নহে আত্মা। দেহটা জড়, সেটা ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এখন যে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, খেলা করিতেছে তুমি যে মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতেছ তাহাও দেহ বটে, কিন্তু স্থূলদেহ নহে ইহা লিঙ্গদেহ; ইহা ভাবনাময় দেহ। ইহা আতিবাহিক দেহ। ইহা চিত্তশরীর। এই চিত্তশরীর ব্রহ্মে মিশিয়া গেলেই তুমি জ্ঞানময়ে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে।

ইহাকে তাঁহাতে মিশাইবার যে কৌশল সেই কৌশলটি জানিয়া সর্ব্বদা তাহার অভ্যাস করিতে পারিলেই তোমার ভক্তিমার্গের সাধনা শেষ হইবে।

কিরূপে মিলাইতে হইবে তাহাই বল।

চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। জড় যাহা তাহা একটা মায়ার ইন্দ্রজাল। কাজেই দেহটা গেলেও চৈতন্যের কোন অনিষ্ট হয় না। এই চৈতন্য জড়ের উপর অভিমান করেন বলিয়া তিনিই বহুরূপে বহুনামে অভিহিত হয়েন। জগতে একমুহূর্ত্তে যত শব্দ উত্থিত হইতেছে, তাহা সেই একমাত্র চেতনপুরুষের সহস্রমুখের কথা মাত্র। তোমার মনে যে শত সহস্র সঙ্কল্প উঠিতেছে তাহাও সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষের বাক্য মাত্র। কাজেই যে মৃতস্বামীর স্মৃতি তুমি চিন্তা কর তাহা সেই পরমপুরুষেরই এক মূর্ত্তি বটে। স্থূলদেহ নাশ হইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। এখন তিনি তোমার অন্তরে অতিবাহিক দেহে—ভাবনাময় দেহে বা চিত্ত শরীরে খেলা করিতেছেন। ইহা তোমার বড়ই সুযোগের সময়। তুমি তোমার সহিত তাঁহার জড়দেহ অবলম্বনের লীলা নিত্য স্মরণ করিতে থাকে। তোমার চিত্ত ত তাঁহাকে চিন্তা করিতেই রস পায়। কিন্তু তাঁহার স্থূলদেহ ধারণের সময় অসংযমী হইয়া তোমরা বহু ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর কোন ব্যভিচার নাই। এখন তুমি শান্তমনে রিপুইন্দ্রিয় শান্ত করিয়া একমাত্র স্বামীকেই চিন্তা কর। এই যে হৃদয়ে স্বামীকে আতিবাহিক দেহে চিন্তা কর সেইরূপে তাঁহাকে শ্রীভগবানের দেহে প্রবেশ করাইয়া স্বামীমূর্ত্তি যে ভগবানের মূর্ত্তি তাহা ভাবনা কর। আর ইহাও সত্য, যে চেতনপুরুষের তুমি উপাসনা কর তিনি সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপীত্বই তাঁহার

স্বরূপ। কেবল তোমার চিন্তানুসারে তিনি তোমায় স্বামীমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া তুমি ভাবনা করিও—তুমি যাঁহাকে হৃদয়ে পূজা কর, তিনিই কিন্তু সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনিই পুরুষে স্ত্রীতে, কুমারে কুমারীতে, যুবাতে বৃদ্ধে, সর্ব্বজীবের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হইয়া তিনিই আছেন। তিনিই অগ্নিতে, তিনিই সূর্য্যে, তিনিই বিদ্যুতে, তিনিই আকাশে, তিনিই তারায়, তিনিই চন্দ্রে, তিনিই আলোকে, তিনিই অন্ধকারে, তিনিই বায়ুতে, তিনিই সমুদ্রে নদীতে, তিনিই সর্ব্বস্থানের জলে, তিনিই বৃক্ষলতা, মণিকাঞ্চন সর্ব্বপদার্থে সর্ব্বজীবে। হৃদয়ের রাজা যিনি তিনিই জলেস্থলে অন্তরীক্ষে। এই ভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার ভাবনা কর। আবার যখন আপন হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি ভাবনা করিবে, তখন তাঁহাতেই সমস্ত দেবতা, সমস্ত দেবী, সমস্ত ভূত, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, ভাবনা কর। মানসে তাঁহার পূজা কর, মালা পরাও, সাজসজ্জা কর, তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত কর, তাঁহার জন্য বিবিধ আহার প্রস্তুত কর। তাঁহার সহিত সর্ব্বদা কথা কও। প্রতি ভাবনাতে, প্রতি বাক্য উচ্চারণে, প্রতি দৈহিক ব্যাপারে সমস্ত মানসিক বাচিক দৈহিক-কর্ম্মে তাঁহাকে উগ্রভাবে স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া, সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাক। লক্ষ্য রাখিও তাঁহাকে গোপন করিয়া যেন কিছু না হয়। ইহাই শ্রীভগবান-স্বামীতে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। প্রথমেই সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করিতে তোমার মনে থাকিবে না। এই জন্য, তিনবেলা আহ্নিককালে সমস্ত ভাবনা সঙ্গে বৈদিক কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর। আবার প্রতি ব্যবহারিক কার্য্যকালে নাম জপ কর, করিয়া সমস্ত ভাবনা, সমস্ত বাক্য, সমস্ত কায়িক কার্য্য তাঁহাতে অর্পণ কর। কোন কিছু,—স্নান, আহার, শয়ন, নিদ্রা, আলাপ কোন কিছু যেন তাঁহাকে না ভুলিয়া হয়। ইহাতেই তোমার পতিনারায়ণ ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। অধিক কি।

কালীকৃষ্ণ নষ্টামি তোর বুঝেছি মা'সব কারসাজি,
গিরিরাজার বেটী তুমি জান কত ভোজের বাজী॥
কভু পতি হৃৎসরোজে, জিব্ কেটে মা দাঁড়াও লাজে,
কভু বৃন্দাবনমাঝে তুমি গোধন চরাও গোপাল সাজি॥
কভু অযোধ্যামণ্ডলে, সহস্রদলপত্রতলে,
পতিসনে কুতূহলে, থাক বিন্দুরূপে সাজি।
নিগু‍র্ণ নিরবয়ব, সগুণে ধর রূপ সব
কভু শিব কভু কেশব হয়ে তোষ ভক্তরাজী ;—
শ্যামা কি শিব কেশব যেরূপে বাসনা তব,
সেইরূপে হও আবির্ভাব, দ্বিজ শশধর তাতেই রাজী।

চিতারোহণ কালে—শেষ দর্শনে।

১

কেন ধর ? ধরিও না। যেতে দাও এখন।
একবার দেখে আসি জন্মের মতন॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আমি গেলাম যখন।
দেখিনু বসনে ঢাকি করিছে বন্ধন॥
হাহাকার করি আমি করিনু বারণ।
সংসার পারেনি ওঁরে করিতে বন্ধন॥
কঠিন মায়ার বাঁধ কেটেছে যে জন।
কেন আর মিছা তাঁরে করিছ বন্ধন॥

২

ও যে খালি বাঁধা ছিল মহামায়ী সনে।
আপনি যাইছে তাই মাতৃ-দরশনে॥
ফিরিয়া আসিয়া আমি পড়িনু ধরায়।
আঁধার আঁধার সব সব শূন্য-প্রায়॥
কে যেন তখন আসি কহে মম কাণে।
চেয়ে দেখ ভাই! তব সন্তানের পানে॥
নয়ন খুলিয়া আমি যা দেখিনু হয়।
বলিতে পারিনি তাহা বুক ফেটে যায়॥

৩

স্থির নেত্রে চেয়ে বাছা না বহে নিশ্বাস।
দেখিয়া বসিনু আমি হইয়া হতাশ॥
তাড়াতাড়ি জল আমি দিনু তার মুখে।
"কোথা গেল বাবা" ব'লে রৈল অধোমুখে॥
আঁখি মুদে করি তারে বুকের ভিতর।
পড়িয়া রহিনু আমি ধরার উপর॥
অহো কিছুতেই প্রাণ নাহি রহে স্থির।
স্মৃতি তুলে সব কথা করয়ে অধীর॥

৪

শোয়ায়োনা শোয়ায়োনা চিতার উপরে।
এখনও অনেক কাজ বাকী এ সংসারে॥
অজ্ঞান বালক ওঁর খেলিছে কোথায়।
এখনি ছুটিয়া সে-যে আসিবে হেথায়॥
বাবা কোথা ব'লে মোরে শুধাবে যখন।
কি বলিয়া নিবারিব তাহার রোদন॥
কি বলিয়া ভুলাইব সেই স্মৃতি তার।
এ চিতায় শেষ কিরে হ'বে হাহাকার॥

৫

না না তুলিও না ওঁরে চিতার উপরে।
আরও এক জন ওঁর আছে এ সংসারে॥
আমি একা শুধু আজ নহি অনাথিনী।
আমারি মতন সেও আজ অভাগিনী॥
শোয়ায়োনা শোয়ায়োনা চিতার উপরে।
এখনও অনেক কাজ আছে এ সংসারে॥
দশের জনক! শুধু নয়ত দশের।
পাঁচটি তনয়া ওঁর হ'য়েছে পরের॥
নিদারুণ বার্ত্তা তারা স'বে কোন্ প্রাণে।
কেমনে ও দেহ হায়! পোড়াবে আগুনে।

৬

মিনতি বচন কেহ শুনিল না কাণে।
তুলিল সে দেব-দেহ ভীষণ আগুনে॥
আমার সৌভাগ্য সুখ চিরদিন-তরে।
ওই দেখ পুড়িতেছে চিতার উপরে॥
মান অপমান আর মনুষ্যত্ব জ্ঞান।
সকলি পুড়িছে ওই—দেখ বিগুমান॥
দেখ সব বন্ধুজন, দেখ দেখ ভাই।
নিমেষের মধ্যে পুড়ে হ'ল শুধু ছাই॥

ওহো-হো আমার প্রাণ বড়ই কঠিন।
এখনও বাঁচিয়া তুমি রবে কত দিন ॥

৭

ফুরায়েছে সুখ তব আজি রাজরাণি!
ত্যজি ও সধবা বেশ সাজ ভিখারিণী ॥
ম্লান করি সীমন্তের মুছিয়া সিন্দূর।
সুবর্ণের অলঙ্কার কর সব দূর ॥
ম'রেছে যে জন সে ত পুড়েছে চিতায়।
আদরে আনন্দময়ী কোলে নেছে তায় ॥
তোমারি হইবে এবে পরীক্ষা ভীষণ।
সংসার-অনলে চিত্ত হইবে দহন ॥
গিয়াছে তোমার পতি সব হয় লীন।
ভাস অশ্রুজলে তুমি হওরে মলিন ॥

৮

নহিরে বিধবা! পতি মরে কি কখন?
মরে কি দেবতা? শুধু হ'লে অদর্শন?
আমার দেবতা আজ ছাড়ি নর-দেহ।
মিলেছেন নারায়ণে তবু একি মোহ ॥
স্থির কর চিত্ত প্রভু! দেব নারায়ণ।
পতি-নারায়ণ ব্রত হ'ক উদ্‌যাপন ॥
নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে আমি সেবিব তাঁহায়।
পরীক্ষার অন্তে লীন হ'ব তাঁর পায় ॥

——(গিরিডি)।

প্রবোধের স্মৃতি।

কাকা! যখন আস্‌তেন তখন এইখানে দাঁড়িয়ে ডাক্‌তেন "খুঁকিরে"! আর কে তেমন্ ক'রে ডাক্‌বে কাকা?

কেঁদোনা মা! এখনও সে প্রেত অবস্থায় আছে, চক্ষের জলে তার ক্লেশ বৃদ্ধি হয়।

না কাকা! আমি আর কাঁদবো না। কিন্তু—

মা! এ কিন্তুর আর শেষ নাই। আমি তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি তোমার কাকাকে আবার তোমার কাছে আন্‌তে চাও, না তার কাছে যেতে যাও।

না কাকা! আর আন্‌তে চাই না। বড় দুঃখময় এই সংসার। কাকা! নিরবধি এখানে দাগা খাইতে হয়। বড় যাতনা এখানে! তুমি একবার দেখ দেখি আর কে রইল? সব গিয়াছে। তোমার দিকে চাইলেও স্থির থাকিতে পারি না। কাকা! কত যাতনা তিনি ভোগ করিলেন। অথচ জীবন তাঁর কত নির্ম্মল! তিনি ব্রহ্মচারী। এই কালে তেমন নিষ্কলঙ্ক, তেমন পবিত্র সাধুচরিত্র আর কোথায় দেখিতে পাই কাকা! আমি কাঁদিব না। কিন্তু আমার প্রাণ নিতান্ত অস্থির হইতেছে। কাকা সে দিন বড় অস্থির হইয়াছিলাম। রোগের কথা, যাতনার কথা, পবিত্রতার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নে যাহা দেখিলাম—

কি দেখিলে?

কাকা! কাকা আমার বড় শুদ্ধ ছিলেন। যতক্ষণ সামর্থ ছিল ততক্ষণ কিছুতেই অপরিষ্কার হইলেন না। কিন্তু হায়! আর ত শেষে কিছুই রহিল না। সেই অবস্থাতেও তাঁর অন্তর্ব্বাসে যখন হাত দিতে গিয়াছিলাম, তখন কত বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। কাকা! তখনও তিনি আশা করিয়াছিলেন— ভাল হইয়া আবার সেই মালা, সেই বহির্ব্বাস, সেই পুস্তক সমস্তই ব্যবহার করিবেন। আজ তাঁর ব্যবহারের বস্তু কার হাতে যায় কাকা! আজ সে সব কাহাকে বিলাইয়া দিতে হয়। কতই বাঁচিতে সাধ ছিল। যে হরিদ্বার হইতে দারুণ ব্যাধি আনিলেন—সেই হরিদ্বারে আবার যাইবার জন্য কত সাধ ছিল। কাকা! এই আশা নিরাশার সংগ্রাম মানুষের হৃদয়ে কেন হয়?

কেন হয় বলিতেছি। কিন্তু স্বপ্নে কি দেখিলে?

স্বপ্নে দেখিলাম কাকা এক অতি সুন্দর স্থানে গিয়াছেন। চারিদিকে ফুলের গাছ। গাছে গাছে কত ফুল ফুটিয়া গন্ধে স্থানটিকে কত রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অদূরে চন্দ্রকলার আকারে গঙ্গা কুল কুল করিয়া কোন সীমা-শূন্য স্থানে যেন ছুটিয়াছে। কাকা আমার পুষ্পবৃক্ষ বেষ্টিত হইয়া অতি উজ্জ্বল মণিবেদিকায় বসিয়া আছেন। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন কাঁদিস্ কেন, দেখ দেখি আমি কত সুখে আছি।

দেহত্যাগের সময় যে কষ্ট পাইয়া আসিলাম তাহা ত দেখিয়াছিস্। কি হইয়া গিয়াছিলাম। বল আর পাইলাম না। পাশ ফিরিতে পারিলাম না। সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিতে থাকিতে পার্শ্বে ঘা হইয়া গেল। সর্ব্বদা অশুচি মধ্যে থাকিতাম। শুইয়া শুইয়া আর যেন শুইয়া থাকিতে পারিতাম না। কত কাতর হইয়া বলিতাম একবার আমায় উঠাইয়া বসাইয়া দাও। হায়! কত কষ্ট করিয়া যদি বসাইয়া দিত, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইত প্রাণ বুঝি গেল। তৎক্ষণাৎ বলিতাম শুইয়াই দাও। সর্ব্বদা গাত্রদাহ হইত। সর্ব্বদা পিপাসায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। কত ঠাণ্ডা দ্রব্য আনিয়া দিত, কিছুতেই পিপাসা নিবৃত্তি হইত না। কত যাতনা—আমি যতদূর পারিতাম সহ্য করিতাম—যখন পারিতাম না তখন ভিতরে কত কাঁদিতাম। নীরব রোদন—চক্ষুজলে প্রকাশ হইত। সেই অকথ্য যাতনা আর এই সীমাশূন্য সুখ। দেখ্ দেখি কত মনোরম স্থান। আমি পার্থিব জীবনে বেশী তপস্যা করিতে পারি নাই, কিন্তু মন আমার পৃথিবীর কোন কিছুই চাহিত না। সর্ব্বদা ঠাকুরকে কিরূপে পাইব এই জন্য অস্থির থাকিত। তার জন্যই আমি তীর্থে তীর্থে কত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। সকল সময়ে বাড়ী হইতে ঠিক সময়ে টাকা পাইতাম না। যেখানে সেখানে সেই মোটা গামছা পাতিয়া পড়িয়া থাকিতাম। মন আমার কখন কলুষিত হয় নাই। তাই দেখ্ আমার অতি অসময়ে গীতা, রামায়ণ, শ্রীভগবানের নাম আমায় শুনান হইল। এখন আমার সুখ দেখ। শাস্ত্রবাক্য একটিও মিথ্যা নহে।

আমি এখন যেখানে আছি সেখানে আরও কে আছে দেখ্‌বি। আয় আমার সঙ্গে।

আমি কাকার সঙ্গে চলিলাম। আহা কি সুন্দর দেশ! কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর পুষ্পবাটিকা। কাকা আমার নিকটে আসিলেন! আহা! মৃত্যু-

সময়ে মুখে বড়ই দুর্গন্ধ হইয়াছিল—আর এখন! সর্ব্বশরীর হইতে কি সুমধুর গন্ধ বাহির হইতেছে। মনপ্রাণ যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কাকা আমাকে যাহা দেখাইলেন তাহাতে আমি আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না। দেখিলাম সুন্দর অতি বিস্তীর্ণ এক বৃক্ষ। তাহার মূলে রত্নবেদিকা। রত্নবেদিকার উপরে এক পুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট। কাকা গিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কাকা বলিলেন এই পুরুষ সর্ব্বদা আমার ও তোমার ইষ্টমন্ত্র জপ করেন। ইঁহার উপাসনা প্রথমে না করিলে আমাদের ইষ্টদেবতাকে পাওয়া যায় না। আহা কি সুন্দর মূর্ত্তি! কত শান্ত, কত আনন্দময়! কাকা তাঁহাকে কি বলিলেন—তিনি সুন্দর এক কনকভবন দেখাইয়া দিলেন। আমি কাকার সঙ্গে কনকভবনে গিয়াছি——মন্দিরের পরদা উঠিয়া গেল। আমার পরিচিত—যাহারা কাকার পূর্ব্বে গিয়াছে তাহারা কত বিচিত্র পুষ্প, বিচিত্র মালা লইয়া পূজার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইঁহারা ৺কাশীলাভ করিয়াছিল। আমি তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ঠাকুরমাকে প্রণাম করিলাম। তাঁহারা কাকাকে নিকটে আনিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন। কেহ কোন কথা কহিল না। আমি কাকার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতেছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন আমি মানসপূজায় ধারণাভ্যাসী পর্য্যন্ত হইয়াছিলাম; তাই এখানে আসিয়াছি। ইহা সন্তানক লোক। ব্রহ্মলোকের উপরে ইহা। যতদিন সংসারে আছ প্রারব্ধ ভোগ কর আর ধারণাভ্যাসী হও। এখানে আসিতে পারিবে। কাকা এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম আমার ইষ্টদেবতার অঙ্গে সকলে মিলাইয়া গেল। আমি যেমন ব্যাকুল হইলাম অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কাকা এ সব কি সত্য।

হাঁ সমস্তই সত্য। বিশ্বাস কর,—করিয়া ধারণাভ্যাসী হও; অন্তে ঐ লোকে যাইতে পারিবে। গতজীবনে যাহা করিয়াছ তাহা ভাবিও না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইও না। উপস্থিত সময় কিছুতেই অপব্যয় করিও না। স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখিয়াছ তাহাই মানসপূজায় মিশাইয়া, তিনসন্ধ্যায় আপন কাজ কর এবং সর্ব্বদা প্রার্থনা, প্রণাম, প্রদক্ষিণসহ নাম জপ কর। শোক করিয়া কি হইবে। কেহ মরে না জানিও। ভাল লোক ভাল স্থানে যায়, মন্দ লোক নরকে যায়। শোক কেবল বৈরাগ্য জন্মাবার জন্য। বৈরাগ্য না

জন্মিলে ভক্তি বা জ্ঞান কখন স্থায়ী হয় না, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা নাম জপ কর, সব মিলিবে।

অশ্বল ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সম্ভোগ সুখে এবং পারত্রিক স্বর্গীয় সুখে যাহার চিত্ত বিরক্ত হইয়াছে, এবং শম (অন্তঃকরণ নিগ্রহ), দম (বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ), উপরতি (উপদিষ্ট আত্ম-বিষয়ের প্রতিকূল বিষয় হইতে চিত্তের বিরতি) সমাধান (একাগ্রতা) এবং শ্রদ্ধা এতৎসমুদয় দ্বারা যাহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং যিনি প্রণিহিত মনে বিচার করিয়া বুঝিয়াছেন যে, আমি দেহইন্দ্রিয় প্রভৃতি বন্ধনে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ, আমাকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তাঁহারই বেদান্ত বিদ্যা গ্রহণে-মুখ্য অধিকার হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মচারি-মাত্রেরও বেদান্ত অধ্যয়ন শাস্ত্র-বিহিত।

মনু বলেন—তপো বিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যোদ্বিজন্মনা॥ (২।১৬৫)

অর্থাৎ—বিবিধ শাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মচারী প্রতিপালনীয় তপস্যা এবং নানাবিধ ব্রত সম্পন্ন দ্বিজাতি ব্রহ্মচারী রহস্য উপনিষদ্ বিদ্যার সহিত সমগ্র বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে।

সুতরাং মুখ্যভাবে তোমার বেদান্ত-অধিকার না হইয়া থাকিলেও শ্রবণে তোমার অধিকার আছে। এই সাধারণ অধিকার লইয়াই তোমাকে আজ উপ-নিষদ্বিদ্যার উপদেশ করিব মনে করিয়াছি।

ব্রহ্ম] ভগবন্! তবে কখন্ আমার সেই মুখ্য অধিকার লাভ হইবে?

আচার্য্য] বৎস! আমি তোমাকে বেদান্ত-বিদ্যায় মুখ্য অধিকার লাভের ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর।

বৎস! বহুজন্মার্জ্জিত সংস্কার-পরম্পরায় জীব-হৃদয় পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে জীবের স্পৃহণীয় নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের অনুকূল সংস্কার-মালা ধর্ম্ম নামে এবং তৎপ্রতিকূল সংস্কার-মালা অধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। এই দেহ, এই জগৎ

ইহা অনিত্য, ইহা অশুচি, ইহা দুঃখে পরিপূর্ণ; কিন্তু অজ্ঞান-জনিত এই অধর্ম্ম স্বীয় আবরণ শক্তি দ্বারা এই তত্ত্ব আবরণ করিয়া জীবকে বুঝাইয়া দেয় —ইহা নিত্য, ইহা বড় পবিত্র, ইহা বড় সুখময়। মানবের চিত্ত সত্ত্বপ্রধান, কিন্তু তথাপি অধর্ম্ম আপন মলিনতায় ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া মলিন করে।

বৎস! প্রত্যেক জীবই তোমার মত এইরূপ মলিনীকৃত এক একটি চিত্ত লইয়া সংসারে আসিয়াছে। এই অবিদ্যা-বিলসিত অধর্ম্ম বা এই মলিনতা অতিক্রমের একরূপ ক্রম আছে। সোপানপরম্পরা সাহায্যে সৌধ-আরোহণের ন্যায় এই ক্রমপরম্পরা দ্বারা মানবের ধর্ম্মরাজ্যে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। এই ক্রমপরম্পরা লইয়াই ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের ক্রমিক অনুষ্ঠানে. ক্রমিক সত্ত্বশুদ্ধিকর ধর্ম্ম সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং যে পরিমাণ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে থাকে তৎপরিমাণ অধর্ম্ম অপসৃত হয়। এবং তৎ-পরিমিত ধর্ম্মের বা সত্ত্বগুণের প্রকাশে ক্রমে ক্রমে অধিকারীর বিশুদ্ধ-মানস প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়; তখন জীব এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা দেহাদি যে অনিত্য, অশুচি এবং দুঃখস্বরূপ তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। এই নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হইতেই দেহাদি-বিষয়ে বৈরাগ্য উদিত হয়। বৈরাগ্যের উদয় হইলে দেহ ও সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তৎপর কি উপায়ে ইহা পরিত্যাগ করিব অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার ফলে শাস্ত্র-বাক্য ও গুরুবাক্য হইতে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়; তৎপর এই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। ইহাই বেদান্ত জিজ্ঞাসা লাভের ক্রম। পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র শারীরক ভাষ্যের টীকায় (৩।৪।২৬ সূঃ) এই ক্রমের উদাহরণ করিয়াছেন।

যাহা হউক. এখন তুমি তোমার বর্ত্তমান অধিকার বুঝিয়া লও।

উৎকৃষ্ট কাল দেশ ও পাত্রের সাময়িক সম্পর্কজাত চিত্তের সাময়িক উৎকর্ষ লইয়া অধিকার আলোচনা করা সম্মত নহে; কারণ উহা চিত্তের স্থায়িভাব নহে সঞ্চারি ভাব। প্রধানতঃ যে অবস্থা লইয়া. যাহার চিত্ত অধিক সময় যাপন করে, তাহাই লইয়া এবং ধর্ম্মের ফলীভূত বিশুদ্ধমানস প্রত্যক্ষ ও অনুমানের তারতম্য লইয়াই অধিকার আলোচিত হয়। বৎস! তুমি এই সৎকথা ও আমার সামীপ্যবশতঃ সাময়িক যে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছ, উহাই দেখিয়া তোমার স্থায়ী অধিকার নির্ব্বাচিত হইতে পারে না, বা তুমি যদি ভক্তের বা

জ্ঞানীর কথাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ঐ দুষ্পাচ্য তত্ত্ব-সমূহ উদ্গিরণ করিতে অভ্যস্ত হও, তাহাও তোমার উন্নত-অধিকারের পরিচায়ক নহে। জাতপক্ষ বিহঙ্গ-যেমন মাতৃকুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যে প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ অনুমান ও ধ্যানাভ্যাস বশতঃ আত্মীকৃত না হইয়াছে, তাহাও কিছুদিন জীবের কণ্ঠ-কুলায়ে বাস করিয়া চলিয়া যায়; তাহা আপনার নহে পরের। বর্ত্তমান-সময়ে লোক, পরের জ্ঞান ভাড়া করিয়া জ্ঞানীনাম গ্রহণ করে, গৈরিক দ্বারা বেদান্ত অধিকার সূচনা করে। ইহা যদৃচ্ছাচার, তুমি এরূপ যদৃচ্ছাচারী হইও না; আমি তোমার অধিকার প্রদর্শন করিতেছি। তুমি এখন ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন এখন তোমার পরম তপস্যা। মনু বলেন—

বেদমেব সদাঽভ্যস্যেৎ তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তম।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥

(মনু—২।১৬৬)

এই তপস্যা, প্রণব, মহাব্যাহৃতি-ভূষিতা গায়ত্রীর নিয়মিত জপ এবং সর্ব্বদা প্রণব-পিঞ্জরবাসিনী জগদম্বার প্রীতির জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাক। যিনি পঞ্চপ্রাণের সহিত সূর্য্য আদি পঞ্চদেবতাকে দৌবারিক করিয়া হৃদয়-রাজ্যে কমলাসনে রাজরাজেশ্বরী হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই প্রীতির জন্য তুমি অশন, বসন, শয়ন, গমন, বেদ-পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতে থাক, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মরূপী অধর্ম্ম তোমার হৃদয়ের উপরে যে জবনিকা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সরাইতে সরাইতে স্বয়ং অপসৃত হইবে। হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে এবং তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ-মানস প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞান গায়ত্রীর অঙ্গজ্যোতিরূপে নির্গতহইবে। তোমার উন্নত অধিকার লাভ হইবে। প্রবাসাগত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা * শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহা মূত্র ফল-ভোগ বৈরাগ্য তোমাকে উপহার দিবেন, তাহারই নির্দ্দেশে তুমি মুমুক্ষু হইবে।

বৎস! ব্রহ্মচর্য্য, সন্ধ্যাবন্দনা, বেদ পাঠ ইত্যাদি প্রণিহিত মনে সেবিত হইলে, ইহারাই দূতের মত আত্ম-বিদ্যার সংবাদ আনয়ন করে। এইরূপ ত্রিভুবন ললাম-ভূমা আত্ম-বিদ্যার অলোকসামান্য সুষমা শ্রবণ করিতে করিতে পক্ষান্তরে

* সালম্বন-সমাধিতে অভ্যস্ত হৃদয় যে জ্ঞান-প্রসাদ লাভ করেন, তাহাকেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলে।

আপনাকে অবিদ্যা-রাক্ষসীর করালগ্রাসে পতিত চিন্তা করিতে করিতে লোক জ্বলিত-মস্তিষ্ক হয়, তখন তাহার হৃদয়ে বেদান্ত-জিজ্ঞাসা উদিত হয়েন। সুতরাং বৎস! তুমি পূর্ব্বোক্তরূপে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুশীলন করিতে থাক-- আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার শ্রেয়োলাভ ঘটিবে! অপাততঃ আমি তোমাকে উপনিষদ্-বিদ্যা মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডের অশ্বল ব্রাহ্মণ বলিতে আরম্ভ করিব।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আমি আপনার অজ্ঞান সন্তান, সুতরাং আমি অজ্ঞানেরই মত জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই বিদ্যার নাম উপনিষদ্ কেন? বৃহদারণ্যক এই নামেরই বা অর্থ কি? উপনিষদের যে অংশ বলিতেছেন—যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত বলিয়াই বোধ হয় উহা যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড নামে অভিহিত, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ও অশ্বল কে? আর কোন্ ক্ষেত্রেই বা ইহা উপদিষ্ট হইয়াছিল?

আচার্য্য] বৎস! অবিদ্যা-কূপে নিমগ্ন আত্মাকে অদ্বয় ব্রহ্মভাবে উপনীত করিয়া যে বিদ্যা, অবিদ্যা ও তজ্জনিত জগৎপ্রপঞ্চ নষ্ট করে, তাহাই উপনিষদ্-বিদ্যা; বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বলেন—

উপনীয়েমমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ।
নিহন্ত্য বিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ ভবেৎ॥

ইহাই উপনিষৎ শব্দের অর্থ! বক্তব্য উপনিষৎ বৃহদারণ্যক নামে অভিহিত হইবার কারণ ইহা পরিমাণতঃ অন্য উপনিষদ্ অপেক্ষা প্রাঞ্জল, এইজন্য ইহা বৃহৎ এবং অরণ্যে ইহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত, এইজন্য ইহা আরণ্যক।

তদ্ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডরূপে পরিচিত হইবার কারণ এই—ইহা যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক প্রণীত; কিন্তু বৎস! মনে রাখিও, প্রণীত অর্থে মহাভারত অথবা কুমারসম্ভবাদির মত ইহা কাহারও কৃত নহে; পরন্তু, যাজ্ঞবল্ক্য সমাহিত হৃদয়ে অপরোক্ষরূপে যে উপনিষদ্-বিদ্যার সাক্ষাৎকর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শুশ্রূষু ঋষিগণের নিকটে প্রকৃষ্টরূপে (অর্থাৎ শ্রোতার হৃদয়স্থিত রাগদ্বেষাদি মল অপসারণ করিয়া, ইহা নীত হইয়াছিল, এইজন্য ইহা যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত বলা যাইতে পারে। প্রণীত শব্দের এই অর্থ আমার স্ব-প্রতিভায় উদ্ভাবিত নহে। বেদান্ত-কল্পতরু নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অমলানন্দ শারীরক সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রের ভামতী ব্যাখ্যায় প্রণয়ন শব্দের এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক অতঃপর আমি তোমাকে যাজ্ঞবল্ক্য ও অশ্বলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলিয়া, যে স্থানে এই উপনিষদের অনুবচন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর—

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম ঋষিসমাজে সুবিদিত। এই মহাপুরুষ মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য। বৈশম্পায়নের অনুমতিক্রমে এই মহাপুরুষ তৎপ্রদত্ত যজুর্ব্বেদ উদ্গিগরণ করিয়া পুনরায় তপঃপ্রসাদিত ভগবান্ সূর্য্যদেবের নিকটে অপর যজুর্ব্বেদ লাভ করেন। এই যজুর্ব্বেদ শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতা নামে ও মাধ্যন্দিনীয় সংহিতা নামে সুপ্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন উপনিষদ্‌বিদ্যারও অধিকাংশ মূর্ত্তি যাজ্ঞবল্ক্য দৃষ্ট। ফলে কি মন্ত্রবিদ্যা কি উপনিষদ্-বিদ্যা সর্ব্ব এই যাজ্ঞবল্ক্যের অপ্রতিহত প্রভাব, বিশেষতঃ শুক্ল-যজুঃসংহিতা বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থানীয় হইয়া এই মহাপুরুষের উৎকর্ষাতিশয় জ্ঞাপন করিতেছে। ইহাই যাজ্ঞবল্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মহর্ষি অশ্বল, রাজর্ষি জনকের যজ্ঞের হোতৃনামক (ঋগ্‌বেদজ্ঞ) ঋত্বিক্। বৎস! আপাততঃ এই পর্য্যন্তই তুমি জানিয়া রাখ, পরে উপনিষদালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ইহাদের জ্ঞানগরিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বৎস! এখন তোমার জিজ্ঞাসিত শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর—

মিথিলাধিপতি জনকের বিস্তীর্ণ যজ্ঞবাটিকা। রাজর্ষি বৎসরাধিককাল পূর্ব্বেই যজ্ঞকার্য্যকুশল ধার্ম্মিক প্রাচীন স্থপতি ও শিল্পিগণ দ্বারা এই যজ্ঞ-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে নানরূপ কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথমতঃ যজ্ঞবাটিকার চারিদিকে বেষ্টনরূপে লতাকুঞ্জ ও বিচিত্র তোরণ বিভূষিত পুষ্পোদ্যান। তন্মধ্যে চতুষ্পার্শ্বব্যাপিনী বিচিত্র সৌধমালা। এক পার্শ্বে ঋষিগণের জন্য ফলপুষ্প সমলঙ্কৃত সুরম্য বহু আশ্রম। এই আশ্রম সমূহ ঋষি-কুলোচিত উপকরণ-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানাদিগাগত মিত্র ও সামন্ত রাজ-গণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৌধাগার রাজ-ভোগ্য বিবিধ উপকরণে ও খাদ্য দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন সাধারণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ধার্ম্মিক শূদ্রগণের যথাযোগ্য আবাসগৃহ উপকল্পিত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যজ্ঞদর্শনার্থী পৌর ও জানপদগণের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন স্থান ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। এইরূপ পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত বিস্তীর্ণ যজ্ঞ বাটিকায় যথাসময়ে যজ্ঞভূমিতে ঋষিগণ, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ, রাজর্ষি-কুল, অন্যান্য রাজন্য-বৃন্দ, সাধারণ ক্ষত্রিয়কুল ধার্ম্মিক বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাযোগ্য ভিন্ন আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্বেতচ্ছত্রতলে শ্বেতচামর বীজিত, হার, কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীটাদি সুশোভিত ঐ যে সুরম্য-মূর্ত্তি,—ইনি যজ্ঞ দীক্ষিত রাজর্ষি জনক। ইঁহারই শুভাদৃষ্টের আকর্ষণে এই মহতী আর্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। আর ঐ তপস্তেজোদ্রক্ষিতবপুঃ মহাপুরুষ—যাহার মস্তকে জটাভার, পরিধানে কৌপীন, দ্বিতীয় বল্কল, গলদেশে রুদ্রাক্ষ, ললাট-বিভূতি ভূষিত ইনিই সেই যাজ্ঞবল্ক্য। ঐ অদূরে অশ্বল শাকল্য

ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী ও অন্যান্য ঋষিগণ বর্ত্তমান। ঐ দেখ উঁহারা সকলেই তপস্যা লব্ধ ব্রহ্মবর্চ্চসে সুশোভিত।

যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইয়াছে, দেবতাগণ অগ্নিমুখে স্বস্ব আহুতি লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি লোক-লোচনের অতীত স্বস্ব রথে তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন, অদ্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতময় ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশে কৃতার্থ-করিবেন : দেবগণ এ সুযোগ ছাড়িতে পারেন না, তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন।

নিস্তব্ধ সভামণ্ডপ সহস্র কণ্ঠ-বাসিনী বাগ্‌দেবীও যেন ব্রহ্মবাদীর শ্রীমুখে ব্রহ্ম-কথা শ্রবণে একাগ্র হইয়া ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে আত্ম-জ্ঞানাভিলাষী রাজর্ষি এই শুভ অবসর বৃথা নষ্ট হইতেছে দেখিয়া প্রথম কথা উত্থাপন করিবেন মনে করিলেন তিনি দেখিলেন ইঁহারা সকলেই মহর্ষি, সুতরাং কাহার নিকট আমি জিজ্ঞাসু হইব। অতএব বিদ্যা পরীক্ষাচ্ছলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য পণ রাখিয়া আমি সহস্রগোদান করিব। রাজর্ষি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মন্ত্রবিৎ ও ব্রহ্মবিৎ, তিনি জনককে জ্ঞান-দানে আসিয়াছেন, এইজন্য একটু প্রগল্‌ভতা হইলেও রাজর্ষির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিলেন। শিষ্য সামশ্রবাকে সহস্র গো-গ্রহণে অনুমতি দিলেন। শিষ্য গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে মহর্ষি অশ্বল যাজ্ঞবল্কের এই প্রাগল্‌ভ ব্যবহারে যেন কুপিত হইলেন। লৌকিকভাবে কোপও জিগীষার অভিনয় করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া একে একে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্ম] ঋষি অশ্বল যদি লৌকিকভাবে কোপ ও জিগীষা পরবশ হইয়া থাকেন, তবে তাহা অসঙ্গত কি ? এইরূপ ক্ষেত্রে সহস্র গো গ্রহণ করা কি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ধৃষ্টতা প্রদর্শন নহে ?

আচার্য্য] বৎস ! যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বলাদি ঋষিগণ সকলেই ব্রহ্মবাদী, সকলেই কৃতার্থ ; ইহাঁদের কার্য্য কেবল পরহিতার্থ। এই পরহিত সাধনের জন্য ইহারা লৌকিক নীতির মাত্রা লঙ্ঘন করিলেও তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত লিপ্ত হয় না। জলপূর্ণ মেঘমালা বিগলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ সিক্ত ও প্লাবিত করে—উহাতে কি আকাশ সিক্ত ও প্লাবিত হয় ? বহ্নি সকল বস্তু পবিত্র করেন, কিন্তু বিষ্ঠাদি অমেধ্য-বস্তু-স্পর্শে কি অগ্নির পাবনতার ব্যাঘাত হয় ? সুতরাং দুর্ব্বাসার ক্রোধ, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রগল্‌ভতা, অশ্বলের কোপ ও জিগীষা, এ সমুদয় লৌকিক-ধারণায় দুর্নীতি হইলেও, এরূপ ক্ষেত্রে উহা উদ্‌ঘাটনীয় নহে।

যাহা হউক বৎস ! এইবার আমি উপনিষদ্ বলিতে আরম্ভ করিতেছি, তুমি ভাবস্থ হইয়া শ্রদ্ধালুহৃদয়ে শ্রবণ কর।

মহাত্মা প্রবোধচন্দ্রের স্বর্গারোহণ
(প্রাপ্ত)।

আজি কি শুনিলাম,—ঋষিবর প্রবোধচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। আর সে দেবমূর্ত্তি আমরা দেখিব না। আর তিনি সেই সুমধুর ধর্ম্মোপদেশে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন না। সহসা একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, এখনও যেন নয়নসম্মুখে সেই পুন্যজ্যোতি প্রতিফলিত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, রজনীর গাঢ় তমিস্রা যখন তরল হইয়া আসিত, বিহগকুল তরুশাখায় অস্ফুট-কুজনে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের স্তোত্র গাণকরিত—প্রত্যহ শুনিতাম, সেই সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের সুপবিত্রক্ষণে তিনিও ব্যাকুলকণ্ঠে সুর-সংযোগে ডাকিতেন "সীতারাম, সীতারাম!" কর্ণে যেন এখনও সেই কণ্ঠ বাজিতেছে। আজ সীতারাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

কি পুণ্যময় তাঁহার চরিত্র ছিল। এজীবনে অমন দেবতার মত মানুষ আর দেখি নাই। কলিকাতায় যখন তাঁহার উদ্‌যোগে পুণ্যশীলা মাতাজী তপস্বিনী কাশীবাই দ্বারা বিধবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সময় আমি কয়েক মাস তাঁহাদিগের সুপবিত্র ছায়ায় বাস করিয়াছিলাম। মানুষ যাহাতে সকল প্রকার কলুষতা ত্যাগ করিয়া জগতে একমাত্র সত্য শ্রীভগবানের পথে যায়, সেজন্য সাধু ৺প্রবোধচন্দ্রের কত চেষ্টা ছিল। সংসারক্লেশদগ্ধ দুঃখী জীবের জন্য তিনি কত কাতর ছিলেন দেখিয়াছি। আজ যদি অন্য দেশ হইত, তাহা হইলে এই মহাত্মার যশঃসৌরভ শত সহস্রকণ্ঠে বিঘোষিত হইত। কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ কত সাধুজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়া "অন্তে নারায়ণ" লাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, কয়জন ধর্ম্মপিপাসু তাহা জানিবার সুযোগ পান?

চিরকুমার প্রবোধচন্দ্র আজীবন শুধু পরোপকার-ব্রতপালনে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, ইহা যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা জানেন। দুঃখিনী ভারতমহিলার ধর্ম্মশিক্ষার দিকে তাঁহার প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইত। তাঁহার কত গুণ ছিল ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে এ অযোগ্য অক্ষম লেখনী সক্ষম নহে। আশা করি কোন সুযোগ্য লেখনী এ পুতচরিত্র

প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মজগতের উপকার সাধন করিবেন। শুধু শোকসন্তপ্তচিত্তে মহিমাময় সেই মহাত্মার স্মরণের জন্য কয়েক ছত্র লিখিলাম। পূজনীয় উৎসব-পরিচালক মহাশয় ইহা উৎসবে প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব।

হে মহাত্মন, তোমার উদ্দেশে আর কি লিখিব? শোকভারে লেখনী আর চলে না শুধু কবির ভাষায় বলি,—

গেলে চলি হে দেবতা, সেই পুণ্যদেশে
কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠে চিদানন্দবাসে,
দেববালা মাল্যদানে তুষিবে তোমারে,
গাবেন তোমার যশঃ দেবর্ষিরা সবে।
স্থাপিলে আদর্শপথ এ ভবমণ্ডলে,
পথভ্রান্ত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষিয়া
দেখাবে উচিৎ পন্থা ঘোষিবে কাননে
প্রভাতিকূজনে পাখী সুমধুরস্বরে,—
চিরধন্য এ চরিত্র, কলুষবর্জ্জিত,
প্রবোধের পুণ্যগাথা এ মরজগতে।

শ্রীসরোজিনী দেবী।
(খেতুপাড়া, পাবনা।)

সমালোচনা।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

১।	মানস প্রসূন	শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী	মূল্য ১৲
২।	সাধনা	ঐ	,, ৸০
৩।	আহ্নিক কৃত্যম্		
	১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড	শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন	,, ॥৵০
৪।	আহ্নিককৃত্যম্		
	৪র্থ ৫ম খণ্ড	ঐ	,, ।০
৫।	চণ্ডী	ঐ	,,
৬।	ভবসিন্ধু তরণী	শ্রীবিহারীলাল পাইন	,, ২॥০

৭।	নীলাম্বরী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	মূল্য ৸০
৮।	লোকালোক	শ্রীজ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ এম, এ,	„ ১৲
৯।	ব্রহ্মচারী	শ্রীযতীশচন্দ্র সেন	„ ॥০
১০।	জ্যোতিঃ পথ ১ম খণ্ড	শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	„
১১।	জ্যোতিঃপথ ২য় খণ্ড	ঐ	„ ৸০
১২।	ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার—	কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	„
১৩।	সাধনা	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	„ ১৲
১৪।	গো ব্রাহ্মণ-গায়ত্রী		

পুস্তকের সমালোচনা করিতে হইলে যতখানি অবসর আবশ্যক আমাদের সেরূপ অবসর নাই। আর বোধ হয় সেরূপ যোগ্যতাও নাই। কাজেই বলিতে হইতেছে ক্রমে ক্রমে অবসরমত হওয়া ভিন্ন আর আমাদের অন্য উপায় নাই। আমরা এবারে ১নং পুস্তকখানি সমালোচনা করিতেছি।

মানসপ্রসূন শ্রীমতীসুশীলাবালা দেবী।

এমন একদিন ছিল যখন স্ত্রীলোকের লেখা পাইলেই সমালোচকগণ ভাল বলিতেন। একজন বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছিলেন আমি নিম্নলিখিত ভাবের স্ত্রীলোকের লেখা কবিতাও পাইয়াছি :—

একে একে দুই হয় দুয়ে দুয়ে চারি
চারে চারে আট হয় আটে আটে ষোল।

তিনি বলিয়াছিলেন এরূপ কবিতা পাইয়াও বেয়াদব হইবার ভয়ে তাঁহাকে ভাল বলিতে হইয়াছিল। এখন কিন্তু সে দিন নাই। কি শিক্ষা, কি সাধনা, কি কবিত্ব সকল বিষয়েই বাঙ্গালী-স্ত্রীলোক ও বাঙ্গালী পুরুষ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। মানসপ্রসূন কাব্যখানি তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রথমেই বলিয়া রাখিতে হয় পুস্তকখানির নামকরণটি ঠিক হয় নাই। পুস্তকের প্রধান বা আকর্ষণীয় চরিত্র ধরিয়া নাম করিলেই ভাল হইত। মায়ামতী বা যোগমায়া নাম দিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

মানসপ্রসূন কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি হইয়াছি। দেবীসমক্ষে মিলনকালে মায়ার আত্মবলিদান চিরদিন নূতন থাকিবে। ঘোমটা

খুলিয়া মায়ার মুখ দেখিতে পারিলে মায়া আর থাকেন না এই সনাতন সত্যটিকে কবিরভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে আমরা নবীন কবিদিগের মধ্যে এই ভাব আর কোথাও দেখি নাই। পুস্তকখানি শেষ করিলে এই চরিত্রের বল বহুক্ষণ ধরিয়া হৃদয়ে আধিপত্য করে এবং সাধকের অন্তরে অনেক নূতন সত্য ইহা প্রকাশ করে।

এই পুস্তকখানি শুধু সুন্দর নহে পুস্তকখানি পবিত্র। রমা মায়া শান্তি—যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ইহারা আপন আপন বিভাগে আদর্শ। এই পুস্তকে দর্শন শাস্ত্রের অতিশয় জটিল বিষয়গুলিও সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। এই পুস্তকের সমস্ত বিশেষত্ব দেখাইবার অবসর আমাদের নাই এজন্য আমরা কবির রচনা হইতে সুন্দর সুন্দর স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলি যে এই পুস্তকে কবি কোথাও শাস্ত্রশিক্ষাকে নিজ প্রতিভাবলে মনগড়া করেন নাই। সর্ব্বত্রই ঋষিদিগের শিক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কবি চরিত্র আঁকিয়াছেন। প্রণয়ের চিত্রে একটা জেলাসি না রাখিলে চরিত্র প্রস্ফুট হয় না—কবি কোথাও ইহা গ্রাহ্য করেন নাই। ইহা হিন্দুসমাজে অস্বাভাবিক। কবিজীবনের দুঃখ কি তাহা দেখাইয়াছেন এবং দুঃখের প্রতীকার কিরূপে হয় তাহাই তিনি শাস্ত্রের রমণীয় উপদেশ মত চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই পুস্তকখানিকে আমরা সুন্দর ও পবিত্র বলিতেছিলাম।

আজকালকার সমালোচক হয় ত বলিবেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়া প্রকৃতির বর্ণনা কিছু কষ্টকল্পিত হইয়াছে, কিছু নীরস হইয়াছে। আমরা কিন্তু ওরূপ ভাবে সমালোচনা করিতে প্রস্তুত নহি।

দাম্পত্যপ্রণয়ের মূল কোথায়? স্ত্রীদ্বারা স্বামীর চরিত্র কিরূপে সংশোধিত হয়? মনুষ্যজীবনের শোক শান্তি কিরূপে হয়? কবি দেখাইয়াছেন তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না। ভারতের যদি কোন বিশেষত্ব থাকে—এইটিই সেই বিশেষত্ব। সুন্দর গল্পে কবির ভাষায় গ্রন্থচরিত্রী তপস্যাই যে ভারতের নারীপুরুষের একমাত্র অবলম্বনের বিষয়—তাহা এই কাব্যে দেখাইয়াছেন। আজকাল বহু কৃতবিদ্যকে এই বিষয় ধরিতে দেখা যায় না। সেই জন্য আমরা একজন মনুষ্যেরই বিবিধ

চরিত্র দেখি। সভাক্ষেত্রে, উপাসনাগৃহে, ধর্ম্মব্যাখ্যা সময়ে, যাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে হয় তিনি ব্যবহারিক জগতে নিজের স্বার্থরক্ষা কালে শাস্ত্রশিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া শয়তানের মত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। আটপৌরে ও পোষাকী চরিত্র লইয়া মানুষ যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। প্রতিনিয়ত অন্যায় করিতেছি আবার প্রত্যহ অনুতাপ করিতেছি ইহাতে অন্যায় করা কখনই শান্ত হইবে না। কবি দেখাইয়াছেন ধর্ম্ম জীবন লাভ না করা পর্য্যন্ত পাপ কখন নিবারিত হইবে না। সেই ধর্ম্ম জীবন লাভ জন্য শুধু নীতি অবলম্বনে ক্ষনিক শান্তি ভিন্ন কিছুই হইবে না। কিন্তু কঠোর তপস্যা দ্বারা মানুষ যখন ধর্ম্ম জীবন লাভ করে তখনই সে ঈশ্বরের অনুগ্রহে যথার্থ মানুষ হইতে পারে।

আমরা স্কন্দপুরাণে পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা দেখিয়াছি। সেই তপঃ ক্লেশখিন্না পর্ব্বতরাজ দুহিতাকে মহাদেব বলিয়াছিলেন এখনও তোমার দেহ আমার দেহ স্পর্শ করিবার যোগ্য হয় নাই। তুমি আরও তপস্যা কর। তপস্যা দ্বারা নির্ম্মল হইলেই আমাকে পাইবে। আজকাল কার স্ত্রৈজিত ব্যক্তির মত কোথাও দুর্ব্বলতা শাস্ত্রে দেখা যায় না আর এই পুস্তকেও আমরা ইহা লক্ষ্য করি নাই। যথার্থ সাধক না হইলে দুর্ব্বলতা ত্যাগ করা যায় না।

এই পুস্তকের প্রধান প্রধান চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী যে সমস্ত শিক্ষা দিয়াছেন হিন্দু জাতির তাহাই যে এই দুর্দ্দিনে একমাত্র পথ, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। শান্তি চরিত্রে কবি দেখাইয়াছেন দুর্বৃত্ত স্বামীকে পাপ পথ হইতে ফিরাইতে হইলে তপস্যা দ্বারা দেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইবে—অন্য চেষ্টাও আবশ্যক কিন্তু তপস্যা ভিন্ন কোন চেষ্টাতে ইহা সফল হইবে না। যোগানন্দ, মায়া—সকল চরিত্রেই কবি এইটিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আমাদের স্থান ও নাই অবসরও নাই নতুবা দেখাইতাম যে সমস্ত জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে গিয়া আজকাল বড় বড় সাধকও সম্প্রদায়িক ভাব আনিয়া শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই; নানা প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যাতে সমাজে নানা প্রকার অনিষ্টের বীজ বপন করিয়া ফেলেন। কবিতা প্রসূনে সেই সমস্ত বিষয়ের সুন্দর মিমাংসা আছে। এই পুস্তকের রচয়িত্রী আপনার সাধনার ফলে এই পুস্তকে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান যোগের সম্বন্ধ যেরূপ দেখাইয়াছেন তাহা যথার্থই সংবুদ্ধির পরিচায়ক। কবি দেখাইতেছেন ভক্তি ও জ্ঞানের

সাহার্য্যেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। আর নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অর্পণ করিতে অভ্যাস না করিলেও ভক্তি হয় না। ইহা ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষির শিক্ষা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ শিক্ষা আজ সমাজে বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

মানস প্রসূন পড়িয়া যদি কোন হিন্দু মহিলা কবির উপদেশ মত তপস্যা দ্বারাই যে সর্ব্ব প্রকার শোক শান্তি লাভ করা যায় ইহা ধারণা করিতে পারেন— এক জনও যদি এই পথে চলেন তাহা হইলেই গ্রন্থ রচনা সার্থক। তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পারিবারিক পবিত্রতাও লাভ হইতে পারে না ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

সাধনা ও একখানি কবিতা পুস্তক। আমরা ইহার সমালোচনা করিলাম না। কারণ এই পুস্তকের প্রশংসা অনেক হইয়াছে। বৃদ্ধ সমালোচকের পক্ষে বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। আমরা সর্ব্বশেষে এই আশীর্ব্বাদ করি যেন কবি আপন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং যাঁহার সম্পর্কে তিনি আসেন তাঁহাকেই যেন এই শিক্ষা দেন যে বিনা সাধনায় কাহারও সংসার পবিত্রভাবে চলিতে পারে না, আর বিনা সাধনায় কখনও শোকশান্তি হইতে পারে না। সাধনাটি বুঝিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ যেন তপস্যার জন্যই জীবন ধারণ করেন। ইতি।

গূঢ়ার্থ-সন্দিপনী।

ব্রহ্ম] ভগবান্! আমার মনে হইতেছিল—'সূপায়নোভব' ইহার অর্থে প্রবাসী পিতা যেমন পুত্রের জন্য সূপায়ন (সুন্দর উপহার) হস্তে আগমন করেন ভগবান্ অগ্নিকেও তদ্রূপ আনন্দরাজ্যের উপহার লইয়া উপস্থিত হইতে প্রার্থনা করা হইতেছে কিন্তু এখন দেখিতেছি আপনি বলিতেছেন অন্য-রূপ। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা কি অসঙ্গত?

আচার্য্য] বৎস! জগজ্জননী ভগবতী শ্রুতি কল্পলতিকার মত অনন্ত অর্থপ্রসূতি ভক্ত কামদুঘা। তাঁহার পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে তত্ত্বের অবিরোধী সব বিশেষণই ব্যবহার করা যাইতে পারে, সব অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বৎস! ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও—সম্প্রদায়ানুগত ব্যাখ্যাই নিরাপদ। নাস্তিকহৃদয়ের অচিন্তনীয় নাই, ব্যভিচারিণী রসনার অবাচ্য নাই, তাহারা ভগবান্ সায়ণকেও সম্প্রদায়বিচ্যুত স্বাধীনব্যাখ্যাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হইতে পারে ভগবান্ সায়ণ সম্প্রদায়-সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্তু তিনি স্বাধীনব্যাখ্যাকার এ শব্দ বড়ই মর্ম্ম-ভেদী। যিনি ব্যাখ্যাকালে দুরূহ শব্দ না। দুরূহ ভাব উপস্থিত হইলেই ভগবান্ জৈমিনি ও পূজ্যপাদ যাস্কের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন—তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আপন যদৃচ্ছাচারের সুযোগ উদ্ভাবন দুর্ব্বুদ্ধি-প্রসূত সন্দেহ নাই। বৎস! এই দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীই মানবকে বিপথে লইয়া যায় ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ বিনয়ের বেশেই এই কুলক্ষয়াবুদ্ধি মানবহৃদয়ে অধিরোহণ করে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এত দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠে, নিরপরাধ জীবকে শত অপরাধে অপরাধী করিয়া তুলে। প্রক্ষিপ্ত-বাদ স্বাধীনচিন্তা প্রভৃতি আজ যে এত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে—ইহার কারণ এই দুর্ব্বুদ্ধি। গুরুপরম্পরা-লব্ধ সম্প্রদায় শুদ্ধ জ্ঞানই জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির কারণ। ভগবতী উপনিষদ্দেবী বলিয়াছেন—'এবমেবেহাচার্য্য-বান্ পুরুষোবেদ' আবৃতচক্ষু ব্যক্তিবিশেষকে স্বদেশ হইতে বিদেশে লইয়া যাইয় তাহার দৃষ্টিনিরুদ্ধ করিয়া রাখিলে যেমন শ্রবণ ভিন্ন তাহার গতি নাই সে যেমন বিশ্বস্ত সাধু জনের নির্দ্দেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া স্বদেশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আচার্য্যবান্ পুরুষ সেই পরম-পদ লাভের যোগ্য। জীব অবিদ্যার আবরণ শক্তিতে আবৃত চক্ষু হইয়া এই মায়া নগরে উপস্থিত হইয়াছে—অজ্ঞানান্ধ পথ চিনিতে না পরিয়া আপন উদ্ভাবনী শক্তির কুহকে

পড়িয়া কতই না কষ্ট পাইতেছে! এ দুঃখের অবস্থায় তাহার অবলম্বন আচার্য্য যিনি আপন জ্ঞান-রূপ অঞ্জন-শলাকায় তাহার অন্ধ নয়নের পুনরুন্মীলন করেন যিনি তাহার নিকট আপন আনন্দধামের পথ নির্দ্দেশ করেন দুঃখী জীবের এক-মাত্র অবলম্বন সেই আচার্য্য। বৎস! তুমি আচার্য্যের অনুসরণ কর; 'সূপায়নো ভব' স্থলে তোমার যেরূপ অর্থ মনে হইতে ছিল, এখানে তাহা কতক সঙ্গত হইলে ও হইতে পারে। তবে যে তোমাকে এত কথা এখানে বলিলাম তাহার কারণ এরূপ অনেক স্থান আসিবে, যেখানে আচার্য্য সায়ণের পদানুসরণ তোমার ভাল লাগিবে না এ জন্য পূর্ব্বেই তোমাকে সতর্ক করিয়া রাখিলাম। যাহা হউক বৎস! তুমি স্বমত পরিত্যাগ করিয়া একবার আচার্য্যের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিয়া দেখনা কেন? কত সৌন্দর্য্য এই মন্ত্রটিতে রহিয়াছে। যিনি এতক্ষণ পরোক্ষ ছিলেন ঋত্বিগ্‌গণ যাহাতে এতক্ষণ পরোক্ষকৃত মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিতে ছিলেন, মন্ত্র-শক্তি-বলে অজ্ঞান-জলদ হৃদয়াকাশ ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই নিত্যোদিত স্বপ্রকাশ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছেন—আর প্রিয় দর্শনের চরণ মূলে উপস্থিত হইয়া ঋত্বিগ্‌গণ কত কথাই বলিতে চাহিতেছেন। শ্রুতির সাধিত ভাষায় ভাব ঢালিয়া বলিতেছেন—'সনঃ পিতেব শূনবে' পিতা যেমন পুত্রের নিকট সেইরূপ তুমি আমাদের। দেব! প্রতিদিন তোমাকে ত পাই না, তুমি আমাদের পক্ষে সুলভ হও আর পিতার মত আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সহিত মিলিত হও। তুমি হৃদয় গুহাশায়ী, তুমি অন্তর্য্যামী, তোমার অবিদিত আমার কোন ইচ্ছাই হইতে পারে না, তথাপি ভগবন্! আমার আত্ম-নিবেদন ভিন্ন তোমাকে লইয়া থাকিবার সুবিধা যে আমার নাই, আমি যে বড় দুর্ব্বল। ইত্যাদি হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগ লইয়া মন্ত্রার্থ চিন্তা কর, কত সৌন্দর্য্য ইহাতে ফুটিয়া উঠিবে।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আপনি কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—পরোক্ষ কৃত মন্ত্র, মন্ত্রকি পরোক্ষ কৃত প্রত্যক্ষকৃত আছে?

আচার্য্য] আছে। এসম্বন্ধে ভগবান্ যাস্ক নিরুক্ত শাস্ত্রে (৭।১।২-৩) যাহা বলিয়াছেন—আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর—তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষ কৃতাঃ প্রত্যক্ষ-কৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ, তত্র পরোক্ষ-কৃতাঃ সর্ব্বাভি র্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথম পুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য।......প্রত্যক্ষ-কৃতা মধ্যম পুরুষযোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্ব্বনাম্না।......আধ্যাত্মিক্য উত্তম পুরুষ যোগা

অহমিতি চৈতেন সর্ব্বনাম্না।......পরোক্ষ-কৃতাঃ প্রত্যক্ষ কৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠা অল্পশ আধ্যাত্মিকাঃ।

সেই ঋক্ সমূহ ত্রিবিধ—(১) পরোক্ষকৃত (২) প্রত্যক্ষ-কৃত (৩) আধ্যাত্মিক তন্মধ্যে (১) পরোক্ষ কৃত, যেখানে স্তবনীয় দেবতা বাচক নাম সমস্ত নাম বিভক্তি ও আখ্যাতের প্রথম পুরুষের বিভক্তিযুক্ত, তাহাই পরোক্ষ-কৃত মন্ত্র নামে অভিহিত যথা অগ্নি মীলে ইত্যাদি......অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ......অগ্নিনা রয়ি মশ্নবৎ...... এই তিনটী ঋক্ পরোক্ষকৃত, কেননা ইহাতে স্তবনীয় অগ্নি নাম পুরুষেরভাবে অভিহিত হইয়াছেন। (২) প্রত্যক্ষকৃত—যে মন্ত্রে দেবতা নাম মধ্যম পুরুষযুক্ত এবং যুষ্মদ্ এই সর্ব্বনাম পদের সহিত যুক্ত তাহাই প্রত্যক্ষকৃত; যথা যদঙ্গদাশুষে ত্বম্...উপত্বাগ্নে দিবে দিবে...সনঃ পিতেব সূনবেহগ্নে...ইত্যাদি মন্ত্রসমূহে মধ্যম-পুরুষযোগে ও ত্বম্ ত্বা ইত্যাদি যুষ্মদ্‌যোগে দেবতানাম ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং এই মন্ত্রসমূহ প্রত্যক্ষকৃত। কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়...মন্ত্রে যুষ্মদ্ ও নাম পুরুষের প্রয়োগ আছে, কিন্তু উহা স্তোতা ঋত্বিগ্‌গণের বাচক, অভিধেয় দেবতা অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্রবৎ পরোক্ষভাবে অভিহিত হইয়াছেন ইহাও প্রত্যক্ষকৃত মধ্যে গ্রহণ করা হয়। যথা মাচিদন্যদ্‌বিশংসত...(ঋ, সং ৮।১।১) ক্রীলংবঃ শর্ধো মারুত...(ঋ, সং, ১।৩৭।১) ইত্যাদি।

(৩) আধ্যাত্মিক—যথায় দেবতা নাম অস্মদ্ এই সর্ব্বনামে উক্ত এবং যাহা উত্তম পুরুষযুক্ত, তাহাই আধ্যাত্মিক মন্ত্র। যথা—অহং ভুবম্ বসুনঃ পূর্ব্ব্যস্পতিঃ (ঋ, সং ১০।৪৮।১) ইত্যাদি।

ব্রহ্ম] ভগবান্! ইতঃপূর্ব্বে সূক্তমধ্যে আপনি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দুই একটী শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ আমি ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। যেমন প্রথম মন্ত্রের বিনিয়োগ প্রদর্শনস্থলে 'প্রাতরনুবাক' কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন —প্রাতরনুবাক কাহাকে বলে? কখনই বা এই প্রাতরনুবাক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে?

আচার্য্য] বৎস! কেবল প্রাতরনুবাক নহে সূক্তশেষে আরও কতিপয় কথা তোমাকে আমি বলিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আপাততঃ তোমার জিজ্ঞাসিত প্রাতরনুবাক শব্দের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বলিয়া অন্যান্য কথা বলিতেছি শ্রবণ কর—সোমযাগের সোমাভিষব দিনের পূর্ব্বদিন কে অগ্নিষোমীয় বা উপবসথ্য অহ বলা হয়। এই দিনের রাত্রিশেষে অগ্নি, উষঃ কালাভি

মানিনী দেবতা এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহারা প্রত্যেকে সপ্তচ্ছন্দোযুক্ত সাতটি করিয়া ঋক্‌মন্ত্র অবলম্বনে যজ্ঞভূমিতে আগমন করেন। যজ্ঞভূমি আগমনেচ্ছু এই দেবতাগণ যে যে ঋক্‌মন্ত্র অবলম্বনে আগমন করেন, তাহাই প্রাতরনুবাক নামে অভিহিত।

পুরাকালে প্রজাপতি স্বয়ং হোতা হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাহার উভয়বিধ সন্তান দেব ও অসুরগণ "ইনি আমাদের জন্যই প্রাতরনুবাক পাঠ করিবেন" এইরূপ মনে করিয়া যজ্ঞভূমির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি অসুরগণকে উপেক্ষা করিয়া দেবতাগণের জন্য প্রাতরনুবাক পাঠ করেন, এইজন্য পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের সহিত প্রাতরনুবাকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে এবং এই জন্যই এই মন্ত্রসমূহ উচ্চারণে অসুরগণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। অপিচ প্রজাপতি দেবতাদের জন্য প্রাতঃকালে ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা প্রাতরনুবাক নামে অভিহিত, এবং এই জন্যই এখনও ইহা অতিপ্রত্যূষে পাঠ্য, অর্থাৎ যে সময়ে আরম্ভ করিলে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই শেষ করা যায়, এমন সময়ে প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিতে হয়।

শ্রৌতসূত্রকারগণ এ সম্বন্ধে বহুকথা বলিয়াছেন—ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (২।২।৫) এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ শ্রুতিতে আছে—মানবকণ্ঠে কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই প্রাতরনুবাক পাঠ করিবে, বিহগশ্রেণী এবং শকুনিকুল শব্দ করিবার পূর্ব্বেই প্রাতরনুবাক পাঠ করিবে, কেন না—পক্ষিগণ এবং শকুনিগণই নির্ঋতিনামক মৃত্যুদেবতার মুখ স্বরূপ। সুতরাং শকুনি ও বিহগকণ্ঠে মৃত্যুবোধন শব্দ জাগ্রত হইয়া জীবহৃদয়ের স্বাভাবিক আসঙ্গরূপ মৃত্যুকে উদ্‌বোধিত করিবার পূর্ব্বেই প্রাতরনুবাক পাঠ করিবে এবং আগামি দৈনিক জীবনে মৃত্যু-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য মন্ত্ররথারূঢ় অগ্নি অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাগণের ভাবে হৃদয়পূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

বৎস! যদিও সে সোমযাগ এখন নাই, সে প্রাতরনুবাক এখন নিষ্প্রয়োজন কিন্তু মৃত্যুসংগ্রামে জয়লাভ করা সকলেরই তদ্রূপ আবশ্যক রহিয়াছে। সুতরাং তুমি যদি এই প্রাতরনুবাক মন্ত্রগুলি শুধু পাঠও অতি প্রত্যূষে কর তাহা হইলেও দেখিবে, আসুর ভাবরাশি তোমার দেবপূজায় হৃদয় ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

রূপী হইয়াও বীজাঙ্কুরের ন্যায় কার্য্যকারণভূত নও; যেহেতু কাষ্ঠ যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তুমি দেহ হইতে ভিন্ন। জীব স্বপ্নে যেমন আপনি আপনার শিরশ্ছেদ দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ জাগ্রদাবস্থায় দেহাদির পঞ্চত্বও আপনিই দেখিতে পায়। অতএব দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা অজ ও অমর। যেমন ঘট ভাঙ্গিলে ঘট-মধ্যস্থ আকাশ পূর্ব্ববৎ আকাশই থাকে, তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলে, জ্ঞানী জীব আবার ব্রহ্মেই লীন হয়। মনই সত্ত্বরজস্তমোগুণ এবং দেহ এবং কর্ম্ম সকলকে সৃষ্টি করে। মায়া সেই মনকে সৃজন করেন। তাহা হইতে জীবের সংসার। যতক্ষণ তৈল, তৈলাধার, বর্ত্তি ও অগ্নি ইহাদের পরস্পরের সংযোগ থাকে, ততক্ষণ তাহা প্রদীপ বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ দেহাদির সংযোগে জীবের জন্ম।

জীব, গুণত্রয়ে জন্মে ও নাশ পাইয়া থাকে। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা জন্মেন না। যেহেতু তিনি সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ ব্যতিরিক্ত। তিনি আকাশের ন্যায় দেহাদির আধার, নির্ব্বিকার এবং অন্তহীন ও উপমাবিহীন এবং বিভু। রাজন্! তুমি অনুভব-সম্মতা বুদ্ধি দ্বারা বাসুদেবের চিন্তা পূর্ব্বক এইরূপ আত্মস্থ পরমাত্মার বিচার কর। এইরূপ অভেদ চিন্তাকালে বিপ্রবাক্যে আদিষ্ট হইয়াও তক্ষক তোমাকে দগ্ধ করিবে না। মৃত্যুর কারণ সকলও তোমাকে দগ্ধ করিবে না। তুমি মৃত্যুরও ঈশ্বর হইবে। "আমিই পরমপদ ব্রহ্ম," এবং "পরমপদ ব্রহ্মই আমি" এইরূপ অভেদ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মযোজনা কর, দেখিতে পাইবে পদতলে লেলিহান দংশনকারী তক্ষক দেহাদি বিশ্ব, আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে। ১২।৫ ভাগবত। শ্রীরামনারায়ণ কৃত অনুবাদ।

শ্রীশুকদেব শ্রীহরির লীলা দ্বারা রাজার হৃদয়ে ভক্তি উদ্রেক করিয়া, শেষে জ্ঞানের উপদেশ দিলেন। ইহাতেই রাজার সদ্যোমুক্তি হইল।

এখন কথা হইতেছে পরম বৈষ্ণব রাজা পরীক্ষিত জীবন্মুক্ত শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ-গলিত রসাল ভাবগত শ্রবণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন; ইহাতে তোমার আমার কি? রাজা পরীক্ষিতের মত ভক্তি আমাদের কোথায়? আমাদের কোন্ ভাগ্য আছে যাহাতে শ্রীশুকদেবের মত বক্তার মুখ হইতে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিব? তবে ভাগবত পাঠে আমাদের লাভ কিরূপে হইবে?

মুমূর্ষু রাজা পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব একবারেই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করেন নাই। একবারেই বলেন নাই রাজন্! তুমি মরিতে ভয় করিতেছ

কেন? তক্ষকও ব্রহ্ম, তোমার দেহও ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম—কে কাহাকে সংহার করে? শ্রীশুকদেব "আমি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম আমি" এই ভাবনা করিতে প্রথমেই বলেন নাই। শুধু চিন্তায় ইহা হয় না বলিয়া যাহাতে ইহা হয় তাহাই ক্রম অনুসারে বলিলেন। প্রথমে হরি-কথা শ্রবণ কর; করিয়া হৃদয়কে ভক্তিরসে আপ্লুত কর। হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইলে বুঝিবে তুমি তাহাকে ভুলিয়া নানা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি কখন তোমায় ত্যাগ করেন না। কাজেই যখন শ্রীগুরু দেখাইয়া দেন—দেখ! কে তোমায় একবারও ত্যাগ করেন না, কে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে জীবন্ত ভাবে আছেন, কে তোমার সঙ্গে থাকিয়া ভিতরে বাস্তবী লীলা, আর বাহিরে নানা ভাবে ব্যবহারিকী লীলা করিতেছেন—তুমি প্রথমে তাঁহাকে ভক্তি কর। পরে যখন এক ক্ষণকালও তুমি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিবে না—যখন আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, জাগরণে এমন কি সুষুপ্তিতেও সেই সদা-জাগ্রত আপন স্বরূপকে ভুলিবে না, তখন তোমার আর মৃত্যু নাই। সত্যই দেখনা কেন—তুমি সুষুপ্ত হইলেও কে জাগিয়া থাকে? সুষুপ্তিতে তিনি ন কঞ্চন কামং কাময়তে—সুষুপ্তিতে চেতো মুখ হইয়া তিনি কোন কামনা আর তুলেন না—কি এক ধীর সমীরে গা ঢালিয়া আপনার স্বরূপে আপনি প্রবেশ করা রূপ লীলা করেন—বিনা ভক্তিতে এই সদা—জাগ্রত পুরুষকে চিনিতে পারা যায় না। ভক্তির প্রথম অবস্থাই সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিতে শিক্ষা করা। তিনি ত তোমাতে সদাই জাগ্রত। তুমি যাহা কিছু কেন করনা—মানসিক কর্ম্ম বল বা বাচিক কর্ম্ম বল বা কায়িক কর্ম্ম বল, তাঁহাকে না ভুলিয়া করিতে অভ্যাস কর; তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কৃত হইবে। তাঁহাকে না ভুলিয়া সকল কর্ম্মই করা যায়। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস সর্ব্বদা চলে—সর্ব্বদা চলে বলিয়া সর্ব্বদা শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা যায় সেইরূপ তোমার হৃদয়ের রাজাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে স্মরিয়া, সর্ব্বদা হৃদয়ে দেখিয়া, শ্বাসের মত সর্ব্বদা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে পারাই ভক্তিযোগের প্রথম কার্য্য। বিনা ভক্তিতে কখন শ্রীভগবানের বাস্তবী ও ব্যবহারিকী লীলা বুঝা যাইবে না। তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গরূপ লীলা বুঝিলেও কখন তাঁহার স্বরূপচিন্তা প্রবাহক্রমে হইবে না। "আমি ব্রহ্ম ব্রহ্ম আমি" এই জ্ঞান বিনা ভক্তিতে কখন জন্মিবে না। তাই শাস্ত্র সর্ব্বস্থানে বলিতেছেন—

মৎভক্তি বিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষ সাত্তেষাং জন্মশতৈরপি ॥

আমাকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ রূপ কর্ম্ম দ্বারা ও জন্মাদ্যস্য যতঃ রূপ লীলা দ্বারা যাহারা ভক্তিযোগ সাধনা না করিয়াছে তাহারা শাস্ত্রের বিধি নিষেধরূপ কর্ম্ম করিলেও মোহপ্রাপ্ত হইবে। শতজন্ম ভক্তিশূন্য শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিলেও ইহাদের "আমি ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম আমি" অনুভবরূপ জ্ঞানও কখন হইবে না আর মুক্তিও কখন হইবে না।

রাজা পরীক্ষিত ত প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। তুমি আমি বুঝি তাঁহার ত কোন কর্ম্ম নাই! কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম নাই কিরূপে? তোমার জীবনের আর ৭ দিন বাকী আছে—ভাব দেখি ইহা। দেখ দেখি তোমার মন কোন কর্ম্ম করে কি না? রাজার জীবনে আর ৭ দিন বাকী ছিল। রাজা যেমন দেখিলেন দিন নাই অমনি রাজা আপনার দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিলেন। রাজা বিষ্ণুভক্ত। তাঁহার কর্ম্ম কি তোমার আমার মত ছিল? কত সৎকর্ম্ম তাঁহার ছিল। তাই তিনি শমাক মুনি-পুত্র শৃঙ্গীর ব্রহ্মশাপকে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ভাবনা করিতে পারিয়াছিলেন! তুমি আমি কি পুত্র কন্যা স্বামী স্ত্রী বিয়োগকে —নিতান্ত দারিদ্র্য অবস্থায় পতনকে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া ধারণা করিতে পারি? রাজা কিন্তু ব্রহ্মশাপকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বুঝিলেন, বৈরাগ্যের হেতু বলিয়া জানিলেন। প্রায়োপবেশন করিলেন সত্য তথাপি কি তাঁহার মন শান্ত হইয়াছিল? মরণ ত আছেই, মৃত্যুত সকলেরই হয় এই ভাবনায় রাজা কি স্থিরত্ব লাভ করিয়াছিলেন? যদি শান্ত হইয়াই যাইতেন তবে আর ঋষিগণকে কেন প্রশ্ন করিবেন আমার মৃত্যু ত নিকট— এখন আমার কর্ত্তব্য কি? হরি তাঁহার বংশেই কত লীলা করিয়াছিলেন ইহা জানিয়াও রাজা স্থির হইতে পারেন নাই। পরে যখন শুকদেব হরিকথা শুনাইলেন রাজার মন তখন শ্রীহরির ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া, শ্রীহরির রসে রসযুক্ত হইল। মন ভক্তিপ্রেমে পূর্ণ হইলে তবে ইহা সকল ভয় ত্যাগ করিতে পারে, সকল ভাবনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থাটিই জ্ঞান উপদেশ ধারনা করিবার যথার্থ সময়। মন শ্রীহরিকে লইয়া যতদিন না আনন্দে ভরিয়া উঠিবে ততদিন তুমি যোগই কর, ধ্যানই কর, সমাধিই লাগাও আর আমি ব্রহ্ম চিন্তাই কর,কোন কিছুতেই তুমি স্থায়ী অবস্থা

লাভ করিতে পারিবে না। যোগকালে বা ধ্যানকালে বা সমাধিকালে বা আমি ব্রহ্ম বিচারকালে তুমি আনন্দে থাকিতে পার কিন্তু ব্যুত্থানকালে তুমি আবার সংসার দেখিবে, আর ব্যবহারকলে কত কি অন্যায় করিয়া ফেলিবে। ব্যবহারকালে আমি অণু বা আমি আকাশের মত এভাব রাখিতেই পারিবে না—আমি ব্রহ্ম এই চিন্তা রাখিয়া সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, রোগে শোকে, জরাতে ব্যাধিতে, অচঞ্চল থাকিতে পারিবে না। কতদিন ত আমি ব্রহ্ম করিতেছ, বল, সমদৃষ্টি, সমচিত্ততা, শীতে গ্রীষ্মে সমভাব, সম্মানে অপমানে সমানভাব, তোমার কি হইল? কখনই হইতে পারে না। তাই এই জীবন্মুক্ত গুরু আপন শিষ্যের প্রাণটি ভগবৎরসে ডুবাইলেন শেষে বলিলেন রাজন্ মরিব এই অবিবেকী ভয় তুমি ত্যাগ কর। রাজন্ তক্ষকও যে, তুমিও সেই। আপনাকে দেখিয়া আপনি ভীত কি কেহ হয়? তখন উপদেশ করিলেন রাজন্ তুমি চিন্তা কর আমি ব্রহ্ম—ব্রহ্মই আমি; জীবাত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই জীবাত্মা। ইহা সোঽহং জ্ঞান। বিনা বৈরাগ্যে, বিনা ভক্তিতে এ জ্ঞানের অধিকারী কেহই হইতে পারে না—এ জ্ঞান না হইলেও মৃত্যুঞ্জয় করিতে কেহ পারে না, জীবন্মুক্তিও কাহারও হয় না।

বলিতেছিলাম যদিও শুকদেব তোমায় ভাগবত শুনাইতে না আসেন তথাপি হৃদয়ের রাজা যিনি তিনি তোমায় যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সেই অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর শক্তি প্রয়োগ কর; আলস্য করিয়া বলিও না আমার সুবিধা নাই কিরূপে হইবে? যে যেমন তাহার সেইরূপ সুবিধা। তুমি একা একা নিজের চেষ্টায় যতটুকু পার—হৃদয়ের রাজার শরণাপন্ন হইয়া—সকল কর্ম্ম তাঁহাকে জানাইয়া করিতে থাক—তিনি পতিত-পাবন, তিনি দীনবন্ধু, তিনি সর্ব্বজনের একমাত্র সুহৃৎ, তিনি তোমার হৃদয় জানিয়া তোমার সমস্ত সুবিধা করিয়া দিবেন। তিনিই তোমাকে শক্তি দিবেন, তিনিই তোমার বিঘ্ন দূর করিয়া দিবেন। তুমি কাতর হইয়া তাঁহারই মুখপানে তাকাও—সতী স্ত্রীর মত সকল কর্ম্ম স্বামীকে জানাইয়া করিতে থাক, তাঁহাকে না জানাইয়া, তাঁহা হইতে গোপন করারূপ বেশ্যাবৃত্তি আর করিও না, তিনি তোমারই। সর্ব্বদা তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর দেখিবে তিনি সর্ব্বদা তোমার মধ্যে জাগ্রত। সেই জাগ্রতকে সর্ব্বদা দেখিতে অভ্যাস করিতে করিতে তুমি তাঁহার ভালবাসার অনুভব করিয়া তাঁহার মত

তম আক্রমণ করে তাহা দূর করাইবার যে চেষ্টা তাহা রজ। অন্য একটী দৃষ্টান্ত লও। বীজের মধ্যে অব্যক্ত শক্তি আছে। সেই শক্তি অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় প্রকাশিত হইতে চায়। প্রকাশ, কার্য্য করিতে গেলেই তম তাহাকে বাধা দেয় আবার রজ সেই বাধা সরাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ যুদ্ধ করিয়া তবে বীজমধ্য-নিহিত বৃক্ষটি বাহিরে আইসে। বদ্ধ জীবকেও এইরূপ যুদ্ধ করিয়া প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইবে। প্রকৃতির সত্বগুণ যে প্রকাশ, ব্রহ্মকেও সেই প্রকাশ বলা যায়—তবে ইহাদের পার্থক্য এই যে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের যে প্রকাশ, তাহা খণ্ড প্রকাশ, কিন্তু পরমাত্মা অখণ্ড প্রকাশ। পরমাত্মাতে অন্য কিছুই নাই; তিনি পরম শান্ত, চলন রহিত, আনন্দময় জ্ঞানময় চৈতন্য। কিন্তু প্রকৃতিতে প্রকাশ, আবরণ, চেষ্টা, ইহাদের সংগ্রাম সর্ব্বদাই আছে। এই জন্য প্রকৃতিকে বলা হয় অনর্থকরী। জীবের সমস্ত দুঃখের কারণ এই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি চৈতন্যকে আবরণ করিয়া খণ্ডমত দেখায়, এবং ইহাকে যেন বন্ধন দশায় আনয়ন করে। অপরা প্রকৃতিতে এই সমস্ত দোষ আছে। কিন্তু পরা প্রকৃতি রজ তমকে অভিভূত করিয়া সত্বদ্বারা সেই পরম প্রকাশে জীবকে পৌছাইয়া দিতে পারে বলিয়া ইহাকে পরা বা শ্রেষ্ঠা বলিতেছি। খণ্ড চৈতন্যকে অখণ্ড চৈতন্যে মিলাইতে পারে বলিয়া পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা। পরা প্রকৃতি রজ তমকে অভিভূত করিয়া সত্বগুণে প্রকাশিত হইতে পারেন। সত্বগুণে অধিষ্ঠিত চৈতন্য স্বপতিত অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতনকে নিষেধ করিতে পারে না। মণিতে বাহিরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে। মণি ইহা নিষেধ করিতে পারেনা। কিন্তু চেতন যিনি তিনি আপনাতে উদিত সঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব রোধ করিতে কেন না পারিবেন? সঙ্কল্প না করাই জীবের মুক্তি।

অর্জ্জুন—সর্ব্বদুঃখের কারণ এই প্রকৃতি কি তাহা তুমি এখন ভাল করিয়া বল।

ভগবান—প্রকৃতি কি তোমাকে ভাল করিয়া বলিতেছি কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ও জীবের দুঃখ সম্বন্ধে দুই এক কথা অগ্রে বলি শ্রবণ কর।

যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর—তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ না করিলে তাঁহার কথা প্রকাশ করে কে? যিনি স্বপ্রকাশ হইলেও স্থূলদৃষ্টির অতীত, যিনি সমস্ত প্রমাণের অতীত, যিনি গুণের অতীত, তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার স্বভাব। তিনি আত্মমায়া অবলম্বনে জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। সৃষ্টি স্বভাবতঃ হয়। সৃষ্টিসম্বন্ধে লোকে দুইটি বিষয় বুঝিতে চায়। (১) জগৎ সৃষ্টি কি কারণে হয়? (২) জগৎ সৃষ্টি কি প্রকারে হয়? সৃষ্টি কেন হয় এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন মণির ঝলকের মত ইহা স্বাভাবিক। সৃষ্টিটা মায়িক। মায়া আশ্রয়ে সৃষ্টি করাই তাঁহার স্বভাব—সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়া। শ্রুতি বলেন "স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ" প্রজাপতি আত্মা একাকী অবস্থায় রতি অনুভব করেন না। দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। আপনাকে, মায়াবলে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বিভক্ত করিলেন। এই দ্বিতীয় হওয়াই মায়ার কার্য্য। ইহা হইতেই ভয়। "দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং ভবতি"। আত্মাই একমাত্র সত্য, অন্য কিছুই নাই; যাহা আছে তাহা মায়া মাত্র। এইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি হয়। যাহা হউক সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্য ব্যাখ্যা পরে বলিতেছি।

এখন সৃষ্টি কিরূপে হয় তাহা বলিব। ইহার জন্য প্রকৃতি কি জানা আবশ্যক। প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য জানিয়া জীব যখন পরমাত্মাকে স্পর্শ করিবে তখনই জীবের সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে।

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি এই প্রকৃতি তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় কেন। পরমাত্মা, জীব-প্রকৃতি এবং জড়-প্রকৃতি বুঝিলেই সমস্ত জানা হইল। সমস্ত শাস্ত্রে তুমি এই তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিয়াছ। সর্ব্বশাস্ত্রেই এইজন্য সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত। একবারে সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করা জীবের পক্ষে কৌতূহল মাত্র। সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র এবং সাধনা দ্বারা তত্ত্ব জানা যায়। তথাপি তুমি স্থূল স্থূল ভাবে পরা অপরা প্রকৃতি তত্ত্বের কিছু আভাস দাও।

ভগবান্—বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

পরম শান্ত চিন্ময় পরব্রহ্ম সর্ব্ববিধ চলন রহিত। তিনি মাত্র চেতন। চেতনে যে চেত্য-ভাব তাহা স্পন্দধর্ম্মী। এই চেত্যভাবটি কি? অগ্নির যেমন উত্তাপ, চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, বায়ুর যেমন স্পন্দন সেইরূপ পরমাত্মারও এই চেত্য ভাব।

পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা॥

যেমন পাবক হইতে উষ্ণতা বিভিন্ন করা যায় না, যেমন পবন হইতে স্পন্দতা ভেদ করা সেইরূপ চেতন হইতে চেত্যতাকে বিভিন্ন করা যায় না।

চেতনে চেত্যভাব আছে কিন্তু চেত্যভাবটিই যে চেতন তাহা নহে। উত্তাপ যেমন অগ্নি নহে, চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্র নহে, স্পন্দন যেমন বায়ু নহে; সেইরূপ চেত্যভাবটিই পরমাত্মা নহে। অথচ পরমাত্মা ভিন্ন ইহার অস্তিত্ব নাই। চেত্যভাব না থাকিলে পরমাত্মার কোন ক্ষতি নাই। চেত্যভাব থাক্ বা না থাক্ পরমাত্মা সব সময়েই আছেন। পরম আত্মা চলন রহিত আর চেতনভাবটি স্পন্দধর্ম্মী। চেত্য ভাবের নাম শক্তি। যখন চেত্যভাবটি পরমাত্মায় অদৃশ্য হইয়া যায় তখন শক্তি ও শক্তিমান কিন্তু অভেদ। এই অবস্থায় শক্তি আছে ইহা বলা যায় না, যদি থাকে বল তবে আমি জিজ্ঞাসা করি—ধরিয়া দাও। তাহা পার না। আরও কারণ এই যে শক্তি যখন শক্তিমানে মিশিয়া থাকে তখন ইহার ধর্ম্ম যে স্পন্দ তাহা থাকে না, শক্তির কোন কার্য্যও থাকে না, শক্তির কোন অনুভবও নাই। এক্ষেত্রে শক্তি নাই একথা বলনা কেন? না তাহাও বলা যায় না। কারণ যাহা নাই তাহা হইতে কিছু আসিবে কিরূপে? এই দৃশ্য প্রপঞ্চ ত অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থা মাত্র। এই জন্য শক্তি অনির্ব্বচনীয়া। শক্তিকে এই জন্য মায়া বলে।

ন সতী সা না সতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ
এতদ্বিলক্ষণা কাচিদ্বস্তুভূতানি সর্ব্বদা॥ এই মায়াই পরব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধা শক্তি। শাস্ত্র বলেন—

অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎপরব্রহ্মৈক নামকম্॥

অপ্রতর্ক্যম্ অনির্দ্দেশ্যম্ অনৌপম্যম্ অনাময়ম্।

তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা।

প্রকৃতি, মায়া, শক্তি, চেত্যভাব, চিতি, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দগুলি একটি বস্তুকেই লক্ষ করে। যিনি চিন্মাত্র, যিনি কেবল চিৎ তিনিই পরমাত্মা। চিৎ এর ভাবটিই চেত্যভাব। এই চেত্য ভাবকেই প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য হয় বলিয়া ইনি প্রকৃতি। এই চেত্যভাবটি পরমাত্মার সহিত যখন মিশ্রিত থাকেন তখন ইঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না—ইহা তখন পরমাত্মাই—অথবা ইহা নাই পরমাত্মাই আছেন। মণির ঝলকের মত যখন স্বভাবতঃ ঈক্ষণ (আমি বহু হইব এই সৃষ্টিকরণেচ্ছা) জাগ্রত হয় তখনই চেত্যভাবটির উদয় হয়। এইটিকে অনাত্মাও বলে। পরে এই প্রকৃতিই মহৎ, অহং, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূতাদি ভাবে অব্যক্ত হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম, স্থূল ভাবে পরিণত হয়েন। অর্থাৎ শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিয়া স্থূল শরীর ধারণ করেন। আর চিৎ বা চিদাত্মা—যিনি পূর্ণ তিনি শক্তির প্রতি পরিণামে খণ্ডমত হইতে থাকেন। চিদাত্মা যখন অনাত্মাকে "আমি" বলেন—চিদাত্মার অনাত্মাতে যে "অহং বোধ" ইহাই মায়া আর নিতান্ত স্থূল শরীরে জীবাত্মার যে অহং বোধ তাহাই অবিদ্যা।

অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।

সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে॥

মায়া ও অবিদ্যাতে কোন কিছুই ভেদ নাই। অনাত্মার অতি সূক্ষ্ম যে উদয়—তাহাতে যে অহং বোধ তাহাই মায়া। অনাত্মার বা মায়ার স্থূল শরীরে যে আগমন তাহাতে যে অভিমান তাহাই অবিদ্যা। দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা। এখানে ইহাও লক্ষ্য কর—মায়াটি সংহত পদার্থ, মিলিত পদার্থ। যাহা কিছু সংহত তাহাই পরের প্রয়োজনে। সত্ত্ব রজ তম যে মিলিত অবস্থায় থাকে তাহারও প্রয়োজন আছে। পরমাত্মা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু মায়া ভিন্ন অন্য দ্বারা তাঁহার প্রকাশ হইতে পারে না। শাস্ত্র এই জন্যই বলেন "সংঘাত পরার্থত্বাৎ"। সৃষ্টির যদি কোন কারণ দিতে চাও তবে ইহা বলিও যে যিনি অবাঙ্মনসগোচর তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য যে প্রকাশ তাহারই জন্য এই সৃষ্টি। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে পরব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও মায়া আশ্রয়ে জীব ও জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। পরমেশ্বর এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে ইহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি আকাশাদি পঞ্চভূতে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্ত্যেব মেবাস্মাদাত্মনঃ। কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ চেতন অচেতন সমস্ত জগৎ পরমাত্মা হইতে নির্গত অথচ এই সৃষ্টি মায়া-মারুত-বিভ্রম।

অর্জ্জুন—মায়ার এই সত্ত্ব রজ তম গুণ কিরূপ ভাবে কার্য্য করে ?

ভগবান্—প্রকাশ আবরণ ও চেষ্টা—মায়ার এই তিন গুণ। গুণকে রজ্জু বলা যায়। এই রজ্জু দ্বারা জীব বদ্ধ হন। আবার সত্ত্বগুণ সাহায্যে জীব মুক্ত হন। এই জন্য মায়ার দুইরূপের কথাও

বলা হইয়াছে। এই দুই রূপের নাম বিদ্যা ও অবিদ্যা। সৃষ্টি লীলাং যদা কর্ত্তুমীহসে,—"অঙ্গীকরোষি মায়াং ত্বং তদাবৈ গুণবানিব" পরমাত্মাকে বলা হইতেছে যখন তুমি সৃষ্টিলীলা করিতে ইচ্ছা কর, তখন তুমি মায়াকে অঙ্গীকার কর এবং মায়ার গুণে গুণবান্ মত হও। "মায়া দ্বিধাভাতি বিদ্যাবিদ্যেতি তে সদা"। মায়াও, বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাবে প্রকাশ হন। "আমি দেহ নই চিদাত্মা এই যে বুদ্ধি তাহাই বিদ্যা। অবিদ্যাই সংসারের হেতু ; ইহাই বন্ধন করে কিন্তু বিদ্যা সংসার নিবৃত্তি করে। অবিদ্যা সংসৃতেহের্তু বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা। অবিদ্যা প্রবৃত্তি মার্গে জীবকে টানিয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি অনর্থে পাতিত করে—বহু সংসার দুঃখে অভিভূত করে কিন্তু বিদ্যা জীবকে নিবৃর্ত্তি মার্গে তুলিয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত করে।

অর্জ্জুন—জীব কাহাকে বলিতেছ ? পরমাত্মাই ত আছেন, জীব আসিল কোথা হইতে ? আর এক কথা।—পরা প্রকৃতি বল বা অপরা প্রকৃতি বল—উভয়েইত জড়। তুমি পরা প্রকৃতিকে চেতন বল কেন ? পরা প্রকৃতিই জীব কিরূপে ?

ভগবান্—শুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিতা প্রকৃতির অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তাহাই পরা প্রকৃতি। ইহাকেই আদি জীব নামে অভিহিত করা যায়। পরমাত্মাতে সঙ্কল্প জন্য যে পরিচ্ছিন্ন ভাব—(সঙ্কল্প তাঁহার শক্তি মাত্র) সঙ্কল্প জন্য পরমাত্মার পরিচ্ছিন্ন হওয়া মত অবস্থাটি জীব ভাব।

"স্ব শক্তেশ্চ সমাযোগাৎ অহং জীবাত্মকং গতা"

পরমাত্মা শক্তির সহিত সংযুক্ত হইলেই জীবভাব ধারণ করেন। মায়া দ্বারা, অখণ্ড পরমাত্মা যে খণ্ডিত হইয়া অহং অভিমান করেন, ইহাই জীব। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই আদি জীব। স্বাধারাবরণ্যত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্। মায়ার আবরণরূপ দোষ দ্বারাই জীবত্ব ঘটে। ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব সমস্তই পরমাত্মাতে কল্পিত। শ্রুতি বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি। ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ "আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) এবং ঐ সকল হইতে বিযুক্ত হইলেই পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন" মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ১৮৭।

"পরমাত্মা নির্গুণ। উঁহার সহিত কোন কিছুর সংশ্রব নাই। জীবাত্মার বিনাশও নাই, জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন। দেহান্তরে গমনই মৃত্যু। শরীর-মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়"। শান্তিপর্ব্ব ঐ।

অর্জ্জুন—শক্তি হইতেই এই সৃষ্টি। ইহাকেই তুমি চেতনের চেত্যভাব বলিতেছ আরও বলিতেছ ইহা স্পন্দ ধর্ম্মী। তুমি আর একবার এই স্পন্দন সম্বন্ধে বল। দেখিতেছি জগৎটা স্পন্দন লইয়া। সকলের মূলেই এই স্পন্দন রহিয়াছে। স্পন্দন হইতেই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ। স্পন্দনের স্বরূপ কি তাহা তুমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—ভগবান্ বশিষ্ঠ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মের স্পন্দ শক্তিটি সঙ্কল্প-বিকল্প-ময়ী। ব্রহ্মের এই সঙ্কল্প-বিকল্প-ময়ী স্পন্দ শক্তিকে তুমি মায়া বলিয়া জানিবে।

চিন্ময় ব্রহ্মের নাম শিব, আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দশক্তিই কালী। মনোময়ী স্পন্দশক্তি পরমব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটেন, অভিন্নও বটেন। ঐ মনোময়ী স্পন্দশক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে অনুভব করাইতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই।

স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন বহ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হন।

শিব শান্ত চিন্ময় পরমাত্মা অবাঙ্মনস গোচর। ভাবনাময়ী স্পন্দশক্তি তাঁহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শক্তির তিনটি ভাগ আছে (১) জ্ঞানশক্তি, (২) ইচ্ছাশক্তি, (৩) ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্য। সূর্য্যের প্রকাশ যাহা তাহা বাহিরের বস্তু দেখান, কিন্তু চেতনের প্রকাশ দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভূত হয়। ইহা জ্ঞানের প্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ চেতনের চেত্যভাবটি তাঁহার মায়া। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকাশ, আবরণ ও প্রবৃত্তি বা সত্ব, তম ও রজ মায়ার এই তিন গুণ। চেত্যভাবের প্রথম স্ফুরণ যাহা তাহাই জ্ঞান শক্তি। ইহা সাত্বিক। এই জ্ঞানশক্তিও কর্ম্মে পরিণত হয় বলিয়া ইহার নামও প্রকৃতি। চেতন পুরুষের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, চেতন যাহা তাহা শুদ্ধ, কেবল, অন্য সমস্ত সম্পর্কশূন্য হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সত্বগুণ কখন রজ ও তম সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। তবে যখন রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া সত্বশক্তি বা জ্ঞানশক্তি প্রবাহিত হয়, তখন ইহা ব্রহ্মের সহিত মিশিতে পারে। ব্রহ্মের সহিত মিশ্রিত হইলে স্পন্দশক্তি নিস্পন্দতা লাভ করে। স্পন্দন যখন কম্পন শূন্য হইয়া যায়, তখন ইহা থাকে না; তখন মহাপ্রলয় হয়, কেবল ব্রহ্মমাত্র থাকেন।

যে জ্ঞান শক্তির কথা বলা হইতেছিল—বলা হইল ব্রহ্মের অতি নিকট বলিয়া ইনিই প্রকাশ-স্বরূপিণী। জ্ঞানশক্তিকে সাত্বিক মায়া বলে। ইচ্ছাশক্তি রাজস মায়া। ক্রিয়াশক্তি তামস মায়া। তমোমায়াত্মক যিনি তাঁহার নাম রুদ্র। সাত্বিক মায়াত্মক যিনি তিনি বিষ্ণু। রাজস মায়াত্মক যিনি তিনিই ব্রহ্মা। শ্রুতি বলেন "চতুর্ব্বর্ণাত্মকোঙ্কারো মম প্রাণাত্মিকা দেবতা। অহমেব জগত্রয়স্যপতিঃ। মম বশানি সর্ব্বাণি। * * * গগনো মম ত্রিশক্তি মায়াস্বরূপঃ নান্যো-মদস্তি। তমো মায়াত্মকো রুদ্রঃ, সাত্বিক মায়াত্মকো বিষ্ণু, রাজস মায়াত্মকো ব্রহ্মা। ইন্দ্রাদয়-স্তামস রাজসাত্মিকা ন সাত্বিকঃ কোঽপি" ইত্যাদি।

এখন দেখ এই জগৎ কি? না ইহা কর্ম্মের মূর্ত্তি। শক্তিই কর্ম্মরূপে ব্যক্ত হয়। কর্ম্মরূপে ব্যক্ত হইতে হইলে অবয়বের আবশ্যক। এই জন্য জগৎ অবয়ব বিশিষ্ট। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই অপরা প্রকৃতি। পঞ্চতন্মাত্র + অহংতত্ব + মহত্তত্ব এবং অবিদ্যা—অপরা প্রকৃতি এই অষ্টভাগে বিভিন্ন হয়েন। এতদ্ভিন্ন আরও যে ষোড়শ ভাগে ইনি বিকৃত হন, তাহাকে বলে প্রকৃতি-বিকৃতি। ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত + একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহাই ইঁহার ষোড়শ ভাগ। এই অপরাপ্রকৃতিকেই বলে বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ।

অর্জ্জুন—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" এই জগৎ, এই অপরা প্রকৃতি জীবরূপা পরাপ্রকৃতি দ্বারা বিধৃত কিরূপে—এখন তাহাই বল।

ভগবান্—কে কাহাকে ধরিয়া রাখে প্রথমে তাহাই দেখ।

(১) যে যাহাতে অভিব্যক্ত হয় সে তাহাকে ধরিয়া রাখে। পটে দৃশ্য অভিব্যক্ত হয় বলিয়া পট দৃশ্যকে ধরিয়া রাখে। মায়াশবলিত ব্রহ্মে এই জগৎ অভিব্যক্ত বলিয়াই মায়া-শবলিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা জীব চৈতন্য এই জগৎ ধরিয়া আছেন।

(২) যাহা হইতে যাহা আত্মলাভ করে সে তাহাকে ধরিয়া রাখে। মৃত্তিকা হইতে ঘট আত্মলাভ করে বলিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঘট বিধৃত। চিন্ময় পুরুষ হইতে চেত্যভাব বা চিতি আত্মলাভ করে বলিয়া চিৎই চেত্যভাব বা চিতি বা শক্তিকে ধরিয়া রাখে। শক্তি-মান হইতে শক্তি আত্মলাভ করেন বলিয়া শক্তিমান শক্তিকে ধরিয়া রাখেন। আবার শক্তি বা চিতির ক্রিয়াই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ, পরব্রহ্মের মনোময়ী স্পন্দরূপিণী চিতি হইতেই আত্মলাভ করে, এই জন্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ স্পন্দরূপিণী চিতি বা জীব-চৈতন্য দ্বারাই বিধৃত।

(৩) আধার যাহা তাহা আধেয়কে ধরিয়া রাখে। অধিষ্ঠান চৈতন্যই জগদাধার। এই জন্য সমুদ্র তরঙ্গকে ধরিয়া থাকার মত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে চেতনই ধরিয়া আছেন। পরম চেতনের কথা কিছুই বলা যায় না। চিতিতে উপহিত যে চৈতন্য তিনিই কখন ঈশ্বর, কখন জীব।

এই চিতির অন্য নাম মহাপ্রাণ। স্পন্দরূপিণী মহাপ্রাণশক্তিই জগৎরূপ দেহ ধারণ করিয়া আছেন—যেমন যত দিন প্রাণ থাকে ততদিন দেহ সজীব থাকে সেইরূপ। সর্ব্বদেহে যেমন প্রাণ আছেন, সেইরূপ অপরা প্রকৃতির সর্ব্বত্র চেতন আত্মা বা পরাপ্রকৃতি বা চিতি আছেন। এই চিতি কোথাও অভিব্যক্ত, কোথাও বা আপন আবরণে আপনি বিশেষরূপে বদ্ধ। এই বিশেষ আবৃতাবস্থাই জড়ত্ব।

চিতিকে শ্রুতি প্রাণ বলিয়াছেন বলিয়া "জীবভূতা" ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "প্রাণধারণ নিমিত্তভূতাং"। প্রাণধারণের হেতুই এই জীবচৈতন্য—অথবা চিতিতে প্রতি-বিম্বিত পুরুষ। আবার "ধার্য্যতে" ইহা ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "স্বতো বিশীর্য্য উত্তভ্যতে" আপনা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্তম্ভভাব বা স্থিরভাব ধারণ করে। অগ্নিকণা অগ্নি হইতে আত্মলাভ করে। অগ্নি, অগ্নি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যদি এই অগ্নিকণার ভিতরে অগ্নি রাখিয়া বাহিরে স্থিরভাব ধারণ করে, তবে বলা হয় অগ্নিকণারাশি মধ্যে অগ্নি আবদ্ধ হইয়া রহিল। এই ভাবে জড়টা কোথা হইতে আসিল বুঝা যায়। স্পন্দধর্ম্মী চিতি স্পন্দন করিতে করিতে চিৎ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। স্পন্দনে যে তেজঃপদার্থ বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া একটা আবরণ সৃজন করে। চৈতন্যের এই আবরণই জড়। চৈতন্যের আবরণ বলিয়া প্রকৃতিকেও যেমন জড় বলা হয়, সেইরূপ চিতি বা শক্তির আবরণ যে সমস্ত স্থূল দেহ তাহাকেও জড় বলে। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যে শ্রুতিব্যাখ্যা আছে তাহাতে বলা হইয়াছে

"স চ ব্যাখ্যাতোঽবিদ্যা বিষয়ঃ। সর্ব্বএব দ্বিপ্রকারোঽন্তঃপ্রাণউপষ্টম্ভকো গৃহস্যেব স্তম্ভাদিলক্ষণঃ প্রকাশকোঽমৃতো। বাহ্যশ্চ কার্য্যলক্ষণোঽপ্রকাশক উপজনাপায় ধর্ম্মকর্ম্মক-তৃণকুশমৃত্তিকাসমো গৃহস্যেব সত্যশব্দবাচ্যো মর্ত্ত্যাস্তেনামৃতশব্দবাচ্যঃ প্রাণশ্ছন্ন ইতি চোপ-সংহৃতঃ। স এব প্রাণো বাহ্যাধার ভেদেষণেকধা বিসৃতাঃ। প্রাণ একোদেব ইত্যুচ্যতে। ভাবার্থ এইঃ—দুই প্রকার অবিদ্যার কথা বলা হইতেছে। এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্য প্রপঞ্চের সমস্ত বস্তুই দুই প্রকার। বাহিরের আবরণটা শরীর, আবার শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণই উপষ্টম্ভক। যে প্রকার স্তম্ভ প্রভৃতি গৃহের উপষ্টম্ভক হইয়া থাকে—গৃহকে ধরিয়া রাখে সেই প্রকার ঐ প্রাণই উপষ্টম্ভক, প্রকাশক, অমৃত। বস্তুর এই অন্তরাংশটিই প্রাণাংশ। ইহাই প্রকাশক, স্থায়ী ও অমরণশীল। বস্তুর বাহ্যাংশটি কার্য্যাত্মক, অপ্রকাশক, উৎপত্তি বিনাশ ধর্ম্মী—গৃহের মৃত্তিকা তৃণ কুশাদির তুল্য। বাহ্যাংশ বা জড়াংশটি চেতনধর্ম্মা প্রাণাংশকে আচ্ছাদন করে, কিন্তু প্রাণটি জড়কে ধরিয়া আছে। এই প্রাণ বাহ্য আধারের ভেদ প্রযুক্ত অনেক রূপে বিসৃত।

আর একদিক্ দিয়া দেখ, পরা প্রকৃতি দ্বারা অপরা প্রকৃতি বিধৃত কিরূপে? এই যে বৃক্ষটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—যাহার তলে আমরা গীতা আলোচনা করিতেছি—এই বৃক্ষটি জীবিত কিরূপে? বৃক্ষ কেশের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু এই রস উপরে উঠিতেছে কিরূপে? কিরূপে ইহা উর্দ্ধে উঠিয়া বৃক্ষের প্রতি অঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে? জল নীচের দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু এই রসপ্রবাহ উর্দ্ধে চলিতেছে কিরূপে? যেমন ফোয়ারা হইতে জল উপরে ছুটিয়া থাকে, সেইরূপ কোন শক্তি হইতে ইহা শক্তিলাভ করিতেছে ইহা সন্দেহ নাই। প্রতি ক্রিয়াশক্তির মূলে ইচ্ছাশক্তি আছে। ইচ্ছা শক্তিটি পরা প্রকৃতি, ক্রিয়াশক্তিটি অপরা প্রকৃতি। তোমার দেহকে চলাইতেছে, ফিরাইতেছে, তোমার ইচ্ছাশক্তি। দেহটী তোমার শক্তিকে বাহিরে আনয়নের যন্ত্র মাত্র। শক্তিই বীজ, কিন্তু বীজ মধ্যে অনাদি সঞ্চিত যে বাসনাসমূহ অবস্থিতি করে—বাসনাগুলি ভাবনা ব্যতীত আর কিছুই নহে—আবার যে ভাবনা স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নয়, সেই বাসনাগুলিই শক্তিকে উপাদান করিয়া বাহিরের স্থূলঅবয়ব ধারণ করে। শক্তিকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন জন্যই জড় অবয়ব। তবেই দেখ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দ শক্তিই দৃশ্য প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। সাকার মানবের ইচ্ছা এই দৃশ্য প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই জীবচৈতন্য। এই জীবচৈতন্যই পরা প্রকৃতি।

অর্জ্জুন—পরমাত্মাই জীবরূপে জড় প্রকৃতিকে ধরিয়া আছেন বলিতেছ। জীবই যদি পরমাত্মা হইলেন, তবে বদ্ধই বা কে হয় এবং মুক্তই বা হয় কে? পরমাত্মা ত সদাই মুক্ত। আর জীব, জড় প্রকৃতিকে ধরিয়া থাকিলেও ঐ প্রকৃতি দ্বারাই বদ্ধ—ইহাও তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন। যদিও পূর্ব্বে বলিয়াছ মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মত হওয়াই পরমাত্মার জীবত্ব তথাপি এই কঠিন তত্ত্ব আবার বল।

ভগবান্—পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু সদাই পূর্ণ। ইনি আনন্দ স্বরূপ, ইনিই চিৎ।

চিন্মাত্র প্রভু প্রথমে অজ্ঞান কল্পনা করেন। চিৎ অর্থ জ্ঞান। চিৎ যখন সৃষ্টিসংকল্প করেন, তখন তাঁহার ভাবনাময়ী স্পন্দশক্তি দেখিয়া 'আমি আর কিছু' এই যে ভাব হয়—ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মের অজ্ঞান কল্পনা। জ্ঞান তখন অজ্ঞানে মিশ্রিত হয়। 'আমিই আছি' ইহাই জ্ঞান। ইহার সহিত 'আমি আর কিছু' এই অজ্ঞান মিশ্রিত হয়। কেবল আমি আছি তথাপি আমি থাকিয়াও আমি ভুলিয়া অন্য কিছুমত হওয়াই প্রকৃতি। অজ্ঞানোপহত চিৎই প্রকৃতি। পরম চিৎ যিনি তিনি অখণ্ড পরমাত্মা। অজ্ঞানোপহত চিৎ যিনি তিনি খণ্ড জীবাত্মা। অখণ্ড প্রকাশের যে মায়া আবরণ তদ্দারাই জীব ভাব। জীবভাবটি, প্রকাশের আবরণ জন্যই বটে। এই আবরণটি সরাইলেই মুক্তি, পরম প্রকাশে স্থিতি। জ্ঞানলাভ করা অর্থ আর কিছুই নহে, প্রকাশের অজ্ঞানরূপ আবরণটি সরাইয়া ফেলা। এই আবরণটি অবিদ্যা বা মায়া। রজক যেমন ছাগবিষ্ঠারূপ মল দ্বারা বস্ত্রের মল ক্ষালন করে, সেইরূপ সাত্বিক বুদ্ধি অবিদ্যা বা বেদোক্ত কর্ম্মাদি দ্বারা প্রকাশের আবরণটি ভঙ্গ করিলেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

অর্জ্জুন—পরমা চিৎ যিনি তিনি অখণ্ড, তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার আবরণ কিরূপে হয় আবার বল।

ভগবান্—পরমা চিৎ মায়া প্রভাবেই জীবরূপে যেন বদ্ধ হয়েন,—যেন আবৃত হয়েন। মায়া চিতেরই শক্তি—চেত্যভাব। ঐ মায়া নিজ আবরণ শক্তি দ্বারা আপন আশ্রয় ব্রহ্মকে—যেন নাই—যেন প্রতীত হইতেছেন না ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান করাইয়া বিবিধ বাসনাময় মানস চেষ্টা তুলিতে থাকে। অসীম অপার চিৎস্বরূপ যিনি তিনি আকাশের মত। ইহাকে চিদাকাশ বলে। ইঁনিই পরমাত্মা। ইঁহাতে চেত্য বা দৃশ্যজগদ্ভাব একেবারেই নাই। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ আপনা আপনি বহু হয়, আবার সেই প্রকাশে বাহিরে প্রভাকারে যে স্পন্দন,—সেই নীল পীতাদিরূপে চিত্রিত হয়—সেইরূপ ঐ অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশের মায়িক বাসনাদি মার্গে যে স্পন্দন তাহাই স্থূল হইয়া জগদাকারে দাঁড়াইয়াছে। স্থূল কিরূপে হয় পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে।

স্থূল জগৎ ত সকলেই দেখিতেছি। কিন্তু ইহা যে দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীতুল্য—ইহা যে চিৎদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া চিত্তের অন্তর্গত প্রতিবিম্ব হইয়াও বাহিরে নামরূপে আকারবান্ হইয়াছে—ইহা যে স্বপ্নে মনোবিলাসের মত ভিতরে বহুচিত্র দেখাইয়াও বাহিরে আত্মমায়া দ্বারা জড়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে—দৃশ্য দেখিয়াই—ইহা চিৎদর্পণে প্রতিফলিত এইটি বোধ করিতে পারিলেই জগৎ কিরূপে মায়িক তাহা অনুভবে আসিবে। যে মায়া দ্বারা এইরূপ হইতেছে, সে মায়াটি কি? না চিত্তেরই মায়িক বাসনাদিরূপে স্পন্দন। চিদাকাশ অখণ্ড, তাহাতে মায়িক বাসনাদি খণ্ডভাবেই উদয় হয়। সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নবৎ প্রকাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও মায়িক বাসনাদি দ্বারা যেন সৃষ্টিরূপে ভাসেন। মায়িক বাসনাদি দ্বারাই তিনি যেন আবৃত হয়েন, যেন খণ্ডিত হয়েন। আবৃত হইয়া, খণ্ডিত হইয়া বিচিত্র বাসনার আকারে যেন বিচিত্র জগদাকারে প্রকাশিত হন। রসন্তঋতু যেমন ইচ্ছা করিয়া তরুলতার

বশিষ্ঠ—তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎপদ ও ত্বং পদ ইহাদের অর্থ জানিতে পারিলে যিনি তৎ তিনিই যে ত্বং এই ঐক্যজ্ঞান লাভ হইবে। অসি পদ দ্বারা এই একত্ব বুঝাইতেছে।

রাম—এই মহাবাক্য কোথায় প্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছিল প্রথমে তাহাই বলুন পরে ইহার অর্থ বিচার শুনিব।

বশিষ্ঠ—সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডস্থ সপ্তম কাণ্ডিকান্তর্গত এই মহাবাক্য। তথায় উদ্দালক মুনি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে ইহা প্রথমে উপদেশ করেন।

প্রতি বেদে এইরূপ মহাবাক্য দৃষ্ট হয়।

(১) সাম বেদের মহাবাক্য=তত্ত্বমসি।

(২) ঋগ্বেদের মহাবাক্য - প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

(৩) যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি।

(৪) অথর্ব্ব বেদের মহাবাক্য—অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

রাম—তত্ত্বমসির অর্থ বিচার কিরূপ করিতে হইবে এক্ষণে বলুন।

বশিষ্ঠ—সকলেই যে এই মহাবাক্যের অর্থ অবধারণ করিতে পারিবে তাহা মনে করিও না। এই মহাবাক্যের অর্থ অবধারণ করিতে হইলে যেরূপে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক শ্রীরাম গীতা হইতে প্রথমেই তাহা উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকল্পে হে রাম! তুমিই ইহা শ্রীলক্ষ্মণকে উপদেশ করিয়াছিলে। আবার এ কল্পেও যথা সময়ে করিবে। তুমিই সর্ব্ব শাস্ত্রের গুরু আমি মাত্র প্রকাশক। গুরুস্তং সর্ব্বশাস্ত্রণোমহমেব প্রকাশকঃ—এখানেও ঠিক।

রাম—বলুন।

বশিষ্ঠ—শ্রদ্ধান্বিত স্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো

গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধ মানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্ম জীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবা প্রকম্পনঃ ॥২৪॥

পূর্ব্ব শ্লোকের পরার্দ্ধে বলা হইয়াছে "আত্মানুসন্ধান পরায়ণো ভবেৎ" সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধান কর। ততঃ কিমিত্যাহ শ্রদ্ধান্বিত ইতি। আত্মানুসন্ধান পরায়ণ হইতে হইলে কি করিতে হইবে? তাহার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা।

শুদ্ধমানসঃ শুদ্ধং মানসং যস্য তাদৃশঃ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাদিতি ভাবঃ। শ্রদ্ধা-

স্থিতঃ গুরুবেদান্তবাক্যেষু শ্রদ্ধাবান্। মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ সুমেরুপর্ব্বতবৎ ক্ষোভ-রহিতঃ সন্, বিষয়াভিলাষাক্ষোভিতান্তঃকরণঃ সন্ ইত্যর্থঃ। অথ শ্রদ্ধাবন্তং সৎকুল-ভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং গুণবন্তমকুটিলং সর্ব্বভূতহিতে রতং দয়াসমুদ্রং সদ্-গুরুং বিবিধত্বপসঙ্গম্য গুরূপসত্ত্যানন্তরং গুরুপ্রসাদাবপি গুর্ব্বানুগ্রহাদেব তত্ত্বমসীতি বাক্যতঃ তত্ত্বমসীত্যাদি মহাবাক্যেন আত্মজীবয়োঃ পরমাত্মজীবাত্মনোঃ ঐকাত্ম্যং ঐক্যরূপং বিজ্ঞায় শ্রবণমননিদিধ্যাসন পরিপাকাভ্যাং সাক্ষাৎকৃত্য অপরোক্ষতয়া-ঽনুভূয়েতি যাবৎ। চ এবার্থঃ। সুখীভবেৎ সাক্ষাৎকৃত্যৈব সকলদুঃখহীনো ভবেৎ আনন্দরূপো ভবেদিত্যর্থঃ। রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীত্যাদি শ্রুতেরিতি।

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত, গুরুবেদান্ত বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসবান্ ব্যক্তি সুমেরু পর্ব্বতবৎ ক্ষোভ শূন্য হইয়া—বিষয়াভিলাষ দ্বারা অক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ হইয়া গুরু শুশ্রূষানন্তর তদনুগ্রহক্রমে তত্ত্বমসীত্যাদি মহাবাক্যাদি দ্বারা পরমাত্মা ও জীবা-ত্মাকে শ্রবণমননিদিধ্যাসন উপায়ে একরূপ জানিয়া—অপরোক্ষানুভব করিয়া—সকল দুঃখ উপশমানন্তর আনন্দরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইবেন। শ্রুতিও বলিতেছেন সেই ব্রহ্ম নিশ্চয় আনন্দ স্বরূপ, সেই আনন্দরূপ ব্রহ্মকে ঈশ্বর ও জীবের সহিত অভেদ জানিয়া বিরক্ত কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী আনন্দ স্বরূপ হয়েন ইতি।

এইরূপ প্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র জ্ঞানের সাধন তত্ত্বমসি বাক্য ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থ বিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বং পদার্থৌ পরমাত্মজীবকা
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ ॥২৫॥

আদৌ প্রথমে। বিধানতঃ বেদোক্তবিধিনা ভ্রমপ্রমাদরহিত্যেন বাক্যার্থ-বিজ্ঞানস্য বিধাবুৎপত্তৌ আদৌ প্রথমং মুখ্যমিতি যাবৎ। পদার্থাবগতিঃ তত্ত্ব-মসীতি বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক পদানামর্থাবগতিঃ কর্ত্তব্যেতি শেষঃ। হি যস্মাৎ সা বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ তত্ত্বমসীতি সমগ্রবাক্যার্থস্য বিশেষজ্ঞানকর্ম্মণি কারণং ভবতি। তানেব পদার্থানাহ তত্ত্বমিতি। তত্ত্বংপদার্থৌ তৎপদস্য ত্বং পদস্য চ অর্থৌ

পরমাত্মজীবকৌ ভবত ইতিশেষঃ। স্বার্থেক প্রত্যয় ইতি। এবং তত্ত্বং পদার্থাবভিধায় অসীতি পদস্তার্থমাহ অসীতিতি। অথ অনয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োরৈকাত্ম্যং ঐক্যং তদ্বোধকং অসীতেত্যাৎ পদস্যার্থো ভবতি। চ কারউক্ত সমুচ্চয়ার্থঃ॥

প্রথমে বেদোক্ত বিধানানুসারে—ভ্রমপ্রমাদরহিত বাক্যার্থ বিজ্ঞানের বিধি অনুসারে তত্ত্বমসি বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক পদের অর্থ জানা উচিত। যেহেতু সেই অর্থাবগতি তত্ত্বমসি এই সমগ্র বাক্যার্থবোধের কারণ। তৎপদের অর্থ পরমাত্মা এবং ত্বংপদের অর্থ জীবাত্মা। [তত্ত্বমসির তৎ ও ত্বং এই উভয় পদের প্রত্যেকের বাচ্য ও লক্ষ্যস্বরূপ দ্বিবিধ অর্থ আছে তাহা পরে আলোচনা করা হইবে] এইরূপ "তত্ত্বং" পদের অর্থ কথনানন্তর "অসি" এই পদের অর্থ বলিতেছেন। তৎ ও ত্বং পদার্থের যে ঐক্য তাহাই অসি এই পদের অর্থ।

রাম—এখন বলুন "তৎ" পদের অর্থ কি ?

বশিষ্ঠ—প্রতি শব্দের সহিত তাহার অর্থের একটী সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধকে বলে শব্দের বৃত্তি। ঐ বৃত্তি দুই প্রকার। এক শক্তিবৃত্তি, দ্বিতীয় লক্ষণাবৃত্তি।

(১) শব্দ প্রয়োগ করিলেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে অর্থের জ্ঞান জন্মে তাহাই হইল শব্দের শক্তিবৃত্তি। যেমন "গঙ্গা" বলিলেই দেবনদীকে বুঝায়। অথবা কোন স্ত্রীলোকের নামও বুঝাইতে পারে। এই অর্থবোধ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সহজেই হয়। ইহা শক্তিবৃত্তি।

শব্দ প্রয়োগ করিলে পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থের যে জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ শক্তিবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত যে অর্থ তাহার অতিরিক্ত অর্থবোধ হয় তাহাই লক্ষণাবৃত্তি।

যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" "গঙ্গাতে গোপ বাস করে" ইহাতে গঙ্গা শব্দের অর্থ যে দেব-নদীপ্রবাহ তাহার অতিরিক্ত অর্থ করিতে হইবে। কারণ গঙ্গাজলে গোপের বসতি অসম্ভব। এইজন্য গঙ্গার অর্থ এখানে গঙ্গাতীর। ইহাই লক্ষণাবৃত্তি।

শক্তিবৃত্তিজাত যে অর্থ তাহার নাম বাচ্যার্থ, আর লক্ষণাবৃত্তিজাত যে অর্থ তাহার নাম লক্ষ্যার্থ।

রাম—তৎপদের বাচ্যার্থ ই বা কি আর লক্ষ্যার্থ ই বা কি ?

বশিষ্ঠ—তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। আর ঐ লক্ষ্যার্থের যে তিন প্রকার ভেদ আছে তন্মধ্যে শেষের অর্থ টি গ্রহণ করিতে হইবে তজ্জন্য প্রথমে লক্ষণাবৃত্তিজাত অর্থের ত্রিবিধ ভেদ শ্রবণ কর।

লক্ষণাবৃত্তি তিন প্রকার। (১) জহৎ স্বার্থলক্ষণা (২) অজহৎ স্বার্থলক্ষণা (৩) জহদজহৎ স্বার্থলক্ষণা বা ভাগ ত্যাগ লক্ষণা। আবার বলি তত্ত্বমসি বাক্যে যে ঐক্যজ্ঞান জন্মিবে তাহা অনুভব করিতে হইলে তৎ ও ত্বং এর অন্য অর্থ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল ভাগ ত্যাগ লক্ষণাই গ্রহণ করিতে হইবে; সেইজন্য এই ত্রিবিধ লক্ষণা জানা আবশ্যক।

তিনটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্রিবিধ লক্ষণা বুঝান যাইতেছে।

(১) গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি ... ... জহৎ স্বার্থলক্ষণা।

(২) কাকেভ্যো দধিরক্ষতাম্ ... ... অজহৎ স্বার্থলক্ষণা।

(৩) সোঽয়ং দেবদত্ত ... ... ভাগ ত্যাগ লক্ষণা।

(১) গঙ্গাতে গোপ বাস করে—এখানে "গঙ্গা" শব্দের প্রকৃত অর্থ যে দেবনদীপ্রবাহ তাহা ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর অর্থ করিতে হইবে। ইহা জহৎ স্বার্থ—(নিজের অর্থ ত্যাগ) লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

(২) কাকে যেন দধি না খায়—এখানে কাক হইতেই দধি রক্ষা করিতে হইবে কুকুর বা বিড়ালকে দধি খাইতে দিতে হইবে এরূপ অর্থ নহে। এজন্য কাক ও অন্যান্য পক্ষী বা পশু হইতে রক্ষা করিতে হইবে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। ইহা অজহৎস্বার্থলক্ষণা। কারণ কাক এখানে আপনার অর্থ ত্যাগ না করিয়া ইহার অতিরিক্ত অর্থ বুঝাইতেছে।

(৩) সেই এই দেবদত্ত—এই বাক্যে কোন দেশে কবচকুণ্ডলধারী হৃষ্টপুষ্ট দেবদত্তকে যে সময়ে দেখা হইয়াছিল এক্ষণে তাহাকে অন্যস্থানে কবচকুণ্ডলহীন কৃশ দেখিতেছি। দুই দেবদত্তের মধ্যে বিশেষণগুলি ত্যাগ করিয়া শুধু বিশেষ্যটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় সেই ব্যক্তিই এই ব্যক্তি। যে ভাগে বৈসাদৃশ্য আছে তাহা ত্যাগ করিয়া যখন একতা অংশটিমাত্র গ্রহণ করা হয় তখন উহাকে ভাগত্যাগলক্ষণা বলে।

এখন প্রথমে তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যার্থ কি ও লক্ষ্যার্থ বা কি তাহা দেখ।

যেমন 'গঙ্গাতে গোপ বাস করে' এই বাক্যের মধ্যে গঙ্গা শব্দের বাচ্যার্থ হইতেছে দেবনদীপ্রবাহ ; কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে নদীপ্রবাহে গোপের বাস অসম্ভব হয় বলিয়া গঙ্গা শব্দে গঙ্গাতীর এই অর্থ করিতে হইবে, সেইরূপ তত্ত্বমসি বাক্যের অন্তর্গত তৎপদের বাচ্যার্থ হইতেছে সমষ্টি অজ্ঞান বা মায়া + মায়া উপহিত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পরোক্ষাদি বিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্য + ঈশ্বরচৈতন্যের আধার স্বরূপ সর্ব্ব উপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধ চৈতন্য। মায়া + মায়া অবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চৈতন্য + তাহার আধার শুদ্ধব্রহ্মচৈতন্য এই মিলিত বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে, তত্ত্বমসি-বাক্যে যে ঐক্যজ্ঞান আছে তাহা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ তৎটিকে ত্বংএর সহিত অভিন্ন প্রমাণ করা যায় না। কারণ ত্বং পদের বাচ্যার্থ হইতেছে ব্যষ্টি অজ্ঞান বা অবিদ্যা + অবিদ্যা উপহিত অল্পজ্ঞত্ব ও অপরোক্ষাদি গুণবিশিষ্ট জীবচৈতন্য + জীবচৈতন্যের আধারস্বরূপ সর্ব্ব উপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য। এ স্থানে সমষ্টি যেমন ব্যষ্টির সহিত এক হয় না সেইরূপ মায়া ও অবিদ্যা এক নহে এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার সহিত যিনি অল্পজ্ঞ তাঁহার ঐক্য হইতে পারে না। এই জন্য তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

রাম—বুঝিলাম লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমে বলুন তৎ বা ত্বংপদের বাচ্যার্থে যে তিনটি করিয়া পৃথক্ বস্তু আছে তাহা একরূপে প্রতীয়মান হয় কিরূপে ?—তৎপদের পৃথক্ বস্তু তিনটি—মায়া + সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-চৈতন্য + অনুপহিত শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য এই বস্তুত্রয় এবং ত্বংপদের পৃথক বস্তু তিনটি অবিদ্যা + অল্পজ্ঞ জীবচৈতন্য + অনুপহিত শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য এই বস্তু তিনটিই বা একরূপে প্রতীয়মান হয় কিরূপে ?

বশিষ্ঠ—এই বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টান্ত পরে দিতেছি এখানে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে অগ্নির অত্যন্ত সংযোগে যেমন লৌহপিণ্ডকে অগ্নি বলিয়াই বোধ হয়—অগ্নি ও লৌহ ভিন্ন পদার্থ হইলেও এবং লৌহের দাহিকাশক্তি না থাকিলেও যেমন লোকে বলে লোহায় দগ্ধ করিতেছে অর্থাৎ লোহার সহিত একীভূত অগ্নিকেই লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বলে সেইরূপ মায়া, সর্ব্বজ্ঞচৈতন্য ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য পৃথক বস্তু হইলেও উহারা একীভূত হইয়া ভাসমান হওয়ায় এক বস্তুই বোধ হয়। এইরূপে অবিদ্যা, অল্পজ্ঞ জীবচৈতন্য ও পরিপূর্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় এক বোধ হয়।

রাম—বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে তবে একত্ব বুঝা যাইবে। এখন বলুন তৎ ও ত্বংপদের লক্ষ্যার্থ কি ?

বশিষ্ঠ—তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ বিচারই আত্মবিচার। আত্মবিচারই শেষ সাধনা। বিশেষ সাবধান হইয়া না শুনিলে ইহার অর্থ উপলব্ধি করা যাইবে না ; এজন্য আবার প্রথম হইতে বলি শ্রবণ কর।

তথাহি তত্ত্বমসীতি বাক্যান্তর্গতয়োস্তত্ত্বং পদয়োঃ প্রত্যেকং দ্বিবিধোঽর্থো বাচ্যো-লক্ষ্যশ্চেতি। তত্র অজ্ঞানাদি সমষ্টিঃ তদুপহিতং সর্ব্বজ্ঞত্ব পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টং চৈতন্যং এতদনুপহিতঞ্চৈতৎ এয়ং তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদেকত্বেন ভাসমানং সৎ তৎপদ বাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থো ভবতি।

অজ্ঞানাদি ব্যষ্টিঃ এতদুপহিতাল্পজ্ঞত্বা পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টঃ চৈতন্যং এতদনু-পহিত চৈতন্যঞ্চৈতৎ এয়ং তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদেকত্বেনাবভাসমানং সৎ ত্বং পদ-বাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং প্রত্যাগানন্দং তুরীয়ং কুটস্থচৈতন্যং তৎ পদলক্ষ্যার্থো ভবতি॥

তৎ পদের লক্ষ্যার্থ হইতেছে সমষ্টি অজ্ঞান বা মায়া উপহিত ঈশ্বর চৈতন্যের আধার যে অনুপহিত শুদ্ধ মায়াতীত ব্রহ্মচৈতন্য তাহাই। ব্যষ্টি অজ্ঞান বা অবিদ্যা উপহিত জীব চৈতন্যের আধার যে অনুপহিত প্রত্যাগানন্দ-স্বরূপ তুরীয় কূটস্থচৈতন্য তিনিই ত্বংপদের লক্ষ্যার্থ।

এক কথায় বলা যায় তৎপদের বাচ্য অর্থ হইতেছে মায়োপাধিক সর্ব্বজ্ঞ-ত্বাদি বিশিষ্টচৈতন্য আর লক্ষ্যার্থ হইতেছে মায়ারহিত শুদ্ধচৈতন্য।

ঐরূপ ত্বংপদের বাচ্য অর্থ হইতেছে মায়াকার্য্য—অবিদ্যোপাধিক অল্পজ্ঞ-ত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য আবার লক্ষ্যার্থ হইতেছে উপাধিরহিত শুদ্ধচৈতন্য।

রাম—তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ তবে কোন্ লক্ষণা অনুসারে হইল ?

বশিষ্ঠ—(১) জহৎ স্বার্থলক্ষণা অনুসারে সম্পূর্ণ বাচ্য অর্থ ত্যাগ হইবে। যেমন গঙ্গায় গোপ বসতি করে এই বাক্যের অন্তর্গত গঙ্গা শব্দের বাচ্যার্থ যে দেবনদীপ্রবাহ ইহা ত্যাগ করিলে জহৎ স্বার্থলক্ষণা মত অর্থ হয় সেইরূপ তত্ত্বমসি মহাবক্যের অন্তর্গত তৎ ও ত্বংপদের বাচ্যার্থ ত্যাগ করিলে একদিকে মায়া + মায়োপাধিক ঈশ্বরচৈতন্য + শুদ্ধচৈতন্য তিনিই বাদ পড়ে আবার অবিদ্যা + অবিদ্যোপাধিক জীবচৈতন্য + শুদ্ধচৈতন্য এই তিনও বাদ পড়ে। ইহাতে একতাসিদ্ধ হয় না। এজন্য জহৎ স্বার্থলক্ষণামত তত্ত্বমসির অর্থ হইবে না।

(২) যেখানে অজহৎ লক্ষণা হইবে সেখানে বাচ্যার্থের কিছুই ত্যাগ হইবে না বরং অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তৎ ও ত্বংপদের অর্থের কিছুই ত্যাগ না হইলে মায়া ও অবিদ্যার একতা এবং সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞত্বের একতা সাধন করিতে হয় তাহাও অসম্ভব।

(৩) যেখানে ভাগত্যাগ লক্ষণা সেখানে বিরোধীভাগ ত্যাগ করিয়া অবিরোধীভাগ গ্রহণ করিতে হয়। মহাবাক্যে ইহা প্রয়োগ করিলে তৎ ও ত্বংপদেব বাচ্য অর্থ হইতে মায়া ও অবিদ্যারূপ বিরোধীভাগ ত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব এই বিরোধীচৈতন্য ভাগত্যাগ করিয়া অবিরোধী অসঙ্গ শুদ্ধচৈতন্য ভাগ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়, এবং উহাদের একতাও সিদ্ধ হয়। এইজন্য ভাগত্যাগলক্ষণা অনুসারে অর্থ করিলে তবে তৎ ও ত্বংএর একতা সিদ্ধ হয়।

রাম—"অসি" পদের দ্বারা তৎ ও ত্বংপদের একত্ব সাধিত হইতেছে পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছেন। এক্ষণে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিন।

বশিষ্ঠ—তৎপদের অর্থে সমষ্টি অজ্ঞান, সমষ্টিচৈতন্য এবং তদাধার অখণ্ড শুদ্ধচৈতন্য এই তিনটি একত্রে। ত্বংপদে ব্যষ্টি অজ্ঞান, ব্যষ্টিচৈতন্য এবং তদাধার শুদ্ধ অখণ্ডচৈতন্য এই তিনটি একত্রে।

এখন সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির স্থান কোথায় ইহা ভাল করিয়া ধারণা কর।

বন ইহা বৃক্ষসমষ্টি। একটি বৃক্ষ ব্যষ্টি।

আকাশকে অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ মনে কর। বনের ভিতরে বাহিরে যে আকাশ আছে সেই আকাশকে অখণ্ড আকাশের পরিচ্ছিন্ন অংশ মনে কর। অখণ্ড আকাশ সর্ব্বদা অখণ্ড আকাশই আছে। তাহার কোন এক স্থানে 'বন' উঠাতে যেন ইহা বনদ্বারা পরিচ্ছিন্নমত বোধ হইতেছে।

এখন ব্যষ্টিবৃক্ষটি লও। সমষ্টিবৃক্ষ উপহিত যে আকাশ তাহা যেন অখণ্ড আকাশের এক অংশ। আবার বৃক্ষটির আশে পাশে ভিতরে বাহিরে যে আকাশ তাহা বনাকাশের মধ্যে এক অংশমাত্র। একটি বৃক্ষ যেমন বনের অংশ সেইরূপ বৃক্ষাকাশটিও আকাশের অংশ। এই দুই আকাশই কিন্তু অখণ্ড আকাশের পরিচ্ছিন্নমত ভাগ মাত্র। এই পরিচ্ছেদ বাস্তবিক নহে। উপাধি-যোগে ইহা কল্পিত। বন ও বৃক্ষ এই দুই উপাধি ত্যাগ হইয়া গেলে অখণ্ড আকাশ যে সর্ব্বদা আপন অপরিচ্ছিন্নভাবে দণ্ডায়মান তাহা বোধ হয়। কিন্তু

বন ও বৃক্ষ এই দুই উপাধি কিরূপে ত্যাগ করা যায় যদি জিজ্ঞাসা কর তদুত্তরে বলি অগ্রে ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে পৌঁছান যায় কিরূপে তাহাই শ্রবণ কর।

কোন হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন তুমি কোন দ্রব্য ক্রয় করিতেছ তখন তুমি অনেক পৃথক্ পৃথক্ শব্দ শুনিতে পাও। কিন্তু হাটের বাহিরে আসিয়া যখন তুমি ক্রয় বিক্রয় চিন্তা না করিয়া শুধু দাঁড়াইয়া শ্রবণ কর অর্থাৎ শ্রোতাভাবে দাঁড়াও তখন সমস্ত মনুষ্যের সমস্ত শব্দের একটা সমষ্টিশব্দ মাত্র শোনা যাইতেছে বুঝিতে পার। সেইরূপ সংসার হাটে যতদিন তুমি বেচা কেনা কর তত্দিন তুমি ব্যষ্টিভাবেই থাক। কিন্তু সংসার হইতে একান্তে আসিয়া বেচাকেনারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়া যখন তুমি শুধু দ্রষ্টাভাবে থাক তখন তুমি সমষ্টিভাবে আসিয়া পৌঁছাও। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিভাবে পৌঁছিলে তুমি, জীবচৈতন্যই যে ঈশ্বরচৈতন্য তাহা অনুভবে আনিতে পার। শাস্ত্র এইজন্য উপাসককে হরি হইয়া হরি ভাবিতে বলেন। আপনাকে ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ ভাবনা করাই অহং গ্রহোপাসনা। এই ভাবে অবিদ্যার অধীনতারূপ জীবভাব ত্যাগ করিয়া যখন মায়াধীশের ভাবে তুমি পৌঁছাও তখন তুমি ঈশ্বরেরমত অষ্টসিদ্ধি লাভে সমর্থ হও। তুমি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ হইয়া যাও। সত্যসঙ্কল্প পুরুষ মায়ার আশ্রয়। কাজেই মায়া ত্যাগ করা ও মায়া গ্রহণ করা—দুইই তাঁহার সহজ। যখন তিনি মায়া ত্যাগ করেন তখন তিনি বিশুদ্ধচৈতন্য, যখন মায়া গ্রহণ করিয়া লীলা করেন তখন তিনি ঈশ্বর অন্তর্যামী জীবের নিয়ামক ইত্যাদি!

ঈশ্বর সর্ব্বদা আপনস্বরূপ যে ব্রহ্ম সেই মায়াতীত ব্রহ্মভাবে থাকিয়াও মায়া লইয়া ঈশ্বরভাবে এবং অবিদ্যা লইয়া জীবভাবে খেলা করিয়া থাকেন। হে রাম! তুমিই সেই সনাতন পুরুষ। তুমিই মায়াধীশ বিশ্বরূপ। আবার তুমিই মায়ামানুষ কৌশল্যা হৃদয়নন্দন সীতাপতি।

আর এক কথা ব্যষ্টি হইয়া সমষ্টিচিন্তার স্থূলকৌশলও এখানে লক্ষ্য কর।

প্রতি বস্তুই একভাবে ব্যষ্টি অন্যভাবে সমষ্টি। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মানুষের দেহের মধ্যে যে অনন্তকোটী জীব রহিয়াছে সেই প্রতি জীবাণু সম্বন্ধে মানুষটি সমষ্টি। আবার বিরাট্পুরুষের তুলনায় একটি একটি জীব ব্যষ্টিমাত্র। মানুষ আপনাকে আপন দেহস্থ জীবসমূহ সম্বন্ধে বিরাট্পুরুষ ভাবনা করুক, করিয়া সমস্ত জীবজন্তুর সমষ্টিস্বরূপ বিরাট্ হিরণ্যগর্ভের ভাবনা

আভাসস্তুমৃষাবুদ্ধিরবিদ্যা কার্য্যমুচ্যতে।
অবিচ্ছিন্নস্তু তদ্‌ব্রহ্ম বিচ্ছেদস্তু বিকল্পতঃ ॥৪৯॥
অবিচ্ছিন্নস্য পূর্ণেন একত্বং প্রতিপাদ্যতে।
তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা ॥৫০॥
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ।
তদাঽবিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৫১॥

৩৭। পরমাত্মার সন্নিধি মাত্রেই মৎকর্ত্তৃক রচিত এই জগৎ, অজ্ঞানীজন তাঁহাতেই আরোপ করে।

৩৬-৪৩। অযোধ্যানগরে অত্যন্ত নির্ম্মল রঘুবংশে তাঁহার জন্ম, বিশ্বামিত্র সহায় করা, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করা, অহল্যাকে শাপমুক্ত করা, হরধনুভঙ্গ করা, পরে আমার পাণিগ্রহণ করা, পরশুরামের দর্পচূর্ণ করা, অযোধ্যানগরে আমার সহিত দ্বাদশবর্ষ বাস করা, দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ রাক্ষস বধ, মায়ামৃগরূপী মারীচ বধ, মায়াসীতা হরণ, জটায়ুমোক্ষ, কবন্ধ রাক্ষস মুক্তি, শবরীর পূজা গ্রহণ, সুগ্রীব সম্মিলন, বালীবধ, পরে সীতান্বেষণ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, লঙ্কা অবরোধ, পুত্রাদি সহিত দুরাত্মা রাবণকে যুদ্ধে বধ, বিভীষণকে রাজ্যদান, পুষ্পক রথে আমার সহিত অযোধ্যায় আগমন এবং সর্ব্বশেষে রাম-রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্ম মৎকর্ত্তৃক আচরিত হইলেও, নির্ব্বিকার [জন্মাদিরহিত] কূটস্থ চৈতন্যে এই সমস্ত কর্ম্ম আরোপ করা হয়।

৪৪। বাস্তবিক কিন্তু রাম কোথাও গমনও করেন না, কোথাও দাঁড়াইয়াও থাকেন না, কোন শোক করেন না, কোন আকাঙ্ক্ষাও করেন না, কিছুই ত্যাগ করেন না, কিছুই করেন না—তিনি আনন্দস্বরূপ, চলনরহিত; কূটস্থ, পরিণামরূপ যে বিকার সেই বিকারহীন সদা একরূপ; কেবল মায়ার গুণে প্রবিষ্ট হইয়া মায়া যেমন যেমন দেখান, সেই সেই প্রকারে সৃষ্টিতে ভাসিয়া থাকেন। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন সর্পাকার অন্তঃকরণের পরিণাম হয় সেইরূপ। [কূর্ম্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ৩৪ অধ্যায়ে মায়া-সীতার হরণ উল্লেখ আছে, বাল্মীকি রামায়ণেও অগ্নিতে প্রবেশের আভাস দেওয়া আছে সেখানে শ্রীসীতা লক্ষ্মণের

ইহা জানি মম ভক্ত, মম ভাবে, স্থিতিলাভ করে।
ভক্তিশূন্য জনে, ক্রিয়া মোহে, শুধুই ডুবিয়া মরে।
মুক্তির সাধন ভক্তি—ভক্তিশূন্য হইবে যে জন।
শতেক জনমে তার, জ্ঞান মোক্ষ, নহে সমাপন ॥৫২॥
আমার চৈতন্য রূপ শ্রীরাম-হৃদয়
হে অনঘ! এ রহস্য! আমার বচন।
মম প্রতি ভক্তিহীন কপট-জনায়
ইন্দ্রের রাজত্ব পেলে না করিবে দান ॥৫৩॥

অনেন স্ত্রীণামেবংবিধোঽগ্নি প্রবেশো ন দোষায় বিপরীতং সর্ব্বপাপ হরশ্চেতিসূচিতম্। বাল্মীকিয়েঽপিঃ—মারীচবধার্থং গতে রামে রামহতেন রাম-শব্দ সদৃশ শব্দে রাক্রোশে কৃতে লক্ষণস্য রাম সহায়ার্থং গমন প্রেরণাবসরে অরণ্য কাণ্ডে।

অপিত্বাসহরামেণ পশ্যেয়ং পুণরাগতঃ।
লক্ষ্মণে নৈবমুক্তাতুরুদতী জনকাত্মজা ॥
প্রত্যুবাচ ততোবাক্যং তীব্র বাষ্প পরিপ্লুতা।
গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষণ! ॥
আবন্ধিষ্যেঽথবাত্যক্ষে বিষমে দেহমাত্মনঃ। ইতি।

বিষমেভৃগ্বাদৌস্থিত্বা ততঃ প্রপাতে নেত্যর্থঃ।

পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
নত্বহং রাঘবাদন্যং কদাঽপি পুরুষং স্পৃশে.॥

ইতি সীতোক্ত্যাসূচিতোঽয়মর্থঃ। অন্তথৈবং প্রতিজ্ঞায় রাবণশরীরে স্পর্শে জগন্মাতুঃ প্রতিজ্ঞা হানিঃ স্যাৎ। তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশন মিত্যনেন স্বকর্ত্তব্যার্থ এবোক্ত ইতি মন্তব্যম্। এতৎ প্রবেশাদেব হনুমৎ পুচ্ছ সংবদ্ধাগ্নিনা লঙ্কাদাহোপপত্তিঃ। অন্যথা রাবণ বশীকৃতেন লোকপালাগ্নিনা কথং তন্নগর দাহঃ স্যাৎ। এতৎ শক্তি প্রবেশেতু তস্য স্বাতন্ত্র্যহান্যা তদুপপত্তিরিত্যলম্॥

৫৩। এবমাদীনি ব্রাহ্মণেভ্যোদানাদীন্যাদিশব্দাৎ গ্রাহ্যানি। নির্ব্বিকারে=জন্মাদি রহিতে আরোপয়ন্তি এবং জগৎ কর্ত্তৃত্বাদিকমপি মন্নিষ্ঠমেব রামে আরোপয়তীত্যর্থঃ॥

এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি ॥৫২॥
ইদং রহস্যং হৃদয়ং মমাত্মনো
ময়ৈব সাক্ষাৎ কথিতং তবানঘ।
মদ্ভক্তিহীনায় শঠায় ন ত্বয়া
দাতব্যমৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোঽধিকম্ ॥৫৩॥

নিকট শপথ করিয়াছিলেন—রাঘব ভিন্ন আমি অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিব না। রাবণ মায়া-সীতাকেই স্পর্শ করিয়াছিল; নতুবা জগন্মাতার প্রতিজ্ঞাহানি হইত। আরও এক কথা আদ্যাশক্তি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, হনূমান পুচ্ছসংবদ্ধ অগ্নি দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছিল; নতুবা রাবণবশীকৃত লোকপাল অগ্নির লঙ্কা দগ্ধ করিবার সামর্থ্য ছিল না।

৪৫। শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন—হে পার্ব্বতি! অতঃপর শ্রীরাম স্বয়ং সম্মুখে দণ্ডায়মান হনুমানকে বলিলেন—আমি তোমাকে আত্মা—অনাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর।

[আত্মা=অক্ষর কূটস্থ ঈশ্বর; অনাত্মা=ক্ষরপুরুষ, চিদাভাস জীব; পরমাত্মা =শুদ্ধচৈতন্য, পরমপুরুষ।]

৪৬।৪৭। মহান্ আকাশের যেরূপ ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয় সেইরূপ চিৎ বা চৈতন্যও তিন প্রকার। আকাশের ত্রিবিধ ভেদ এই। (১) মহাকাশ—ইনি অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ।

(২) জলাশয়াবচ্ছিন্ন আকাশ—ইনি জল রাখিবার আধার যে জলাশয় তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন। (৩) প্রতিবিম্বাকাশ—ইনি জলের উপরে পতিত আকাশ প্রতিবিম্ব। এক মহাকাশই জলাশয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া একরূপ এবং জলের উপরে পতিত প্রতিবিম্ব রূপে ভাসিয়া অন্যরূপ। মহাকাশ সর্ব্বদা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বদা শান্ত। জলাশয়াবচ্ছিন্ন আকাশও সর্ব্বদা শান্ত কিন্তু জলাশয় দ্বারা একভাবে খণ্ডিত। প্রতিবিম্বাকাশ কিন্তু জলের চঞ্চলতা দ্বারা

শ্রীমহাদেব বাক্য— ১

এই ত বলিনু দেবি! আত্মতত্ত্ব! শ্রীরাম-হৃদয়।
অতি গুহ্য রম্য শুদ্ধ, ধারণায়, সর্ব্বপাপক্ষয় ॥৫৪॥
সাক্ষাৎ শ্রীরাম মুখে, ব্যক্ত ইহা, সর্ব্ব বেদ সার।
ভক্তিভাবে পড়ে যেই, সেই মুক্ত সন্দেহ কি তার ?৫৫॥

৪৪। নির্ব্বিকারত্বমেব রামস্যোপপাদয়তি। রাম ইতি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্। ইত্যাদি শ্রুতেঃ। আনন্দমূর্ত্তিরানন্দস্বরূপঃ। অচলঃ=কূটস্থোঽত এব পরিণামহীনঃ মায়াগুণান্=মায়য়াস্পৃষ্ট পদার্থাননুগতত্তদধিষ্ঠানত্বেন স্থিত স্তথা বিভাতি সৃষ্টিরূপোভাতি। যথা রজ্জ্ববচ্ছেদেন সর্পাকারোন্তঃকরণ পরিণাম ইতি রজ্জুঃ সর্পাত্মনাভাতি এতদেব বিবর্ত্তোপাদানত্বমিত্যাহুঃ। সচ সর্পাকারোন্তঃকরণ পরিণামঃ সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয় ইত্যুচ্যতে। এবং প্রপঞ্চোঽপ্যনির্ব্বচনীয় ইতি দিক্।

৪৫। উপস্থিতমাত্মনোঽদ্বিতীয়ত্বে জীবেশ্বরাদি ব্যবস্থা কথ মিতি জিজ্ঞাসয়োপপন্নম্। আত্মা=ঈশ্বরঃ। অনাত্মা=চিদাভাসোজীবঃ। পরাত্মা=শুদ্ধ চৈতন্যম্।

৪৬। তেষাং তত্ত্বমেব সদৃষ্টান্তমাহ। আকাশস্যেতি। একস্যাকাশস্য ত্রিবিধো ভেদঃ (১) মহাকাশো (২) জলাশয়াবচ্ছিন্ন আকাশঃ (৩) প্রতিবিম্বকাশশ্চেতি ভেদাৎ॥ তদেবাহ। মহানিতি। মহাকাশ ইত্যর্থঃ। স এব মহাকাশো জলাশয়ে তদবচ্ছিন্ন এব ভবতি। তত্রৈব জলাশয়ে পরং প্রতিবিম্বাখ্যং দৃশ্যতে। এবং নভস্ত্রিবিধমিত্যর্থঃ।

৪৭। এবং দৃষ্টান্তমুপপাদ্যদার্ষ্টান্তিকমাহ। বুদ্ধীতি। সর্ব্ববুদ্ধি সাক্ষিতয়া বুদ্ধ্যুপহিতং চৈতন্যম্। পূর্ণং=উপাধিমণ্ডলস্য বিভুত্বাদ্বিভু সকলবুদ্ধিসমষ্টিরেব মায়েতি তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যমীশ্বর ইত্যর্থঃ। অথাপরমাভাসস্তত্ত্ব দ্ধি প্রতিবিম্বভূতো জীব ইত্যর্থঃ। অপরং বিম্বভূতম্। এবং চিতিস্ত্রিধা ইত্যর্থঃ। আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমিতি পাঠে বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যমেকমিত্যনেনেশ্বরঃ পূর্ণমথাপরমিত্যনেন শুদ্ধমাভাসঃ ত্বপরমিতিজ্জীবঃ। জীবত্বমেব স্ফুটয়তি বিম্ববভূতমিতি বিম্বশব্দেন জাগ্রদবস্থাভিমানী বিশতিদেহেন্দ্রিয়াদিম্বিতিব্যুৎপত্তেঃ। এতৎ প্রতি-

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এতত্তেঽভিহিতং দেবি ! শ্রীরামহৃদয়ং ময়া।
অতিগুহ্যতমং হৃদ্যং পবিত্রং পাপশোধনম্ ॥৫৪॥
সাক্ষাৎ রামেণ কথিতং সর্ব্ব বেদান্তসংগ্রহম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৫॥

বহুভাবে খণ্ডিত। জল খণ্ডিত বলিয়া তদুপরি পতিত আকাশও বহুভাবে খণ্ড প্রাপ্ত।

এইরূপ চৈতন্যের ভেদও তিন প্রকার।

(১) বুদ্ধি অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রথম। ইনি জীব চৈতন্য। ইহার সহিত প্রতিবিম্বাকাশের তুলনা করা হইয়াছে।

(২) অথ অপরম্ পূর্ণম্। ইনি ঈশ্বর চৈতন্য। মায়াতে উপহত হইয়া ইনি সর্ব্ববস্তুতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। ইহার সহিত জলাশয় অবচ্ছিন্ন আকাশের তুলনা করা হইয়াছে।

(৩) অথ অপরমাভাসঃ বিম্বভূতম্। ইনি বিম্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য। ইনিই ব্রহ্ম। ইঁহার সহিত মহাকাশের তুলনা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বুদ্ধি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ব্রহ্ম। কারণ তিনি সর্ব্ব বুদ্ধির সাক্ষী বলিয়া বুদ্ধি উপহিত চৈতন্য।

[আবার সমষ্টি বুদ্ধি যে মায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনিই পূর্ণ। ইনি ঈশ্বর। মায়া পূর্ণ ভাবে সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ঈশ্বর চৈতন্য বলা হইতেছে। অপর বিম্বভূত অর্থাৎ প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে চৈতন্য তিনিই জীব।]

৪৮। অবুধ জনে ভ্রান্তি বশতঃ আভাস সহিত বুদ্ধির যে কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম এবং জীবত্ব, তাহা অবিচ্ছিন্ন অবিকারী সাক্ষীরূপ পরব্রহ্মে আরোপ করে। [শুদ্ধ চৈতন্যকে সাক্ষী বলা হয় কেন ? সাক্ষাৎ দ্রষ্টা যিনি তিনিই ত সাক্ষী ? শুদ্ধ চৈতন্যের দ্রষ্টৃত্ব কিরূপে হইবে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—চেতনের প্রতিবিম্বটিই হইতেছে আভাস। আভাসের সহিত যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ তাহাই আভাস বুদ্ধি। তাহারই মধ্যে কর্ত্তৃত্ব থাকে। যেমন কমল বীজের

ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ, বহুজন্মে, হলেও অর্জ্জিত।
নষ্ট হবে নিঃসন্দেহে, রামবাক্য, নহে অন্যমত ॥৫৬॥

বিম্বাকাশস্থানীয়মিতি ত্রিধাচিতিরিত্যর্থ ইত্যাহুঃ। তত্র দ্বৌ মিথ্যাভূতৌ উপাধ্যোর্মিথ্যাত্বাৎ॥

৪৮। নন্বেবং শুদ্ধচৈতন্যে সাক্ষীতি ব্যবহারানুপপত্তিঃ সাক্ষাৎ দ্রষ্টাহি সাক্ষী নচ শুদ্ধচৈতন্যে দ্রষ্টৃত্বমিত্যত আহ। সাভাসেতি। আভাসেন চেতনপ্রতিবিম্বেন সহিতা যা বুদ্ধেরন্তঃকরণস্যেত্যর্থঃ। তদ্গতং কর্ত্তৃত্বমবুধৈঃ সাক্ষিণি আরোপ্যতে তৈনায়ং সাক্ষিপদবাচ্য ইত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ।

জানাতীত্যাদাবন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষরূপাক্রিয়া জ্ঞাধাতুবাচ্যা। আভাসবিশিষ্টশ্চ তিঙর্থ আশ্রয়ঃ॥ পরস্পরাধ্যাসেনাভাসবুদ্ধ্যোবিবেকাগ্রহাৎ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ।

আত্মাভাসস্তুতিঙ্‌বাচ্যো ধাত্বর্থশ্চ ধিয়ঃ ক্রিয়া।
উভয়ং চাবিবেকেন জানাতীত্যুচ্যতে মৃষা॥
বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বমধ্যস্য জানাতীতি স্ত উচ্যতে।
তথা চৈতন্যমধ্যস্য জ্ঞত্বং বুদ্ধেরিহোচ্যতে॥ ইতি।

আত্মাভাস ইতি বহুব্রীহিঃ। ধীয়োঽন্তকরণস্য। তদেবাহ। উভয়ং চেতি মৃষেতি আভাসবুদ্ধি তৎক্রিয়াণাং মিথ্যাত্বাদয়ং ব্যবহারোঽপি মিথ্যেত্যর্থঃ। এবং চ সাভাস বুদ্ধিগত দ্রষ্টৃত্বস্যাবিচ্ছিন্নেঽপরিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি সাক্ষিণি বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্নাভাসতাদাত্ম্যাধ্যাসেনারোপঃ তথা জীবো নিত্যঃ সত্য ইত্যাদি ব্যবহারাজ্জীবত্বমপিতত্রারোপ্যত ইত্যর্থঃ॥

৪৯। আত্মাভাসমাদায়নূনং তথা ব্যবহার সম্ভব ইত্যাহ॥ আভাসস্থিতি॥ তস্য মৃষাত্বাদবিদ্যাকার্য্যত্বাচ্চতথাব্যবহারস্য তমাদায় নোপপত্তিরিত্যর্থঃ। ন দর্পণে মুখমস্তিমিথ্যৈবাত্র দর্পণে মুখমভাবাদিত্যেবং সর্ব্বসিদ্ধবাধানুভবাৎ। অতত্রবাসাববিদ্যাকার্য্যং গ্রীবাস্থমুখে আদর্শস্থত্বং স্বাধ্যাসিকং নতু বাস্তবমিতি বোধ্যম্। আভাসাসত্যত্বং চাকরে প্রপঞ্চিতং। বিস্তারভয়ান্নেহোচ্যতে। ননূক্তং ত্রৈবিধ্যং কিং চিতের্বাস্তবং নেত্যাহ। অবিচ্ছিন্নং বিচ্ছেদোভেদস্তদ্রহিতম্। নন্বেবং ত্রিধাচিতিরিত্যসঙ্গতং তত্রাহ। বিচ্ছেদ ইতি। ভেদ

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এতত্তেঽভিহিতং দেবি ! শ্রীরামহৃদয়ং ময়া।
অতিগুহ্যতমং হৃদ্যং পবিত্রং পাপশোধনম্ ॥৫৪॥
সাক্ষাৎ রামেণ কথিতং সর্ব্ব বেদান্তসংগ্রহম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৫॥

বহুভাবে খণ্ডিত। জল খণ্ডিত বলিয়া তদুপরি পতিত আকাশও বহুভাবে খণ্ড প্রাপ্ত।

এইরূপ চৈতন্যের ভেদও তিন প্রকার।

(১) বুদ্ধি অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রথম। ইনি জীব চৈতন্য। ইহার সহিত প্রতিবিম্বাকাশের তুলনা করা হইয়াছে।

(২) অথ অপরম্ পূর্ণম্। ইনি ঈশ্বর চৈতন্য। মায়াতে উপহত হইয়া ইনি সর্ব্ববস্তুতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। ইহার সহিত জলাশয় অবচ্ছিন্ন আকাশের তুলনা করা হইয়াছে।

(৩) অথ অপরমাভাসঃ বিম্বভূতম্। ইনি বিম্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য। ইনিই ব্রহ্ম। ইঁহার সহিত মহাকাশের তুলনা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বুদ্ধি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ব্রহ্ম। কারণ তিনি সর্ব্ব বুদ্ধির সাক্ষী বলিয়া বুদ্ধি উপহিত চৈতন্য।

[আবার সমষ্টি বুদ্ধি যে মায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনিই পূর্ণ। ইনি ঈশ্বর। মায়া পূর্ণ ভাবে সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ঈশ্বর চৈতন্য বলা হইতেছে। অপর বিম্বভূত অর্থাৎ প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে চৈতন্য তিনিই জীব।]

৪৮। অবুধ জনে ভ্রান্তি বশতঃ আভাস সহিত বুদ্ধির যে কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম এবং জীবত্ব, তাহা অবিচ্ছিন্ন অবিকারী সাক্ষীরূপ পরব্রহ্মে আরোপ করে। [শুদ্ধ চৈতন্যকে সাক্ষী বলা হয় কেন ? সাক্ষাৎ দ্রষ্টা যিনি তিনিই ত সাক্ষী ? শুদ্ধ চৈতন্যের দ্রষ্টৃত্ব কিরূপে হইবে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—চেতনের প্রতিবিম্বটিই হইতেছে আভাস। আভাসের সহিত যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ তাহাই আভাস বুদ্ধি। তাহারই মধ্যে কর্ত্তৃত্ব থাকে। যেমন কমল বীজের

ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ, বহুজন্মে, হলেও অর্জ্জিত।
নষ্ট হবে নিঃসন্দেহে, রামবাক্য, নহে অন্যমত ॥৫৬॥

বিদ্যাকাশস্থানীয়মিতি ত্রিধাচিতিরিতার্থ ইত্যাহুঃ। তত্র দ্বৌ মিথ্যাভূতৌ উপাধ্যোর্মিথ্যাত্বাৎ ॥

৪৮। নম্বেবং শুদ্ধচৈতন্যে সাক্ষীতি ব্যবহারানুপপত্তিঃ সাক্ষাৎ দ্রষ্টাহি সাক্ষী নচ শুদ্ধচৈতন্যে দ্রষ্টৃত্বমিত্যত আহ। সাভাসেতি। আভাসেন চেতন-প্রতিবিম্বেন সহিতা যা বুদ্ধেরন্তঃকরণস্যেতার্থঃ। তদ্গতং কর্তৃত্বমবুধৈঃ সাক্ষিণি আরোপ্যতে তৈনায়ং সাক্ষিপদবাচ্য ইত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ।

জানাতীত্যাদাবন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষরূপাক্রিয়া জ্ঞাধাতুবাচ্যা। আভাস-বিশিষ্টশ্চ তিঙর্থ আশ্রয়ঃ॥ পরস্পরাধ্যাসেনাভাসবুদ্ধ্যোবিবেকাগ্রহাৎ। তদুক্ত-মাচার্য্যৈঃ।

আত্মাভাসস্তুতিঙ্‌বাচ্যো ধাত্বর্থশ্চ ধিয়ঃ ক্রিয়া।
উভয়ং চাবিবেকেন জানাতীত্যুচ্যতে মৃষা ॥
বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বমধ্যস্য জানাতীতি জ্ঞ উচ্যতে।
তথা চৈতন্যমধ্যস্য জ্ঞত্বং বুদ্ধেরিহোচ্যতে ॥ ইতি।

আত্মাভাস ইতি বহুব্রীহিঃ। ধীয়োঽন্তকরণস্য। তদেবাহ। উভয়ং চেতি মৃষেতি আভাসবুদ্ধি তৎক্রিয়াণাং মিথ্যাত্বাদয়ং ব্যবহারোঽপি মিথ্যেত্যর্থঃ। এবং চ সাভাস বুদ্ধিগত দ্রষ্টৃত্বস্যাবিচ্ছিন্নেঽপরিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি সাক্ষিণি বুদ্ধিতাদাত্ম্যা-পন্নাভাসতাদাত্ম্যাধ্যাসেনারোপঃ তথা জীবো নিত্যঃ সত্য ইত্যাদি ব্যবহারাজ্জীবত্ব-মপিতত্রারোপ্যত ইত্যর্থঃ ॥

৪৯। আত্মাভাসমাদায়নূনং তথা ব্যবহার সম্ভব ইত্যাহ॥ আভাসস্ত্বিতি॥ তস্য মৃষাত্বাদবিদ্যাকার্য্যত্বাচ্চতথাব্যবহারস্য তমাদায় নোপপত্তিরিত্যর্থঃ। ন দর্পণে মুখমস্তিমিথ্যৈবাত্র দর্পণে মুখমভাবাদিত্যেবং সর্ব্বসিদ্ধনাধানুভবাৎ। অতত্রবাসাববিদ্যাকার্য্যং গ্রীবাস্থমুখে আদর্শস্থত্বং ত্বাধ্যাসিকং নতু বাস্তবমিতি বোধ্যম্। আভাসাসত্যত্বং চাকরে প্রপঞ্চিতং। বিস্তারভয়ান্নেহোচ্যতে। ননূক্তং ত্রৈবিধ্যং কিং চিতের্বাস্তবং নেত্যাহ। অবিচ্ছিন্নং বিচ্ছেদোভেদ-স্তদ্রহিতম্। নম্বেবং ত্রিধাচিতিরিত্যসঙ্গতং তত্রাহ। বিচ্ছেদ ইতি। ভেদ

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

শুভকথা।

১। ঈশ্বর এই সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন। যাহারা জগতের অনিষ্ট করে—সৃষ্টবস্তুর বিনাশ করে—তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট হয়। আর যাঁহারা ঈশ্বর পালিত এই জগৎ রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। অতএব লোকহিতকর কার্য্য করিবে। * মহানির্ব্বাণ।

২। ওঁকারের তিনটি মাত্রা [অ উ ম] পৃথক ভাবে প্রয়োগ করিলে লোকে মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না। উক্ত মাত্রাত্রয় পরস্পর আসক্ত; ব্রহ্মবাচক অর্থে ব্যবহৃত। বাহ্য অভ্যন্তর ও মধ্যম ক্রিয়াতে সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে, জ্ঞানীব্যক্তি বিচলিত হন না। প্রশ্নোপনিষদ্।

তিন মাত্রার ধ্যান সমকালে কিরূপ হইবে?

অ=ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। উ=বিষ্ণু পালনকর্ত্তা। ম=মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা। যেখানেই সৃষ্টি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্থিতি ও লয় ব্যাপার রহিয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জগৎ যেরূপে ও যে জন্য সৃষ্ট হইতেছে, লোকপালাদি দ্বারা যেরূপ ইহার রক্ষা হইতেছে, এবং অন্তে যেরূপে সমস্ত সৃষ্টি স্পন্দন মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া, সেই পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভুকে স্পর্শমাত্রে লয় হইয়া যাইতেছে, ইহা সমকালে চিন্তা করিতে পারিলে, ওঁকারের ধ্যান হয়। পরম শান্ত চলন রহিত পরম

পদই পরব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই তাঁহার একদেশে মায়ার উদ্ভব হয়। মায়ার সহিত একপাদ মিলিত হইলেই ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম হয়েন। সগুণ ব্রহ্ম মায়াকে লইয়া সৃষ্টি করেন। মায়া বা শক্তির স্পন্দনেই সৃষ্টি। সূর্য্যদেব সমস্ত রশ্মিগুলি নিজের মধ্যে গুটাইয়া, যখন সূর্য্য ও দীধিতি এক হইয়া থাকেন—যখন শক্তিও শক্তিমান্ এক থাকেন, তখন সৃষ্টি নাই। প্রাতঃকালে সূর্য্য যখন আপন রশ্মি বিকীর্ণ করেন, যখন রশ্মিগুলি স্পন্দন করিতে করিতে বাহিরে আসিতে থাকে, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়! পরে সেই স্পন্দন ক্রমে স্থিতিভাব লাভ করে, আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্য আপন রশ্মি সংযত করিয়া যখন সমস্ত লয় করেন, তখন আবার সেই অন্ধকারে জগৎ প্রসুপ্ত হইয়া যায়। নাভিতে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু ও ললাটে মহেশ্বর চিন্তা, এই জন্য ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া।

৩। তুমি দুঃখসাগর পার হইবার জন্য মহান্ পুণ্যরূপ মূল্য দিয়া, দেহরূপ নৌকা ক্রয় করিয়াছ, অতএব ইহা যাবৎ না ভাঙ্গিয়া যায়, তাবৎ ইহা দ্বারা দুঃখ সাগর পার হইবার চেষ্টা কর! দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম এবং শরীরের অবৈকল্য লাভ করিয়াও যে নরাধম সংসার হইতে অপক্রান্ত না হয় সে আত্মঘাতী।

৪। এই সংসারে পরলোক হিত বিধানার্থ যতিগণ তপশ্চরণ করেন, যাজ্ঞিকগণ হোমানুষ্ঠান করেন, এবং দাতারা দান করিয়া থাকেন।

৫। দান ও তপস্যার মধ্যে দানই দুষ্কর। দান করিলে ধনক্ষয় হয় না; পরন্তু তাহা বৃদ্ধি পায়। মূর্খ মানব ইহজন্মে দরিদ্রতার আশঙ্কায় ধন দান করে না; কিন্তু প্রাজ্ঞব্যক্তি কালে দারিদ্র্যের আশঙ্কায় ধন দান করিয়া থাকেন।

৬। যাহারা দান না করে তাহারাই জন্মান্তরে দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, মূর্খ ও পরাধীনরূপে বিবিধ দুঃখ ভাজন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৭। ধনবান্ হইয়াও যদি দান না করে, এবং দরিদ্র হইয়াও যদি তপস্যা না করে, তবে তাহাদিগকে কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত করা কর্ত্তব্য।

ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রং বা তপস্বিনম্।
উভাবম্ভসি মোক্তব্যৌ কণ্ঠে বদ্ধা মহাশিলাম্॥

মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিকা খণ্ড। ১ম ২য় অধ্যায় হইতে।

বিবিধ কথা।

কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়] কত লোক তাঁহাকে পাইয়াছে, আমি কি পাইব না? আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও ত তুমিই বলিবে, তাই তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আচ্ছা, তুমি একবার ভাবত, তিনি আমার সঙ্গে কথা কন, আর তোমার সঙ্গে কথা কন না কেন? আমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকি, গোপীরা যেমন "তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্গুণানেবগায়ন্ত্যঃ নত্মা গায়াণি সস্মরুঃ। কখন তন্মনা হইয়া, কখনও তাঁহার প্রসঙ্গ লইয়া, কখন লীলার অনুকরণ করিয়া, কখন তন্ময় হইয়া, কখনও তাঁহার গুণগানে লুব্ধ-মতি হইয়া থাকিতেন, এবং এই উৎসবে মজিয়া গৃহে যাইবার কথাও যেমন ভুলিয়া যাইতেন, আমিও সেইরূপ ছায়ার মত তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন-প্রাণের অনুকরণ করি, তাই আমি তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন, আর তুমি ইহার বিপরীতটি কর, তাই তুমি তাঁহার বহিরঙ্গ, তাই তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেন না, এস আমি তুমি এক হইয়া যাই, তুমি তাহাকে পাইবে।

তুমি ত তোমার সহিত এক হইতেই বল, কিন্তু আমি যে পারি না। আর যদি একেবারে এক হইতে নাই পার, তুমি আমার অনুকরণ কর। আমি যেমন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে আর তোমাকে ডাকি না, আমিই বলি এইরূপ তুমি তাঁহার সঙ্গে নিজেই কথা বল, তিনি শুনিবেন না, নাই বা শুনিলেন, তুমি বলিয়া যাও, এবং তিনি শুনিয়াছেন ভাবিয়া তার পর যাহা বলিবার তাহাও বলিতে থাক, এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি নিজেই তোমার কথার জবাব দিবেন। তাহা হইলেই তুমি তাঁহাকে পাইলে, ইহা হইলে আমি তাঁহাকে পাইলাম সত্য, কিন্তু তিনি কি আমাকে পাইবেন না? তবে কি "কবে আমি তাঁহাকে পাইব" অর্থে কবে তিনি আমাকে পাইবেন? হাঁ তাইত। আমার সাধ যায়, আমি যে ভাবি আছি সেই ভাবেই থাকিব, আর আমার 'সোণায় সোহাগা হইবে' আমার সোণার সংসার তাঁহার সোহাগে লোকলোচনের নিকট লোভনীয় সুষমা লইয়া হাসিতে থাকিবে!

উঃ, তুমি বড় ভুল করিয়াছ এইজন্যই ত তুমি তাহাকে পাও না, তিনি বলিয়াছেন, সর্ব্বাশাঃ কিল সন্ত্যাজ্য পদমেতদবাপ্যতে। সংসারের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিলে তবে এই পরমপদ সেবনে অধিকার জন্মে। তুমি তাঁতে ক্ষেতে উন্নতি করিতে চাও, তাই কিছুই হয় না। তুমি এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর; তবে তাহাকে পাইবে। আচ্ছা তাহা হইলে কি তিনি আমাকে পাইবেন?

হাঁ, দেখনা তোমার যদি তোমা অপেক্ষা এক্জন বড় লোকের সহিত বন্ধুতা হয়, তবে প্রথম প্রথম তোমারই তাহাকে পাইয়া বসিতে হয়। তার পর তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে করিতে যখন তুমি তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া যাও, তখন তিনি তোমার বাড়ীতে আসেন। এখানেও সেইরূপ তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়িকা আর তুমি পথের কাঙ্গাল। তিনি তোমাকে পাইবেন দূরের কথা তুমি তাহাকে পাইবে কিসে আশা করিতে পার—তিনি দয়াময়ী তিনি স্নেহময়ী, প্রথম ইহাই কারণ। তার পর তোমার কার্য্য, তুমি কাঙ্গাল ইহা তুমি যদি বুঝিতে পার, তাহা দ্বিতীয় কারণ, তার পর তুমি তাহার গুণ-গান কর, লীলা চিন্তা কর, লোকসমক্ষে অকপট ভাবে তাহাই বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাও, কখন নির্জ্জনে তন্ময় হইয়া যাও, এইরূপ করিয়া করিয়া তাহার বিশ্বতঃ প্রসারিত দৃষ্টিকে যখন তুমি বিশেষ ভাবে তোমার দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে পারিবে, তখন তুমি তাহার অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ হইয়া যাইবে, তখন তুমি তাহাকে পাইবে। ইহা হইলেই তুমি তাহার প্রিয়জন মধ্যে পরিগণিত হইলে 'ভাগ্যাধীনমতঃ পরম্' তার পর তোমার ভাগ্য তিনি বলেন যততামপিসিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' যত্ন করিয়া যাহারা সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে সিদ্ধিও লাভ করেন তাঁহাদেরও সহস্রের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

তুমি ইহা শুনিয়াই নিরাশ হইও না। বিশুদ্ধ সত্ত্বই তাঁহার সর্ব্বস্ব, তুমি কর্ম্ম দ্বারা রজঃ তমঃ কাটিয়া সর্ব্বদা উপাসনাযোগে নিত্যসত্ত্বস্থ হও, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবগুণ্ঠিত হইয়া দৃশ্যদর্শনে বিরত হও, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অবস্থায় উপ-নীত হইয়া তুমিই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া যাইবে, তখন তিনি তোমার গৃহে আসিবেন। তখন তিনি স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভাবে ভিতরে বাহিরে তোমার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন।

কিন্তু যতদিন না তিনি এই ভাবে আসিতেছেন, ততদিন তুমি খট্বারূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিও না, সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা-স্ফুটিতহৃদয়ে বলিতে থাক 'আয়াহি বরদে দেবি' বলিতে থাক "অজাত পক্ষাইব মাতরং খগাঃ। স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তা। প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যষিতং বিষণ্ণা। মনোহরবিন্দাক্ষদিদৃক্ষতে ত্বাম্"।

বলিতে থাক--হে অরবিন্দাক্ষ অজাত পক্ষ পক্ষি-শাবক যেমন জননীর দর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়, কখন তাহার স্নেহময়ী জননী আহার-ভার মন্থরগমনে তাহার তৃষ্ণার্ত্ত নয়নের পথে পতিত হইবে ভাবিয়া যেমন জননীর আশা-পথ চাহিয়া থাকে, ক্ষুধার্ত্ত বৎস যেমন মাতৃস্তন্যের দিকে লালায়িত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে বিষাদিনী বিরহিণী যেমন প্রবাসী প্রিয়তম দর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়, হে অরবিন্দাক্ষ চির-প্রলোভিত আমার এই হৃদয় তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

কখনও শ্রৌতভাষায় বল, ইন্দ্র বায়ূ ইমেসুতাঃ উপপ্রয়োভিরাগতম্ ইন্দাবা বা মুশন্তিহি।

বল—হে ইন্দ্রবায়ুরূপিণী তোমার জন্য আমার এই (সমাধিষ্ঠিত) মানসী বৃত্তিগণ সুসংস্কৃত হইয়াছে, ইহারা তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তোমার আশা-পথে চাহিয়া আছ।

কখনও বল। ধেনু যেমন হাম্বারবে বৎসের নিকট উপস্থিত হয়, যুদ্ধ-কামী পুরুষ যেমন অশ্বের নিকট উপস্থিত হয়, স্বামী যেমন পতিব্রতার উৎকণ্ঠিত বিরহতপ্ত নয়ন পথে উপনীত হয়, তদ্রূপ হে রাজরাজেশ্বরি! তুমি —তুমি আমার এই চিরপিপাসিত নয়নের পথে উপনীত হও। তুমি এইরূপ বলিতে থাক, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সহঃ সম্পাদক।

অশান্তি।

আমি শত অপরাধে অপরাধী। তাই আমি শান্তি পাই না। তাই আমার একচিন্তা প্রবাহ থাকে না। দুই দিন এক নিয়মে চলিতে পারি না। তোমাকে ডাকা আমি কোন দিনই যথা সময়ে পারি না। আমি অনুভব করি শত শত অপরাধে আমি এখনও অপরাধী তাই সংসার আমার চাপিয়া ধরে। যথা সময়ে কাজ করিতে গেলে শত বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন দিন শরীর

আমার নিয়ম ভঙ্গ করায়; কোন দিন মন নিয়ম ভাঙ্গে; কখন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বা সংসার নিয়ম ভঙ্গ করায়। কখন বা জগতের হিত চিন্তা নিয়ম ভঙ্গ করায়।

জগতের হিত চিন্তা ভাল কিন্তু সে চিন্তারও সময় আছে। যথা সময়ে সে চিন্তা করিলে নিজেরও হিত হয়, জগতেরও হিত হয়। কিন্তু অসময়ে সে চিন্তায় অনিষ্টই হয়। একুল ওকুল দুকূল যায়। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিতে ভাবিতে শ্যামও যায় কুলও যায়।

বলিতেছি শত অপরাধে অপরাধী। জীবন ধরিয়া অপরাধ করিতেছি। তাই আমার এই অশান্তি।

আমি এই অপরাধের প্রতীকার চাই। আমি তোমার চরণে নির্দ্দোষ হইতে চাই। আমি এই অশান্তির প্রতিবিধান করিতে চাই।

আমি চাই আমার সকল ভাবনার মূলে তুমি থাক, আমি চাই আমি সকল কর্ম্মের মূলে তোমায় দেখি, আমি চাই আমার মন আর অসম্বদ্ধ প্রলাপ না তুলে, আমি চাই আমি এক করিতে আর করিয়া আর না ফেলি, আমি চাই আমি যথা সময়ে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করি, আমি চাই আমি মুখে এক আর মনের আর না করি, আমি চাই আমি কোন প্রকার কপটতা আর না করি, আমি চাই শত্রুমিত্র সকলের উপর অচঞ্চল হইয়া, শান্তভাবে ব্যবহার করি। এক কথায় আমি চাই আমি সর্ব্বত্র তোমার সত্তা দেখিয়া সকলের মধ্যে তুমি আছ ভাবিয়া নির্ভয়ে যখনকার যাহা তখন তাহা সম্পাদন করিয়া চাই।

উঠিবার ও বসিবার মুখে নিত্য অভ্যাস।

১। বৈরাগ্য অভ্যাস।

২। ভাবনা, বাক্য, কর্ম্মে স্মরণ অভ্যাস।

৩। আমি কর্ত্তা নই বুঝিয়া অভ্যাস।

কিসে অশান্তি দূর হইবে? কিরূপে সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকিব? কবে আমার সে দিন হইবে যখন গত জীবনের কোন কিছু আর মনে থাকিবে না, ভবিষ্যত্ জীবনে কি হইবে তাহার ভাবনাও থাকিবে না—যখন গত ও ভবিষ্যৎ মুছিয়া ফেলিয়া শুধু বর্ত্তমানে তোমায় লইয়া থাকিব?

আমার নিয়মে চল। মনের নিয়মে চলিও না।

তাইত করিতে চাই। নিত্য ক্রিয়ার জন্যত বিশেষ চেষ্টা করি।

নিত্য ক্রিয়া তিন বেলায় ত করিবেই। কিন্তু নিত্যক্রিয়া করিতে বসিবার মুখে এবং নিত্যক্রিয়া করিয়া উঠিবার মুখে যাহা শিখাইয়া দিয়াছি তাহা নিত্য করা চাই; মনকে অগ্রে প্রস্তুত না করিয়া লইলে কাজ ঠিক হয় না। উঠিবার ও বসিবার মুখে নিত্য অভ্যাসটি নিত্য ক্রিয়ার সহিত যোগ করিয়া লও। হইবে। আজ হইতেই তাহা হউক।

এইত রজনী শেষ হয় আর কেন আলস্যে লুটাও। উঠ। উঠিয়াই শয্যায় উপবেশন কর। পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসন বা বীরাসন করিয়াই উপবেশন কর। করিয়া অন্য চিন্তা না করিয়াই তাঁরে ডাক। যার যাতে ডাকা অভ্যাস সে তাতেই ডাকুক। কেহ খালি জপে ডাকে, কেহ শ্বাসের জপে ডাকে। যতক্ষণ পার প্রথমেই ডাক। ডাকিয়া একটু শান্ত হইয়া প্রার্থনা কর। নিজের জন্য প্রার্থনা! সেত বহুদিন হইয়াছে। আজ একবার পরের জন্য ডাক। একবার দুঃখময় জগতের দুঃখী আর্ত্তজনের জন্য ডাক।

এ ডাকা বৈরাগ্য অভ্যাস জন্য। বল হে ঠাকুর! সংসারে যে বড় দুঃখ। আমি জীবনে কত দাগা পাইলাম, কত জ্বালায় জ্বলিলাম। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, এখনও আমার বৈরাগ্য হইল না। ভগবন্! সব ত গিয়াছে। মাতা গিয়াছেন, পিতা গিয়াছেন, ভ্রাতা গিয়াছেন, পুত্র গিয়াছে, কন্যা গিয়াছে আর ত কেহই নাই একরূপ। যখন এই সমস্ত বিয়োগ হয় তখন যেমন বিষয়ে রুচি থাকে না কৈ তার পর ত আর সে ভাব থাকে না। হৃদয়ে তাহাদের চিতা জাগাইয়া তোমায় ডাকিতে বল তাওত তখনকার মত রসের সহিত হয় না। পুত্র বিয়োগের পর, ভ্রাতার মৃত্যু সজ্জায়—তোমার জন্য যে কাতরতা হইয়াছিল সে কাতরতা ত সকল সময়ে থাকে না। সে ভোগে অরুচিত এখন নাই। তাই বলি প্রভু! আমার বৈরাগ্য স্থায়ী হইল না। এখন কি উপায় করিব?

তুমি কি তাই বলিতেছ অনেক দিন ত নিজের জন্য ডাকিয়াছ। স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা ভ্রাতা ইহারা নিজের জন। ইহারা গিয়াছে—কাতরতা কি তাহাও বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহাতেও আমার হয় নাই, তাই পরের জন্য তোমায় ডাকিব।

দয়াময়! আমার মত কত লোক সংসারে দাগা পাইতেছে, কত জ্বালায়

জ্বলিতেছে। এ শোকত নিত্যই আছে। আমার শোকই লোকে নিত্য ভোগ করিতেছে। পতিশোকে দুঃখ ভুগিয়াছি—সে পতি বহুদিন গিয়াছেন, পুত্রশোকে দাগা পাইয়াছি, কালে সে দাগা সে জ্বালাও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে কত লোকেরত পতি গেল, পুত্র গেল, কন্যা গেল, ভ্রাতা গেল। হায়! তাহারা আজ আমার মত লুটাইয়া লুটাইয়া কতই কাঁদিতেছে। হে ভগবান্ এক দিন আমি আমার শোকে ডাকিয়াছি আজ অন্যের শোককেও আমার শোক মনে করিয়া তাহাদের জন্য তোমায় ডাকিতেছি। প্রতিদিন এই ভাবে নিত্যক্রিয়ার পূর্ব্বে বৈরাগ্য আনিয়া কাতর হইয়া সবার জন্য তোমায় ডাকিব। হে দীননাথ! জগতের লোক বড় দুঃখী, শোকাতুর। তুমি একবার তাহাদের প্রাণ জুড়াইয়া দাও। তাহারা দুঃখে অধীর হইয়া, শোকে মোহে অধীর হইয়া, শুধুই হাহাকার করিতেছে। তোমায় ডাকিতে ভুলিয়া যাইতেছে তুমি একবার এই জগতের জ্বালা-যন্ত্রণাময় অধীর জীবের দিকে করুণাদৃষ্টি কর। শোকে কাতর করিয়াছ কর; কিন্তু যে জন্য এই শোক তাপ সেই বৈরাগ্য একবার জন্মাইয়া দিয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া লও। আমাদিগের বৈরাগ্য সর্ব্বদা প্রবল রাখিয়া ভবভোগে অরুচি করাইয়া দাও। আহা! তোমা বিমুখ হইয়াই জীব বড় কষ্ট পায়।

করুণাসিন্ধো! দাও—একটু যথার্থ স্থায়ী বৈরাগ্য উদয় করিয়া দাও; যে বৈরাগ্যে "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে" হয় যে বৈরাগ্যে পৃথিবীর কোন কিছু ভোগই বিরস হইয়া যায় সেই বৈরাগ্য দাও। পৃথিবীর ভোগ বিরস হইলে তোমার রস ভোগ হইবে। তুমি যে রসময়। তোমাকে ডাকিলে রস কেন আসিবে না? রসময়কে ডাকিলেও যদি রস না আসে তবে ত ডাকা হয় নাই। তবে ত জিহ্বায় অন্য রস থাকে বলিয়াই তোমার রস পাওয়া যায় না। প্রকৃত সুখ ভোগ করিলে কি বিষয়-বিষ সুখ বলিয়া বোধ হইতে পারে? প্রভু কৃপা কর।

নিত্য ক্রিয়ায় বসিবার পূর্ব্বে পরের শোকে নিজের শোক জাগাইয়া প্রাণকে যথার্থ কাতর করিয়া পরের জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে ডাকাই বৈরাগ্য অভ্যাস। ঐরূপ ডাকায় পরের উপকার ত আছেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনও শ্রীভগবানের চরণ প্রান্তে উপনীত হইবেই। জগতের দুঃখের জন্য শ্রীভগবানের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়া, জগতের সমস্তই অসার, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী এই ভাবিয়া—জগতের ভোগ সুখকে অগ্রাহ্য করা; শরীর, দেহ, মন, জগৎ মায়িক ভাবিয়া শুধু তাঁহাকে লইয়া থাকিতে প্রয়াস করা—বিনা বৈরাগ্যে

এ সমস্ত হইবে না ; বিনা বৈরাগ্যে ধর্ম্ম জগতে উঠিতে পারা যাইবেই না। তাই সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যহ পরের জন্য দুঃখ, পরের দুঃখ প্রতীকার জন্য শ্রীভগবানের প্রার্থনায় বৈরাগ্য অভ্যাসে মনকে কাতর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

২

দ্বিতীয় চিন্তা ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ সর্ব্বকালে কার্য্যে করা।

ঠাকুর আর একটি প্রার্থনা তোমায় শুনাই। আর কার কাছে বলিব ? তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে ? কে আর শুনিবে ? তুমি ভিন্ন অন্তরের জ্বালা আর কে জুড়াইতে পারে ? তাই তোমাকেই বলিব। সবাইত ছাড়িয়া যায়। তুমি ত এক দণ্ডের তরেও ছাড়না। তুমি ছাড়িলে জীব ত একক্ষণও বাঁচে না। দয়াময় যাহা কিছু চিত্তে উদয় হইবে তৎক্ষণাৎ যেন তাহা ধরিতে পারি, পারিয়া যেন তোমাকে জানাইতে পারি। সর্ব্বদাই ত চিত্তে কতকি উঠে—সবই যদি তোমাকে জানাইতে পারি তবে ত সর্ব্বক্ষণই তোমাকে স্মরণ হয়। ইহাই ত সর্ব্বকর্ম্মার্পণ ! তুমিইত বলিয়াছ কর্ম্মের পূর্ব্ব অবস্থা বাক্য বাক্যের পূর্ব্বে ভাবনা। জীব যাহা কিছু ভাবিবে বলিবে বা করিবে সব যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করে—যদি তোমার অনুমতি, প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে, লইতে অভ্যাস করে তবে সেত তোমায় লইয়াই থাকে !

কিরূপে ইহা হইবে ?

তোমার নামই জীবের একমাত্র অবলম্বন। তোমার নাম করাকে যদি সর্ব্বদার কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে তবে নাম করিতে গেলে যাহা অন্য ভাবনা উঠিবে তৎক্ষণাৎ তাহা তোমাকে জানান যায়। নামের বিঘ্ন অন্য ভাবনা, অন্য বাক্য, ব্যবহারিক কার্য্য। নাম লইয়া থাকিলেই বিঘ্ন ধরা যায় ধরিলেই বিঘ্ন উদয়ে জানান যায়। ইহাতে সর্ব্বদা তোমার স্মরণ হয়। তাই বলি জীব তোমার নাম করুক—আরও এক কর্ম্ম করুক। নাম করিতে করিতে প্রণামও অভ্যাস করুক। কোথায় নাই তুমি ! তুমিই বলিয়াছ মাং নমস্কুরু। তুমি যখন সকলে—তখন তুমি মনে করিয়া, মনে মনেত সকলকে প্রণাম করা যায়। সর্ব্বত্র তোমায় দেখিতে পাওয়া যায় না—তা নাই হউক—কিন্তু সর্ব্বত্র ত তুমি আছ। ইহা বিশ্বাস করুক। জলে স্থলে, অনলে অনীলে, শশী তারকায়, মেঘমালায় পৃথিবীতে, ফুলে ফলে, বৃক্ষ পাতায়, মানুষে পশুতে, শত্রু মিত্রে, কীট পতঙ্গে কোথায় তুমি নাই ? কোথায় তোমার অভাব ? তুমি

সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই তুমি বিষ্ণু, তুমি মঙ্গলময় বলিয়াই তুমি শিব--তুমি পরিপূর্ণ। বিশ্বাস করুক, করিয়া, প্রতি নাম জপে, প্রতি মন্ত্র জপে তোমার প্রণাম করা অভ্যাস করুক। ভুল ত হইবেই। নামকে ত সর্ব্বদার কার্য্য অভ্যাস করা হয় নাই। হউক না অভ্যাস। কিছু সময় লাগে। তা কোন্ শুভ কর্ম্ম অভ্যাসে সময় দিতে না হয়? তাই বলি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে নাম জপিতে জপিতে প্রণাম করুক। প্রদক্ষিণ করুক। নাম জপিতে জপিতে প্রণাম করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে--আবার নাম জপুক। বিঘ্ন উঠিলেই তাহাতে স্মরণ করিয়া কর্ম্মার্পণ করুক হে একমাত্র ভরসা! হে কাঙ্গালের হরি! হে দীনবন্ধু বিশ্বাসে তুমি সর্ব্বত্র আছ ভাবিয়া তোমার কথা মত মাং নমস্কুরু অভ্যাস চলুক।

নিত্য ক্রিয়ায় বসিবার পূর্ব্বে জগতের দুঃখীজীবের জন্য প্রার্থনা এবং প্রতি ভাবনায় প্রতি বাক্য উচ্চারণে এবং প্রতি কার্য্য করিবার প্রথমে তোমাকে জানান অভ্যাস ইহা স্মরণ করিয়া কার্য্যে বসিবার কথা বলা হইল। শেষ চিন্তা বাকী।

৩

আমি কর্ত্তা নহি বুঝিয়া সর্ব্ব বিষয়ে ইহা অভ্যাস।

হে প্রাণেশ্বর! আর যেন মানুষ কর্ত্তা না সাজে। আমি করি, আমি খাই, আমি চলি, আমি বলি—বেঁহুস হইয়া "আমি "আমার" এই সব কথা ব্যবহার করিলেই কিন্তু কর্ত্তা সাজা হইল। আর ভিতরে যদি বেশ করিয়া বুঝিতে পারা যায় প্রকৃতিই সমস্ত করিতেছেন তাও পুরুষের চৈতন্যে চৈতন্যদীপ্তা হইয়া—পুরুষ কিছুই করেন না তিনি দ্রষ্টা মাত্র আর আমিটা পুরুষই, প্রকৃতি নহে এক্ষেত্রে—ভিতরে বোধ রহিল আমি করি না, চলি না, বলি না—কিন্তু বাহিরে আমি কথার ব্যবহারে একটা মৌখিক আমি বলা হইল মাত্র। এই মৌখিক আমি বলার ব্যবহারও যতদূর পারা যায় ত্যাগ করা উচিত। মৌখিক বলিতে বলিতে আবার সত্য সত্যই বলা হইয়া যায় তাই ব্যবহারিক জগতে আমির ব্যবহারও বড় সতর্ক হইয়া করা উচিত!

আমি চেতন, আমি পুরুষ, আমি কর্ত্তাও নহি, আমি ভোক্তাও নহি, আমি দ্রষ্টাও নহি, আমি শ্রোতাও নহি, আমি প্রকৃতির ব্যপারে সাক্ষী পুরুষ—বহুকাল ধরিয়া এই ভাবে আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক রাখিতে হইবে; বহুকাল ধরিয়া পুরুষ যে নিঃসঙ্গ ইহা সর্ব্বদা ধারণার বিষয় করিতে হইবে, বহুকাল ধারণা

করিতে করিতে আমির ধ্যান হইবে—এই ধ্যানই আপনি আপনি ভাব। সর্ব্বদা আমাকে ইহার শ্রবণ চাই, মনন চাই এবং ধ্যান চাই—এই শ্রবণ মনন ধ্যান পরিপক্ক হইলে আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করা যায়। তাহা হইলেই জীবন্মুক্তি হয়।

এইরূপে জীবন্মুক্ত হওয়া বড় সহজ হইয়া গেল। না—যত সহজ ভাবিতেছ তত সহজ নহে। যখন খাওয়ার আস্বাদন টের পাওয়া যাইবে না; যখন রৌদ্র অগ্নিতে উত্তাপ বোধ হইবে না, যখন শীতেও কোন বোধ থাকিবে না, যখন সুখ ও দুঃখ, ঘৃণা লজ্জা, কিছুই বোধ হইবে না; তখন সত্য সত্যই আমি অখণ্ড চৈতন্য হইয়াছে। যতক্ষণ সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা এ সমস্ত বোধ হয় ততদিন কিন্তু দেহে বা প্রকৃতিতে আমি স্থাপিত হইয়া আছে। ততদিন সোঽহং মুখে বলিলে সোঽহং হওয়া হইল না। সোঽহং হওয়া হইল—প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতি। মুক্ত পুরুষেরা কখন জড়ের মত থাকেন কখন মূক হয়েন কখন বা উন্মত্ত পিশাচ মত বাহিরে কর্ত্তা সাজেন ভিতরে কিন্তু অকর্ত্তা। যাঁহারা ততদূর হইতে পারেন নাই কিন্তু জ্ঞানানুষ্ঠানে রুচি আছে তাঁহারা সর্ব্বদা আত্মা ও অনাত্মার বিচার লইয়া থাকিবেন এবং ব্যবহারিক জগতে "আমি" কথার ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হইবেন। আমি কথা ব্যবহার না করিলে কথা কওয়া সহজে হয় না—তাই জানিয়া শুনিয়া পাকে প্রকারে ব্যবহার করা হয়, ভিতরে আমি কর্ত্তা নহি এ বোধ রাখা যায়। ইহা অপেক্ষাও কঠিন সুখ ও দুঃখ অনুভব করা বা শীত গ্রীষ্ম অনুভব করা। দেহে আত্মবোধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহা অনুভব হয়। এ সমস্ত স্থানেও এই নিশ্চয় করিতে হইবে যে মূঢ় হইয়া, আত্ম বিচার শূন্য হইয়া প্রকৃতির ব্যাপারে অহং আরোপ হইয়া গিয়াছে সেই জন্য পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেছে বাস্তবিক কিন্তু আমার আহারও নাই, নিদ্রাও নাই, ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই, জীবনও নাই, মৃত্যুও নাই, সুখও নাই, দুঃখও নাই আমি সাক্ষী চৈতন্য, আমি নিঃসঙ্গ, আমি আপনি আপনি।

নিত্যক্রিয়ায় বসিবার পূর্ব্বে এবং নিত্যক্রিয়া হইতে উঠিবার সময়ে যদি তিন বেলা এই অভ্যাস গুলি করা যায় তবে কি হয় না? বহু দিন লাগিতে পারে—তা লাগিলেই বা। যদি নিশ্চয় হয় উহাতেই হইবে তবে যবে কেন হউক না তাহাতে ক্ষতি কি? অভ্যাস কি করিবে?

শেষ খেলা।

গিয়াছে মা বেলা, হ'য়েছে মা খেলা
আমায় নিয়ে চল ঘরে।
গিয়াছে মা সাথী, হ'লো যে মা রাতি
রেখো না মা আর আঁধারে ॥
নতুন নতুন পুতুল দিয়িয়ে
ভুলায়ে রাখিছ আমারে।
(আমি) ভুলিবার মেয়ে নই মা তোমার।
ছাড়ব না আর তোমারে ॥
অনেক খেল্‌না দিয়াছ আমায়
সাজায়ে সংসার ভিতরে।
মাগো—শেষ খেলায় এবার হার হ'ল আমার
(তাই) কাঁদি কাতর অন্তরে ॥

(গিরিডি)

৺প্রবোধচন্দ্রের স্মৃতি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

নারায়ণ! নারায়ণ! বলিতে বলিতে যে তনুত্যাগ করে তাহার গতি যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। আর পর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ৺কাশী যাইবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল; বাড়ীর সকলকে, সাধুমহাত্মাকে এবং ডাক্তার বাবুদিগকে যে ভাবে তুমি ৺কাশী পাঠাইবার জন্য জেদ করিয়াছিলে—যদিও তোমার বাসনা আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণে এবং সাধুবাক্যে জানিতেছি তোমার ৺কাশীলাভই হইয়াছে। এত পবিত্র তুমি ছিলে, এত সাধুহৃদয় তোমার ছিল। তাহাতে মনে হয় যেখানে তুমি থাকিতে সেই স্থানই ৺কাশী।

তোমার পূর্ব্বে হিরণ্যকুমার ৺কাশীলাভ করিয়াছে, তাহারও পূর্ব্বে সনৎ-কুমার ৺কাশী পাইয়াছে, তাহারও পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণী ৺কাশী প্রাপ্ত হইয়া-

ছেন। এতদ্ভিন্ন যশোমতী ; সর্ব্বগুণাধার আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৺নীলকণ্ঠ, জ্যেষ্ঠ সহোদরা ৺ব্রজেশ্বরী ; কনিষ্ঠ ৺অতুলকৃষ্ণ, অগ্রজের বালকপৌত্র ইহারা গঙ্গাতীরে গিয়াছেন। ইহাদের সকলের কথা বলিব না—বলিতে পারা যায় না—তোমার কথা বলি অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ হইয়াও শ্রীভগবানের সঙ্গী ৺কাশী প্রাপ্ত তোমাদের কাছে প্রার্থনা হয় তোমরা আমার গতি করিও। নিজে অলস হইয়া থাকিয়া তোমাদিগের নিকট যে সাহায্য চাই তাহা নহে আপন চেষ্টায় যাহা পারি তাহাত করিতেছি তথাপি শ্রীভগবানে মিলিত তোমাদিগকে সময় থাকিতে জানাইয়া রাখিতেছি যেন আমার হইয়া তোমরা তাঁহাকে একটু জানাইয়া রাখিও। স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় তোমরা—তোমরা ইষ্টদেবতার সঙ্গে মিশিয়াছ দুর্ব্বল আমরা আমাদের আরজী তোমাদের দ্বারা তাঁহার নিকট করা রহিল। আর অধিক কি বলিব।

সাধুমহাত্মার নিকটেও শুনিলাম—তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন তোমার সদ্গতি সম্বন্ধে তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস। তথাপি তোমার স্মৃতি রাখিবার বাসনা হয় কেন ?

তুমি এই জগৎ অরণ্যে নীরবে ফুটিয়াছিলে। নীরবে ফুটিয়া, নীরবে গন্ধ বিতরণ করিয়া এই দারুণ সংসার নিঃশব্দে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ। কোন আড়ম্বর ছিল না, কত সুন্দর তুমি ছিলে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশের চেষ্টা ছিল না, যাহাদের সঙ্গ করিয়াছিলে তাহারাই তোমাকে জানিয়াছিল। তুমি যাহা করিতে, যাহা তোমার সাধ ছিল তাহা তোমার দৈনন্দিন কর্ম্ম-তালিকার খাতায় তুমি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ। কত সুন্দর তোমার সংগ্রহ, কত মনোহর তোমার হৃদয়ের ভাব। তুমি কখন তোমার কোন লেখা প্রকাশ কর নাই। দুই একটি প্রবন্ধ যাহা তুমি ৺হরিদ্বারে লিখিয়াছিলে তাহাও এখন দেখিতেছি। ১৩১০ সালের চৈত্রএকাদশী হইতে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কতক বিবরণ তুমি রাখিয়া গিয়াছ। ইহার পরে তুমি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলে আর কিছুই লিখিতে পার নাই। ইহাই তোমার স্মৃতিস্বরূপ থাকিবে। যতদূর পারি এই স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে ইচ্ছা হয়। এমন অনেক বস্তু তুমি রাখিয়া গিয়াছ যাহাতে দুঃখী মানুষের অনেক উপকার হইতে পারে। তুমি ৺হরিদ্বারে গিয়া যাহা লিখিয়াছিলে তাহাই অগ্রে প্রকাশ করিতেছি।

হরিদ্বার ২৯ মে ১৯১২ অথবা ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ সাল চম্পকশুক্লা চতুর্দ্দশী।

"হরিদ্বারের যেখানে আমরা আপাততঃ আছি তাহা হরিদ্বারের মধ্যে উত্তম স্থান। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এখান হইতে বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পর্ব্বতের কোলেই গঙ্গা আর কলকল নিনাদ এবং সাগরে সঙ্গত হইবার জন্য উন্মত্ত বেগ! সবই অতি হৃদয়াকর্ষক। পর্ব্বতের নাম চণ্ডীর পাহাড়। মা দক্ষ-যজ্ঞের সময় হিমালয় দিয়া আসিবার মুখে এই পর্ব্বতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। মার আগমনের আর কোন চিহ্ন এখানে আছে কি না আমি বুঝিতে পারি-লাম না। কিন্তু পর্ব্বতটি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত মার পদধূলি লইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত যেন সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া আছে এবং আগন্তুক পথিকদিগকে তাহার অংশ বিতরণ করিতেছে। যে দিন প্রথম আমি চণ্ডীর পাহাড়ে উঠি সে দিন সঙ্গে আরও ৩।৪ জন লোক ছিল। পর্ব্বতে উঠিবার দুইটি করিয়া রাস্তা আছে। একটি পুরাতন কিছু দুরারোহ। একটি নূতন ইংরাজ বাহাদুরদের সুতরাং সুগম। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এবং মা চণ্ডীর সংস্পর্শে বল পাইয়া সেই দুরারোহ পথ দিয়া সর্ব্বাগ্রে উঠিয়াছিলাম। পর্ব্বতাগ্রে উঠিয়াই এমন একটা নিস্তব্ধতা অনুভব করিলাম—সেই সময়ে এত আনন্দ এবং প্রার্থনা প্রাণে জাগিয়া উঠিল যে আমি ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই শব্দ পর্ব্বতের বহু স্থানে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার প্রার্থনা চারিদিকে বিঘোষিত করিল। আমি যেন একটু বল পাইলাম। মনে হইল মা যেন আমার প্রার্থনা শুনিলেন। পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে চতুপার্শ্ববর্ত্তী স্থান গুলি কত সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই সেই স্থানে মা গঙ্গার শতধারে প্রবাহিত হইয়া যাওয়া বড়ই সুন্দর। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভক্তের হৃদয় আরও সুন্দর —যে হৃদয়ে ভগবান্ বিরাজ করেন,—যে হৃদয় ভগবানের বসিবার জন্য সর্ব্বদাই—"

ইহা এই পর্য্যন্ত লেখা। ইহার পরের লেখাটিও আমরা দিতেছি। চণ্ডীর পাহাড় হইতে ডম্‌পার মঠে কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া ইহা লেখা হয়। পূর্ব্বের লেখার সহিত শেষের লেখার সংশ্রব আছে।

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যাবন্দনার সময় ব্রহ্মচারীর বেশ পরা ও সন্ধ্যা করা।

কি সাধ হয়? সাধ হয় ভীষ্মের মত ব্রহ্মচারী হইতে, প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীমাতার ধ্যানে বিভোর হইতে, ব্রহ্মচারীর প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপ মনের সহিত করিতে—আর সাধ হয় মনে যেন অতি ক্ষুদ্র, ব্রহ্মচারীর বিরোধী কোন চিন্তা বা কল্পনা না আইসে—সর্ব্বদা যেন ভর্গো দেবস্য ধীমহি লইয়া থাকি।

আর সাধ হয় সেবাধর্ম্মটি যথাযথ ভাবে শিক্ষা করিতে—তাঁকে সেবা করিয়া সেবা শিখিতে—তাঁকে নিষ্কাম ভাবে সেবা করিয়া ভগবৎসেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে। আর মনে হয় জগতে কেহ যদি কোন কাজের মত কাজ লইতে পারে, তবে তাহাতে যোগ দিতে। আর সাধ হয় প্রাণ যখন সর্ব্বত্র সেই আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিবে সেই অবস্থায় উত্তর কাশী অথবা আরও উপরে মায়ের কলনিনাদ শ্রবণ করিয়া বিভোর হইতে।

শঙ্কর! তুমি ত দয়ার সাগর। অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হও। আমার এই সাধ পূর্ণ করিবে কি? কতদিন ত গেল। অবশিষ্ট গোটা কয়েক দিন মানুষের মত কাটাই, নতুবা যেমন তেমনে কাটিবে—আবার আসিব আবার তোমার পূজা করিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া মনোভিলষিত বর তপস্যা দ্বারা প্রার্থনা করিয়া লইব। কেন শঙ্কর! এ জন্মে আমার উপর সন্তুষ্ট হইবে না? আমি কি কৃপার অযোগ্য? শঙ্কর! তোমার কৃপার অযোগ্য কি জগতে কেহ আছে? শঙ্কর! আমি ত শুনিয়াছি যে তোমায় চায় সেই তোমাকে পাইয়া থাকে। তবে আমার সময় কি অন্য নিয়ম হইবে?

মা চণ্ডি! সেই দিন সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া যে তোমায় ডাকিয়াছিলাম, শক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি শোন নাই? আমার সেই চীৎকারে পর্ব্বতস্থ পশুপক্ষী—তোমার সেখানকার সর্ব্বজীবই ত শুনিয়াছিল আর কেবল তুমিই উহা শোন নাই তাহা ত নয় মা! তুমি যদি না শুনিবে তবে আজ আমার প্রাণে কে এই মহৎভাবের বীজ রোপণ করিল? আমি ত স্রোতেই চলিয়াছিলাম—কে আমায় ফিরাইল? কে আমার প্রাণে ব্রহ্মচারীর সৌন্দর্য্য জাগাইয়াছিল মা? এসব ত মা তোমারই কৃপা। জয় বিশ্বজননি! জয় বিশ্বজননি! তোমার আশীর্ব্বাদ আমার শিরে বর্ষিত হইয়াছে। আমার যত অশুভ সব কাটিয়াছে। আমি তোমায় মা বলিতে পারিয়াছি। এজন্মে আমার ইহাই

শান্তি। পরজন্মেও শান্তি। আর আমি জগতের লোকের দিকে তাকাইব না। আর আমি কাহারও মন যোগাইবার জন্য কোন চেষ্টা করিব না। আমার সকল চেষ্টা তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতেই কাটাইব। তোমার সাড়া পাইলে তোমার কোলে বিশ্রামলাভ করিব। যত আবদার তোমায় জানাইব তুমি যাহা ভাল করিবে। প্রাণে তোমায় ছাড়া, তোমার পূজা ছাড়া, তোমার ধ্যান ছাড়া, তোমার সেবাশিক্ষা ছাড়া তোমার নিকট যাইবার রাস্তা ছাড়া— অন্য কিছুরই বাসনা আর থাকিবে না। মা আমার উপর প্রসন্ন হইয়া একবার তোমার আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দাও। হরিদ্বার।

ইহাই প্রবোধের শেষ লেখা। যে ভাবে দেহত্যাগ করিয়া গেল তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় বুঝি তাহার সেই দেহে তাহার সাধ এই দুরন্তকালে পূর্ণ হয় না। তাই তাঁহার নিকটে সাধ পূর্ণ করিতে যাইতে পারিল।

ক্রমশঃ—

পথভ্রান্ত।

পথের ভিখারী ফিরে দুয়ারে।
বৃথা কি হারাবে বেলা শুধুই ঘুরে?
দুর্গম কান্তার এল হারাল দিশি।
ঘনায়ে এল পথে অন্ধ নিশি॥
কে তারে শুধায়—কে যায় সুদূর পারে?
হারিয়ে বুকভাসে, নয়ন ধারে॥
আলসে গেল বহি দীর্ঘ তরুণ বেলা।
এখন মিটেছে সাধ ফুরাল খেলা॥
আর কেন মিছে ডাকা, মিছে রাখা ধ'রে
বিদেশী ফিরিতে চায় আপন ঘরে॥
কোন্ সে সুদূরে কাহার বিজন বাসে।
মিলন ব্যাকুল স্বদেশ, স্বজন আসে॥
তোমরা পথিক কে যাও উজল রথে?
কণক কিরণ রাশি ছড়ায়ে পথে।
ভিখারী প্রবাসী তারে নেবে কি সাথে?
পাথেয় তাহার নাই কিছুই হাতে।
যোগ্যতা কিছুই নাই তবু যেতে চায়
স্থান যদি নাহি মিলে ক্ষতি নাহি তায়॥
তারে দিও ঠাঁই সবার চরণ তলে।
দিও না ফিরায়ে তারে নয়নের জলে॥

মৃ (ভবানীপুর)

অন্বেষণ।

কেন মিছে খুঁজে খুঁজে মর ওরে মন।
হৃদয় মাঝারে পাবে হৃদয় রতন॥
প্রেম চক্ষু উন্মীলন কর একবার।
তাহ'লে তাহাতে পূর্ণ দেখিবে সংসার॥
পিতা মাতা হৃদয়েতে কর অন্বেষণ।
স্নেহরূপে স্নেহময়ে পাবে দরশন॥
সতীর পবিত্র মুখ পানে দেখ চেয়ে।
প্রেমের দেবতা রূপে পাবে প্রেমময়ে॥
শিশুর পবিত্র মুখ দেখ একবার।
সদানন্দ রূপে তথা করেন বিহার॥
সুধাংসুর সুধা তিনি ফুলের সৌরভ।
জীবের জীবন তিনি গুনীর গৌরব॥
উদ্ভিদ চেতন আর জড় আদি করি।
সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজেন হরি॥
পাপীর হৃদয় ছাড়া আর সব স্থানে।
প্রেম চক্ষে নেহারিলে পাবে নারায়ণে॥
সর্ব্বব্যাপী কিন্তু তাঁরে না খুঁজিলে নয়।
হৃদি মাঝে অন্বেষণ কর সাধনায়॥

কি (কলিকাতা)

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ড।
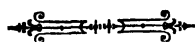
অশ্বল ব্রাহ্মণ।

বিদেহ-রাজ্যে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বহু দক্ষিণা-সম্পন্ন অশ্বমেধ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে বহু দেশদেশান্তরে পণ্ডিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হয়েন। কুরু এবং পাঞ্চালদেশ হইতেও, এই সভায় বহু ব্রাহ্মণ বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। বিদেহাধিপতি জনকের আগ্রহে এবং কার্য্যকুশল মন্ত্রিগণের সুব্যবস্থায় সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলী যথাবিধি সৎকৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন।

বিদেহাধিপতি আপন যজ্ঞসভায় সেই মহতী বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাবেশ দেখিয়া পুলকিত হইলেন, এবং ভাবিলেন ইঁহারা সকলেই বিদ্বান্, কিন্তু কে এই ব্রাহ্মণ-সমাজে বিদ্যায় সমধিক শ্রেষ্ঠ? তিনি ইহা জানিতে নিতান্ত কৌতূহলপরবশ হইলেন, এবং কি উপায়ে ইহা জানা যাইবে মনে করিয়া তরুণবয়স্ক সহস্র গো, গোষ্ঠে অবরুদ্ধ করিলেন, এবং প্রতি গোর উভয় শৃঙ্গে কুড়ি তোলা করিয়া সুবর্ণ আবদ্ধ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, যিনি আপনাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) তিনি এই গোষ্ঠে আবদ্ধ গোসমূহ গ্রহণ করুন। রাজর্ষি এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেহই আপনাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে সাহসী হইলেন না।

অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্যকে বলিলেন,—বৎস সামশ্রবাঃ! এই গোসমূহ আমাদের গৃহে লইয়া যাও। আদেশপ্রাপ্ত শিষ্য, গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলেন।

এদিকে সমবেত ব্রাহ্মণগণ যখন দেখিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য কার্য্যতঃ আপনাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন সকলেই সবিশেষ কুপিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠতায় সমকক্ষ, তথাপি

যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া আপন শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতেছেন? জনকের হোতা অশ্বলও এই ব্রাহ্মণগণের অন্যতম। অশ্বল রাজপুরোহিত, রাজার আশ্রিত; আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা তাঁহার স্বাভাবিক! তিনি এই অভিমান ও তদুপযুক্ত ধৃষ্টতা লইয়া পরুষবাক্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—কেমন হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি নাকি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিৎ, সর্ব্বদা চন্দ্রকোটি সুশীতল পরমপদস্পর্শে যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় আপ্যায়িত, শান্ত। যাজ্ঞবল্ক্য বিনীত বচনে বলিলেন,—ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা শত শত প্রণাম করি। আমি ব্রহ্মিষ্ঠ নহি, প্রয়োজন ছিল, এই জন্যই আমি এই গোসমূহ গ্রহণ করিয়াছি।

হোতা অশ্বলের রোষকষায়িত হৃদয় এই অনুদ্ধত বচনেও প্রসন্ন হইল না। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠজন-লভ্য সহস্র গো গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রশ্নোত্তরে আপন শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিতে বাধ্য মনে করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিবেন সংকল্প করিলেন *।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! ঋত্বিক্ অগ্নি প্রভৃতি যে সমুদয় উপকরণ লইয়া যজমান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয়ই মৃত্যুকবলিত এবং মৃত্যুবশীকৃত—কেননা সাধ্য যজ্ঞ এবং তৎসাধন ঋত্বিক্ প্রভৃতি, এমন কি, যজমানের বাক্য, মন, চক্ষু, প্রাণ ইত্যাদি সমস্তই ত প্রতিক্ষণ মৃত্যুদ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে। জীব সুখপ্রয়াসী, সুখ-সাধন তাহার আবশ্যক, অথচ মৃত্যু এই সুখের বিরোধী। অনুভূয়মান বিষয়সমূহ রূপান্তরিত করিয়া, অনুভবের উপকরণ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের শক্তি হ্রাস করিয়া, মানসিক রুচির পরিবর্ত্তন করিয়া—এই পরিবর্ত্তন স্বরূপ মৃত্যু অশেষ প্রকারে জীবের অশেষ যাতনা উপস্থিত করিতেছে। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য! বল দেখি কি উপায়ে যজমান বহু দংষ্ট্রা সমন্বিত এই মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিবে? মৃত্যুবশীকৃত যজমান কি উপায়ে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে?

যাজ্ঞবল্ক্য] যজমান হোতৃনামক ঋত্বিক্ এবং বাক্য দ্বারা মৃত্যুগ্রাস হইতে

---

* বলা বাহুল্য যাজ্ঞবল্ক্যের গো গ্রহণে ধৃষ্টতা প্রদর্শন ও অশ্বলের কোপ, পরুষবাদিতা এতৎসমুদয় ব্রহ্মবাদিগণের বশীকৃত মায়া দ্বারা লোক-ব্যবহারের অনুকরণ বা অভিনয়মাত্র।

মুক্তিলাভ করিবে। বিরাট্ যজ্ঞপুরুষের মুখস্থানীয় অগ্নিদেব আধ্যাত্মিক ভাবে যজমানের বাগিন্দ্রিয়রূপে এবং অধিযজ্ঞস্বরূপে তিনিই হোতৃরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। যজমানের বিরাট্ আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি এবং ক্ষুদ্র ভাবনাই এই ক্ষুদ্রতা লাভের কারণ। ক্ষুদ্রতাই জন্মমরণ-বাহুল্যরূপ দুঃখ-বাহুল্যের কারণ। মানব যদি অনবরত আপনাকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা ভাবনা করে তবে সে ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইয়া যাইতে পারে এবং মানবীয় পরমায়ু কালকে পিপীলিকা রাজ্যের মৌহূর্ত্তিক জন্মমরণ কাল দ্বারা সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক মরণ দুঃখকে সহস্র সহস্র মরণ দুঃখে পরিণত করিতে পারে। পক্ষান্তরে মানব আপন বিরাট্ স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিরাট্ রূপে উপনীত হইতে পারিলে মানবীয় পরমায়ু শতবৎসরকে দ্বিপরার্দ্ধবৎসররূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, মানব-ভোগ্য লক্ষ লক্ষ জন্মমরণদুঃখের গ্রাস হইতে মুক্তিও লাভ করিতে পারে।

মলিনচেতা ব্যক্তি, এই শুভ ভাবনা করিবার অনধিকারী। যজ্ঞ, দান, তপস্যা-রূপ কর্ম্ম করিতে করিতে এই অধিকার লাভ হয়। জনক বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া চিত্ত-বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, জনক বিশুদ্ধ-চিত্ত যজমান, উপনিষদ্দেবী তাঁহার উদাহরণে মুমুক্ষুজীবকে চিত্তবিশুদ্ধির উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদরূপে ভাবনাশুদ্ধির উপদেশ করিতেছেন—যজমানকে যাজ্ঞিকজনলভ্য বিরাট্ আত্মস্বরূপে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যরূপে বলিতেছেন—এই যে যজমানের বাক্, ইহাই অধিযজ্ঞে হোতা, কেননা এই যে যজমানের বাগিন্দ্রিয় ইহাই অগ্নি এবং এই যে অগ্নি ইনিই যজ্ঞভূমিতে হোতৃরূপী। ইহাই মুক্তি এবং অতিমুক্তি অর্থাৎ এক অগ্নিই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধি-দৈবিক মূর্ত্তিতে অবভাসমান। যে অগ্নি তত্ত্বতঃ ব্রহ্মস্বরূপ তিনি আধিদৈবিক ভাবে হিরণ্যগর্ভরূপী এবং তিনি হিরণ্যগর্ভের মুখস্বরূপ অগ্নি, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে যজমানের বাগিন্দ্রিয়রূপে অধিযজ্ঞভাবে হোতৃরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যজ্ঞাবসানে যজমান যদি আপন বাগিন্দ্রিয়কে এবং হোতৃনামক ঋত্বিক্‌কে হিরণ্যগর্ভরূপী আপনস্বরূপের মুখরূপধারী অগ্নিরূপে ভাবনা করেন তবে তাহাই মুক্তি এবং এই ভাবনার ফলে যজমানের বাগিন্দ্রিয় এবং হোতৃ-পুরুষের যে অগ্নিভাব লাভ তাহাই অতিমুক্তি।

স্বাভাবিক অজ্ঞানজনিত কর্ম্মসংস্কাররূপ মৃত্যু দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই মৃত্যু আত্মসহচরী স্মৃতির সাহায্যে

বাহিরে নানারূপ ত্রিগুণময় বিষয়রজ্জু রচনা করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীবকে বন্ধন করিয়া লইতেছে, অবশেষে পরমায়ুশেষে সমষ্টি মৃত্যুর নিকট ইহাকে বলির ন্যায় উপহার দিতেছে। উপনিষদ্‌দেবী এই কর্ম্মসংস্কাররূপ মৃত্যুর গ্রাস হইতে যজমানকে মুক্ত করিবার জন্য ক্ষুদ্র সংস্কার-সহচরী ক্ষুদ্র স্মৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া বিরাট্ আত্মস্মৃতি আনয়নের জন্য, প্রথম হিরণ্যগর্ভস্বরূপ সূত্রাত্মার মুখাবয়ব নির্দ্দেশ করিলেন।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য কর্ম্মরূপ মৃত্যুর গ্রাস হইতে অতিমুক্তি পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিলেন দেখিয়া হোতা অশ্বল পূর্ব্বোক্ত মৃত্যুর আশ্রয়স্থানীয় সকাম দর্শপূর্ণ-মাস প্রভৃতি যজ্ঞের পরিণাম হেতু যে কাল তাহাও কর্ম্মেরই মত বস্তুপরিবর্ত্তন-কারী মৃত্যুস্বরূপ সুতরাং তাহার গ্রাস হইতেও যজমানের অতিমুক্তি আবশ্যক মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! আমার আরও প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞের সাধন বস্তু সমূহ ত সকলই অহোরাত্ররূপী কালের গ্রাসে পতিত, এবং কালবশীকৃত। কি উপায়ে যজমান এই অহোরাত্ররূপী কালের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাতন্ত্র্যলাভ করিতে পারে? এই যে কালবশে যজমানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তরূপ হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম-অসমর্থ হইয়া পড়ে; এই যে—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্
দশন-বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।

হইয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য! কি উপায়ে জীব এই কালকবল হইতে অব্যাহতি পাইবে?

যাজ্ঞ] অধ্বর্য্যু নামক যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ দ্বারা এবং আদিত্যস্বরূপ চক্ষু দ্বারা যজমান এই কালগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে।

এই যে যজমানের চক্ষু ইহাই অধ্বর্য্যু, কেননা এই চক্ষুই আদিত্য এবং আদিত্যই অধ্বর্য্যু। যজমানের চক্ষু এবং অধ্বর্য্যু যজ্ঞের এই উপকরণদ্বয় মুখাবয়বের ন্যায় যজমানের ভাবনার ক্ষুদ্রতায় আধ্যাত্মিক ও আধিযজ্ঞিকরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া আছে তাহাই যজমানের ভাবনা বিশালতায় আধিদৈবিক সূর্য্যরূপে ভাবিত হইয়া যজমানের মুক্তির কারণ হয়। এই ভাবনাই মুক্তি এবং এই আদিত্য-ভাবনার ফলে যজমানের চক্ষু ও অধ্বর্য্যুর যে আদিত্য-ভাব-প্রাপ্তি তাহাই কালগ্রাস হইতে অতিমুক্তি। সর্ব্বদা প্রকাশময় সূর্য্যদেবের যেমন

অহোরাত্ররূপ কালগ্রাসে পতিত হইবার আশঙ্কা নাই, তদ্রূপ সূর্য্যভাবাপন্ন-দৃষ্টি যজমানও ভাবনাফলে কালগ্রাস হইতে অতিমুক্ত হইয়া অভয়লাভ করেন।

কাল দ্বিবিধ—অহোরাত্র স্বরূপ এবং তিথ্যাদিরূপ। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসানুরূপ অহোরাত্রস্বরূপ কালের গ্রাস হইতে যজমানের অতিমুক্তির যথাযথ ব্যাখ্যা করিলেন, দেখিয়া অশ্বল পুনরপি তিথ্যাদি স্বরূপ কালের গ্রাস হইতে যজমানের অতিমুক্তির উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! এই যজ্ঞের উপকরণ স্বরূপ যাবতীয় পদার্থ শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষরূপ তিথি সমূহ দ্বারা কবলিত, এবং তিথি বশীকৃত, যজমান কি উপায়ে এই তিথিরূপ কালের মুখ হইতে মুক্তিলাভ করে?

যাজ্ঞ] উদ্‌গাতা (সমবেদজ্ঞ ঋত্বিক্) এবং আপন প্রাণ সাহায্যে যজমান তিথিরূপ কালের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে। যজমানের প্রাণই যজ্ঞভূমিতে উদ্‌গাতা, কেননা এই প্রাণই আধিদৈবিকরূপে হিরণ্যগর্ভের প্রাণবায়ু, আবার এই হিরণ্যগর্ভের প্রাণবায়ুই যজ্ঞ নির্ব্বাহের জন্য উদ্‌গাতামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যখন যজমান ভাবনার প্রসারে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করেন, যখন আপন প্রাণবায়ুকে এবং যজ্ঞের ঋত্বিক্‌বিশেষ উদ্‌গাতাকে হিরণ্যগর্ভ প্রাণস্বরূপ বায়ুরূপে ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হন, তখন তাহাই তিথ্যাদিরূপ কালগ্রাস হইতে মুক্তি এবং এই ভাবনার ফলে যজমানের প্রাণবায়ু এবং উদ্‌গাতার যে হিরণ্যগর্ভ-প্রাণরূপে পরিণতি, তাহাই অতিমুক্তি।

যদিও চন্দ্রকলার উপচয়াপচয় হইতে তিথিরূপ কাল নির্গত হয়, এবং তজ্জন্য অহোরাত্ররূপ কালের গ্রাস হইতে মুক্তির জন্য যেমন সূর্য্যভাব প্রাপ্তি আবশ্যক, তদ্রূপ তিথিরূপ কালগ্রাস হইতে মুক্তির জন্য চন্দ্রভাব প্রাপ্তি আবশ্যক * তথাপি মনের কার্য্য প্রাণবৃত্তি পূর্ব্বক, অতএব হিরণ্যগর্ভের মনোরূপী চন্দ্রের কার্য্যস্বরূপ তিথি প্রভৃতি হিরণ্যগর্ভের প্রাণস্বরূপ বায়ুরই কার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অতিমুক্তির জন্যও বায়ুভাবনাই গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক যাজ্ঞবল্ক্য তিথিরূপ কালের গ্রাস হইতেও অতিমুক্তি পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া ফেলিলেন দেখিয়া অশ্বল পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—

* মাধ্যন্দিনীয় শাখায় প্রাণে এবং উদ্গাতায় চন্দ্রভাবনার ফলে তিথিরূপ কালের কবল হইতে অতিমুক্তি ব্যাখ্যাত হইতেছে। শাঃ ভাঃ

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য ! যজমান মৃত্যুমুখ হইতে অতিমুক্ত হইয়া কাহার আশ্রয়ে ফলপ্রাপ্ত হয় ? কারণ, এই যে আকাশ, ইহা যেন মনে হয়, নিরালম্বন। যজমান কাহাকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবেন এবং অতিমুক্তি ফল-ভোগ করিবেন ?

যাজ্ঞবল্ক্য] ব্রহ্মা (অথর্ব্ববেদজ্ঞ ঋত্বিক্) এবং আপন মনকে চন্দ্ররূপে ভাবনা করিয়া যজমান স্বর্গলোক লাভ করেন, এবং অতিমুক্তি ফল ভোগ করেন। যজমানের মনই ব্রহ্মা, কেননা মনই আধিদৈবিকরূপে চন্দ্র এবং এই চন্দ্রই যজ্ঞভূমিতে ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্। যদি যজমান ব্রহ্মা এবং আপন মনকে চন্দ্র-স্বরূপের ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হয়েন তবে সেই ভাবনাই যজমানের মনের মুক্তি এবং এই মুক্তির ফলে যজমানের মন ও ব্রহ্মার যে চন্দ্রভাবপ্রাপ্তি তাহাই অতিমুক্তি।

হোতৃবর ! অশ্বল ! এই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদত্ত হইল; সম্প্রতি আপনার অজিজ্ঞাসিত হইলেও আমি পূর্ব্বোক্ত ভাবনার অঙ্গ বলিয়া কতিপয় সম্পদের বর্ণনা করিব।

অশ্বল] সম্পদ কি ?

যাজ্ঞ] যথাশক্তি অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে (কোনরূপ সাম্য লইয়া) যে অশ্বমেধাদি ভাবনা এবং তদ্দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ন্যায় ফল সম্পাদন, তাহাকেই সম্পদ্ বলে। উদাহরণে এই লক্ষণের অর্থ স্পষ্টতররূপে উপলব্ধ হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে কর্ম্মের যে ফল শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, কেবল ঐ কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠানেই তৎফলসিদ্ধি যুক্তিযুক্ত মনে হয়, ঐ কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া পক্ষান্তরে অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শুধু ভাবনারূপ সম্পদে কি ঐ ফলের সিদ্ধিসঙ্গত ? তদুত্তরে বক্তব্য এই—রাজসূয়, অশ্বমেধ পুরুষমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি কতিপয় যজ্ঞে সকল বর্ণের অধিকার নাই অথচ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞসমূহ যে যে শ্রুতির প্রতিপাদ্য তৎসমুদয় পাঠে দ্বিজাতি মাত্রেরই সমান অধিকার রহিয়াছে, এরূপ স্থলে অপর বর্ণের পক্ষে ঐ শ্রুতিভাগের অধ্যয়ন অনর্থক হয়, এই জন্য শ্রৌতসিদ্ধান্ত এই—পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞে অনধিকারী দ্বিজাতিগণও আপন অধিকারভুক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে বা অন্য শ্রৌতকর্ম্মে অশ্বমেধাদি ভাবনারূপ সম্পদের সাহায্যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবেন।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! এই যজ্ঞে হোতা কতটি ঋক্ দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকেন?

যাজ্ঞ] হোতা তিনটী ঋক্ দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকেন।

অশ্বল] কি সেই তিনটী ঋক্?

যাজ্ঞ] পুরোঽনুবাক্যা প্রথম, যাজ্যা দ্বিতীয় এবং শস্যাই ইহাদের তৃতীয়। (যে জাতীয় ঋক্ যজ্ঞকালের পূর্ব্বে স্তুতিরূপে প্রযুক্ত হয় উহা পুরোঽনুবাক্যা, আর যজ্ঞকালে যজ্ঞনির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহাই যাজ্যা এবং অগের যে ঋগ্‌জাতি স্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাই শস্যা। যত প্রকারের ঋক আছে, তৎসমুদয়ই এই ত্রিজাতির অন্তর্ভূত।

অশ্বল] এই ত্রিবিধ ঋক্‌দ্বারা যজমান কোন্ কোন্ স্থান জয় করেন?

যাজ্ঞ] যাহা কিছু প্রাণিপুঞ্জ আছে, তৎসমুদয় অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ (যাজ্ঞিক নিজের প্রযুক্ত ত্রিবিধ ঋক্ দ্বারা) এই ত্রিভুবন জয় করেন। কেননা (ঋত্বিক্ ত্রিজাতীয় ঋক্ যজ্ঞে ব্যবহার করেন, তদ্দ্বারা ত্রিভুবন জয় করা হয়). এখানে ঋক্ ও তিন লোক ও তিন এই সংখ্যা সাম্য লইয়া ঋত্বিক্ আপন ভাবনাবলে প্রযুক্ত মন্ত্রত্রয়কে ত্রিলোকীজয়ের কারণরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, এই জন্য ইহা সম্পদ্।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে ত্রিলোকী জয় করিতে হইলে যে সমুদয় উপকরণ আবশ্যক, তাহার কিছু নাই অথচ মনে মনে ভাবনা করিলাম—এই আমি ত্রৈলোক্য জয় করিলাম তাহাতেই ত্রৈলোক্য জয় হইয়া গেল ইহা ব্যর্থ কল্পনামাত্র।

তদুত্তরে বক্তব্য এই, যতদিন আত্মা সত্যসঙ্কল্প থাকেন বা যখন পুনরায় সংসার-মলনাশে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া অল্পাধিক সত্যসংকল্প হন, ততদিন বা তখন ভাবনা ও কল্পনা শব্দের অর্থ এক, ততদিন বা তখন কল্পনামাত্রেই উহা সত্য হইয়া যায়। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আপন মনে 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' পূর্ব্ব-সৃষ্টির ন্যায় বস্তুসমূহ কল্পনা করিতে লাগিলেন, আর এদিকে বস্তুসমূহের সৃষ্টি হইল। মহর্ষি গাধি অন্তর্জ্জলে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ ভাবনা হইল—আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এই মরিলাম, এই আমার ব্যাধপল্লীতে পুনর্জ্জন্ম, এই আমার বিবাহ, এই রাজহস্তীর শুণ্ডাকর্ষণে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ, এই রাজা

হইলাম, ইত্যাদি যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই সত্য হইয়া গেল ইত্যাদি উদাহরণ নিভৃত-হৃদয়ে আলোচনা করিলে আর এ সংশয় থাকে না।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্) এই যজ্ঞে কতটি আহুতি দ্বারা হোম করেন ?

যাজ্ঞ] তিনটী।

অশ্বল] কি সেই তিনটী ?

যাজ্ঞ] সমিধ্ ঘৃত প্রভৃতি যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে. এবং মাংসাদি যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া অতীব শব্দ করে এবং দুগ্ধ সোম-রস প্রভৃতি যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলগত হয় এই সেই তিনটী আহুতি।

অশ্বল] এই ত্রিবিধ আহুতি দ্বারা যজমান কোন্ কোন্ স্থান জয় করেন ?

যাজ্ঞ] এই ত্রিবিধ আহুতি মধ্যে যে আহুতিসমূহ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, তাহা দ্বারা যজমান আহুতিরই মত উজ্জ্বল স্থান দেবলোক লাভ করেন। এবং যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া অতীব কুৎসিত শব্দ করে, যজমান তাহা দ্বারা পিতৃলোক জয় করেন। কেননা পিতৃলোকসংবদ্ধ সংযমনী নামক যমপুরীতে জীবগণ অসহনীয় যম-যাতনায় কাতর হইয়া "ছাড়, ছাড়, মরিলাম, মরিলাম" ইত্যাদি উৎকট শব্দ করিয়া থাকে, এই উৎকট শব্দসাম্য আছে বলিয়া উৎকট শব্দকারী আহুতির ফলে যজমান পিতৃলোক জয় করেন। অর্থাৎ আহুত মাংসাদি দ্রব্যের উৎকট শব্দ শ্রবণে এই আমি পিতৃলোক জয় করিলাম এই ভাবনাফলে ঐ আহুতিই পিতৃলোক জয়ের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলগত হয়, তাহা দ্বারা যজমান মনুষ্য-লোক জয় করিয়া থাকেন। কেননা মনুষ্যগণ—ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, আহুতিও প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে অধিশয়িত হইতেছে দেখিয়া ভূতল-স্থিতি-সাদৃশ্যে এই আমি মনুষ্যলোক জয় করিলাম এই ভাবনায় মনুষ্য-লোক জিত হইয়া যায়।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! যজ্ঞকালে ব্রহ্মা দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কতটি দেবতার সাহায্যে যজ্ঞ রক্ষা করেন ?

যাজ্ঞ] একটী মাত্র দেবতার সাহায্যে ব্রহ্মা যজ্ঞ রক্ষা করেন।

অশ্বল] কে এই একটী দেবতা ?

ক্রমশঃ

করিতে অভ্যাস করুক। এইরূপ করিলে হিণ্যগর্ভের উপাসনা সহজ হইবে। ভগবান্ শুকদেব মুমুক্ষু বিষ্ণুরাত্‌কে এইজন্য প্রথমেই হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করিতে উপদেশ প্রদান করেন। ইহার উপরের কথা ব্রহ্মভাবে স্থিতি।

এখন দেখ। তোমার নাম ও রূপ হইতেছে ব্যষ্টি অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই ব্যষ্টি অজ্ঞানে উপহিত যে চৈতন্য সেই খণ্ডমত প্রতীয়মান চৈতন্যই তুমি। ঐ খণ্ডচৈতন্য ভিতরে থাকিয়া ত্রিবিধ শরীরকে চৈতন্য দিতেছে। কিন্তু খণ্ডনাম রূপে পরিচ্ছিন্নমত যে চৈতন্য তাহার পূর্ণত্ব কোথায় ?

যদ্দ্বারা পূর্ণ চৈতন্য খণ্ডমত হইয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা ঐ নামরূপ বিশিষ্ট উপাধি। আপনার মধ্যে যে দ্রষ্টাভাব তাহাই চৈতন্য। যখন তুমি আছ - তখন তুমি কোন কিছুর দ্রষ্টা। মনে কর তুমি শ্বাসের হং ও সঃ ইহার দ্রষ্টা। বহুকাল ধরিয়া শ্বাসের দ্রষ্টা থাকিতে থাকিতে যখন বায়ু স্থির হইবে তখন তুমি দ্রষ্টার স্বরূপ যে অখণ্ড চৈতন্য তাহাতেই স্থিতি লাভ করিবে। ঐ কালে ত্রিবিধ দেহ বা জগৎরূপ উপাধি তোমাতে প্রতিভাত হইবে না, ভুল হইয়া যাইবে। কিন্তু দেহ বা জগৎরূপ উপাধিটি ভুল হইলেই যে হইবে তাহা নহে। কারণ ব্যুত্থান সময়ে আবার দেহ বা জগৎ যেমন ছিল তেমনিই থাকিবে। তাই দেহ ও জগৎ মিথ্যা ইহা যতক্ষণ না বিচার দ্বারা নিশ্চয় হইবে ততক্ষণ আত্মা-দর্পণে মিথ্যা জগৎ বা দেহের ছায়া পড়িয়া ইহাকে কলঙ্কিত করিবেই।

দেহ ও জগৎ অর্থাৎ দৃশ্যদর্শনের যে অত্যন্তাভাব তাহা বিচার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। তৎ ও ত্বং এই দুই পদের উপাধির আত্যন্তিক নিবৃত্তিই ইহাদের একভাবে স্থিতি। অন্য দৃষ্টান্ত দিয়া আবার বুঝাইতেছি শ্রবণ কর।

মনে করা হউক অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় আকাশ—তাহার উপরে একখণ্ড মেঘ উঠিয়া তাঁহার একদেশ মাত্র ঢাকিয়া ফেলিল। এখানে আকাশ হইতেছেন শুদ্ধ পূর্ণ চৈতন্য, মেঘ খণ্ডটি হইলেন মায়া আর পূর্ণ আকাশ মধ্যে মেঘ খণ্ড উঠাতে মেঘখণ্ডিত যে আকাশ হইলেন তিনি হইতেছেন ঈশ্বর চৈতন্য। যদি এইখানে সব শেষ হইত তবেত কোন কথা ছিল না। কিন্তু মায়া মেঘ এক-খানিই থাকে ক্রমে সেই মেঘখানি বহু খণ্ডে বিভক্ত হইতে থাকে। মায়া বহুখণ্ডে বিভক্ত হইলে নাম হয় অবিদ্যা। একখানি মেঘই যখন বহুধা খণ্ডীকৃত হয় তখন প্রতি খণ্ডমেঘের তলে তলে থাকিয়া ঐ এক আকাশই বহু খণ্ডে

দেখা দিতে থাকেন। মায়া এক, অবিদ্যা বহু। সেই অবিদ্যা পরিচ্ছিন্ন যে বহু চৈতন্য খণ্ড তাহাই জীবচৈতন্য। এখন সবগুলি এক সঙ্গে ভাবনা কর।

পরিপূর্ণ চৈতন্য + মায়া = ঈশ্বর চৈতন্য। ঈশ্বর চৈতন্য + অবিদ্যা = বহু-জীব। আকাশ সর্ব্বদা আকাশই আছেন। স্বভাবতঃ মণির ঝলকের মত তাঁহাতে একখানি মেঘ উঠিলেও আকাশ অপরিচ্ছিন্নই থাকেন তথাপি মনে হয় যেন মেঘ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেন। আবার ঐ মেঘখানি বায়ু দ্বারা বহুভাগে বিভক্ত হইলে আকাশকে বহুখণ্ডে খণ্ডিত দেখা যায়। এই বহুখণ্ডে খণ্ডিত যে এক আকাশ—তাহাই যখন বহু দেখায় তখন তাহারা জীবাখ্যা ধারণ করে। ব্রহ্ম চিরদিনই ব্রহ্ম। মায়া শবলিত হইয়া যখন তিনি সগুণ হয়েন তখন তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়। এই ঈশ্বরই আবার অবিদ্যা শবলিত হইয়া বহু জীব আখ্যা ধারণ করেন। ঈশ্বরকে বলা হয় সমষ্টি চৈতন্য, জীবকে বলা হয় ব্যষ্টি চৈতন্য। ব্যষ্টিগুলি একত্র করিলেই সমষ্টি হয় সত্য, কিন্তু ব্যষ্টি না থাকিলেও মায়া শবলিত সগুণ ব্রহ্ম থাকেন। বাস্তবিক ব্যষ্টি সমষ্টি নাই! এক মায়া থাকিলে সমষ্টি আবার অবিদ্যা উঠিলেই ব্যষ্টি। অবিদ্যা উঠিলেই জীব উঠেন; উঠিয়া তিনি অবিদ্যার মূর্ত্তি এই বিচিত্র প্রপঞ্চ দর্শন করেন। জীবের জগদ্দর্শন—ইহা অবিদ্যার কার্য্য। আকাশ খণ্ড সমূহকে বাহিরের খণ্ড-মেঘ দর্শন ছাড়াও বাহির ছাড়িয়া ভিতরের অনুভব আনুক তখন মেঘ ও নাই, মেঘখণ্ডও নাই এক আকাশ এক আকাশই আছেন। সোঽহং বা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার ঐ একত্ব অনুভব জন্য। ওঁ এই অখণ্ড আকাশ। সঃ মেঘ উঠিলে আকাশ যাহা হয়েন তাহা মায়ামণ্ডিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। হং যাহা তাহা খণ্ড খণ্ড মায়া বা অবিদ্যা মণ্ডিত সেই এক আকাশ। সঃ ও অহং এই দুইই মায়া-অবিদ্যার প্রভাবে। হ বাহিরে যাওয়া স ভিতরে প্রবেশ। বাহিরে যাওয়াও ভিতরে প্রবেশ করা বাদ দিলে যে স্থিরত্ব তাহাই আছেন তাহাই তুমি তাহাই আমি। তত্ত্বটি আলোচনা করিয়া আপনাকে অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় আকাশ সদৃশ চিন্তা করিতে পারিলে, ব্যষ্টি সমষ্টি মধ্যে লুকাইয়া যাইবে। পরে উপাধিগত এই সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদ অদৃশ্য হইয়া এক কেবল, সেই মাত্রই থাকিবে। জ্যোতির্ম্ময় আকাশ সদৃশ ইহা চিন্তা করার সুবিধার জন্য বৈরাগ্য, প্রাণায়াম, জপ, কুম্ভক, ধ্যান, পূজা, আত্মবিচার যাহার যাহা সুবিধা বহুদিন ধরিয়া করা চাই। ক্রিয়াযোগ সিদ্ধ হইলে

তবে ঈশ্বর প্রাণিধান বা নিষ্কাম কর্ম্ম সিদ্ধ হইল। নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তিযোগে কোন প্রভেদ নাই। উহার পরেই সঙ্কল্প ক্ষয় হইয়া জ্ঞানে ঐক্য সাধন।

রাম—ব্রহ্ম ঈশ্বর জীব ইঁহারা চৈতন্য স্বরূপ। চৈতন্য অর্থে জ্ঞানকেই বুঝায়। জ্ঞান জানার নাম। জানা বলিলে সাধারণতঃ আপনাকে আপনি জানা ও আপনি পরকে জানা এই বুঝায়। ইহাই চৈতন্য কথার অর্থ। কিন্তু যখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকে না তখন যে শুদ্ধ জ্ঞানটি মাত্র থাকে যে জ্ঞানে দ্রষ্টা দৃশ্যদর্শন থাকে না তাহাই ব্রহ্ম। দ্রষ্টাভাব জাগিলেই বুঝা যায় ব্রহ্ম মায়া অবলম্বনে সগুণ মত বোধ হইতেছে। এই অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে জড় দৃষ্টান্তদ্বারা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইবে তাহাই বলুন।

বশিষ্ঠ—এই গ্রন্থের ৬৬পৃষ্ঠায় ইহার উত্তর দিয়াছি। দৃষ্টান্তের বিসদৃশ অংশ-ত্যাগ করিয়া সাধর্ম্ম্যাবলম্বন করিলে জড় দৃষ্টান্তে একটা মোটামুটি ধারণা মাত্র হয়। ধারণা দ্বারা ধ্যানের সুবিধা হয়। ধ্যান পরিপক্ক হইলেই স্থিতি হয়। স্থিতিই ব্রহ্ম। যে উপায়ে পার স্থিতি লাভ কর। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার বা সোঽহং মহাবাক্যের বিচারই হইতেছে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। বেদ ইহা বহুভাবে অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যতো জাতানি জীবন্তি" সৃষ্টি সম্বন্ধে এই সমস্ত শ্রুতি তৎ পদের বাচ্যার্থ প্রকাশ করে। আবার "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতি তৎ পদের লক্ষ্যার্থ জানাইতেছে।

পুনশ্চ জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি বিষয়ক শ্রুতি "তদ্যথা মহামৎস্য উভে কুলে অনু-সঞ্চরতি পূর্ব্বং চৈবাপরং চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ" ইত্যাদি তৎপদ বাচ্যার্থের প্রকাশক। "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" ইহা লক্ষ্যার্থ। বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া এই লক্ষ্যার্থে তৎ ও ত্বম্পদের একত্ব।

তত্ত্বমসির অনুভব জন্য পরমব্রহ্ম স্বরূপ তৎ পদার্থ হইতে কিরূপে জীবভাব পর্য্যন্ত আসিতেছে সেই বিচার করা আবশ্যক। সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাই সৃষ্টিক্রম। মায়ার উদয়, পরে মায়াশবলিত ব্রহ্ম, পরে মায়ার অবিদ্যা মূর্ত্তি গ্রহণ, তদুদয়ে জীবভাব গ্রহণ, ইত্যাদি সৃষ্টিতত্ত্ব : আবার চৈতন্য কোনটি ইহার অনুভব জন্য যখন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহা নহে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ইহা নহে, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার প্রকৃতি পর্য্যন্ত কেহই ইহা নহে ; তন্ন তন্ন এই সংহারক্রমে শুদ্ধ চৈতন্যটি কি ইহার বিচার যখন করা যায়, তখনই জীবচৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্য কিরূপে তাহা জানিতে পারা যায়।

বিবিদিষা সন্ন্যাসের পর পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বমসির শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা যখন আত্মাকে জানা যায় তখনই দৃশ্যদর্শন যে নাই ইহার বিচারও পূর্ণ হয়।

---

২ সর্গ।

দৃশ্যমার্জ্জনে মৃত্যু অতিক্রম—আকাশজ ব্রাহ্মণ।

দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি তিলে তৈলের মত, কুসুমে গন্ধের মত, কমল লতিকার পদ্মবীজের মত লুক্কায়িত থাকে পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে। দর্শন কর্ত্তাতে দৃশ্য থাকিবেই। এই দৃশ্যজ্ঞানই মৃত্যুর বীজ। দৃশ্যরূপিণী পিশাচী দ্রষ্টাকেই হনন করে। জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যেখানেই থাকুন না কেন তদীয় উদরে দৃশ্যজগতের উদ্ভব হইবেই। কাজেই যতদিন জীব ভাব থাকিবে ততদিন মৃত্যু অবশ্যই জীবকে গ্রহণ করিবেই। এখানে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে যতদিন চিত্ত থাকিবে ততদিন দৃশ্য দর্শন থাকিবেই। চিত্তই বাসনা। আত্মা দেখেন চিত্তকে বা বাসনাকে আর চিত্ত দেখেন জগৎ। তবেই দেখ বাসনা ত্যাগই স্বরূপ প্রাপ্তি।

রাম—মৃত্যুত সকলকেই অসীম যন্ত্রণা দিয়া গ্রহণ করেন। এমন কেহ কি আছেন মৃত্যু যাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না?

বশিষ্ঠ—আকাশজ এক ব্রাহ্মণ আছেন। মৃত্যু তাঁহাকে শত চেষ্টা করিয়াও গ্রহণ করিতে পারেন না। যিনি আকাশজ ব্রাহ্মণের মত হইতে পারেন তিনি মৃত্যুকেও জয় করেন।

রাম—কি কারণে জীবের মৃত্যু হয় অগ্রে তাহাই বলুন। পরে আকাশজ ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তে দৃশ্যমার্জ্জন করিয়া কিরূপে মৃত্যু অতিক্রম করা যায় তাহা বলিবেন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মাণ্ড কত তাহার সংখ্যা নাই। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে কত জীব তাহার সংখ্যা কে করিবে? একজন মনুষ্যের রক্ত বিন্দুতে যেমন কোটি কোটি জীব বিচরণ করে সেইরূপ কোন এক মহাপুরুষের অঙ্গে এই অনন্ত কোটি জীব চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। একটি একটি জীব ব্যষ্টিভাব এবং সমস্ত

জীবের সমষ্টি যিনি তিনিই সমষ্টিভাব। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ বেশ করিয়া ধারণ কর ব্যষ্টি জীবের মৃত্যু কিরূপে হয় বুঝিতে পারিবে।

রাম—ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ আর একবার বলুন।

বশিষ্ঠ—একটি স্তম্ভ কল্পনা কর। আর সেই স্তম্ভটি যেন সর্ব্বত্র কাষ্ঠ-পুত্তলিকা ক্ষোদিত মনে কর। সমস্ত কাষ্ঠপুত্তলিকার সমষ্টি লইয়াই এই স্তম্ভ। স্তম্ভ ক্ষোদিত কাষ্ঠপুত্তলিকাগুলি স্তম্ভ হইতে অভিন্ন হইলেও যেমন বিভিন্ন আকার দেখায় সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত চিন্ময়ী প্রপঞ্চ রচনাও স্বীয় আধার চিৎ হইতে বিভিন্ন দেখাইয়া থাকে। ফলে জীবচৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্য; তথাপি অবিদ্যা জীবচৈতন্যকে একটা আকার দিয়া আকারবান করেন বলিয়া, জীবচৈতন্য যেন আপনাকে আপনার স্বরূপ যে ব্রহ্মচৈতন্য তাহা হইতে বিভিন্ন মনে করিবেন, এইরূপে আপনাকে আপন প্রকৃত স্বরূপ হইতে বিভিন্ন মনে করিলে "তিনিই ঐ অবয়বটি," এইরূপ একটা ভ্রম করেন। এই ভ্রমের মধ্যেই মৃত্যুর বীজ থাকে।

ব্রহ্মও জীবে ভেদ নাই। ব্রহ্মও যেমন সত্যসঙ্কল্প জীবও স্বরূপে সেইরূপ সত্যসঙ্কল্প। এই সত্যসঙ্কল্প জীব যখন দৃঢ়নিশ্চয় করেন যে আমি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের কার্য্য তখনই তিনি পার্থিব বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ব্যষ্টিজীবের ঐরূপ সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে সমষ্টি পুরুষও আপন বুদ্ধিতে ব্যষ্টিজীবের মৃত্যু কল্পনা করেন। "আমি দেহ" জীবের এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইলেই সমষ্টি পুরুষ দ্বারা ব্যষ্টি জীবের মৃত্যু কল্পিত হইয়া যায়। স্তম্ভখোদিত পুত্তলিকা আপনাকে স্তম্ভ হইতে পৃথক মনে করিলেই আপন মৃত্যুর কারণ আপনিই হয়। সমষ্টি পুরুষ সে ক্ষেত্রে নিমিত্ত মাত্র। এই সময়ে হিরণ্যগর্ভের ব্যষ্টিভূত জীবকে মৃত্যু ঝটিতি আক্রমণ করেন।

ব্যষ্টি জীব আপনার আতিবাহিক দেহ বা নিরাকারতা ভুলিয়া যখন আপনাকে লিঙ্গদেহ বিশিষ্ট বা আধিভৌতিকদেহ বিশিষ্ট মনে করে তখনই সে আপন স্বরূপ ভুলিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। আমি দেহ এইরূপ মনে করিলেই জীব কর্ম্মে আসক্ত হয়। অভিমান, বিষয় বাসনাদিই ঐহিক কর্ম্ম। কর্ম্মই মরণের সহকারী কারণ। কর্ম্মশূন্য অবস্থায় থাকিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। জীব কর্ম্ম করুক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু বেশ করিয়া বুঝুক যে, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করা, এবং কর্ম্ম না

করা উভয়ই সমান। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে, অথবা অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারিলে জীব মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে। কর্ম্ম হয় হউক কিন্তু কর্ম্মে যিনি বিশ্রাম বা অকর্ম্ম দেখেন তিনিই মৃত্যু জয় করিতে পারেন। তবেই দেখ প্রাণিগণের কর্ম্ম অনুসারেই সমষ্টি পুরুষের সঙ্কল্প জাগ্রত হয়। সমষ্টি পুরুষের এই ইচ্ছাতেই তবে জীবের মৃত্যু হয়।

রাম—ইহা কতক কতক বুঝিতেছি কিন্তু পরিষ্কাররূপে ধারণা করিয়া দিউন।

বশিষ্ঠ—আকাশজ ব্রাহ্মণের উপাখ্যান শ্রবণ কর উৎপত্তি প্রকরণও বুঝিবে।

রাম—বলুন!

বশিষ্ঠ—আকাশজ ব্রাহ্মণ পরম ধার্ম্মিক। তিনি ধ্যাননিষ্ঠ। মৃত্যু সকলকে ভক্ষণ করেন কিন্তু ইঁহাকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছেন না। অত্র ম কুণ্ঠিতা-শক্তি খড়্গাধারাইবোপলে। আমি সকলকে ভক্ষণ করি কিন্তু প্রস্তরে খড়্গাধারার মত এই আকাশজ বিপ্রে আমার শক্তি কুণ্ঠিত হইতেছে কেন? পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও হয় না। মৃত্যু উদ্যোগ ত্যাগ করিলেন না। শেষে ঐ ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গমন করিলেন। আশ্চর্য্য! পুরে প্রবেশ মাত্র অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি অগ্নি বিদারণ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণকে পাইয়া মৃত্যু সেই ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিলেন কিন্তু একজনের সঙ্কল্প পুরুষকে যেমন অন্যে গ্রহণ করিতে পারে না সেইরূপ তিনি কিছুতেই উহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না।

মৃত্যু তখন ধর্ম্মরাজ যমের নিকটে গিয়া দুঃখ জানাইলেন। কিমিত্যহং ন শক্নোমি ভোক্তুমাকাশজং বিভো! আকাশজ ব্রাহ্মণকে আমি ভক্ষণ করিতে পারিতেছিনা কেন? যম বলিলেন মৃত্যো! তুমি একা কাহাকেও ভক্ষণ করিতে পার না। মারণীয় কর্ম্ম যাহার না থাকে তাহাকে তুমি সংহার করিবে কিরূপে? তুমি ঐ ব্রাহ্মণের মারক কর্ম্ম অনুসন্ধান কর—ঐ কর্ম্মের সাহায্যে সংহার করিতে পারিবে।

মৃত্যু বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কর্ম্ম পাইলেন না। শেষে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন ধর্ম্মরাজ আমিত উহার কর্ম্ম পাইলাম না। আপনি আকাশজ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম দেখাইয়া দিন।

ধর্ম্মরাজ বলিলেন উঁহার কর্ম্ম নাই প্রাক্তন কর্ম্মও নাই অদ্যতনও নাই।

এই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মিয়াছে কাজেই আকাশের মত ইহার কোন কর্ম্মই নাই। বন্ধ্যাপুত্রের মত ইনি উৎপন্নও নহেন। আকাশ ব্যতীত ইঁহার জন্মের অন্য উপাদান নাই বলিয়া ইঁহাকে আকাশ ভিন্ন কিছুই বলা যায় না। ইনি স্বকারণ আকাশেই অবস্থিত। ভ্রম বশতঃ আমরা তাঁহার প্রাণস্পন্দন দেখি। বস্তুতঃ ইঁহার কর্ম্মবুদ্ধি নাই। এই ব্রাহ্মণ চিদাকাশে স্বভাবতঃ জাত। যেমন জলে তরলতা, আকাশে শূন্যতা, বায়ুতে স্পন্দতা, স্বভাবতঃ অবস্থিত, সেইরূপ ইনিও পরমপদে অবস্থিত। ইনি আপনিই আপনি। ইনি সংসারের বশ নহেন। ইঁহার জন্মের কোন সহকারী কারণ নাই। ইনি স্বয়ম্ভু।

হে মৃত্যো! যে আপনাকে ক্ষিত্যাদি দেহ বিশিষ্ট বলিয়া জানে তাহাকেই তুমি মারিতে পার। ইনি সে কল্পনাও কখন করেন না। সেইজন্য ইনি সাকারও নহেন। তুমি আকাশকে বাঁধিবেই বা কিরূপে? মারিবেই বা কিরূপে?

মৃত্যু জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আকাশ ত শূন্যই। শূন্য হইতে জন্ম কিরূপে হইবে? পৃথিব্যাদি ভূত কিরূপে থাকে অথবা থাকে না তাহা বলুন।

ধর্ম্মরাজ বলিলেন আকাশজ ব্রাহ্মণ কখন জন্মান নাই—নাইও যে তাহাও নহে—চিরদিনই তিনি আছেন। উনি বিজ্ঞানদীপ্তি মাত্র—অতএব নিরাকার।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
ব্রহ্মান্তে শান্তমজরমনন্তাত্মৈবকেবলম্॥

মহাপ্রলয়ে কিছুই থাকে না কেবল শান্তব্রহ্মই থাকেন। আকাশজ ব্রাহ্মণের স্বরূপ এই ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের অতি নিকটে পর্ব্বতপ্রমাণ "আমি দেহ" ইত্যাকার সঙ্কল্প বিরাট দেহ স্ফুরিত হয়। এই দ্বিজই সেই বিজ্ঞান বিরাটপুরুষ। ইনিই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। ইঁহার দেহ নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, কর্ম্ম নাই, বাসনা নাই। ইনি শুদ্ধ চিদাকাশ, কেবল জ্ঞানঘন। তেজের যেমন প্রভা ইনিও সেইরূপ বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের প্রভা। ইনি সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষাৎ চৈতন্য।

আকাশশরীর ব্রহ্মাকে মৃত্যু কিরূপে আক্রমণ করিবে? ইনি সঙ্কল্প-পুরুষের ন্যায় অবস্থিত। পৃথিব্যাদিরহিত বলিয়া নিরাকার। ইনি কেবলমাত্র সঙ্কল্প-শরীর সেইজন্য ইনি মনোব্রহ্ম ইঁহার শরীর নাই, কর্ম্মও নাই। যাহার কর্ম্ম নাই, তাহার মৃত্যুও নাই।

৩য় সর্গ।

ব্রহ্মার বা সগুণব্রহ্মের মৃত্যু নাই কেন ?

রাম—অবিদ্যা অভিমানী আত্মাকে আপনি ভৌতিকদেহাত্মা অজ্ঞপুরুষ বলিতেছেন। ইনি মৃত্যুভক্ষ্য। কিন্তু আকাশজ-ব্রাহ্মণ বিদ্যাদ্বারা মৃত্যুবীজ ও অগবীজ দগ্ধ করিয়া ফেলায়, তিনি মৃত্যুর বশ নহেন। এই আকাশজ ব্রাহ্মণই চিন্মাত্রাত্মা। ইনিই সমষ্টিলিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ। ইনিই ব্রহ্মা। ইনিই মহামন। ইনিই সঙ্কল্পশরীর গ্রহণ করেন। "নৈতস্য পূর্ব্বকর্ম্মাস্তি" "ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মসঞ্চিতম্"। ইঁহার সঞ্চিত কর্ম্ম কিছুই নাই। ইঁহার অন্ততম কর্ম্মও কিছুই নাই। ইনি পূর্ব্বেও কর্ত্তা ছিলেন না, এখনও কর্ত্তা নহেন। "কর্ত্তা ন পূর্ব্বং নাপ্যদ্য"। ইঁহাকে মৃত্যু কিরূপে আক্রমণ করিবে? দৃঢ়-রজ্জ্বেব গগনং গ্রহীতং নৈব যুজ্যতে। দৃঢ়রজ্জু দ্বারা আকাশকে যেমন বন্ধন করা যায় না সেইরূপ মৃত্যুও ইঁহাকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না।

> নাস্যদেহো ন কর্ম্মাণি কর্ত্তৃত্বং ন বাসনা।
> এষ শুদ্ধচিদাকাশো বিজ্ঞান ঘন আততঃ॥
> প্রাক্তনং বাসনাজালং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
> কেবলং ব্যোমরূপস্য ভারূপস্যেব তেজসঃ॥

ইঁহার দেহ [পাঞ্চভৌতিকদেহ] কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব, বাসনা কিছুই নাই। প্রাক্তন বাসনাজালও ইঁহার কিছুই নাই। ইনি কেবল, ইনি ব্যোমরূপ। তেজের প্রভা যেমন তেমনি ইনি বিজ্ঞানময় জ্ঞানের প্রভা অর্থাৎ প্রকাশ।

আকাশজ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে আপনি পূর্ব্বে ইহা বলিলেন। কিন্তু আমার আরও জিজ্ঞাস্য আছে।

বশিষ্ঠ—কি বলিবে বল।

রাম—আপনি মহৎতত্ত্বকেই আকাশজ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। প্রথম সৃষ্ট-পদার্থই এই মহৎতত্ত্ব। ব্রহ্ম হইতে যে মায়ার উদয় হয় তাহা মণির ঝলকের মত অবুদ্ধিপূর্ব্বক। উহা স্বাভাবতঃই হয়। মহৎতত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম বিকার। নির্গুণব্রহ্মে মায়ার উদয় হইলে যিনি তিনি সগুণব্রহ্ম। মায়াতে সঙ্গত হইলে ইঁহার যে কল্পনা তাহাই মহৎ। শ্রীগীতা এইজন্য বলিতেছেন "মম যোনি মহৎব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্"।

মহতত্ত্বের অন্যনাম হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, মহান্, আকাশজ ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি। মহৎতত্ত্ব যিনি, তিনি শুদ্ধ, পৃথ্যাদিরহিত। ইঁহার সঙ্কল্প-শরীরমাত্রই আছে।

আমার জিজ্ঞাস্য এই :—আপনি পূর্ব্বসর্গে বলিলেন

যথা চিত্রকৃদন্তঃস্থা নির্দ্দেহা ভাতি পুত্রিকা।
তথৈব ভাসতেব্রহ্মা চিদাকাশাচ্ছরঞ্জনম্ ॥

মহত্তত্বটি কল্পনামাত্র। নিরাকার সঙ্কল্পের পুরুষকাতরা—পুরুষের মত কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা কোথায়? আপনি বলিতেছেন চিত্রকর যখন অন্তরে আলেখ্য প্রতিমার সঙ্কল্প করেন তখন তাঁহার বহির্লিখিত অন্তঃস্থা পুত্রিকা চিত্রপ্রতিমা, দেহশূন্য হইয়াও যেমন আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ মহামন বা ব্রহ্মা যিনি চিদাকাশের স্বচ্ছ প্রতিবিম্বগ্রাহক, তিনি প্রজাপতি শরীরাকারে প্রকট হয়েন। প্রকৃতি বা অব্যক্তের আদ্য বিকারই মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব উদয় হইলে তাঁহাতে ব্রহ্মের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়ে। ঐ প্রতিবিম্ব মহত্তত্ত্ব দ্বারা খণ্ডিত হয় বা আকারবান হয়। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের প্রভা আপন কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া যে আকার ধারণ করার মত দেখায় তাহাই প্রজাপতি ব্রহ্মা। ইহাই কল্পনাশরীর। ইঁহার সম্বন্ধে আপনি বলিতেছেন

চিদ্ব্যোম কেবলমনন্তমনাদিমধ্যং
ব্রহ্মেতি ভাতি নিজচিত্তবশাৎ স্বয়ম্ভুঃ।
আকারবানিব পুমানিব বস্তুতস্তু
বন্ধ্যাতনুজ ইব তস্য তু নাস্তি দেহঃ ॥

আদি, অন্ত ও মধ্যরহিত একমাত্র চিদাকাশরূপে অর্থাৎ জ্ঞানরূপে প্রকাশমান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আপন কল্পনা দ্বারা—আপন বিষয় প্রকাশক সামর্থ্য দ্বারা সঙ্কল্প শরীরী হইয়া আকাশীয় পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পান সত্য কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বন্ধ্যাসুতের ন্যায় ইঁহার কোন আকার নাই, কোন দেহ নাই। শুদ্ধ ব্রহ্মই কল্পনা মায়া বা অজ্ঞান দ্বারাই ঐরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মিথ্যা মায়ার উপর তাঁহার যে প্রতিবিম্ব তাহা রজ্জুতে সর্প ভাসার মত মিথ্যা কল্পনা মাত্র। অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া বা অজ্ঞানই ব্রহ্মকে আকারবান মত দেখান।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি দেহবর্জ্জিত মনোব্রহ্মের প্রাক্তনী স্মৃতি—পূর্ব্ব-শরীর ত্যাগ কালোদ্ভূতা স্মৃতি—না থাকে কেন?

তদত্র প্রাক্তনী ব্রহ্মন্ স্মৃতি কস্মান্ন কারণম্।
যথা মম তবান্যস্য ভূতানাঞ্চেতি মে বদ।

প্রাক্তনী স্মৃতিই দেহ ধারণের কারণ। হে ব্রহ্মন্ আপনার, আমার, কি অন্যান্য ভূতগণের শরীর ধারণের কারণ প্রাক্তনী স্মৃতি—পূর্ব্বশরীর ত্যাগ কালোদ্ভূতা স্মৃতি। শ্রীগীতাও "যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং" মৃত্যুকালে যাহার যেরূপ স্মৃতি উৎপন্ন হয় পরেও সেইরূপ দেহ তাহাকে ধরিতে হয়। ব্রহ্মার প্রাক্তনী স্মৃতিও কি থাকে না? যদি প্রাক্তনী স্মৃতিরস্তি তর্হি—তদনুভবাধার সংস্কার দেহাদিকমপি প্রাক্তনং দুর্ব্বারমিতি ভাবঃ।

বশিষ্ঠ—স্থূল শরীর থাকিলে তবে না দেহত্যাগ কালোদ্ভূতা স্মৃতি অন্য দেহ ধারণের কারণ হইবে? অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্ম সমন্বিত লিঙ্গদেহ যাহার থাকে তাহার পক্ষেই প্রাক্তনী স্মৃতি পুনরায় স্থূল দেহ ধারণের কারণ হয়। ব্রহ্মার পূর্ব্বসঞ্চিত কোন কর্ম্মই নাই। ব্রহ্মার দেহই নাই। বস্ত্র দগ্ধ হইয়া গেলে দগ্ধ বস্ত্রের আকারটা মাত্র যেমন থাকে কিন্তু সেটাকে বস্ত্র বলা যায় না ব্রহ্মারও কল্পনায় একটা দেহ থাকে সেটা কিন্তু ভৌতিক দেহ নহে। তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মই যখন নাই তখন আবার স্মৃতি আসিবে কোথা হইতে? ব্রহ্মার আতিবাহিক নামে এক শরীর মাত্র লক্ষ্য হয়, আধিভৌতিক শরীর ইঁহার নাই।

রাম—সকল প্রাণীরই আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দুই শরীর থাকে ব্রহ্মার শুধু অতিবাহিক দেহ মাত্র আছে কেন?

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম সদা শান্ত, চলনরহিত; কখন তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জগতের মত তিনি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল নহেন। দুগ্ধের বিকার যেমন দধি, সেইরূপ তাঁহার কোন বিকার হইতে পারে না। তিনি পরম শান্ত জ্ঞানানন্দ—স্থিতি। তিনি আপনিই আপনি।

তবে মণিতে স্বভাবতঃ যেমন ঝলক উঠে সেইরূপ তাঁহাতে মায়ার ঝলক উঠে। মায়ার প্রথম ঝলকের যে স্পন্দন উঠে সেই স্পন্দন আরও স্পন্দিত হইতে থাকে। স্পন্দন ক্রমে অত্যন্ত অধিক হইতে থাকে তাহা হইতেই এই জগৎ রচনা হয়। স্পন্দন ও কল্পনা একই। ব্রহ্মের স্পন্দন স্বভাবতঃ হয়। কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্কল্প অবুদ্ধিপূর্ব্বক নহে; বুদ্ধি পূর্ব্বক।

স্পন্দন যতই হউক না কেন ব্রহ্ম কিন্তু চিরদিনই সমান ভাবে শান্ত। রজ্জুতে

যেমন সর্প ভাসে সেইরূপে ব্রহ্মে মায়রচিত জগৎ ভাসে। রজ্জু রজ্জুই থাকে। সর্পটা একটা মিথ্যা, একটা ইন্দ্রজাল।

এখন দেখ চিত্তশরীর ও বোধরূপ নির্ব্বাণ পুরুষ, সমুদায় সংসারী জীবের আদি প্রস্পন্দ। এবং তাঁহা হইতেই প্রথম অহংভাবের উদয় হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ, ব্রহ্ম হইতে সঙ্কল্পাত্মিকা মায়ার উদয়ে ব্রহ্ম স্পন্দিত হওয়ার মত যে বোধ হয় সেই প্রথম প্রতিস্পন্দই ব্রহ্মা। আদি প্রতিস্পন্দ হইতে স্থূলতর যে সমস্ত প্রতিস্পন্দ তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, তাহাই প্রজা। এজন্য ব্রহ্মাকে আদি প্রজাপতি বলে।

ব্রহ্মার আকার নাই। তিনি প্রাতিভাসিক আকার বিশিষ্ট। এই প্রাতিভাসিক আকর বিশিষ্ট ব্রহ্মা হইতে স্থূল সৃষ্টি জন্ম লাভ করে।

জগতের আদি কারণ ব্রহ্মা। তাঁহার কোন কারণ নাই। সেই জন্য তিনি এক দেহী। ইঁহার ভৌতিক দেহ নাই। কেবলমাত্র আতিবাহিক দেহ আছে। যাহা আতিবাহিক তাহা নিরাকার।

সঙ্কল্পময় পুরুষই ব্রহ্মা। সঙ্কল্পের কোন আকার নাই। প্রাণিগণের কর্ম্ম অনুসারে ব্রহ্মার সঙ্কল্প যখন যে আকারে বিকশিত হয় তখন তিনি সেই আকারেই প্রতিভান হন। যেমন মনের সঙ্কল্পে মন প্রতিভাত হয়—মন যখন পর্ব্বত সঙ্কল্প করে তখন পর্ব্বতরূপে প্রতিভাত হয় সেইরূপ সংসারস্থ জনগণ দৃঢ় অন্তর্ব্বিস্মৃতির দ্বারা স্বীয় আতিবাহিক দেহ—আপনার নিরাকারত্ব ভুলিয়া গিয়া ভৌতিক দেহে অভিমান করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার সেরূপ মোহের কোন কারণ নাই বলিয়া তিনি একমাত্র আতিবাহিক দেহ বিশিষ্ট। বুঝিতেছ কি?

রাম - যাহা বুঝিতেছি তাহা একবার বলিব কি?

বশিষ্ঠ - বল।

রাম—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, মহামন বা মনমাত্র। মন হইতে সঙ্কল্প উঠিতেছে। সঙ্কল্পকে কিন্তু মন বলা হইতেছে না। সঙ্কল্প মন হইতে জাত। সঙ্কল্প মনের সৃষ্টি। সমস্ত সঙ্কল্প বাদ দিলেও যে মন থাকে না তাহা নহে। সমস্ত সঙ্কল্প বাদ দিলে মন আপস্বরূপে—আপন সত্তামাত্রে অবশিষ্ট থাকে। এই সত্তাটি চেতন। সঙ্কল্পটি ঐ সত্তার শরীর। ব্রহ্মা এই চৈতন্যযুক্ত সঙ্কল্প। মন, মূলে চৈতন্যসত্তা। এই সত্তার উপরে সৃষ্টিতরঙ্গ ভাসে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের প্রভা,

স্বসঙ্কল্পে আকারবান মত হয়েন। তবেই হইল মনের সত্তায় কোন কর্ম্ম নাই। মনের সত্তার সঙ্কল্প আছে মাত্র। কর্ম্ম যাহা তাহা স্পন্দনরূপ সঙ্কল্পের স্থূল অবস্থা। সঙ্কল্পের স্থূলরূপই কর্ম্ম। এইজন্য বলিতেছেন ব্রহ্মা সঙ্কল্প দেহ মাত্র। ইঁহার আতিবাহিকতাই আছে। সঙ্কল্প যাহা তাহাতে পৃথ্যাদি ভৌতিক কিছু নাই।

বশিষ্ঠ—ঠিক বুঝিয়াছ। কিন্তু আরও একটু বুঝিবার আছে। এই যে সঙ্কল্প ইহা বাস্তবিক কি? ইহাই মায়া। কাজেই বলা হয় ব্রহ্মার আতিবাহিক দেহও নাই। তিনি চিৎমাত্র। শুধু ব্রহ্মা কেন যাঁহারা প্রবুদ্ধ তাঁহাদেরও আতিবাহিক দেহ নাই। কারণ সঙ্কল্প যাহা তাহা মায়া মাত্র। তাহা নাই। এই জগৎ যেমন মায়িক সেইরূপ সঙ্কল্প বপুঃ বিরিঞ্চি মিথ্যা সঙ্কল্প বিস্তার করিয়া স্থূল সৃষ্টি করেন। মনও দৃশ্যদ্রষ্টা একই বস্তু। যেমন জগৎ সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা কাহারও নিকট প্রকাশিত হন না সেইরূপ সঙ্কল্প না থাকিলে ব্রহ্মাও অবিজ্ঞাতস্বরূপ। সঙ্কল্প উঠে বলিয়াই দৃশ্যজ্ঞান জন্মে। এই দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিলেই মুক্তিলাভ হয়।

রাম—আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। প্রাণিগণের কর্ম্ম যখন হয় তখন ব্রহ্মার সঙ্কল্প জাগে জাগিলেই তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন সেই আকারে আকারিত হন কিরূপে?

বশিষ্ঠ—তোমার সঙ্কল্পে তুমি যেরূপে প্রতিভাত হও সেইরূপ জীবের কর্ম্মে ব্রহ্মাও আকারিত মত হন। কিরূপে হন দেখ।

তোমার মন, আমার মন, মানবজাতির মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের মন—ইহাদের সমষ্টি যাহা তাহাই মহামন। ব্যষ্টির চলন হইলে মহামনেও সঙ্কল্প উঠিবেই।

সমুদ্র জলে একটি অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকার গমনেও যে তরঙ্গ উঠে সেই তরঙ্গে বিশাল বারিধি বক্ষেও একটি কার্য্য হয়। সেইরূপ কোন মনুষ্যের মনে যখন কোন পুণ্য চিন্তা বা পাপ চিন্তা উঠে তাহাও আকাশ সদৃশ মহামনকেও অতি সূক্ষ্মভাবে তরঙ্গায়িত করিবেই। ব্রহ্ম বা মহামনে সঙ্কল্প উঠিলেই তিনিও সেই আকারে আকারিত হইবেন। সেই জন্যই বলা হয় প্রজাপতি হইতে সমস্ত প্রজার জন্ম হয়। ব্রহ্মার বুদ্ধিপূর্ব্বক সঙ্কল্পে জীব জন্মে। আবার জীবের সঙ্কল্পে ও ব্রহ্মার চঞ্চলতা হইয়া সঙ্কল্প উঠে। সেই সঙ্কল্পে আবার জীব হয় আবার জীবের সঙ্কল্পে ব্রহ্মা হইতে আবার সঙ্কল্প উঠে ইত্যাদি।

তবেই দেখ সঙ্কল্প উঠিতে না দিলেই জীবের পরম শান্ত পদে স্থিতি হয় ইহাই মোক্ষ।

ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি।
নশ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো রামস্য বচনং যথা ॥৫৬॥

মধ্যে কমললতিকা থাকে সেইরূপ দ্রষ্টার মধ্যে দৃশ্যদর্শন থাকিবেই তাই বলা হইল আভাস বুদ্ধি গত কর্ত্তৃত্ব, শুদ্ধ চৈতন্যে আরোপ হয় মাত্র নতুবা শুদ্ধ চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদি কিছুই নাই। কর্ত্তৃত্ব আরোপেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণমত হয়েন তখন তিনি সাক্ষিপদ বাচ্য। আমি দেখি, আমি করি, আমি জানি এই গুলি বুদ্ধি ধর্ম্ম। ইহারা আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। আবার আত্মধর্ম্ম (নিত্যত্বাদি) যখন বুদ্ধিতে আরোপ হয় তখন বুদ্ধিতে জ্ঞানের প্রতীতি হয়। এইরূপ সাক্ষী চৈতন্যে যখন জীবত্বের আরোপ হয় তখন জীব নিত্য ইত্যাদি ব্যবহার হয়। কিন্তু আভাস দৃষ্টিতে জীবকে নিত্য বলা যায় না। তাহার কারণ দেখাইতেছেন।

৪৯। আভাস যাহা তাহা মিথ্যা ইহা বুদ্ধিতে প্রতীয়মান হয়। এবং ইহা অবিদ্যার কার্য্য। দর্পণে মুখ নাই—যাহা দেখা যায় তাহা আভাস, তজ্জন্য মিথ্যা। অতএব ইহা অবিদ্যার কার্য্য। চিৎ বা চৈতন্যের এই যে ত্রিবিধ ভেদ ইহা কি সত্য? না সত্য নহে। ব্রহ্ম অবিচ্ছিন্ন। বিচ্ছেদ অর্থে ভেদ। ব্রহ্ম ভেদরহিত বলিয়া অবিচ্ছিন্ন। তবে যে বলা হইল ত্রিধাচিতি ইহা কি অসঙ্গত? তাই বলা হইতেছে ভেদ যাহা করা হইতেছে তাহা কল্পিত, উপাধি অধ্যাসকৃত।

৫০। "অবিচ্ছিন্নস্যসাভাসস্যাহম" ইহা দ্বারা "ত্বং" পদার্থ দেখান হইতেছে আর 'পূর্ণেন' ইহা দ্বারা "তৎ" পদার্থ দর্শিত হইতেছে।

তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বাস্তবিক ভেদশূন্য হইয়াও অধ্যাস ভেদবান্ সাভাসচৈতন্য যে "ত্বম্" ইহার সহিত পূর্ণ যে "তৎ" তাহার একত্ব স্থাপিত হয়। তবেই হইল জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। তবে যে ভেদ দৃষ্ট হয় তাহা কল্পিত: তাহা মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা কল্পিত মাত্র।

ব্রহ্ম সর্ব্বথা ত্রিধাভেদশূন্য। ভেদ যাহা তাহা মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা কল্পিত। শাস্ত্র ভেদরহিত চৈতন্যকে পূর্ণ ঈশ্বরের সহিত এক প্রতিপাদন করিতেছেন। ভেদ যাহা আছে তাহা কল্পিত ভেদ ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যদি একবারে ভেদ না থাকে তবে শাস্ত্র অনর্থক; কারণ যখন কোন ভেদই নাই তখন শাস্ত্র অভেদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করেন কেন? আবার বাস্তবিক ভেদ যদি থাকে তাহা হইলেও শাস্ত্র অনর্থক; কারণ যেখানে বাস্তবিক ভেদ আছে সেখানে অভেদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা অনর্থক ভিন্ন আর কি? এই জন্য বলা হয় ব্রহ্ম ঈশ্বর ও ইঁহাদের যে ভেদ তাহা কল্পিত ভেদ মাত্র।

পদে পদে ভ্রষ্টাচার, অতিপাপী কুলাঙ্গার
ব্রহ্মবধে মিত্রবধে ভয় নাই যার।
স্বর্ণ, বিত্ত, চুরী করে, যোগিজন হিংসা করে,
কলুষ শতেক সদা অভ্যস্ত যাহার॥
এহেন পাপের পাপী, অনুতাপে তাঁরে ডাকি,
ভক্তিভাবে করে পাঠ শ্রীরামহৃদয়।
সেও দেবপূজ্য হয়ে, এজনমে গতি পেয়ে,
যোগীন্দ্র দুর্ল্লভপদ লভয়ে নিশ্চয়॥৫৭॥

ইতি শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে বালকাণ্ডে শ্রীরাম-
হৃদয় নামক প্রথম সর্গ॥

ইত্যর্থঃ। বিকল্পতঃ উপাধ্যধ্যাসকৃত ইত্যর্থঃ। এবং জীবানাং পরস্পরং ভেদো-ঽপ্যধ্যাসকৃত এবেতি বোধ্যম্।

৫০। কল্পিতভেদসত্ত্বে প্রমাণমাহ॥ অবিচ্ছিন্নস্যেতি। অবিচ্ছেদো ভেদ-শূন্যতঃ আধ্যাসিক ভেদবতঃ সাভাসস্যাহমস্তত্ত্বমস্যাদবাক্যৈঃ পূর্ণেনেশ্বরেণ একত্বং প্রতিপদ্যতে। তথা সতি কল্পিতভেদে সতি উপপদ্যত ইতি শেষঃ। সর্ব্বথা ভেদা-ভাবেতদানর্থক্যং বাস্তবেঽপি ভেদেতদানর্থক্যং বাস্তবস্যবচনশতেনাপ্যনিবৃত্তি-রিতিভাবঃ। অত্রাবচ্ছিন্নস্য সাভাস্যাহম ইত্যনেন ত্বং পদার্থোদর্শিতঃ।

৫১। এতদেবধ্বনয়ং স্তদুপদেশফলমাহ। ঐক্যেতি।

আত্মনোর্জীবেশ্বরয়োরৈক্যজ্ঞানমহং ব্রহ্মেতি জ্ঞানম্।
যদেতি কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপক্ষয়ে সমুৎপন্নে।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে। ইতি স্মৃতেঃ।

অয়ং ভাবঃ। জীবেশ্বরয়োরুপাধিভিন্নয়োরৈক্য শ্রুত্যোচ্যমানং বাধিতং সত্তয়ং পদয়োরুপাধিরহিতে লক্ষণয়া বিম্বভূতং শুদ্ধব্রহ্মৈক্যপরতয়া পর্য্যবস্যতীতি বোধ্যম্। এতচ্ছাকরে বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতম্। ব্রহ্মৈক্যজ্ঞান ফলমাহ। তদেতি। তাদৃশ-জ্ঞানে সতি নির্ধর্ম্মকত্বেন চিন্মাত্রতয়া তৎ স্বরূপজ্ঞানাত্তৎস্বরূপাজ্ঞানরূপাঽবিদ্যা স্বকার্য্যৈঃ প্রপঞ্চৈঃ সহনশ্যত্যেব নসংশয়ঃ। এতেন ভৃষ্টবীজবৎ কার্য্যজননাসামর্থ্য-মেব তস্যাজ্ঞানেন ক্রিয়ত ইতি পক্ষোঽপাস্তঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ।

যোঽতি ভ্রষ্টোঽতিপাপী পরধননিরতোব্রহ্মহা মিত্রহন্তা।
স্বর্ণস্তেয়াকুলঘ্নঃ কলুষশতযুতো যোগিবৃন্দাপকারী ॥
যঃ সংপূজ্যাভিরামং পঠতি চ হৃদয়ং রামচন্দ্রস্যভক্ত্যা
যোগীন্দ্রৈরপ্যলভ্যং পদমিহলভতে সর্ব্বদেবৈঃ স পূজ্যম্ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীআধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে বালকাণ্ডে শ্রীরাম-হৃদয়ং নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

৫১। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য দ্বারা যখন ব্রহ্ম ঈশ্বর ও জীবাত্মার ঐক্য জ্ঞান অর্থাৎ অহং ব্রহ্ম এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন অবিদ্যা আপন কার্য্য যে প্রপঞ্চ তাহার সহিত নিশ্চয়ই নাশ প্রাপ্ত হয়।

৫২। ঈদৃশ ঐক্য জ্ঞানের মুখ্য সাধন বলিতেছেন। আমার ভক্ত ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া আমার ভাব অর্থাৎ মৎ-সাযুজ্য লাভ করেন। কিন্তু হে হনুমান্! যে পুরুষ আমাকে ভক্তি করে না আর শাস্ত্র বোধিত ক্রিয়া কলাপ রূপ গর্ত্তে পতিত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এরূপ পুরুষের শত জন্মেও জ্ঞান হইবে না, মোক্ষও হইবে না।

৫৩। হে অনঘ! হে নিষ্পাপ! আমি আপনি এই অত্যন্ত গুপ্ত মমাত্মার অর্থাৎ মৎরূপ চৈতন্যের হৃদয় এই রাম হৃদয় তোমাকে বলিলাম। আমাতে ভক্তি হীন শঠ পুরুষকে তুমি ইহা দিও না—তাহাদের নিকট ইহার অর্থ প্রকাশ করিও না। কারণ ইহার প্রাপ্তি ইন্দ্ররাজ্য লাভ অপেক্ষাও অধিক সুখকর।

৫৪। শ্রীমহাদেব বলিলেন হে দেবি! পার্ব্বতি! এই রাম হৃদয় স্তোত্র অত্যন্ত গুপ্ত, হৃদয়ের প্রিয়, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ পাপ শোধক—ইহা আমি তোমাকে বলিলাম।

৫৫। এই রাম হৃদয় সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র আপন মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা সর্ব্ব বেদান্ত শাস্ত্রের সংগ্রহ অর্থাৎ সার সংগ্রহ স্বরূপ। ইহা যে পুরুষ নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫৬। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বহু জন্মার্জ্জিত হইলেও রাম হৃদয় জ্ঞানে নাশ প্রাপ্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ শ্রীরামচন্দ্রেরই এই বাক্য।

৫৭। যে পুরুষ অত্যন্ত ভ্রষ্ট, অত্যন্ত পাপী, অন্যের কামিনী কাঞ্চনে যাহার অত্যন্ত প্রীতি; যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণহত্যাকারী, মিত্রহত্যাকারী, যে ব্যক্তি স্বর্ণ চৌর, কুলনাশক, এবং ঐরূপ শত শত পাতক যুক্ত এবং যোগি সকলের অপকারী [নিন্দা তিরস্কার করিয়া থাকে] সে ব্যক্তিও যদি শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক রামহৃদয় নিত্য পাঠ করে তবে সে ব্যক্তি যোগীন্দ্রদুর্ল্লভ রামপদ ইহ সংসারেই লাভ করেন এবং সে ব্যক্তি সর্ব্বদেবপূজ্য হয়েন।

ইতি শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে শ্রীরামহৃদয়নামক প্রথম সর্গ।

সোঽহমিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধাত্তদিদং তয়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়োলক্ষ্যতে তথা॥
মায়াবিদ্যেবিহায়ৈব মুপাধীপরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥ ইতি॥

যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদৌ পূর্ব্বানুভূতরূপতত্তায়া ইদানীমনুভূয়মানস্বরূপেদং তায়াশ্চত্যাগেন দেবদত্তস্বরূপমাত্রং লক্ষ্যতে। মায়া=বুদ্ধিঃ সমষ্টিঃ। অবিদ্যা= ব্যষ্টিরূপেতি বোধ্যম্। অপরোক্ষজ্ঞানং মননাদি সংস্কৃতান্তঃকরণাদেব। দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যেতি স্মৃতেঃ। অগ্রয়া=মননাদি সংস্কৃতয়া। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ সমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে কারণমিতি গীতাব্যোক্তেশ্চেতি দিক্। উক্তঞ্চ নারদীয়ে। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থজ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্। ইতি। শ্রুতিরপি। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ইতি॥

৫২। ঈদৃশ জ্ঞানস্য মুখ্যং সাধনমাহ। এতদিতি॥ মদ্ভক্ত ইতি হেতুগর্ভং বিশেষণম্। মদ্ভাবো=মৎসাযুজ্যম্। ভক্তেঃ কারণত্ব দার্ঢ্যায় ভক্তিব্যতিরেকে কার্য্যব্যতিরেকমাহ। মদ্ভক্তীতি॥ শাস্ত্রগর্ত্তেষু শাস্ত্রবোধিতক্রিয়াকলাপরূপ গর্ত্তেষু।

৫৩। ৫৪। মমাত্মনোঽদ্রূপস্য চেতনস্য।

৫৫। ৫৬। সর্ব্ববেদান্তসংগ্রহং—সর্ব্ববেদান্ত প্রতিপাদ্যার্থসারসংগ্রহরূপম্।

৫৭। অতিভূষ্টত্বোপপাদকমতি পাপীত্যাদি।

সর্ব্বদেবৈঃ পূজ্যং পদং ব্রহ্মলোকং স লভত ইত্যন্বয়ঃ।

ইতি শ্রীমৎ সকলরাজবিপদুদ্ধরণ সমর্থে অধ্যাত্মরামায়ণসেতৌ বালকাণ্ডে
শ্রীরামহৃদয় ব্যাখ্যানং নাম প্রথমঃ সর্গঃ॥

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

প্রীতি-ভিক্ষা।

আঘাতিয়া মর্ম্মবীণা হে প্রিয় আমার!
যে সুর তুলেছ বক্ষে, ঝঙ্কারে তাহার
গোপন হৃদয় ব্যথা গলিয়া ঝরিয়া
উৎস রূপে বক্ষভরি আসিছে যে নামি—
তোমার চরণ প্রান্তে পড়িতে লুটিয়া,
বল মোরে সেকি ভাল লাগিয়াছে স্বামি?
বিজন বিপিনে কোথা তোমারি উদ্দেশে
বনফুল ঝ'রে পড়ে নিস্তব্ধ নিশায়,—
নিবেদিয়া যাহা কিছু সর্ব্বস্ব তাহার,
সে ক্ষুদ্র মরণ তার সে কি বৃথা যায়?
পল্লব অঞ্চল প্রান্তে লুকায়ে দোয়েল
তোমারে শুনায় তার মুগ্ধ কণ্ঠ বাণী,
ক্ষুদ্র বিহগের সেই ক্ষণিক সাধনা—
সে তৃপ্তি কি বিন্দু তৃপ্তি দেয় তোমা আনি?
বিশ্বের আরতি মাঝে ক্ষুদ্র জ্যোতি কণা
অনুরাগ দীপ্ত নেত্রে চেয়ে থাকে তারা
তোমার সন্তোষ তার প্রাণের কামনা
মিটায়ে ঢালোকি সেথা করুণার ধারা?
এ ব্যথা নহে গো শুধু আঘাত বেদনা
তব প্রীতি মাগিবারে উন্মুক্ত ঝরণা।
তোমার কঠোর প্রেম দেছে শান্তি সুধা,
সে তৃষ্ণা মিটেছে নাথ! নাহি আর ক্ষুধা।
যে চাহে অনন্ত প্রেম নিত্য ভালবাসা
তার কাছে শত তুচ্ছ মরতের আশা॥

মৃঃ—(ভবানীপুর)

প্রার্থনা।

হে প্রণত প্রিয়! হে ত্রিলোক মঙ্গল! হে আত্মন্! কি আর জানাইব? তোমাকে জানিয়া—অন্ততঃ বিশ্বাসেও জানিয়া যাহাতে আমরা তোমার ভজনা করিতে পারি তুমি সেইরূপ অনুগ্রহ কর। স্বামী শ্রীধর শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যায় একস্থানে বলিয়াছেন—যস্তব যোগমায়ায়া গুণৈ সহ যো যোগস্তেন মোহিতম্। অতো বিশ্বস্য মঙ্গলং বিধেহি যথা ত্বামচিন্ত্যানন্তশক্তিং জ্ঞাত্বা ভজেৎ তথানুগৃহাণেত্যর্থঃ। সত্য কথা ভাবনায়, বাক্যে এবং কর্ম্মে—তোমাকে জানাইয়া সমস্ত করাই নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ। ইহা বুঝি। তোমাকে গোপন করিয়া—না জানাইয়া কিছু করাই ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী হওয়া ইহাও বুঝি। ভক্ত হইতে চাই, সতী হইতে চাই, পবিত্র হইতে চাই ইহাও সত্য। তথাপি যে তোমাকে জানাইয়া সব করিতে পারি না ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। হে প্রভু! বেশ বুঝিতেছি তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের কোন সাধ্য নাই যাহাতে তোমার আজ্ঞা আমরা পালন করিতে পারি। কেননা অতি সহজ করিয়া—যাহাতে সকলে পারে এরূপ করিয়া তুমি তোমার আজ্ঞা আমাদিগকে জানাইতেছ তথাপি আমরা তোমায় জানাইয়া সকল কর্ম্ম করিতে পারি না। দেহের ও মনের সকল অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া সুখ দুঃখ সমস্ত সহ্য করিতে তুমি বল। আমরা তাহাও পারি না। দেহে আত্ম বোধ করিয়া দেহের ও মনের দুঃখকে আমার দুঃখ মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়ি। হে সকল মঙ্গলাধার! তুমি প্রসন্ন হইলে আর কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। তুমি অনুগ্রহ করিলে অসাধ্য সাধনে বাধা কি?

তোমার অনুগ্রহ যে সর্ব্বদা আছে তাহা কে বুঝিতে পারে? যে সাধক প্রাণপণে চেষ্টা করে—শতবার বিফল মনোরথ হইয়াও চেষ্টা ছাড়ে না সেই তোমার অনুগ্রহ কি তাহা বুঝিতে পারে।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবের উপরে সর্ব্বদা অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছেন। মেঘ সমান ভাবে কণ্টকবৃক্ষে ও পুষ্পবৃক্ষে বারিবর্ষণ করে। কাঁটাগাছ বলিয়া তাহার প্রতি কৃপণতা করে না। শ্রীভগবানত একসের কৃপার মালিক নহেন যে একস্থানে কৃপা করিলেই তাঁহার কৃপা ফুরাইয়া যাইবে? তাঁহার অপার করুণা। করুণাময়ের অপার করুণা সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবেই বর্ষিত হইতেছে।

তবু কেন আমরা তাঁহার অনুগ্রহ ধরিতে পারি না? এই টুকু বুঝিবার জন্য কিছু আয়োজন করা চাই। তুমি গো-গাড়ীতে কোথাও যাইতেছ। রাস্তার কর্দ্দমে গাড়ীর চাকা বসিয়া গেল। গাড়ী আর চলে না। তুমি তখন গাড়ী হইতে নাঁবিয়া গুড়ুক সাজিয়া আলবোলায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিলে। আর রাস্তা দিয়া যে লোক যাইতেছে তাহাকেই বলিতে লাগিলে ভাই! আমার গাড়ীর চাকাটা ঠেলিয়া দিয়া যাওনা! রাস্তার পথিক তখন তোমায় কি বলিবে? বলিবে না কি লোকটা কি বেয়াদব। বাবু নবাব। আপনি বসিয়া গুড়ুক খাইতেছেন আর আমরা যেন উঁহার খানসামা আমরা উঁহার চাকা ঠেলিব! কেহই তোমার সাহায্য করিবে না। কিন্তু তুমি যদি কোমরে কাপড় বাঁধিয়া আপনি চাকা ঠেলিতে প্রাণপণ কর তবে যে পথিক ইহা দেখিবে সেই তোমার ক্লেশ দেখিয়া বলিবে বাবু লোকটি বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। এস আমরা ইঁহার চাকা ঠেলিয়া দি। তুমি চেষ্টা কর। পুনঃ পুনঃ কর। শত শত লোক তোমার সাহায্যার্থ আসিবে। সমস্তদেবতা এমন কি শ্রীভগবানও গোপনে থাকিয়া তোমার সহায় হইবেন। তাই বলি ভাল হইতে চেষ্টা কর শ্রীভগবানের অনুগ্রহ তিনিই বুঝাইয়া দিবেন। যে চেষ্টা হীন কেহই তাহাকে অনুগ্রহ করিতে রাজী নহেন। প্রবল পুরুষার্থ কর। তাহাতেও হইবে না। তখন কাতর ভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর! বল ঠাকুর! যতদূর সাধ্য তাহা ত করিতেছি কিন্তু আমার দ্বারাত কিছুই হয় না। তুমি প্রণতপ্রিয়! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমায় কৃপা কর। সর্ব্বপুরুষার্থ করিয়াও কাতর ভাবে যখন প্রার্থনা করিবে তখন তাঁহার অনুগ্রহ বুঝিবে।

হে দয়াময়! আমার আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। হে অগতির গতি! হে দীনবন্ধু! হে জগন্নাথ! এই যে আমরা কত কার্য্য করিতেছি এই কার্য্যে কি তুমি আমাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছ? এই সমস্ত কার্য্য কি তুমি আমাদিগকে করাইতেছ? কৈ ইহা বুঝিলাম প্রভু! শুনি যে তোমার অনভিপ্রায়ে গাছের পাতাটি অবধি নড়িতে পারে না। কিন্তু আমি যে এত কার্য্যে স্পন্দিত হইতেছি, সে যে তোমায় অভিপ্রায়ে তাহা আমি বুঝিলাম কৈ? যদি বুঝিতাম তবে কি বলিতাম এসব কর্ম্ম আমার কবে ছুটিয়া যাইবে? ভালকর্ম্ম, মন্দকর্ম্ম যে যাহা করিতেছে সে কি তোমার ইচ্ছায়? জন্ম, মৃত্যু, যম যাতনা যাহা হইতেছে সেওকি তোমার ইচ্ছায়? বিরোধ, বিবাদ, মতভেদ, কাটাকাটি, মারামারি,

রক্তারক্তি যাহা হইতেছে সে কি তোমার ইচ্ছায় ? কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির কার্য্যত আমাদেরও ভাল লাগে না। আর তোমার ? পরম প্রেমময় তুমি, কাম তোমার ভাল লাগিবে ? পরম শান্ত তুমি ! ক্রোধ তোমার ভাল লাগিবে ? সুখময় তুমি ! অপার দুঃখ যে আত্মহত্যা তাও তোমার ইচ্ছায় ঘটিবে ? এ সব কি তোমার ইচ্ছায় হইতেছে ? ইহাত প্রভু ! বুঝিতে পারি না। আমি স্থূলবুদ্ধি ! আমি মূর্খ ! ইহাত আমি বুঝিতে পারি না। ব্যাখ্যাত অনেক শুনি—কিন্তু তাহাতে ত হৃদয় জুড়াইয়া যায় না। তাই বলি যে রাজ্যে ঐ সমস্ত ব্যভিচার, কু বিষয়ের সমর্থনা সেটি তোমার রাজ্য নহে। তোমার রাজ্যে কোথাও পাপ তাপ নাই। আমার মনে হয় যাহা কিছু মন্দ যাহা কিছু অপবিত্র, যাহা কিছু গোপন, যাহা কিছু কপটতা, যাহা কিছু ক্লেশজনক তাহা তোমার রাজ্যে নাই ; আছে অজ্ঞানের রাজ্যে, আছে মায়ার রাজ্যে। আর যাহা পবিত্র, যাহা ভাল, যাহা সৎ তাহা আছে, তোমার রাজ্যে। তুমি মন্দ কাজে মানুষকে স্পন্দিত কর না। মানুষ মন্দ কাজে স্পন্দিত হয় অজ্ঞানে ! ঠাকুর ! এই অজ্ঞানের সৃষ্টি কর্ত্তাও কি তুমি ?

নানা তাহাও হইতে পারে না। অজ্ঞানটা মিথ্যা। অজ্ঞানটা মায়া। অজ্ঞানটা ইন্দ্রজাল। তুমিই আছ ! অজ্ঞান নাই। অজ্ঞানটা বস্তুও নহে, অবস্তুও নহে। অজ্ঞানটা কল্পিত বস্তু। এটা মায়া কল্পিত। রজ্জু আছে সর্প নাই। ইহাও সত্য কথা। মানুষ ! তুমি ইচ্ছা করিয়া রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখিতে পার আবার নাও পার। এই টুকুই মানুষের স্বাধীনতা। এই ইচ্ছার স্বাধীনতা তুমি মানুষকে দিয়াছ। নতুবা মানুষ মানুষ থাকিত না, জড় বস্তু হইয়া যাইত। মানুষ ইচ্ছা করিয়া আপন শক্তির অপব্যহার করিতে করিতে আপনার সত্য সঙ্কল্পতা যখন হারাইয়া ফেলে তখন মানুষের পতন হয়। মানুষ শক্তির ব্যবহার করিতে করিতেই সত্যসঙ্কল্পতা লাভ করে। আবার যখন অপব্যবহার দ্বারা ঐ সত্যসঙ্কল্পতা হারায় তখন শতবার যদি ইচ্ছা করে আমার পাপ যাউক, আমি ভাল হইয়া যাই, আমার অজ্ঞান দূর হউক, আমার শরীর নীরোগ হউক—সেই অসত্য সঙ্কল্প অবস্থায় পড়িয়া সব হারাইয়া মানুষের আর কোন প্রার্থনা সফল হয় না। মানুষ তোমার কাছে প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। অশুদ্ধ মানুষের অভিলাষ তুমি পূর্ণ কর না। তাই মানুষকে সত্যসঙ্কল্পতার সাধনা জন্য পবিত্র হইতে হয়।

কোন্ সাধনায় সত্য সঙ্কল্প হওয়া যায় ?

যদি স্ত্রীলোক হও তবে সতী হও, যদি পুরুষ হও তবে পবিত্র হও। এতভিন্ন সত্যসঙ্কল্প হওয়ার অন্য উপায় নাই। নিষ্কাম ধর্ম্মই পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায়। প্রতি ভাবনা, প্রতি বাক্য, প্রতি কার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া করিতে প্রাণপণ কর—সতী হইতে পারিবে, পবিত্র হইয়া ভক্ত হইয়া যাইবে। প্রভু এই যুক্তি কি ঠিক ?

পূর্ব্বস্মৃতি।

১

এতই আঁধার যদি মানব জীবন হায়।
ক্ষণেকের তরে কেন প্রেমচন্দ্র উঠে তায় ?
দেখেছিনু হৃদাকাশে সেই পূর্ণিমার জ্যোতি।
এবেত পাইনা প্রভু কিছুতে সেরূপ প্রীতি॥
সে আলোকে যতসুখ ছিল এহৃদয় ভ'রে।
খুঁজিয়া তুলনা তার পাইনাত এসংসারে॥
সেই শত-মন্দাকিনী বহিত হৃদয় মাঝে।
সহসা লুকায়ে যাবে স্বপনে ভাবিনি তাযে॥
মনে ভেবে ছিনু আমি এসুখ তোমারই দান।
এসুখে বঞ্চিত কভু হবেনাক মম প্রাণ॥
আমারি সে ভুল প্রভু সে সুখ ধরার নয়।
অমূল্য সে প্রেমধন তোমাতেই শোভা পায়॥
অসার সংসার তরে যেইজন বাঁচে মরে।
তোমার পবিত্র প্রেম কেন দিয়াছিলে তারে ?
কতবার কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে মোর।
ডাকিছ আমারে তবু ভাঙ্গেনা যে ঘুম ঘোর॥
মোহের মদিরা পানে এমনি অলস প্রাণ।
জাগি জাগি করি সদা রহি তবু ম্রিয়মান॥
সে ঘুম কোথায় আজ যাতে প্রাণ ডুবে ছিল ;
অকস্মাৎ কেশে ধরে কে আমারে উঠাইল ?

(গিরিডি) ক্রমশঃ—

মাতৃভাবে তত্ত্ব করা।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবার কথা শ্রীবৈষ্ণবেরা উল্লেখ করেন। মাতৃভাবে তত্ত্ব করার কথা তাঁহারা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। মাতৃভাবে উপাসনার কথা শাস্ত্রে পাই। শ্রীরামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি ইঁহারা মাতৃভাবের সাধক। শ্রীরামপ্রসাদ মাতৃভাবে তত্ত্ব করার সম্বন্ধে বলেনঃ—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে
শেষে চাতারে কি ভাঙ্গব হাঁড়ী বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে।

মাতৃভাবে তত্ত্ব করার মধ্যে এমন কি রহস্য আছে যাহা ভাঙ্গিতে গেলে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা হইয়া যায়? রামপ্রসাদ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন সকলকে বলিবার কথা ইহা নহে। বলিতে গেলে পাছে চাতারে হাঁড়ী ভাঙ্গা হইয়া যায় তাই আপন মনকে ঠারে ঠোরে বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন।

প্রসাদ ত রাজী ছিলেন না কিন্তু আজ কাল কি সেই কথা সবাই বলে? এখন সব কথাই প্রকাশ করিতে হইবে ইহাই নব বিধান। আমরা ইহারই একটু আলোচনা করিব।

শ্রীভগবান যখন ভাবের বিষয়—অভাবে যখন তাঁহাকে ধরা যায় না তখন কোন একটি ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে ইহা সাধু মহাত্মারা বলিয়া থাকেন। একটি ভাবকে মুখ্য রাখিয়া অন্য সকল ভাবেই তাঁহাকে ডাকা যায়। শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়, সাধু জীবনেও ইহা দেখা যায়। সাধু মহাত্মাগণ আরও বলেন যিনি গুরু তিনি শ্রীভগবানের সঙ্গে সাধকের কি সম্বন্ধ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সাধনার উপায়গুলি বলিয়া দিবেন। সম্বন্ধ নির্দ্দেশটি সাধক জীবনে প্রধান আবশ্যকীয় বস্তু। এইটি ধরা না হইলে সাধনায় রস আইসে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাতৃভাবের সাধনাকেই আজকালকার অসংযমী মানুষের অবলম্বনীয় ইহা বলিতেন এবং নিজে আচরণ করিয়া জীব শিক্ষার জন্য তাহাই দেখাইয়াছেন। মাতৃভাবের সাধনা কেন আজকালকার দিনে সকল সাধকের প্রথম প্রয়োজনীয় তাহাই এখানে আলোচ্য।

মাতৃভাবে তত্ত্ব করা কি প্রথমে তাহাই দেখা যাউক।

আজকাল বিপদ যেরূপ সুলভ আর জীবন যেরূপ বিপদসঙ্কুল তাহাতে যিনি আমাদের রক্ষা করেন তিনিই যে সর্ব্বপ্রথমে উপাস্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবানই রক্ষা করেন সত্য কিন্তু আমরা কয়জনে তাঁহার রক্ষার ভাবটি ধরিতে পারি? রক্ষার ভাবটি যেখানে অধিক পরিমাণে আমাদের অনুভবে আইসে সেই বস্তুটিই আমাদের অবলম্বনীয়। মাতৃভাবে উপাসনা করার অর্থ এই রক্ষাভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপাসনা করা।

মা নামে রক্ষা এবং পবিত্রতা যেন জড়িত। বিনাশ হইতে পরিত্রাণ করার নাম রক্ষা। বিনাশের মূল কোথায়? কামনাই মানুষকে বিনাশ করে। কামই জীবের বিনাশক। কাম পদার্থটি প্রেমেরই বিকার। কাম বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। কামনা অজ্ঞান হইতেই জন্মে। শোভনাধ্যাসই কামের জনক। পরমপুরুষই সুন্দর। আর কিছুই সুন্দর নাই। মণির ঝলক উঠার মত স্বভাবতঃ তাঁহা হইলে যে আত্মমায়া উঠে সেই আত্মমায়াকে সুন্দর দেখাই শোভনাধ্যাস। অধ্যাস বা আরোপ দ্বারাই অসুন্দরকে সুন্দর দেখা হয়। রজ্জুর উপরে যেমন অজ্ঞানে মিথ্যা সর্পভাসে সেইরূপ প্রেমের উপরেই কামভাসে। স্থিতি ভিন্ন যেমন গতি হয় না সেইরূপ মূলে প্রেম না থাকিলে কাম তাহার উপরে ভাসে না। তাই বলা হয় কামটা অজ্ঞানেই দেখা হয়। প্রেমকেই অজ্ঞানে কামভাবে দেখা হইয়া যায়। অজ্ঞান কাটাইতে পারিলেই কাম থাকে না। কামই প্রেম হইয়া যায়। যে যত অজ্ঞানী সে তত কামুক। উপস্থিত সময়ে অজ্ঞানের প্রসার অত্যন্ত অধিক। এ জন্য কামেই মানুষ সুখ পায় মনে করে। সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য কাম ত্যাগ করিয়া প্রেমের মুখ দেখা। কামটা প্রেমের অজ্ঞানজ আবরণ। এই আবরণ সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই প্রেম মেঘমুক্ত সূর্য্যের সমান প্রকাশ পান। প্রেমিক হইলেই মুক্তি।

কামের আবরণ দূর করিবার দুইটি পথ। একটি জ্ঞানমার্গ একটি ভক্তিমার্গ। বস্তুবিচার দ্বারা কাম নিরস্ত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গ। আমরা ভক্তিমার্গে কাম দূর করিবার কথা বলিতেছি।

স্ত্রীলোক কোথায় নাই? চিত্ত কলুষিত হইলে স্ত্রীলোককে কুভাবে দেখা হইয়া যায়। কিন্তু মাও স্ত্রীলোক বটেন। কেবল ঐ স্থানে কাম কিছুই করিতে পারে না। পশুদিগের মধ্যেই ইহাও দেখা যায় বটে। ভক্তগণ বলেন স্ত্রীলোক

দেখিলে যখন চঞ্চলতা আইসে তখন কতক্ষণ ধরিয়া মা মা মা মা করিতে থাক। এইরূপ করিলে যখন মার মুখ মনে পড়িবে, মার রক্ষার ভাব মনে পড়িবে, মার পবিত্রতা জাগিবে তখন আর কামভাবে স্ত্রীলোক দেখা যাইবে না! তখন এক পবিত্র আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যাইবে। কামভাব দূর হইবে আসিবে প্রেম। কামভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বিনাশ পথে মানুষ ছুটে। মা মা করিতে করিতে যখন মাতৃভাব জাগে তখন কামই প্রেম রূপে অমরত্ব দেখাইয়া দেয়। দুই একদিনের চেষ্টায় ইহা হয় না; বহুদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতে প্রকৃত অবস্থা লাভ হয়। ইহা কথায় হয় না ইহা নিত্য অভ্যাসের সাধনা।

এখন রামপ্রসাদের চাতারে হাঁড়ী ভাঙ্গার কথা বলিয়া শেষ করা যাউক।

মাতৃভাবে তাঁকে তত্ত্ব করা চাই। মাতৃভাবট সর্ব্বত্র প্রসারিত করিতে হইবে। কোন একটি স্থানেও ইহা বাদ দিলে চলিবে না। বালকের ইহাতে আপত্তি নাই। বালিকারও নাই। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহাদেরও আপত্তি নাই। যত আপত্তি মধ্য বয়সে। লোকে একস্থানে ইহা বাদ দিতে চায়। রামপ্রসাদ বলিতেছেন যাহারা ভাল লোক এবং সাধক তাঁহারা অন্য সকল স্থানেইত মাতৃভাব আনিবেন, কিন্তু যে স্থানটিতে বাদ দিতে চাহেন সেই স্থানটিতেই জ্ঞানের প্রবল শত্রু যে কাম তাহার বিনাশ তাঁহাদের হয় না। আর বলিতে কি সেই একটি স্থানই জীবের প্রধান শত্রু! সকলকে ইহা বলিতে গেলে চাতারে হাঁড়ী ভাঙ্গা হয়।

দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া বলিয়াছিলেন মহারাজ! আপনি জানিবেন আমি সন্তানের জননী। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ ইহাও আপনি জানিবেন যে আমাকে শুধু এক ভাবে দেখিলে চলিবে না। মহাভারতে ইহা আছে।

আর আছে তন্ত্রে। দেবাদিদেব পর্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন গুরুস্তং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অহমেব প্রকাশকঃ। তুমিই সর্ব্বশাস্ত্রের গুরু। আমি মাত্র প্রকাশক আবার বলিয়াছেন কথং ত্বং জননীভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্। উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোহহং নগাত্মজে।

ইহাই বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে।

আমরা উপসংহারে বলি—ফুল দেখিতেই ভাল লাগুক বা কোকিলের স্বরই ভাল লাগুক, বা বসন্তে প্রকৃতি দেখিতেই ভাল লাগুক, বা চন্দ্রনক্ষত্রশালিনী

আকাশ দেখিতেই ভাল লাগুক, বা স্ত্রীলোক দেখিতেই ভাল লাগুক বা গান শুনিতেই ভাল লাগুক—যাহা ভাল লাগে, যাহাতে আসক্তি যায় সেই খানে মা মা মা মা জপ করিতে করিতে যদি মাতৃভাব আনিতে পার তবে বড় উৎকৃষ্ট সাধনা হয়। অভ্যাস কর—হয় কি না বুঝিবে। ইতি—

সাধ।

একাকী এসেছি নাথ একাই যাইব চ'লে।
জানিনা কোথায় যাব কেবা পথ দিবে ব'লে॥
কেনবা এসেছি হেথা কি কার্য্য সাধিতে তব।
কবে কাজ সারা হবে কতদিন হেথা রব॥
কিছুই জানিনা হরি। অজ্ঞান রমণী আমি।
যা কিছু কর্ত্তব্য মম শিখাইয়া দিও তুমি॥
একাকী এসেচি যদি একাই যাইতে হবে।
সংসারের মায়া জালে কেন বদ্ধ হই তবে?
মহামোহ অন্ধকারে কেন অন্ধ আঁখি তারা?
ভুলিয়া সে পুণ্য জ্যোতি কেন হই দিশে হারা?
ভুলি নাই দয়াময় তোমার সে প্রেমানন।
বিশ্বাস নয়নে করি হৃদিমাঝে দরশন॥
মাঝে মাঝে ভুলে যাই সংসারের কলরবে।
তোমারি সংসার—আমি একথা বুঝিব কবে?
কৃপা করি বুঝাইয়ে দাও হরি দয়াময়।
নিস্বার্থ সংসারী হ'লে তুমি অসন্তোষ নও॥
কতদিনে দিব আমি স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন।
তব ইচ্ছা পালনেতে রব রত সর্ব্বক্ষণ॥
ক্ষুদ্র হৃদি মিশে যাবে তব পুণ্য শ্রীচরণে।
তুমি আমি মিশামিশি হ'য়ে যাব দুই জনে॥
মনসুখে হেঁসে খেলে কাজ শেষে চ'লে যাব।
একা যদি ভয় পাই তোমাকেই সঙ্গী পাব॥

কি—(কলিকাতা)

২

৺প্রবোধের স্মৃতি

তৃতীয় প্রবন্ধ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

(প্রবোধচন্দ্রের লেখা)

[(১) আগে স্বদেশের কাজ কর, নিজের কাজ হয় বা না হয় সে জন্য ভাবিও না। আজ কালকার বিকৃত চিন্তা ইহা।

(২) সন্ধ্যা আহ্নিক লইয়াই থাক লোকের ভাল হউক বা মন্দ হউক সে দিকে দৃষ্টি রাখিও না। আশ্রম ধর্ম্মের যে শিক্ষা তাহারই বিকৃত ইহা।

(৩) প্রকৃত শিক্ষা তাহাই যেখানে স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের সেবা সমকালে চলে। স্বধর্ম্মই হইতেছে আত্মকর্ম্ম। ইহাই প্রথম হইতে অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা করিতে মানুষ রস পায় না বলিয়া স্বজাতিসেবা দ্বারা স্বধর্ম্মের রস আনিতে হয়। কিন্তু স্বধর্ম্ম বাদ দিয়া যে স্বজাতি সেবা বা স্বদেশ সেবা তাহাতে জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। কারণ মনুষ্য যে জীবন প্রাপ্ত হয় তাহা অনন্ত সুখস্বরূপ যে ভগবান্ তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য। যতদিন জরামরণরূপ দুঃখ তোমার আছে ততদিন তুমি তাঁহাকে পাও নাই। জরা মরণ সকলেরই হয়, ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না, এই শিক্ষাই আধুনিক সময়ের কুশিক্ষা। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া কেবল জরা মরণ হইতে রক্ষা পাওয়া জন্য। "জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য" ইত্যাদি ভগবানই শিক্ষা দিয়াছেন। আত্মরক্ষা ও জগৎরক্ষা সমকালে করা চাই ইহাই আর্য্যশিক্ষা। অন্য শিক্ষা বিকৃতি। প্রবোধচন্দ্রের প্রবন্ধ কোন প্রকারের চিন্তা তাহার বিচার পাঠকের উপর। যদি এই চিন্তাটি অবিকৃত চিন্তা হয় তবে সংযম এবং সৎসঙ্গ দ্বারাই যে মনুষ্য সংগতি লাভ করে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।]

"দেশের লোক, দেশের সব আমার বড়ই আদরের। মা আমাকে যেরূপ ভালবাসিতেন সেরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা জগতে কোথাও দেখি নাই। আমি জননীর সেই স্নেহের প্রতিদান কিছুই করিতে পারি নাই। আমি তখন বজ্রমূর্খ ছিলাম। সেবাধর্ম্ম জানিতাম না। মাতৃপূজা জানিতাম না। মাকে আমার কোন সেবাই করিতে পারি নাই। যে দেশে মা আমার ছিলেন, যে

সকল লোকেদের মধ্যে মা আমার বেড়াইতেন এখন যদি উহাদের সেবা করিতে পারি তাহা হইলে কতকটা সেবা হইবে।

হারু দাদার বাগানে একটু ছোট ঘর থাকিবে ১২ হাত লম্বা ৮হাত চওড়া। এই ঘর পূজার জন্য। আর একখানি ছোট ঘর থাকিবে আহারের জন্য। বাগানে ত অনেক ফল ফুলের গাছ আছে, রামনামে সেই সকল ফল ফুলের বৃক্ষ সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিবে। বাগানটি ঋষিআশ্রম বিশেষ করিব। নদীতেই স্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা নদীতটেই হইবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা উদ্যানে হইবে। সায়ংসন্ধ্যা নদীতটে। আহারাদি প্রস্তুত স্বহস্তেই করা যাইবে।

আহার্য্যসামগ্রী এই—আতপ, মুগের ডাল, সামান্য ঘৃত, কাঁচাকলা রোজ। রাত্রে দুগ্ধ।

আহার প্রস্তুত হইলে প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগত বালক বা অন্য দীনদুঃখী এবং গোসেবা জন্য—রন্ধনের তিন ভাগ রাখা। এক ভাগ নিজে সেবা করা—ইহাই ব্যবস্থা।

আহারের পর শাস্ত্র দেখা—যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্মরামায়ণ, পঞ্চদশী, গীতা ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি। পরে সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ। ঐকালে ব্রহ্মচারীর বেশ থাকিবে।

আর এক কার্য্য হইবে ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা। ঠাকুরের ভোগের জন্য একটা বড় পিতলের হাঁড়া ও একটি ছোট পিতলের হাঁড়ী। একটা ডালের হাঁড়ী, একটা পিতলের কড়া, একটা পিতলের হাতা, একটা ছান্তা, একটা সরা।

ছেলেদের সন্ধ্যাবন্দনা জন্য পঞ্চপাত্র, কুশী, ছোট রেকাব চারি জোড়া। কুশাসন ১০খানা। রুদ্রাক্ষমালা ৪টা গোমুখী—চন্দনকাষ্ঠ—সাজী।

গুরুদেবের জন্য মৃজাপুরের আসন।

[উপস্থিত জীবনে তোমার এ সঙ্কল্প কখনই সিদ্ধ হইত না। তুমি যে রাজ্যে গিয়াছ সেখানে হইবে। এই প্রবন্ধ এই পর্য্যন্তই শেষ] ৺প্রবোধের লেখা ও সংগ্রহ নানাস্থানে আছে দেখিতেছি। এই প্রবন্ধে কতক কতক দিয়া যে বংশে ৺প্রবোধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহারই আধুনিক অবস্থা দেখাইবার জন্য আমরা ঐ বংশের একটি তালিকা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই প্রাচীনবংশ অতি অল্প দিনেই নিঃশেষ হইবার পথে যেন চলিতেছে।

বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট। যে স্থান পূর্ব্বে বালকবালিকা দ্বারা মুখরিত থাকিত আজ অধিকাংশ গৃহের প্রাঙ্গন, রন্ধনশালা, পুষ্করিণীর পাড়, ঠাকুরদালান প্রভৃতি সমস্তই বন্যবৃক্ষে পূর্ণ হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। যে বৎসর হইতে কংসাবতী নদীর অ্যানিকেট বাঁধা হইল সেই বৎসর হইতেই এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম—এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামও মৃত্যুমুখে ছুটিবার পথে আসিল। যে বৎসর কেনেলের বাঁধ শেষ হইয়া গেল সেই বৎসর হইতেই ম্যালেরিয়া সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের বেশ মনে আছে বালককালে আমরা বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময় কংসাবতীর জল বাড়িতে দেখিয়া আসিতাম শেষ রাত্রে চারিদিকে জলকল্লোল শুনিতাম। প্রভাতে দেখিতাম চারিদিক জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যখন কেনেলের বাঁধ ছিল না—তখনকার দিনে আমরা দেখিয়াছি এক দিনেই জল নিকাশ হইয়া গেল। পুকুরের পুরাতন জল গিয়া নূতন জল হইল। গ্রামের সমস্ত আবর্জ্জনা জলে ভাসিয়া গেল। তখন মানুষের স্বাস্থ্য বড় সুন্দর ছিল। আর এখন? এখনও বন্যা হয়। কিন্তু বন্যার জল বাহির হইতে পায় না। কেনেলের বাঁধে ঠেক খায়। গ্রামের ভিতরে বহুদিন জল জমিয়া সব পচাইয়া তুলে। যে গ্রাম পূর্ব্বে বড়ই স্বাস্থ্যকর ছিল কেনেল হইবার কিছুদিন পরে দেখা গিয়াছিল দোতলার উপর পর্য্যন্ত সেঁতসেঁতে হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই জনার্দ্দনপুর গ্রাম, পাতরাগ্রাম, তুতিয়া মুনিবগড়, চঞ্চলপুর, কুমারডোবা, লছমাপুর প্রভৃতি স্থান সকল প্রায় শ্মশান হইয়া আসিল। প্রাচীন-কীর্ত্তি এখনও আছে। দোল দুর্গোৎসব অতিথিসেবা সবই একরূপ চলে কিন্তু মানুষ নাই বলিলেই হয়। প্রাচীন পুষ্করিণী গ্রামের চারিধারে, কিন্তু পঙ্কোদ্ধার নাই। পুরাতন বাড়ী, পুরাতন দেবমন্দির, প্রভৃতির আধুনিক অবস্থা দেখিলে এবং জনার্দ্দনপুর ও পাথরা গ্রামের সমৃদ্ধির সহিত এখনকার অবশিষ্ট বালক ও স্ত্রীলোকের অবস্থার তুলনা করিলে চক্ষে জল পড়ে না, জলের পরিবর্ত্তে রক্তধারা বাহির হইতে চায়।

যে প্রাচীনবংশ স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য চিরদিন বিখ্যাত ছিল, যে বংশ কুলীনের কুলমর্য্যাদা রক্ষাজন্য এখনও প্রশংসিত, যে বংশ ৺নীলকণ্ঠের মত রত্ন প্রসব করে, সেই বংশেই প্রবোধচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

আমরা প্রবোধের লেখা ও সংগ্রহ হইতে আরও কিছু উদ্ধার করিয়া ঐ বংশের তালিকা দিতেছি।

পারের আয়োজন ফেব্রুয়ারি ৫ই ১৯০৮। পারের জন্য কি আয়োজন করিয়াছি? পারঘাটের রাস্তায় পর্য্যন্ত চলিতে আরম্ভ করি নাই। কত দেখিলাম, কত কষ্টভোগ করিলাম, কিন্তু চৈতন্য হইল না। শরীর মন ইন্দ্রিয়াদি লইয়া এই ৪০ বৎসর কাটাইলাম তথাপি মোহ ঘুচিল না। যাহা অস্থায়ী নশ্বর তাহার তৃপ্তিতেই অনবরত ৪০ বৎসর কাটাইলাম। মোহনিদ্রা এখনও ভাঙ্গে নাই। কবে ভগবানের দিকে তাকাইতে পারিব? কবে তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারিব? কবে আমার সুদিন আসিবে?

২। কেন মিছা ভাব আর, রাম ময় এ সংসার, সুখ দুঃখ তাঁহারই ঘটনা।

৩। ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় বোধ করিয়া তাহাতে প্রীতিলাভ করিবেন না। এবং অপমানকে সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন।

৪। বৈষয়িক সুখভোগে বিষবুদ্ধি না হইলে মুক্তি চেষ্টা হইবে না।

৫। তোমাতে আমাতে এবং অন্যত্র সকল বস্তুতেই একমাত্র বিষ্ণু বিরাজমান; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি কি জন্য কোপ করিতেছ? সর্ব্বত্র ভেদ জ্ঞান ত্যাগ কর।

৬। সূর্য্য অস্ত গেলে তিল সংযুক্ত কোন দ্রব্য ভোজন করিও না। উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিবে। ভোজন উত্তর মুখে।

মানসপূজা ৩০ আশ্বিন ১৩১২ সাল—মনটিকে বেশ পরিষ্কার পূর্ব্বক অর্থাৎ মনের ময়লা দূরে ফেলিয়া তাহাতে একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত আসন বিছাইয়া তাহার উপর একটি সিংহাসন বসাইয়া তাহাতে আপন ইষ্টদেবতাকে বসাইবে। স্বয়ং একটি উত্তম গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া উত্তম পুষ্পসহ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিবে। স্বীয় কামনা জানাইয়া বর প্রার্থনা করিবে। প্রণাম করিবে। তৎপরে ঠাকুরকে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার চরণামৃত পান করিবে। তৎপরে উত্তম পুরাণাদি পাঠ করিবে। তৎপরে ভোজনাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া একটি নির্জ্জনঘরে একাকী তাঁহার ভাবনা করিবে। এই সমস্ত মন দ্বারা করিবে। যদ্যপি এই মতে চলি তবে কোন দুঃখ থাকিবে না।

৩০ আশ্বিন ১৩১৬। মানসতীর্থ সত্য, দয়া, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়জয়, আর্জ্জব (সরলতা), দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য এবং তপস্যা প্রত্যেকেই এক একটি তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য একটি পরম তীর্থ। চিত্ত শুদ্ধিই তীর্থেরও তীর্থ। মাত্র জলে দেহ ডুবানার নাম স্নান নহে। বাহ্যেন্দ্রিয় দমনরূপ স্নান যে করিয়াছে সেই স্নাত। যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে সেই পবিত্র। দাম্ভিক এবং বিষয়ান্ধ সর্ব্ব তীর্থে সুস্নাত হইলেও সে ব্যক্তি পাপী এবং মলিন।

মানস তীর্থগুলি প্রতিদিন ভ্রমণ করিব।

১৩১৬ পূর্ণিমা দোল যাত্রা। কিসের পেছুনে ছুটিতেছি। মরীচিকা ভ্রমমিথ্যা। অদ্য হইতে নিদ্রা দূর হউক ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

মৃগ যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় মরে আমরাও তেমনি ভ্রমের পাছু পাছু ছুটিতেছি। ইহার ফল কি? ফল মৃত্যু—পুনরপি জননং পুনরপি মরণম্।

১৩১৬।৮ই চৈত্র মঙ্গলবার নূতন বৎসরের জন্য নিয়ম। রাত্রে লঘু আহার। নিয়মিত নিদ্রা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত। রাত্রি ৪টায় জাগরণ। ৪ হইতে ৫ ক্রিয়া। পরে শৌচাদি। পরে স্নান। স্নানের পর সন্ধ্যা। গায়ত্রী জপ নাম জপ। গায়ত্রী প্রত্যহ তিনবারে ২১০৮। নাম জপ প্রত্যহ ১০,০০০। বৈকালে পাঠ। কত সময়ে কত জপ তাহার হিসাব। সন্ধ্যায় সন্ধ্যা করিয়া আবার জপ।

শুভবৎসর। পুণ্যবৎসর। ১৩১৭। (১) যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট (২) সর্ব্বজীবে ভগবানের স্বরূপ বোধ। (৩) একান্তে তাঁহার সেবা (৪) পুণ্যকর্ম্ম।

৺জগন্নাথধাম শ্রাবণ ১৩১৮ শুক্রবার ২১,৭,১১। প্রার্থনা আমি পতিত আমায় উদ্ধার কর। আমি অবসন্ন, আমায় রক্ষা কর। আমি পাপী আমার পরিত্রাণ কর। আমি তাপী আমায় শীতল কর। আমি অনাথ আমায় আশ্রয় দান কর। আমি দীন হীন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল আমার সহায় হও।

আমরা এবারে আর অধিক দিব না। শেষে একটি হিন্দি পদ ও একটি ধ্যান দিয়া এবার কার মত ক্ষান্ত রহিলাম।

২৩।৩।১২। অযোধ্যা—রামনবমী। সরযু মাতার নিকট রামভক্তি প্রার্থনা। আত্মীয় কুটুম্বগণের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা। নয়ন, মনও বচন দ্বারা কাহাকেও দূষিত করিও না। কাহারও প্রত্যক্ষ দোষ বা পরোক্ষদোষ কাহারও নিকট

উল্লেখ করিও না ধৈর্য্য রক্ষাই পুরুষার্থ। তীব্র বৈরাগ্য কর। হচ্চ হবে ইহা মন্দ বৈরাগ্য।

পদ—গুরু কৃপাঞ্জন পাও মেরা ভাই।
রাম বিনা কুছু সুচতো নাহি॥
অন্দর রাম বাহার রাম।
যা দেখো তা রামই রাম॥
জাগত রাম শোওত রাম।
স্বপতা দেখো তা রামই রাম॥
একো জনার্দ্দনী ভার্বহি নীকো।
জিতে দেখো উতে রাম সরিখো॥

ধ্যানম্—ধ্যায়েদাজানুবাহুং ধৃতশরধনুষং বদ্ধপদ্মাসনস্থং।
পীতং বাসোবসানং নব কমলদলস্পর্দ্ধি নেত্রং প্রসন্নম্।
বামাঙ্কারূঢ়সীতামুখকমল মিলল্লোচনং নীরদাভং
নানালঙ্কারদীপ্তং দধতমুরুজটামণ্ডনং রামচন্দ্রম্।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৺প্রবোধ চন্দ্রের সংগ্রহ ও নিজ উক্তি অনেক। ঐ বারে আমরা এই পর্য্যন্ত দিলাম। যে বংশে ৺প্রবোধ চন্দ্র জন্মিয়াছিল সেই বংশের মজুমদার মহাশয়গণের এবং তাঁহাদের দৌহিত্রগণের বংশ বিবরণ শ্রীযুক্ত হারাণ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সংগ্রহ হইতে বংশ বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

মজুমদার বংশের বিবরণ।

কংসাবতী নদীর (কাঁসাই) উত্তর কূলে পাথরা গ্রাম,দক্ষিণ কূলে বেড়জনার্দ্দন-পুর। এই বংশের আদিবাস পাথরা। ইঁহাদের আদি পুরুষ ছান্দড়। ইঁহারা ঘোষাল। পশোর সন্তান। বাৎস্য গোত্র। পশোর পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম। সুরভি—সাগর—মনোরম—বিশ্বামিত্র—জীতমিত্র—ভগবান—পিঙ্গল—শিরো—উদ্ধব—কোঁচ—আভো—পশো। পশোর পরে হিঙ্গল—মাই—গোবর্দ্ধন—মুরারি—সর্ব্বেশ্বর—শ্রীনাথ—সর্ব্বানন্দ—শ্রীগর্ভ—(ভঙ্গকুল)—বনমালী—রাঘব-রাম ঘোষাল। ইঁহারা কলিকাতার ঘোষাল। রাঘবরাম হইতে বংশ বিবরণ আরম্ভ।
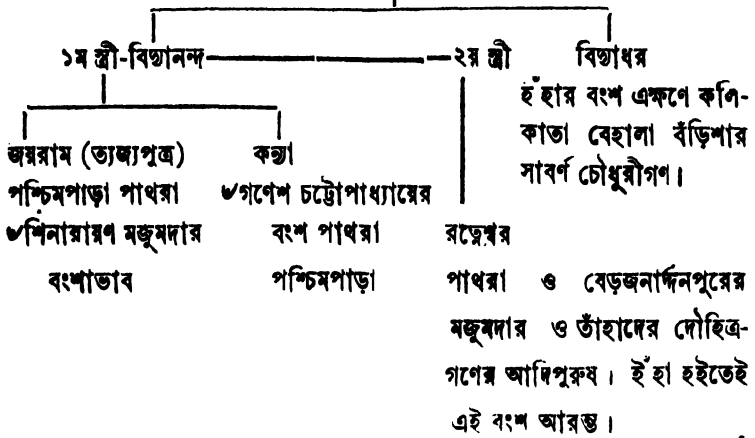
রাঘবরাম, ঘোষাল ছিলেন। ইঁহার পুত্র বিদ্যানন্দ নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন এবং মজুমদার উপাধি পান। তিনি বহু অর্থ ভাঙ্গতি করায় মুরশিদাবাদের নবাব উঁহাকে ধরিয়া লইয়া যান। বিদ্যানন্দ, জয়রাম ও রত্নেশ্বর এই দুই পুত্র সঙ্গে নৌকা করিয়া মুরশিদাবাদে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে একদিন ইনি ভট্টপল্লীর (ভাটপাড়ার) গঙ্গাতটে সন্ধ্যা করিবার জন্য নৌকা লাগান। গঙ্গাতীরে ঐ সময়ে তিনি এক ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণের দর্শন পান। ঐ তেজস্বী ব্রাহ্মণের নিকট তিনি আপন অবস্থা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যানন্দকে অভয় দেন। বলেন আমি তিনদিন এই ঘাটে তোমার জন্য তপস্যা করিব। তুমি এই তিনদিনের মধ্যেই খালাস পাইয়া আমার নিকট আসিবে। তাহাই হয়। বিদ্যানন্দ খালাস পাইয়া গঙ্গাতীরে দরিমান করিয়া ঐ মহাপুরুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। মহাপুরুষ অর্থাদি কিছুই গ্রহণ না করিয়া বিদ্যানন্দ বংশের সকলে যেন তাঁহার বংশের শিষ্য হয় এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া লয়েন। তখন হইতে ভাটপাড়ার বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মজুমদার বংশের গুরুকুল।

বিদ্যানন্দ মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলে তাঁহার বিচার হয়। ঐ বিচারে বিদ্যানন্দকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিবার হুকুম হয়। বিদ্যানন্দ কাতর হইয়া এক দিনের জন্য তপস্যা করিবার হুকুম প্রার্থনা করেন। হুকুম মঞ্জুর হয়। বিদ্যানন্দ বেলা দুই প্রহরের সময় ভয়ানক রৌদ্রে চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া পঞ্চতপা হয়েন। ঐ সময়ে নবাব-পত্নী বিদ্যানন্দের মস্তক হইতে অগ্নি বাহির

হইতেছে দেখিতে পান। নবাব-পত্নী তখন নবাবকে বলেন "মুল্ল্‌ক জ্বল যায়েগা—ওস্‌কো ছোড় দেনা"। ইহাতেই বিদ্যানন্দ মুক্ত হয়েন।

যেদিন বিদ্যানন্দকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিবার হুকুম হয় সেইদিন তাঁহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র জয়রাম পাথরা মোকামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একাদশ দিনে তিনি যখন পিতার শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছিলেন সেই সময়ে বিদ্যানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রত্নেশ্বরকে লইয়া বাটীতে আগমন করেন। পিতা পুত্রের ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করেন। এখনও পশ্চিম পাড়ায় গোলবারাণ্ডা যুক্ত নাটমন্দির বর্ত্তমান আছে। নাট্‌মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ এখনও পূর্ব্বের মত শল্পকার্য্যের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। এখন ঐ মন্দির ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে ও মন্দিরের বহু স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

* আরও প্রবাদ আছে নবাব পত্নীর অনুরোধ সত্বেও বিদ্যানন্দকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলা হয়। তিনবার চেষ্টা করা হয় কোন বারেই হস্তী পা তুলে নাই। তাহা হইতেই পা-তরা নাম। পাতরা হইতে পাথরা নাম হইয়াছে।

বিদ্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে রত্নেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পাথরা ও বেড়জনার্দ্দনপুর গ্রামস্থ মজুমদার ও তাঁহাদের দৌহিত্র সন্তানদিগের আদিপুরুষ। ইঁহা হইতে বংশ বিস্তার দেখান হইতেছে।

রামচন্দ্র [রত্নেশ্বরের ১ম পুত্র]
শোভারাম
সীতারাম
সাফলরাম
দুর্গাপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ
রামলোচন
অভয়রাম
অনন্তরাম
কন্যা-প্রভিতামহ
রামকুমার
ঈশান
রামময় রামরূপ বা ছিরু
প্রসাদ
ফৌজদারী
পেস্কার
চন্দ্র
মাখনলাল
নিঃসন্তান বিধবা পত্নী বর্ত্তমান
রামরাম
রামরতন
রামদয়াল
রামদাস
শ্রীরাম
বলরাম
রামসহায়
রামানুকূল
নীলকণ্ঠ
কন্যা
রামপ্রসাদ
গঙ্গাপ্রসাদ
শম্ভুরাম
গুরুদাস
শ্রীনাথ
নারায়ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার বিধবা
পত্নী শ্রীক্ষীরোদমণি দেবী বর্ত্তমান

হরিনারায়ণ [রত্নেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র]
পরশুরাম
বালকরাম
দৌহিত্রবংশে
অনন্ত
শশী
(দ্বিতীয় পাড়)
বাবারাম
লোকনাথ
জগৎরাম
রাঘবরাম
নীলকমল
ক্ষেত্রনারায়ণ
কন্যা
অমূল্য
কন্যা পুত্র মাখনলাল মুখোপাধ্যায়
৪র্থ মুন্সেফের পেস্কার
রামচন্দ্র
কন্যার স্বামী শ্রীরামচন্দ্র মুখো
কুমুদ
নারায়ণ
কুমারী
প্রবোধ
পুত্র
পুত্র
কন্যার স্বামী গণেশমুখো
বাড়ী এড়িয়াদহ পণ্ডিত
রত্নীকুল
রামনাথ
লক্ষণ
কন্যা
গোপীনাথ
কন্যা
মাণিকরাম
মুক্তারাম
কন্যা
রামচন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র
গোরাচাঁদ
নিধিরাম
কালিপ্রসাদ
প্রসন্নকুমার
জ্যোতিন্দ্র নগেন্দ্র তিনকড়ি তারাপদ
দুর্গাপ্রসাদ
জানকী—দর্পনারায়ণ
নন্দরাম
কন্যা বিধুমুখী
নারায়ণদাস
দেবেন্দ্র
নিত্যগোপাল
রামজীবন
ভাগবত
পঞ্চানন
রামতারণ
রামগতি
গুরুপ্রসাদ
রামকুমার
আশু
খুদীরাম
কন্যা
রামপ্রেয়সী
কন্যা
রামাঙ্গিণী

শিবনারায়ণ [রত্নেশ্বরের ৩য় পুত্র]
১ম স্ত্রী—রঘুনাথ—২য় স্ত্রী
জগন্নাথ
জীতরাম
(বেড়জনার্দনপুর স্থাপন)
কৃপারাম
(পাথরা রতনচক)
কেবলরাম
(পাথরা পুরাতনবাটী)
ছকুরাম (নবরত্ন প্রতিষ্ঠা করেন, তুলামেরু করেন। জীতরামের নিকট মান্য পান)।
রায়
বেচারাম
নিধিরাম
বিপ্রদাস
রামপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
দৌহিত্রী কন্যা
গুরুপ্রসাদ রায়
সাবিত্রী
মহেশ্বরী
রাজনারায়ণ
রামনারায়ণ
কেনারাম
ঝঁতু
ফতু
বাবুরাম মজুমদার
কন্যার স্বামী
ক্ষীরোদ বন্দ্যো।
ডাক্তার
জহরলাল
উপেন্দ্রনাথ রায়
বিধবা পত্নী বিরাজমোহিনী
কন্যা
শ্রীরাম বন্দ্যো। পুত্রবধূ
প্রিয়নাথ
সূর্য্যকুমার
শিশিরকুমার
নাবালক
রামজীবন
রামধন
রামচরণ
গগনচাঁদ
গোরাচাঁদ
তারাচাঁদ
রামব্রহ্ম
রজনী
লক্ষ্মণ
রামসত্য
নিত্যগোপাল
ফণিভূষণ
কালিপদ
রামসদয়
কন্যা
রামহৃদয়
পত্র
রামময়
কন্যা

(ক্রমশঃ)

সোঽহং জ্ঞানে অমরত্ব সদাজাগ্রতত্ব লাভ করিবে। ইহাই মুক্তি। ইহার কোনটি বাদ দিয়া যদি তুমি সোঽহং জ্ঞানী সাজিয়া থাক সে তোমার সাজা মাত্র; সে তোমার কপটাচার মাত্র। কপটকে ভগবান কখন কৃপা করেন না। সরল হও সরল শ্রীভগবান তোমারই নিশ্চয়। হে সর্ব্বজনের সুহৃৎ! আমি এই সব চিন্তা করিয়া নিজের শক্তিতে যতটুকু কুলায় তাহা লইয়াই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছি—যদি ইহা তোমার অভিমত না হয় তবে তুমি, আমি যাহার উপযুক্ত তাহাই করাইও—অন্য আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিও।

(৪) ব্রহ্মজ্ঞানীর ভাগবত কতদূর আবশ্যক :—ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি—অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে যিনি যাইতেছেন তিনি কি হরিকথা লইয়া থাকিবেন এ প্রশ্ন আজ বহুজনে করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ বাণী ছিল ঘরে ঘরে ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে, স্ত্রীলোকও পত্রের মাথায় ওঁ লিখিবে—হরি রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা ইঁহাদের নাম আর করিবে না—পত্রের মাথাতেও ইঁহাদের নাম লিখিয়া আর ইঁহাদের স্মরণ করিবে না। পূর্ব্বে আমরা যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছি আধুনিক সমাজের এই গতি ব্যভিচার; ইহা কপটাচার; ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানী সাজা মাত্র। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন দেখা যাউক।

এই ভাগবত গ্রন্থেই ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব বলিতেছেন

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেবতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥ ২।১৭

হে রাজন্! যে সকল মুনি বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত, তাঁহারাও শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে আমোদ করিয়া থাকেন।

পরে শ্রীশুকদেব নিজের কথায় বলিতেছেন

পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে! আখ্যানং যদধীতবান্॥ ২।১।৯

হে রাজন্। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য কিন্তু উত্তম শ্লোক শ্রীভগবানের লীলা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতেই আমার এই (শ্রীভাগবত) অধ্যয়ন করা হয়।

আজকালকার অশাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞানীকে অধিক আর কি বলা যাইবে? বলিবারও প্রয়োজন কিছুই নাই। এক প্রয়োজন পাছে ঐরূপ কপট ব্রহ্মজ্ঞানী সাজা হইয়া যায় তাই এই সতর্কতা। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছামত উপাসনাদি

করিলে সিদ্ধিও কখন হইবে না। প্রকৃত সুখও কখন হইবে না। আর জীবমুক্তিরূপ পরাগতি কখন লাভ হইবে না। শ্রীগীতাই ইহা উপদেশ করেন :—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

শ্রীভাগবতও সর্ব্বশাস্ত্রমত ক্রম দেখাইতেছেন :—

তস্মাদ্ভারত! সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ ২।১।৫
এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরং পুংসামন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ॥ ২।১।৬

অতএব হে ভারত! যে ব্যক্তি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ এবং ঈশ্বর হরির শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপ ভক্তিযোগই ইহা; ঈশ্বরপ্রণিধানের প্রকৃষ্ট উপায় সর্ব্বকর্ম্মার্পণ।

স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা করিয়া আত্মানাত্ম বিবেক ও অষ্টাঙ্গ যোগ এতদুভয় দ্বারা যে নারায়ণ স্মরণ তাবন্মাত্রই পুরুষের লাভ। পরন্তু অন্তে নারায়ণ স্মরণই পরম লাভ।

(৫) কোন শ্রীভাগবত অবলম্বনীয় :—দুইখানি ভাগবত এখনও প্রচলিত। একখানি দেবীভাগবত ও অন্যখানি শ্রীমদ্ভাগবত। ইহার মধ্যে একখানি পুরাণ, একখানি উপপুরাণ এই কথা অনেকেই বলেন। কেহ বলেন এই দুই খানি পুস্তক এক ভাগবতেরই পূর্ব্বার্দ্ধ এবং উত্তরার্দ্ধ। পূজ্যপাদ শ্রীনীলকণ্ঠ শূরী দেবীভাগবতের উপক্রমণিকায় যে গবেষণা তুলিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চান দেবীভাগবতই পুরাণ। আজকাল আর এক মত বাহির হইয়াছে তাহাতে বলা হয় শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা দৃষ্টে প্রমাণ করা যায় যে শ্রীমৎ ভাগবত ব্যাসদেবের লেখা নহে; ইঁহার লেখক বোপদেব।

আমরা অন্যান্য পুরাণ দেখিয়া বুঝিতে পারি শাস্ত্র শ্রীমৎ ভাগবতকেই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। সেই সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীভাগবতের প্রচার কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহারও উল্লেখ আছে। আমরা পরে ইহার আলোচনা করিতেছি। এখানে অন্যান্য শাস্ত্র যে শ্রীমৎ ভাগবতকেই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন তাহাই দেখাইতেছি।

প্রাণতোষিণী গ্রন্থকার কোন্‌টি ভাগবত তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া নারদ পঞ্চ রাত্রের দ্বিতীয় রাত্রের সপ্তম অধ্যায়ের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

গ্রন্থাষ্টাদশসাহস্রং দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতম্।
শুকপ্রোক্তং ভাগবতং শ্রুত্বা নির্ব্বাণতাং বিদুঃ।
পুরা ভগবতা প্রোক্তং কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে শুকে।
পুরাণসারং শুদ্ধং তৎ তেন ভাগবতং বিদুঃ॥

এখানে শ্রীমদ্ভাগবতকেই শ্রীভাগবত বলা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। আর্য্য জাতির কত মহামুল্য রত্নরাজি যে এই পুরাণ-ভাণ্ডারে সযত্নে সজ্জিত আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানপিপাসা মিটাইতে চাহেন তাঁহারা মহাভারতের মত এই বিপুলগ্রন্থ সমগ্র পাঠ করিতে যদি অবসর নাও পান তবে এইপুরাণের মধ্যস্থিত সূতসংহিতা পাঠ করুন—তাঁহারা নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইবেন। স্কন্দপুরাণকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলা হইয়াছে। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য আজ বহুলোকেই পুরাণ মানিতে চাহেন না। প্রক্ষিপ্ত বাদ বলিয়া যে বাদ উঠিয়াছে তাহাতেই প্রাচীন আর্য্যজাতির বংশধরগণকে সংশয়াত্মা করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা উপনিষদ্ মানিতে চান, বেদ মানিতে চান কিন্তু পুরাণ মানে না তাঁহাদিগকে আমরা বেশী কিছুই বলিতে চাই না। শুধু বায়ু পুরাণ এই সমস্ত লোকের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিয়াই আময়া নিরস্ত হইব।

বায়ু পুরাণ বলেন :—

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদোদ্বিজঃ।
নচেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স-স্যাদ্বিচক্ষণঃ।
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্প শ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

যিনি সাঙ্গোপনিষদ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন তাদৃশ ব্যক্তিকে বিচক্ষণ বলা যায় না। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান উপচিত করিয়া লইতে হয়। নতুবা "আমাকে এই ব্যক্তি প্রহার করিবে" এই মনে করিয়া অল্পজ্ঞান ব্যক্তি হইতে বেদ ভীত হয়েন। যাঁহারা পুরাণ মানেন না অথচ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতে যান তাঁহাদের কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ইহা সুন্দর বুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রেই প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন।

বলিতেছিলাম স্কন্দপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। আরও বলিতেছেন :—

পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদো যোঽসৌ ব্যাসেন কীর্ত্তিতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো যোঽসৌ ভাগবতাভিধঃ।
কলিগ্রাহগৃহীতানাং স এব পরমাশ্রয়ঃ॥

ব্যাসদেব যে পরীক্ষিত-শুক-সংবাদাত্মক ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন সেই গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকপূর্ণ এবং তাহাই ভাগবত নামে অভিহিত। কোন্ ভাগবত অবলম্বনীয় তাহা দেখান হইল এক্ষণে শ্রীভাগবত কতদিনের গ্রন্থ এবং কিরূপে ইহা প্রচার হয় তাহাই বলা হইতেছে।

(১) শ্রীভাগবত কতদিনের গ্রন্থ! ইহা কাহার দ্বারা প্রচার হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায় 'ব্যাসদেব যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক নিখিল বেদতুল্য, মহৎ স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ এই ভাগবত গ্রন্থ লোকের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত রচনা করেন এবং প্রথমে স্বীয়পুত্র ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে ইহা অধ্যয়ন করান। ইহাতে পবিত্র কীর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণের পুণ্যচরিত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে"।

ইহাই শ্রীভাগবতের আদি নহে। দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে পাওয়া যায়:—

জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা আপনার অবলম্বন স্থান পদ্মে উপবেশন করিয়া সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত যখন চিন্তা করিতে ছিলেন, কিন্তু যে জ্ঞানে সৃষ্টি করা যায় এবং সৃষ্টির প্রকার জানা যায় তাহা লাভ করিতে পারিতেছিলেন তখন আদি পুরুষ নারায়ণ আকাশবাণীতে বারিমধ্য হইতে তপঃ কথাটি উচ্চারণ করেন। ব্রহ্মা তখন তপস্যা করিতে থাকেন। নারায়ণ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে তাঁহার বৈকুণ্ঠ-ধাম দর্শন করান এবং নিজেও দর্শন দেন। ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট হইতে, চতুঃশ্লোক সংক্ষিপ্ত ভাগবত প্রাপ্ত হয়েন। পরে শ্রীনারদ তাঁহার পিতা ব্রহ্মার নিকট হইতে ইহা লাভ করেন। ব্যাসদেব নারদের নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে পল্লবিত করেন, এবং শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শ্রীশুকদেব হইতে রাজা পরীক্ষিতের জন্য ইহা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়।

স্কন্দপুরাণে ভাগবতের সৃষ্টি এইরূপত আছেই বরং ইহা অপেক্ষা অধিক বৃত্তান্ত আছে। আমরা তাহা দেখাইতেছি।

পুরাকালে সাংখ্যায়ন এই ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রীতিবশতঃ ইহা বৃহস্পতিকে উপদেশ করেন। 'অনন্তর' উদ্ধব বলিতেছেন 'আমি বৃহস্পতির

বৎস! সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে তুমি অগ্নির প্রতি 'অঙ্গিরঃ' এই সম্বোধন প্রয়োগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সূক্তশেষে বিস্তৃতরূপে তোমাকে এই বিষয় বলিব মনে করিয়া তখন আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর করিয়াছি। সম্প্রতি তোমাকে মহর্ষি অঙ্গিরার বিবরণ সবিস্তররূপে করিতেছি। প্রথমতঃ মহর্ষি অঙ্গিরার আবির্ভূতি প্রদর্শন করার পরে কেন অগ্নিকে অঙ্গিরাঃ নামে অভিহিত করা হয়, তাহা বলিব। প্রণিহিত মনে শ্রবণ কর—

ঋষিগণ গণনারম্ভে অঙ্গিরোগণের নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষতঃ ঋগ্বেদে অঙ্গিরোদৃষ্ট মন্ত্র দুর্ল্লভ হইলেও মন্ত্রভাগের বহুল অংশ অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণকর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট। ঋগ্বেদের নবমমণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধ ১১৩টী সূক্ত, তন্মধ্যে ২৪টী সূক্তিই অঙ্গিরস ঋষিগণের দৃষ্ট এতদ্ভিন্ন প্রকীর্ণরূপে বেদে বহুস্থানে অঙ্গিরস ঋষিবংশের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল। শ্রৌত ভাবে প্রবেশার্থীর জন্য যে কারণে ঋষিজ্ঞান আবশ্যক আর্যমহিমা বর্ণনা এবং আর্যবিভূতি কীর্ত্তনও সেইজন্যই আবশ্যক। বৎস! মহর্ষি অঙ্গিরোগণের চরিতাবলী বড় আশাপ্রদ। হারানিধি লাভের জন্য যাঁহারা সুদূরপ্রস্থিত তাঁহাদের বড় আদরের সামগ্রী এই ঋষিচরিত্র। কিরূপে মানব হইয়াও ক্রমিক উপায় পরম্পরার অনুষ্ঠান দ্বারা জীব সাধ্য ও সিদ্ধ আজান দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তাহার জ্ঞাপনায় এই চরিত্র বড় আশ্বাসপ্রদ এই জন্যও আর্য চরিতালোচনা আবশ্যক। বৎস! আলোচ্য বিষয় সহজরূপে তোমার বোধগম্য করিবার জন্য আলোচনাটিকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইল—

(১) অঙ্গিরোগণের জন্মকথা। (২) অঙ্গিরোগণ আদিত্যের পুত্র এবং অগ্নির পুত্র (৩) বামদেব ও মেধাতিথি পরিচয়ে অঙ্গিরা। (৩) অঙ্গিরোগণের বংশ। (৫) অগ্নির অঙ্গিরোগণের পরিচয় শ্রেষ্ঠতা ও প্রাচীনতা। (৬) অঙ্গিরোগণের দেবত্বপ্রাপ্তি। (৭) অগ্নির অঙ্গিরঃ পুত্রত্ব। (৮) সাধারণ ভাবে শ্রুতিতে অঙ্গিরোগণের উল্লেখ। (৯) অঙ্গিরোগণের পণি অপহৃত গোধনোদ্ধার কথা। (১০) মহাভারতে আঙ্গিরসবংশ।

অঙ্গিরোগণের জন্মকথা] অঙ্গিরোগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আছে—কিন্তু দেবগণ বৈশ্বানরনামক অগ্নি দ্বারা প্রজাপতির রেত আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু মরুদগণ পূর্ব্ববৎ ঐ রেতঃ কে চালিত করিতে লাগিলেন, অবশেষে বৈশ্বানর-অগ্নির তাপে উহা দ্রবভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করিল এবং উহার যে প্রথম উদ্দীপ্ত অবস্থা, তাহাই অন্তরীক্ষ লোকে পরি-

দৃশ্যমান আদিত্যরূপে পরিণত হইল; এবং দেদীপ্যমান দ্বিতীয় পিণ্ড হইতে মহর্ষি ভৃগু উৎপন্ন হইলেন, বরুণদেব তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন (এইজন্য ভৃগুকে বারুণি বলা হয়)। অনন্তর তৃতীয় পিণ্ডরূপে যাহা উদ্দীপ্ত হইল, তাহাই আদিত্যনামক দেব বিশেষরূপে উৎপন্ন হইল, যে রেতঃ-পিণ্ড দগ্ধ হইয়া অঙ্গার অবস্থায় উপস্থিত হইল, এবং পুনরায় অনুপশমিত যে অঙ্গার-রাশি ছিল, তাহা উদ্দীপ্ত হইল এবং তৎসমুদয় বৃহস্পতিরূপে পরিণত হইল। (ঐঃ ব্রাঃ ১৩।১০)

উল্লিখিত অনুবাদ অংশের দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীত হয়, ঐতরেয় শ্রুতিতে অগ্নিকেই অঙ্গিরোরূপে পরিণত বর্ণনা করিতেছেন, এই জন্যই এখানে শ্রুতিতে অগ্নিরঃ সম্বোধন করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের স্থানান্তরে অগ্নিকে অগ্নিরোগণের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাহউক অঙ্গিরোগণের এই জন্মকথা আলোচনা করিলেই অগ্নিই যে আঙ্গি-রসবংশের প্রথম অঙ্গিরা, এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। এই জন্যই ঋগ্বেদে (১।৩১।১,২—১।১২৭।২।৮।৪৩।১৮) অগ্নিকে আঙ্গিরসবংশের জনক এবং অঙ্গিরঃ শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

অঙ্গিরোগণ অগ্নিপুত্র ও আদিত্যপুত্র] এতদ্ভিন্ন অগ্নিরোগণ বেদের নানা-স্থানে অগ্নিরপুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে নাভানেদিষ্ঠ দৃষ্ট (১০।৬২।৪) মন্ত্রে অঙ্গিরোগণ অগ্নিরপুত্র কর্ম্মদ্রষ্টা ঋষি, রূপতঃ ও নামতঃ নানাবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ মণ্ডলের ষষ্ঠ মন্ত্রে অঙ্গিরো গণকে বিবিধ রূপধারী এবং দ্যুলোকস্থিত অগ্নি হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অঙ্গিরোগণের অগ্নিপুত্রত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি যাস্ক স্বপ্রণীত নিরুক্তশাস্ত্রে (১১।২।৬,৭ খণ্ড) ঋক্‌সংহিতার ৭।৬। ১৫।১ মন্ত্রস্থিত এবং নাভানেদিষ্ঠদৃষ্ট ৮।২।১।৫ মন্ত্রস্থিত অঙ্গিরোগণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"তে হঙ্গিরসঃ সূনবস্তেঽগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে ইতি।" অঙ্গিরো-নামক ঋষি বহুসংখ্যক, তাঁহারা নিত্যব্রহ্মদর্শী এবং অপ্রমেয় বুদ্ধি তাঁহারা অগ্নির পুত্র, কে এই অঙ্গিরাঃ অঙ্গিরা অগ্নির পুত্র। 'তে হগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে' এই অংশের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ টীকাকার দেবরাজ বলিয়াছেন অগ্নিত্ব প্রাপ্ত অঙ্গিরা হইতে তাঁহারা উৎপন্ন। দেবরাজের এই উক্তি হইতে এই বোধ হয়,

যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলে যে অঙ্গিরাঃ অগ্নিত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনিই ঐতরেয় শ্রুতিবর্ণিত অঙ্গারশেষ অগ্নিরূপে পরজন্মে আবির্ভূত হইয়া আঙ্গিরস বংশপ্রবর্ত্তন করেন। ইহা হইলেই অঙ্গিরার শ্রুতিবর্ণিত অগ্নিত্ব এবং অগ্নিপুত্রত্ব উভয়ই সমর্থিত হয়।

এতদ্ভিন্ন ঐতরেয় শ্রুতিতে আর একটী বিশেষ কথা পাওয়া যাইতেছে— অঙ্গারাবশিষ্ট যে তেজোরাশি হইতে অঙ্গিরোগণের উৎপত্তি হইয়াছে তাহারই প্রাথমিক উদ্দীপ্ত পিণ্ড সূর্য্যরূপে ঐরূপ দ্বিতীয় পিণ্ড মহর্ষি ভৃগুরূপে তৃতীয় পিণ্ড আদিত্যনামক দেব বিশেষরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং অগ্নিরোগণের উৎপত্তির পরে তাহা হইতেই দেবগুরু বৃহস্পতি উৎপন্ন হইয়াছেন। মানব জগতের উৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে একই রেতবিন্দু যেমন কালক্রমে বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করিয়া পুত্রপৌত্রাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই উৎপত্তি পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেই স্থানবিশেষে (ঋ, সং ৪ ২।১৫) অঙ্গিরোগণ সূর্য্যপুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং এই উৎপত্তি ক্রম অনুসারেই বৃহস্পতি বেদের বহু-স্থানে (ঋ, স, ২।২৩।১৮) অঙ্গিরার পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই জন্যই লৌকিকভাষায়ও বৃহস্পতি আঙ্গিরস চিত্রশিখণ্ডিজ এবং চিত্রশিখণ্ডিনন্দন নামে পরিচিত হইয়া থাকেন।

বামদেব ও মেধাতিথি পরিচয়ে অঙ্গিরোগণ] আর এক কথা শ্রুতিতে প্রায় সর্ব্বত্রই অঙ্গিরস শব্দ বহুবচনান্তরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা দেখিয়া স্বতঃই মনেহয় অঙ্গিরা বহুসংখ্যক, ঐতরেয় শ্রুতিতে যেখানে অঙ্গিরোগণের উৎপত্তি কথা নিবদ্ধ সেখানে 'অঙ্গিরসোঽভবন্' এইরূপে বহুবচনান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে, ভাষ্যকার সায়নও সেখানে বহু অঙ্গিরার উৎপত্তি কথাই লিখিয়াছেন। ঋগ্বেদের কতিপয় স্থানে ইহাদের মধ্যে দুই একজনের নাম, এবং সমষ্টিসংখ্যা পরিদৃষ্ট হয়, যেমন বামদেব-দৃষ্ট (৪।২।১৫) মন্ত্রে বামদেব অন্য ছয়-জন অঙ্গিরার সহিত বলিতেছেন (সায়ণ) আমরা সাতজন বিপ্র অগ্নির শ্রেষ্ঠ পরিচারক। ঋগ্বেদের আর দুই একস্থানে (৩।৫৩।৭৮।৭।১১) মেধাতিথি প্রভৃতি সপ্ত অঙ্গিরার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মনে হয় ঐতরেয় শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট রূপান্তরিত অগ্নিস্বরূপ অঙ্গিরোগণ প্রথম সপ্তসংখ্যক হইয়া উৎপন্ন হন। তাঁহারা আঙ্গিরসবংশের প্রবর্ত্তক। এবং ইহাদেরই মধ্যে একজন বামদেব

নামে এবং একজন মেধাতিথি নামে পরিচিত, এবং ইহাদেরই মধ্যে প্রধান অঙ্গিরা। ঐতরেয় (৬।৫।৮) বর্ণিত অগ্নি নামে পরিচিত।

অঙ্গিরোগণের বংশ] এতদ্ভিন্ন শ্রুতিতে (ঋ, স ১০।৬২।৬—১।৬২।৪ সায়ণ) অঙ্গিরোগণ নবগ্ব ও দশগ্বনামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা নয়মাস ধরিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নবগ্ব, এবং যাঁহারা দশমাসব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই দশগ্ব নামে অভিহিত। নিরুক্তপ্রণেতা মহর্ষি যাস্কও (১১।২।৬,৭ খণ্ডে) অঙ্গিরোগণকে নবগ্ব ও দশগ্ব নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এই বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কারণেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

অঙ্গিরোগণের পরিচয় শ্রেষ্ঠতা ও প্রাচীনতা] এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের আরও বহুস্থানে (১।৭৫।২ ; ১।১২৭।২ ; ১।৩১।৯ ; ১।৩১।১,২ ;) অঙ্গিরোগণের পরিচয় পাওয়া যায়, অপিচ এই সমুদয় শ্রুতিপাঠে ইহাও প্রতীতি হয় অঙ্গিরোগণ অথর্ব্বা, দধ্যচ্ এবং ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের ন্যায় অন্যতম প্রাচীন ঋষি এবং ঋষি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

অঙ্গিরোগণের দেবত্ব প্রাপ্তি] মনুপুত্র নাভানেদিষ্ঠের ইতিহাসে অঙ্গিরোগণের দেবত্বপ্রাপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সায়ণ (১০।৬১।১) মন্ত্রের পাতনিকায় এই ইতিহাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দশম মণ্ডলের ৬২ তম সূক্তের প্রথম মন্ত্রে—অঙ্গিরোগণের দেবত্ব প্রাপ্তি স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। অপিচ এই মন্ত্রে অঙ্গিরোগণই দেবতা, তাঁহাদেরই নিকট মনুপুত্র নাভানেদিষ্ঠ দেবত্ব প্রার্থনা করিতেছেন।

অগ্নির অঙ্গিরঃ পুত্রত্ব] অপিচ ঋগ্বেদের স্থান বিশেষে (১।৩১।১১) অঙ্গিরঃ পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নিকে অঙ্গিরঃ পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা অঙ্গিরোগণকেই অগ্নির পুত্ররূপে অবগত হইয়াছি সম্প্রতি তাহার বিপরীত পাইতেছি, উপসংহারে এবিরোধ নিরাকৃত হইবে।

সাধারণ উল্লেখ] এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের বহু স্থানে * অঙ্গিরোগণের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, এতৎসমুদায়ের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক, সেই সেই মন্ত্রপাঠ কালে তুমি নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

---

* অঙ্গিরোগণের সাধারণ উল্লেখ ঋং সং ১।৬২।১, ৫ ; ১।১০৭।২ ; ১।৪৫।৩ ; ১।৩১।১৭ ; ৩।৫৩।৭ ; ৮।৪৩।১৩ ; ৮।৩৫।১৪ ; ৯।৬২।৯ ; ১০।৬২।৩ ; ১০।৩৮,৫ এবং ১।১৩৪।১৬ ভাষ্যে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। পণি অপহৃত গোধনোদ্ধার কথা—১।৬২।২,৩ ; ১।৫১।৩ ; ১।৭২।৮ ; ১।৮৩।৪ ; ২।১৫।৮ ; ৪।৩।১১ ; ৮।৫২।৩ ; ৮।১৪।৮ ; ৯।৮৬।২৩ ; ১০।৬২।২ ; ১০।১০৮।১০।

অঙ্কুর উৎপাদন করে না—তরুলতার স্ফুরণ যেমন স্বভাবতঃ হয়, সেইরূপ নিরিচ্ছ চিদাত্মাতে এই জগৎ লক্ষী স্বভাবতঃই হয়। তিনি মায়িক বাসনা তুলিলে তাঁহাতেই জগৎ আপনিই ভাসিয়া উঠে। এই জন্য বলা হয়—যেন মায়াতে অনাদি সৃষ্টির কর্ম্মসংস্কার বীজভাবে থাকে —ব্রহ্ম মায়া অঙ্গীকার করিলেই মায়া হইতে বিচিত্র সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ -পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মতনই সৃষ্টি করিলেন। জগতে যাহা কিছু আকারবান্ দেখা যায় তাহা মায়াশবলিত বহুবাসনাবীজপূরিত খণ্ড চিৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিৎই মায়া আশ্রয়ে রুদ্রমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করেন। চিৎই মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া জগজ্জাত পদার্থের আকার ধারণ করেন। এখন বুঝিতেছ আবরণ কিরূপে হয়? চিৎ স্বপ্রকাশ। "আমি বহু হইব" এই স্পন্দন—এই ভাবনা -এই সঙ্কল্পই মায়া। মায়ার মধ্যে অনাদি বাসনাসংস্কার আছে—মায়া গ্রহণে ব্রহ্ম যেন স্বভাবতঃ 'আমি বহু হইব' এই ভাবে স্পন্দিত হয়েন। ফলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। তথাপি এই মায়িক সৃষ্টি হইতেছে বলা হয়। এই কারণে চিৎ দ্বিবিধ বলা হয়। "কূটস্থ চৈতন্য পরম শান্ত নির্ব্বিকল্প' পরিপূর্ণ ব্যাপক সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থিত। মায়াশবলিত (চিত্রিত) চিৎটি চঞ্চল, ব্যষ্টি-সমষ্টি তুলিতে উন্মুখী, কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপা। সুশীলা স্ত্রী স্বপ্নে পরপুরুষ ভাবনা করিয়া যেমন কলঙ্কিত হয়, চিৎও সঙ্কল্পবলে কলঙ্কিতা হইয়া আপনাকে জীব ভাবনা করেন। ইহাই পরাপ্রকৃতি। সঙ্কল্পই বন্ধন—সঙ্কল্পক্ষয়ই মুক্তি। চেতনপ্রকৃতি বলিবার কারণ এই যে অগ্নির উত্তাপের মত, বায়ুর স্পন্দনের মত, এই চেত্যভাবটি প্রকৃতি অথচ ইহা চেতনাত্মিকা প্রকৃতি। জীব যাহাকে বলা হয়, তাহা এই প্রকৃতি উপহিত চৈতন্য।

ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব হইলেও এই জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় চিত্তভাবে আপতিত হয়েন। চেত্যভাব—বা চিতি হইতেছেন অনন্তবাসনার প্রসূতি। স্বস্বরূপের অজ্ঞানরূপ মোহবশতঃ চিতির যে চেত্যাকারে অনুভব তাহাতেই বাসনা সমুদায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। ঐ বাসনা দ্বারা চালিত হইয়াই চিৎ অন্তরে স্বস্বরূপের বিস্মৃতিপূর্ব্বক অলীক ভাব স্মরণ করেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সাধনার সহিত পুনঃ পুনঃ আলোচিত না হওয়া পর্য্যন্ত বোধগম্য হওয়া কঠিন।

তুমি সর্ব্বদা ভাবনা করিও সর্ব্বত্রগামিনী ব্রহ্ম চিৎই—চেত্যভাব হইতে চেতনভাব, চেতনভাব হইতে জীবভাব, জীবভাব হইতে মনোভাব, মনোভাব হইতে আতিবাহিক দেহ ধারণ করেন। মায়াশবলিত ব্রহ্মের জগৎসংস্কার সম্বলিত যে সত্তা তাহাই অতিবাহিক দেহ। আবার বলি চিৎ চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অহং বহুস্যাম্ ভাবনা করিয়া অহংকারের অনুসরণ করেন। ঐ অহন্তাব কল্পনা হইতে দেশ কাল কল্পনা আইসে। দেশ কাল কল্পনা সমবেত অহন্তাব কল্পনা। স্পন্দ বিজ্ঞান লাভ করিয়া বাতকণার ন্যায় প্রাণস্পন্দ প্রাপ্ত হন। প্রাণস্পন্দ প্রাপ্ত হইয়া জীবসত্তা বা জীবশক্তি নাম ধারণ করেন। এই জীবশক্তি "আমি এই" ইত্যাকার নিশ্চয়বতী হইয়া বুদ্ধিভাব প্রাপ্ত হওতঃ অজ্ঞপদ লাভ করেন। তখন উহাতে শব্দশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, আপন আপন রূপ বিস্তার করিয়া স্ফুরিত হয়।

অর্জ্জুন—তুমি পরমাত্মা, পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিলে তদপেক্ষা কঠিন

তত্ত্ব আর নাই। স্পন্দন হইতে এই জগৎ—আর স্পন্দন বা চেত্যভাব মহাপ্রলয়কালে সমস্ত বিনাশ করিয়া যখন আপন চিৎকে স্পর্শ করে—যখন মহাপ্রলয়ে মহাকালী সমস্ত সৃষ্টি নাশ করিয়া যম মহিষ বিষাণ হস্তে ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং—ঝম্য ঝম্য প্রঝম্যং ভাবে নৃত্য করিতে করিতে মহাকালকে আলিঙ্গন করেন, তখনই এই স্পন্দনাত্মক জগৎ সৃষ্টির অবসান হয়। তখন পরম-শান্ত ব্রহ্মই থাকেন। আবার তিনি মায়া গ্রহণ করেন আবার সৃষ্টি হয়—আবার মহাপ্রলয় হয়। জীব এই মহাপ্রলয়ে অনন্ত কোটি জীবের বিনাশ চিন্তা করিয়া যখন বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, হইয়া যখন মায়িক জগতের মায়িক ভাবনা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভাবিতে পারিবে পরমাত্মাই সত্য—ভগবান্ই সত্য—তাহার নাম করাই সত্য—আর কিছুতেই কিছু নাই—তখনই সে ক্রমে ক্রমে তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানিয়া যুক্ততম হইতে পারিবে এবং শেষে জ্ঞানী হইয়া নিরন্তর পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে—কেহ বা অনন্ত কাল পরা ভক্তি লাভে স্বস্বরূপে ক্রীড়াশীল থাকিবে। আমি তোমায় অধিক কি বলিব, আমার সর্ব্বস্বই তুমি।

ভগবান্—এখন তোমাকে যাহা বলিব তাহা তোমার সহজে বোধগম্য হইবে।

অর্জ্জুন—এই শ্লোকে আরও একটু জ্ঞাতব্য আছে।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—যিনি অবাঙ্মনসগোচর তাঁহাকেই ত নির্গুণ বা গুণাতীত ব্রহ্ম বলা হয়। আবার যখন শক্তি, শক্তিমানে মিশিয়া থাকেন, তখন সেই শক্তি বা প্রকৃতিকে কেহ কেহ নির্গুণ প্রকৃতিও ত বলেন।

ভগবান্—নির্গুণ ব্রহ্মও যাঁহার নাম নির্গুণা প্রকৃতি ও তাঁহার নাম। শক্তি ও শক্তিমানের যে অভেদ অবস্থা তাহাকে ঐ দুয়ের কোন নামে অভিহিত করায় কোন দোষ হয় না। যাঁহারা শক্তি উপাসক তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্ম না বলিয়া নির্গুণা প্রকৃতি বলিতে ভাল বাসেন। ভগবান্ পতঞ্জলি যেখানে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন বলিতেছেন সেখানে তিনি নির্গুণা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন না জানিও ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

ম ম
সর্ব্বাণি চেতনাচেতনাত্মকানি ভূতানি ভবনধর্ম্মকাণি এতৎ

ম
যোনীনি এতে অপরেণেত্থেন পরত্থেন চ প্রাগুক্তে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে

প্রকৃতী যোনিঃ উৎপত্তিলয়স্থানং যেষাং ভূতানাং তানি এতৎ প্রকৃতিদ্বয়ং যোনিরূপাদানকারণং যেষাং তানি এতৎ যোনীনি ভূতানি চতুর্ব্বিধানি ইতি এবং উপধারয় সম্যগ্ জানীহি। তত্র জড়া প্রকৃতি দেহরূপেণ পরিণমতে। চেতনাতু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি। তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সম্ভূতে। যস্মান্মম প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাম্ অতঃ কৃৎস্নস্য মদীয় প্রকৃতিদ্বয়বিশিষ্টস্য সর্ব্বস্য জগতঃ অহং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরোঽনন্তশক্তির্মায়োপাধিঃ প্রভবঃ উৎপত্তিকারণম্ তথা অহমেব প্রলয়ঃ লয়কারণঞ্চ। তয়োশ্চিদচিৎ সমষ্টিভূতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরপি পরমপুরুষযোনিত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্। "মহানব্যক্তে লীয়তে। অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে। অক্ষরং তমসি লীয়তে। তমঃ পরে দেবে একীভবতি, বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতোদিতে দ্বেরূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র" ইতি। "প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥ পরমাত্মা চ সর্ব্বেষা-

রা
মাধারঃ পরমেশ্বরঃ। বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥

রা ম
ইত্যাদিকা হি শ্রুতিস্মৃতয়ঃ॥ স্বাপ্নিকস্যেব প্রপঞ্চস্য মায়িকস্য

ম ম
মায়াশ্রয়ত্ববিষয়ত্বাভ্যাং মায়াব্যহমেবোপাদানং চ দ্রষ্টা চেত্যর্থঃ॥ ৬॥

সমুদায় ভূত এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত ইহা বিশেষরূপে জানিও। সুতরাং আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও লয় কারণ॥ ৬॥

অর্জ্জুন—তুমি পরমাত্মা! জীব ও জড় এই দুই তোমার প্রকৃতি। তুমি কেবল চিৎ। জীব, প্রকৃতি অবচ্ছিন্ন চেতন। কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, আবার কত অনন্ত কোটি জীব আছে। সবই কি তোমা হইতে জন্মিতেছে ও তোমাতে লয় হইতেছে?

ভগবান্—অচেতন প্রকৃতি আমার উপরেই ভাসে। কাজেই যেখানে প্রকৃতি আছে সেই-খানে চেতনও আছে। সে চেতন যেন খণ্ডিত। তবেই দেখ ভূত সকল চিজ্জড় মিশ্রণে জাত। আমি অখণ্ড চৈতন্য। আমা হইতেই এই চিজ্জড়মিশ্রণরূপ সৃষ্টি। আবার মহা প্রলয়ে সমস্ত ভূত স্পন্দনাত্মিকা প্রকৃতিতে প্রথমে লয় হয়, পরে প্রকৃতি আবার আমাতে লয় হয়। পরাপ্রকৃতিই জীব বা পুরুষ এবং জড় প্রকৃতিই প্রকৃতি। এই পুরুষ আমার যেন অংশ আর প্রকৃতি আমার মনোময়ী স্পন্দনাত্মিকা শক্তি। এই জন্য বলা হইতেছে প্রকৃতি ও পুরুষ সেই পরমপুরুষ হইতে জন্মে এবং শেষে সেই পরমপুরুষেই লয় হয়। আর সমস্ত জীব ও জড়—এই প্রকৃতি পুরুষ হইতে জাত। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি সত্য, কিন্তু অনন্ত নহে। মহাপ্রলয়ে কেহই থাকেন না, থাকেন পরমাত্মা।

অর্জ্জুন—মহাপ্রলয়ে পরমাত্মাই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। যদি বলা যায় সংস্কার-রূপে পরমাত্মাতে সৃষ্টিবীজ থাকে তাহাও বলা যায় না। কারণ তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম—অবাঙ্মনসগোচর—ইহাতে এই ব্রহ্মাণ্ডের বীজ কিরূপে থাকিতে পারে? বীজাঙ্কুর ন্যায় জড়ের সম্বন্ধে খাটে, পরমাত্মার সম্বন্ধে খাটে না। বিশেষ বীজ হইতে যে অঙ্কুর হয় তাহাও কোন সহকারী কারণ না পাইলে হয় না। কিন্তু পরমাত্মা হইতে যে সৃষ্টিবীজের অঙ্কুর হইবে তৎপ্রতি সহকারী কারণও কিছু নাই। এই জন্য বলিতেছ পরমাত্মাতে কোন কিছুই নাই। তিনি শুদ্ধ চিৎমাত্র। পরমাত্মাতে মায়া পর্য্যন্ত আছে কিনা বলা যায় না। সৃষ্টি ইচ্ছা তাহার স্বভাব। নিজ স্বভাব বশতঃই তিনি স্পন্দভাব ধারণ করেন। নিজ স্বভাব বশতঃই মায়া নৃত্য করেন। পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই মায়া সৃষ্টিবিস্তার করেন।

স্বভাবতঃ যখন তাঁহা হইতে মণির ঝলকের মত ঝলক হয়—হইয়া স্বভাবতঃ সৃষ্টি বিস্তার হয়—এই বিস্তারও প্রথম অবস্থায় প্রকাশ করিবার কেহ থাকে না। কারণ অদ্বৈত হইতে দ্বৈতভাব যাহা আইসে তাহা সূচীর শতপত্র ভেদের ন্যায় হইয়া যায়। মনে হয় যেন সূচী এক মুহূর্তে শতপত্রভেদ করিল—কিন্তু ক্রম অনুসারেই সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়াতে মন পর্য্যন্ত আসিলে পরে সৃষ্টির প্রকাশ মন দ্বারা অনুভূত হয়। যেমন বালক জ্ঞানলাভের বহু পূর্ব্বে বহু কর্ম্ম করে কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া তবে আপন কর্ম্ম বিচার করিতে পারে—কেন কর্ম্ম হইল তাহারও আলোচনা করিতে পারে সেইরূপ। জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মে লয় হয়, কিন্তু জাগিবার বহু পূর্ব্বে জীবের বহু কর্ম্ম হইয়া যায়—শেষে জাগ্রত হইয়া দেখে সে অহং অভিমান করিয়া ফেলিয়াছে এবং অহং অভিমানটি ধরিবার বহু পূর্ব্বে তাহার মধ্যে বহু সংকল্প হইয়া গিয়াছে।—রামঅভিমানী পুরুষ জন্মিবার বহু পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা হইয়া যায়। জীব জন্মিয়াই রামায়ণ আরম্ভ করেন, কিন্তু বহু পরে বুঝিতে পারেন রামায়ণ কবে লেখা হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিব্যাপার সম্বন্ধে মহাপ্রলয়ের কথা আর একবার শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। "জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা জীবের নিতান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি যে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র তাহা ধারণা করিবার জন্যই প্রকৃতির লয় ব্যাপার শুনিতে চাই। এই ব্যাপার ভালরূপে ধারণা না করিতে পারিলে মিথ্যা প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া বোধ করা যাইবে না। পরমার্থ-সত্য আত্মাই যে একমাত্র সত্য পদার্থ তাহাও বোধ হইবে না। সত্যকে সত্যরূপে না জানিলে এবং এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া না জানিলে কখনই আপনস্বরূপ যে আনন্দ তাহাতে স্থিতিলাভ করা যাইবে না। এই জন্য মহাপ্রলয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান্—আপন স্বরূপে স্থিতিলাভে যে সাধক ইচ্ছা করেন, তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই তত্ত্ব বিচার করিতে হয়—ইহা তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর।

সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মই আছেন। তুমি অন্য যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু দৃশ্যজাত—এই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র, মানব জাতি, বৃক্ষজাতি, পশু জাতি, পক্ষী জাতি, যাহা কিছু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিতে আছে তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ। সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা। সর্গস্থিতি বিনাশ এই প্রকৃতিরই হয়। মহাপ্রলয়ে এই প্রকৃতিই নষ্ট হইয়া যায়।

চুম্বক সন্নিধানে লৌহের স্পন্দনের ন্যায় পরমাত্মা সন্নিধানে প্রকৃতি স্বভাবতঃই কম্পিত হন। ইহাই সৃষ্টি। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর সেই শান্ত পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রকৃতি বিচিত্র সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েন ; সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও খণ্ড মত হয়েন। আবার সেই পরমাত্মা দ্বারাই তিনি প্রলয়ের জন্য চালিত হয়েন। প্রকৃতি নাচিয়া নাচিয়া তাঁহা হইতে সরিয়া যাইলেই সৃষ্টি। আবার প্রকৃতি তাঁহার আহ্বানে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই প্রলয়। প্রকৃতি সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া শেষে পরমাত্মাতে যখন ডুবিয়া যান তখন সেই শিব শান্ত পরমপুরুষ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। কোনরূপ আর তাঁহার থাকে না।

বিধি, বিষ্ণু, রুদ্রাদি রূপ ত্যাগ করিয়া তিনি আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠারূপ পরমাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। স্পন্দরূপিণী প্রকৃতির নাম মহাকালী. আর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের নাম মহাকাল।

ভগবতী, কালরাত্রিরূপিণী ময়ূরী যখন জগৎ বিষধর ভুজঙ্গকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন তদীয় দেহ-দর্পণে জগতের যে বিপরীত নৃত্য হয় তাহা স্বরূপতঃ বলা দুঃসাধ্য। যখন মহাকালীর নৃত্যাবেগে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতে থাকে, তখন সুনীল আকাশ হইতে তারকানিচয় ছিঁড়িয়া পড়ে, পর্ব্বত সমূহ ঘুরিতে থাকে, দেব দানবগণ মশকনিকরের ন্যায় বায়ুভরে ইতঃস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে; চক্রাস্ত্রের ন্যায় ঘূর্ণমান্ দ্বীপ ও সাগরে আকাশমণ্ডল আবৃত হয়। পর্ব্বতনিচয় বায়ুবেগে উপরে তরঙ্গ-সমীরণে তৃণের ন্যায় উড্ডীয়মান্ হয়. স্থিরচিত্তে একবার ভাবনা করিয়া দেখ দেখি - মহাপ্রলয় কিরূপ? পর্ব্বত, বৃক্ষাদি ভূতল হইতে আকাশে, আবার আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে থাকে, গৃহ অট্টালিকা সমুদায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে। ক্রমে সমুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া নৃত্য করে, পর্ব্বতও অত্যুচ্চ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সমুদ্রে পতিত হয়, আকাশ চন্দ্র সূর্য্যের সহিত ভূমণ্ডলের কোন্ অধঃপ্রদেশে চলিয়া যায় কে বলিবে? কালরাত্রির নৃত্যকালে পর্ব্বত আকাশে উঠিয়া সাগর দিক্ প্রান্তে ছুটিয়া. নদী, সরোবর, পুর, নগর ও অন্যান্য স্থান সকল নিজ আধার ছাড়িয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকে। অগাধ জলসঞ্চারী অতি বৃহৎ মৎস্যাদি জলজন্তু সকল জলাশয় সমভিব্যাবহারে মরুভূমিতে নীত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ নষ্ট হইয়া যায়,—থাকে কেবল নিবিড় সর্ব্বব্যাপী অন্ধকার। সেই অন্ধকার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, রবি, যম প্রভৃতি দেবতাগণ, অসুরগণ, তড়িতের বিলাসের ন্যায় অস্থির ভাবে ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে থাকেন। কল্পান্ত কালে বিশালশরীরা মহাভৈরবী কল্পান্ত রুদ্রের পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক যখন নৃত্য করেন, আর কল্পান্ত রুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নিতে যখন সমস্ত দগ্ধ হইয়া স্থাণু মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন নৃত্যাবেশে সেই দেবী প্রলয়ের প্রবল বাত্যায় বিচূর্ণিত অরণ্যশ্রেণীর ন্যায় আন্দোলিত হয়েন। দেবদানবগণের বিবিধ বর্ণের মস্তকশ্রেণী তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা। এই মুণ্ডমালা কুদ্দাল, উদুখল, চর্ম্মাসন, ফল, কুম্ভ, মুসল, উদকেশ প্রভৃতি বস্তু বিজড়িত হইয়া ভগবতী কালরাত্রির গলদেশে প্রবলবেগে দুলিতেছে—তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মহাকালীর এই মূর্ত্তি একবার ধ্যান কর, আর আমিও শ্রোতৃবর্গকে আশীর্ব্বাদ করি —হে শ্রোতৃবর্গ! ঐ যে গলদেশে মুণ্ডমালা দোলাইয়া মস্তককে গরুড়পক্ষনির্ম্মিত শিখায় বিভূষিত করিয়া, হস্তে যম মহিষের বিশাল শৃঙ্গ লইয়া পরমানন্দে যিনি ডিমি ডিমি, পচ পচ, ঝমা ঝম্য ইত্যাকার তালে নৃত্য করিতেছেন এবং যিনি মধ্যে মধ্যে সেই কালভৈরবের নৃত্যোৎদিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছেন—হে শ্রোতৃবর্গ! সেই কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই কালরুদ্র তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

অর্জ্জুন—তুমিই সেই কালরুদ্র, আমি তোমাকে নমস্কার করি। নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করি—সৃষ্টির সংহার কি কোন ক্রম অনুসারে হয় অথবা বিশৃঙ্খলভাবে হয়।

ভগবান্—সৃষ্টি বা সংহার সম্পূর্ণ মায়িক হইলেও ইহাদের ক্রম আছে। যে ক্রমে সংহার হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মহাপ্রলয়কালে প্রবল পরাক্রান্ত ভূতসমূহ ক্ষিপ্ত হইয়া যখন পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিতে ছুটিতে থাকে, তখন প্রথমে পৃথিবীকে জলরাশি গ্রাস করে। পৃথিবীর কারণ জল। কার্য্য কারণেই লয় হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র। পৃথিবীর সার যে গন্ধতন্মাত্র তাহা জলের সার রসতন্মাত্রে লীন হইয়া যায়। যখন পৃথ্বী জলরূপে পরিণত হয়, তখন আবার ঐ জলরাশি অগ্নি ও সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, আর রসতন্মাত্র,রূপতন্মাত্রে নিঃশেষ হয়। আবার বায়ু অগ্নিরাশিকে আত্মসাৎ করে, আর সূর্য্য উত্তাপকে গ্রাস করেন। রূপতন্মাত্র তখন স্পর্শতন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। পরে বায়ুরাশি অকাশে লীন হয় এবং স্পর্শতন্মাত্র আর থাকে না—থাকে শব্দতন্মাত্র। শব্দতন্মাত্র, তামস অহঙ্কার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়—এই সময়ে পৃথ্ব্যাদি পঞ্চভূত থাকে না—শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র থাকে না—দেহাদি স্থূল পদার্থ ত পূর্ব্বেই নষ্ট হয়, এক ঘনীভূত সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে। ইন্দ্রিয়, তৈজস অহঙ্কারে লয় হয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বৈকারিক অহঙ্কারে লয় প্রাপ্ত হয়। মহত্তত্ত্ব তখন অহঙ্কারকে গ্রাস করে এবং মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে সত্ত্ব রজ তম গুণান্বিতা প্রকৃতি। সত্ত্ব রজ তমের বৈষম্যাবস্থা থাকে না—যিনি থাকেন তিনি আদ্যাপ্রকৃতি, তিনি অনির্ব্বচনীয়া। ইনিই অব্যক্তা, ইনিই মায়া, ইনিই স্পন্দনাত্মিকা। পুরুষস্পর্শে স্পন্দন আর থাকে না—থাকে, চলন রহিত সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষই রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তিতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। তাই বলিতেছি অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

যা　　　　শ্রী　　　　ম

হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ মদপেক্ষয়া পরতরং শ্রেষ্ঠং পরমার্থসত্যম্ অন্যৎ কিঞ্চিদপি ন অস্তি ন বিদ্যতে অথবা পরমেশ্বরাৎ পরতরং অন্যৎ কারণান্তরং ন বিদ্যতে অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বমিদং চিদচিদ্বস্তুজাতং সূত্রে তন্তৌ মণিগণাঃ রত্নসমূহা ইব প্রোতঃ অনুস্যূতমনুগতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ।

মৎসত্তয়া মদিব মৎস্ফুরণেন চ স্ফুরদিব ব্যবহারায় মায়াময়ায় কল্পতে

ম
সর্ব্বস্য চৈতন্যগ্রথিতত্বমাত্রে দৃষ্টান্তঃ সূত্রে মণিগণা ইবেতি। অথব

ম
সূত্রে তৈ সাত্মনি হিরণ্যগর্ভে স্বপ্নদৃশি স্বপ্নপ্রোতা মণিগণা ইবেতি

নী আ
সর্ব্বাংশেঽপি দৃষ্টান্তো ব্যাখ্যেয়ঃ। যদ্বা যথা চ মনয়ঃ সূত্রেঽনুস্যূতা-

আ
স্তেনৈব ধ্রিয়ন্তে তদভাবে বিপ্রকীর্য্যন্তে তথা ময্যেবাত্মভূতে সর্ব্বং

আ
ব্যাপ্তম্, ততো নিকৃষ্ট' বিনষ্টমেব স্যাদিতি শ্লোকোক্তং দৃষ্টান্তমাহ

আ ম
সূত্রেতি॥ অন্যেতু ব্যাচক্ষতে—মত্তঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্ব-

ম
কারণাৎ পরতরং প্রশস্ততরং সর্ব্বস্য জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং

ব ম
কারণমন্যন্নাস্তি হে ধনঞ্জয়! যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি সর্ব্বকারণে

ম
সর্ব্বমিদং কার্য্যজাতং প্রোতং গ্রথিতং নান্যত্র। সূত্রে মণিগণা ইবেতি

ম
দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে, ন তু কারণত্বে। কনকে কুণ্ডলাদিবদিতি তু

ম
যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ॥ ৭॥

হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পরমার্থ সত্য) অন্য কিছুই (বিদ্যমান) নাই। সূত্রে মণিমালার মত আমাতে এই সমস্ত (চিদচিদ্দৃশ্য জাত) গ্রথিত॥ ৭॥